নানা লেখা

॥ ম্যাকসিম গর্কি ॥

অনুবাদ : সরোজকুমার দত্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা ১২

সূচী

আমেরিকায়

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

বিবিধ

আমেরিকায়

॥ পীত দানবের সহর ॥

...পৃথিবী ও সমুদ্রের উপর যে কুয়াসা জমা হইয়াছে, তাহাতে ধোঁয়ার পরিমাণ কম নহে। সহরের কালো বাড়ীগুলির ও রাস্তার পাশে জমিয়া থাকা ঘোলা জলের উপর ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম বৃষ্টিধারা পড়িতেছে।

বহিরাগতেরা জাহাজখানির পাশে আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও ভয় মেশানো কৌতুহলী দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছে।

'স্বাধীনতা-মূর্তি'টির দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকাইয়া পোলাণ্ডের একটি মেয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে?"

কে যেন জবাব দিল, "আমেরিকার দেবতা।"

ব্রোঞ্জের সেই বিশাল নারীমূর্তিটির মাথা হইতে পা পর্যন্ত মরিচায় ঢাকা। তাহার ভাবলেশহীন মুখখানির শূন্যদৃষ্টি কুয়াসার আস্তরণ ভেদ করিয়া দূরে সমুদ্রের অবারিত বুকের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সূর্য কখন তাহার প্রাণহীন দুটি চোখের দ্বারে আলোর পশরা লইয়া আসিবে, মূর্তিটি যেন তাহারই অপেক্ষা করিয়া আছে। এই 'স্বাধীনতা'র পদতলে মাটি এত কম যে, মনে হয় তিনি যেন সমুদ্রের মধ্য হইতেই উঠিয়াছেন, সমুদ্রের জমাটবাঁধা তরঙ্গগুলিই যেন তাঁহার পাদপীঠ। সমুদ্র ও জাহাজের মাস্তুলগুলির মাথার উপর উত্থিত বাহু মূর্তিটির ভঙ্গিমাকে এক গর্বোন্নত রাজকীয় সৌন্দর্যে ও মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার হাত বজ্রমুঠিতে যে মশালটি ধরিয়া আছে মনে হয় এখনই তাহা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে শিখা ধূসর ধোঁয়ার যবনিকাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া আনন্দের তীব্র আলোকে চারিদিক ভরিয়া দিবে।

যে সামান্য মাটিটুকুর উপর মূর্তিটি দাঁড়াইয়া আছে তাহার চারিপাশ দিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের দানবীয় জন্তুর মত বিশালকায় লোহার জাহাজগুলি নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইতেছে; ক্ষুধিত শিকারী পাখীর মত ছোট ছোট জাহাজগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ভোঁ বাজিতেছে, যেন রূপকথার দৈত্যের কণ্ঠস্বর; ক্রুদ্ধ তীব্র তীক্ষ্ম শব্দে বাজিতেছে হুইস্‌ল; নোঙরে-শেকলে উঠিতেছে ঝনৎকার। ঢেউগুলি এক ভয়াল ভঙ্গীতে তীরের কোল মুছিয়া দিয়া যাইতেছে।

সব কিছুই যেন রুদ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, দুলিতেছে তীব্রভাবে। দ্রুতগতিতে জল পিষিয়া পিষিয়া চলিয়াছে জাহাজের চাকাগুলি, সে জল ঢাকিয়া যাইতেছে হলদে ফেনায়, বলিরেখার ভাঁজ পড়িতেছে সে ফেনার বুকে।

লোহা, পাথর, জল, কাঠ,—সব কিছুই যেন এক সূর্যালোকহীন, আনন্দ-সঙ্গীতহীন, অনন্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিকর কারাজীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। মানুষের প্রাণগ্রাসী এক রহস্য-শক্তির কশাঘাতে সব কিছুই যেন আর্ত-নাদ করিতেছে, গর্জন করিতেছে। লোহার আঘাতে আঘাতে পিষ্ট ও চূর্ণবিচূর্ণ জল, পরিত্যক্ত আবর্জনায় ও খাদ্যের উচ্ছিষ্টে সে জল কলুষিত। সেই জলের সারা বুকের উপর যেন এক অদৃশ্য অশুভ শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে। সেই শক্তি বৈচিত্র্যহীন ভয়াল ভঙ্গীতে অবিশ্রাম দোলা দিয়া চলিয়াছে এই প্রকাণ্ড যন্ত্রটিকে,—জাহাজ ও ডক যে যন্ত্রের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, মানুষ যে যন্ত্রের একটি নগণ্য স্ক্রু; জাহাজ, নৌকা, মালবাহী গাদাবোটের বিশৃঙ্খল ভীড়ের লোহা ও কাঠের কদর্যজটিল জঞ্জালের মধ্যে একটি অদৃশ্য বিন্দু ছাড়া কিছুই নহে।

এই কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত ও বধির, এই প্রাণহীন জড়ের নৃত্যে তিক্ত ও উত্যক্ত, সর্বাঙ্গে ঝুলকালি ও তেলমাখা একটি দ্বিপদ প্রাণী দুই পকেটের মধ্যে অনেকখানি হাত ঢুকাইয়া কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার মুখের উপর তেল ও ময়লার আবরণ। সে আবরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে যাহা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা মানুষের চোখের দৃষ্টির আলোক নহে, সাদা দাঁতের ঝলকানি।

জাহাজখানি ধীরে ধীরে ভীড়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিল। বহিরাগতদের মুখগুলি অদ্ভুত বিবর্ণ ও নির্বোধ দেখাইতেছে। তাহাদের চোখে যেন গড্ডালিকা-প্রবাহের আভাস। জাহাজের পাশে জড়ো হইয়া তাহারা নীরবে কুয়াসার দিকে তাকাইয়া আছে।

এই কুয়াসার মধ্য হইতে কী যেন জন্ম নিতেছে। উহা এত বিশাল যে ধারণার অতীত। উহার বুক হইতে একটা শূন্য চাপা গর্জন বাহির হইয়া আসিতেছে। ক্রমেই সে বড় হইতেছে, তাহার গন্ধময় ভারী নিঃশ্বাস লোকগুলির গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। তাহার গলার শব্দের মধ্যে যেন একটা লুব্ধ ভীষণতা রহিয়াছে।

ইহা একটি সহর। ইহার নাম নিউইয়র্ক। বিশতলা বাড়ীগুলি ও শব্দহীন

কালো কালো 'স্কাইস্ক্রেপার'গুলি সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছে। চতুষ্কোণ আড়ষ্ট প্রকাণ্ড বাড়ীগুলি নিরানন্দ, বিষণ্ণমুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর হইবার কোন ইচ্ছাই যেন তাহাদের নাই। তাহাদের উচ্চতার মধ্যে এক দম্ভ প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেকটি বাড়ীতে এই কদর্যতার ছাপ পড়িয়াছে। কোন জানলায় ফুল নাই, কোথাও একটি শিশু চোখে পড়ে না।...

এই দূর হইতে সহরটিকে দেখাইতেছে অসমান কালো কালো দাঁতওয়ালা একটি চোয়ালের মত। তাহার প্রতি নিঃশ্বাসে আকাশে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হইতেছে। মেদস্ফীত পেটুকের মত সে হাঁসফাঁস করিতেছে।

সহরে প্রবেশ করিতে গেলে মনে হয়, পাথর ও লোহার তৈরী এমন এক পাকস্থলীর মধ্যে ঢুকিতেছি যে পাকস্থলী লক্ষ লক্ষ মানুষকে গিলিয়া খাইয়া এখন পরিপাক করিতেছে।

সহরের প্রবেশপথ যেন লালসার লালাসিক্ত এক পিচ্ছিল কণ্ঠনালী। এই কণ্ঠনালীর গভীর অভ্যন্তরে জীবন্ত মানুষেরা সহরের খাদ্যের কালো কালো টুকরার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাথার উপর, পায়ের তলায়, এপাশে, ওপাশে সর্বত্রই লোহার ঝনৎকারে এই সহরের জয়ের বাজনা বাজিতেছে। প্রাণ পাইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে, দৈবশক্তিতে সে শক্তিমান। জাল ফেলিয়া সে মানুষ ধরিতেছে। তারপর তাহাকে টুঁটি পিষিয়া মারিয়া তাহার রক্ত ও মস্তিষ্ক শুষিয়া খাইতেছে, চিবাইয়া খাইতেছে তাহার পেশী ও স্নায়ুগুলি, ক্রমেই সে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ক্রমেই সে বেশী করিয়া তাহার জাল ছড়াইয়া দিতেছে।

অতিকায় পোকার মত ইঞ্জিনগুলি পেছনে গাড়ী বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; মোটরগাড়ীগুলি মোটা রাজহাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, বিদ্যুৎশক্তিতে একঘেয়ে কান্নার সুর। স্পঞ্জ যেমন জল টানিয়া লয়, তেমনই শ্বাসরোধকারী বাতাস চারিপাশ হইতে হাজার রকমের প্রচণ্ড কর্কশ শব্দ টানিয়া লইতেছে। এই ভয়াল সহরের হাতে নিষ্পিষ্ট ও কারখানার ধোঁয়ায় কলুষিত হইয়া বাতাস ঝুলকালিমাখা দেয়ালগুলির উপরে থমকিয়া আছে।

পার্কে ও স্কোয়ারগুলিতে যেখানে গাছের ধূলিমলিন পাতাগুলি নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভভাবে ডালের উপর নুইয়া পড়িয়াছে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে স্মৃতিস্তম্ভরূপে অনেকগুলি মর্মর মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মুখে ময়লার পুরু পর্দা পড়িয়াছে। যে চোখে একদিন দেশপ্রেমের আলো জ্বলিত, সে চোখ আজ সহরের ধূলায় ঢাকিয়া গিয়াছে। এই ব্রোঞ্জের মানুষগুলি প্রাণহীন; চারিপাশের বহুতলা বাড়ীর ভীড়ের মধ্যে তাহারা নিঃসঙ্গ। উঁচু দেয়ালের ছায়ার অন্ধকারে তাহাকে কত ছোটই না দেখাইতেছে। চারিপাশের উন্মত্ততা ও বিশৃঙ্খলার ভীড়ে পথ হারাইয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং ব্যথিত, বিষণ্ন হৃদয়ে ক্ষীণদৃষ্টিতে পায়ের নীচের মানুষগুলির লুব্ধ কলরব তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন। ছোট ছোট কালো কালো মানুষ স্মৃতিস্তম্ভগুলির পাশ দিয়া ব্যস্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। বীরের মুখের দিকে কেহ এক মুহূর্ত ফিরিয়া তাকাইতেছেন। যাহারা স্বাধীনতা সৃষ্টি করিয়া-

ছিলেন তাঁহাদের নাম মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া দিয়াছে রাজধানী নামক এই অতিকায় জন্তু।

ব্রোঞ্জের মানুষগুলি মনে হয় সকলেই একই বিষণ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন :

"এই জীবনই কি আমরা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম?"

তাহাদের চারিপাশের জ্বরতপ্ত জীবনযাত্রা জ্বলন্ত চুল্লীর উপর ঝোলের মত ফুটিতেছে। ঝোলের মধ্যে খাদ্যকণার মত ফুটন্ত পানীয়ের বুদ্বুদশীর্ষে অসংখ্য ছোট মানুষ সমুদ্রের জলে দিয়াশলায়ের কাঠির মত উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরপাক খাইতেছে। পশুর মত গর্জন করিতে করিতে এই সহর এক এক করিয়া তাহাদের গিলিয়া গিলিয়া অতৃপ্ত জঠর পূর্ণ করিতেছে।

স্মৃতিস্তম্ভের উপরের কোন কোন বীর তাহাদের হাত নামাইয়াছে, কেহ কেহ আবার হাত তুলিয়া, জনসাধারণের মাথার উপর দিয়া সে হাত বাড়াইয়া দিয়া সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছেন,

"থাম! এ ত জীবন নয়, এ উন্মত্ততা..."

রাস্তার জীবনযাত্রার উন্মত্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইঁহাদের স্থান নাই, প্রয়োজন নাই। লালসা ও লুণ্ঠনের এই বর্বর হুঙ্কারের মধ্যে, কাঁচ, পাথর, লোহার তৈরী এই বিষণ্ণ মায়াপুরীর শ্বাসরোধকারী কারাগারের মধ্যে ইঁহাদের যেন মানায় না।

একদিন রাত্রে পাদপীঠ হইতে ইহারা সকলেই নামিয়া আসিবে ও অত্যাচারিতের ভারী পায়ে সহরের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। নিঃসঙ্গতার মর্মযন্ত্রণা নিঃশব্দে বহন করিয়া তাহারা সহর ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইবে। চলিয়া যাইবে সেই নির্জন প্রান্তরে যেখানে চাঁদ ওঠে, হাওয়া বয়, পরিপূর্ণ শান্তিতে চারিদিক ভরিয়া থাকে। সারা জীবন যে দেশের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করিল, মৃত্যুর পরে একটু শান্তিতে থাকিবার অধিকার অহার নিশ্চয়ই আছে।

ফুটপাথ বাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে এদিক-ওদিক লোক চলিয়াছে, রাস্তা যেদিকেই গিয়াছে লোকও সেইদিকে চলিয়াছে। পাথরের দেয়ালের গভীর গর্তগুলি তাহাদের শুষিয়া লইতেছে। লোহার উল্লসিত গর্জন, বিদ্যুতের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, কোথায় কোন্ নূতন ধাতুর জাল পাতা হইতেছে তাহারই নির্মাণকার্যের ঝনঝনানি —সব কিছু মিলিয়া যে শব্দ উঠিতেছে তাহাতে সমুদ্রের গর্জনে পাখীর ডাকের মতই মানুষের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যাইতেছে।

মানুষগুলির মুখ অনড়, অসাড়, শান্ত। তাহারা যে জীবনের ক্রীতদাস ও সহরদানবের পুষ্টি, তাহা যেন তাহারা জানে না। তাহারা মনে করে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের বিধাতা। মাঝে মাঝে স্বাধীনতার চেতনা তাহাদের চোখে ফুটিয়া ওঠে; কিন্তু তাহারা ত বোঝে না যে তাহাদের এই স্বাধীনতা কাঠুরিয়ার হাতের কুঠারের স্বাধীনতা, কামারের হাতের হাতুড়ির স্বাধীনতা,—যে রাজমিস্ত্রী চতুর হাসিয়া সকলের জন্য এক বিশাল অথচ শ্বাসরোধকারী কয়েদখানা

বানাইতেছে, সেই রাজমিস্ত্রীর হাতের একখানি ইটের যে স্বাধীনতা এ স্বাধীনতাও সেই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার দম্ভ সত্যই বড় করুণ। বহু বলিষ্ঠ মুখই চোখে পড়ে, কিন্তু প্রত্যেক মুখেই প্রথমে চোখে পড়ে দাঁত। চিত্তের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা, অন্তরের স্বাধীনতার দীপ্তি কোন মুখেই ফুটিয়া ওঠে না। ইহাদের এই স্বাধীনতাহীন শান্তি দেখিয়া যে ছুরি এখনও ভোঁতা হইয়া যায় নাই তাহার ঠাণ্ডা ঝলকানির কথাই মনে পড়ে। এই স্বাধীনতা 'সোনা' নামক পীত দানবের হাতের অন্ধ যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

এত বীভৎস দানবীয় সহর আগে কখনো দেখি নাই। মানুষ যে এত নগণ্য, এত পরাধীন হইতে পারে আগে কোনদিন বুঝি নাই। কিন্তু মানুষ যে নিজের ভাগ্য লইয়া এতখানি খুশী থাকিতে পারে, তাহাও আগে কোনদিন দেখি নাই। লালসায় অন্ধ, অক্ষম, উদরসর্বস্ব এক রাক্ষস ভোজনরত পশুর মত গর্জন করিতে করিতে মানুষের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে, অথচ তাহার বীভৎস, বিশাল পাকস্থলীর মধ্যেই এই মানুষই কেমন নিশ্চিন্ত সন্তোষে দিন কাটাইতেছে। এতখানি মর্মান্তিক প্রহসন আগে কখনো চোখে পড়ে নাই।...

জনসাধারণের কথা বলিতে গেলে কষ্ট হয়, ভয় করে। সরু একটি রাস্তার বাড়ীগুলির মধ্যে দিয়া অসংখ্য সিঁড়ি ও চিমনির বৈচিত্রহীন জটিলতা ভেদ করিয়া তিনতলার মাথাসমান উঁচু লাইন বাহিয়া তীব্র চীৎকার ও ঘড়ঘড় শব্দ করিতে করিতে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। বাড়ীগুলির জানলা খোলা, প্রায় সব বাড়ীতেই মানুষ দেখা যায়। কেহ কাজ করিতেছে, ডেস্কের উপর মাথা নোয়াইয়া সেলাই অথবা হিসাব করিতেছে; কেহ কিছুই করিতেছে না, জানলার উপর হেলান দিয়া বসিয়া ট্রেন দেখিতেছে। প্রতি মিনিটেই একখানা করিয়া ট্রেন চলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ, তরুণ, শিশু সকলেই নীরব, সমান নীরব। এই অসাড় থাকিবার চেষ্টা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এ চেষ্টার কোন উদ্দেশ্য নাই, অথচ এই উদ্দেশ্যহীনতাকেই তাহারা উদ্দেশ্য ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। লৌহরাজের প্রভুত্বের প্রতিবাদে তাহাদের চোখে রাগের আগুন জ্বলিয়া ওঠে না, লৌহরাজের জয়যাত্রার প্রতি তাহাদের মনে কোন ঘৃণা নাই। ট্রেনের গতিতে বাড়ীর দেয়ালগুলি কাঁপিতে থাকে। কাঁপিতে থাকে মেয়েদের বুক, ছেলেদের মাথা, শিশুদের দেহ। এইভাবেই এই কদর্য জীবনকে অনিবার্য অদৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয়। যে মস্তিষ্ক অবিরাম নাড়া খাইতেছে, সে মস্তিষ্কের চিন্তাধারার পক্ষে সূচীশিল্পের অভিনব সুন্দর পরিকল্পনা অসম্ভব; কোন জীবন্ত দুঃসাহসী স্বপ্ন সে মস্তিষ্কে কিছুতেই রূপগ্রহণ করিতে পারে না।

হঠাৎ চোখের উপর দিয়া একটি বৃদ্ধার অন্ধকার মুখ ভাসিয়া গেল। তাহার পরণের ময়লা ব্লাউজের সামনেটা খোলা। যন্ত্রণাজর্জর বিষাক্ত বাতাস ধাবমান ট্রেনকে পথ ছাড়িয়া দিয়া ভয়ে ছুটিয়া গিয়া পড়িল বৃদ্ধার জানলার উপর। বৃদ্ধার

রুক্ষ পাকা চুলগুলি হঠাৎ একটা সাদা পাখীর ডানার মত ঝাপট খাইতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহার নিষ্প্রভ ক্ষীণ চোখ দুটি বন্ধ করিল। তারপর তাহাকে আর দেখা গেল না।

ঘরের মধ্যের আবছা অন্ধকারে চোখে পড়ে ছেঁড়া বিছানার স্তূপভর্তি লোহার খাট, নোংরা তৈজসপত্র, টেবিলের উপর ভুক্তভোজ্যের উচ্ছিষ্ট। কোন জানলায় একটা ফুল দেখিবার জন্য মন আকুল হইয়া ওঠে, কোথাও কেউ বই পড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য চোখ মেলিয়া থাকি। ধাবমান ট্রেনের পাশ দিয়া দেয়ালগুলি যেন গলিয়া বহিয়া যাইতেছে, সম্মুখে আসিতেছে ঘোলা বন্যাস্রোত ও তাহারই খরস্রোতে নিঃশব্দে ভাসিতেছে অসংখ্য বিষণ্ণ মানুষ।

ধুলায় ঢাকা একটি জানলার কাঁচের ওপাশে দেখা গেল একটি মাথা। মাথায় চুল নাই। একটি কারিগরের বেঞ্চের উপর মাথাটি এদিক-ওদিক দুলিতেছে। একটি রোগা লালচুলওয়ালা মেয়ে জানলায় বসিয়া মোজা সেলাই করিতেছে, তাহার কালো দুটি চোখ সেলাইয়ের ঘর গণিবার কাজে নিবিষ্ট। বাতাসের ঢেউ আসিয়া তাহাকে জানলা হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে হাতের কাজ হইতে চোখ তোলে নাই, বাতাসে বিস্রস্ত পরনের পোষাকটিকেও ঠিক করে নাই। বছর পাঁচেক বয়সের দুইটি শিশু চিমনির উপর কাঠের টুকরা দিয়া ঘর বানাইতেছিল। বাড়ীটি নড়িয়া ওঠায় সে ঘর ধ্বসিয়া গেল। পাছে সেগুলি জানলা দিয়া গলিয়া পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে ছোট ছোট হাত দিয়া তাহারা ভঙ্গুর কাঠের টুকরাগুলি আঁকড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যে জিনিসটি তাহাদের কাজ ভণ্ডুল করিয়া দিল সেই ট্রেনের দিকে তাহারা ফিরিয়াও তাকাইল না। জানলায় জানলায়, মুহূর্তে মুহূর্তে মুখের পর মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। মুখগুলি যেন একটা সমগ্র কিছুর ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরা। কে যেন একটা বড় কিছুকে পিষিয়া অসংখ্য ছোট পথের পাথরে পরিণত করিয়াছে।

পাগলের মত ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। তাড়া খাইয়া ছুটিয়া পালাইয়াছে সম্মুখের বাতাস। সে বাতাস আসিয়া এই সব মানুষগুলির চুল ও পোষাক উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে, সে বাতাস একটা গরম গুমোট ঢেউয়ের মত তাহাদের মুখে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাদের কাণে বাজাইতেছে হাজার হাজার শব্দের ঝন্‌ঝনা, চোখে মারিতেছে সূক্ষ্ম ধূলির নির্মম ঝাপ্‌টা। চোখের দৃষ্টি নিভিয়া আসিতেছে, কাণে বাজিতেছে একটা অনন্ত অবিশ্রাম গর্জন।...

যে জীবন্ত মানুষ চিন্তা করে; মনের রাজ্যে স্বপ্ন গড়ে, ছবি আঁকে, মূর্তি বানায়, কামনার জন্ম দেয়, আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, দাবি করে, অস্বীকার করে, প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই জীবন্ত মানুষের কাছে এই চীৎকার, হুঙ্কার ও বুনো গর্জন, এই পাথরের দেয়ালের কম্পন, জানলার কাঁচের এই থর্‌থরানি অসহ্য। রাগে সে এ বাড়ী ছাড়িয়া দিবে, ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিবে এই উঁচুতলার ট্রেনযাত্রাকে। সে স্তব্ধ করিয়া দিবে লোহার এই উদ্ধত চীৎকারকে। সে-ই জীবনের মালিক, অধীশ্বর। জীবন তাহারই জন্য। এই জীবনের সম্ভোগে যাহা কিছু বাধা সৃষ্টি করিবে তাহাকে সে ধ্বংস করিবে।

যাহা কিছু মানুষকে হত্যা করে, পীতদানবের সহরের মানুষেরা তাহা শান্ত-ভাবে সহ্য করে।

* * *

উঁচু রেল লাইনের লোহার জালবিস্তারের তলায় নীচে ফুটপাথের উপর শিশুরা খেলা করিতেছে। পৃথিবীর যে কোন দেশের শিশুর মতই তাহারা হাসিতেছে, চীৎকার করিতেছে। কিন্তু মাথার উপরের বিকট শব্দে তাহাদের মুখের কোন শব্দই শোনা যাইতেছে না। গভীর শব্দের সমুদ্রে তাহাদের কথার বৃষ্টি-বিন্দুগুলি ডুবিয়া যাইতেছে। শিশুগুলিকে দেখিয়া মনে হয়, কে যেন জানলা দিয়া কতকগুলি ফুল রাস্তার নোংরার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহাদের শরীরে লাগিয়াছে সহরের দেহনিঃসৃত তেল। তাহারা বড় রোগা, বড় ফ্যাকাশে। তাহাদের রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে, মরিচাধরা ধাতুর তীক্ষ্ম চীৎকারে, শৃংখলিত বিদ্যুতের আর্তনাদে তাহাদের স্নায়ু উত্তপ্ত হইয়াছে।

মনে প্রশ্ন জাগে, এই শিশুরা কি সুস্থ, সাহসী, সুগঠিত মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে? ঘর্ষণ, গর্জন ও ক্রুদ্ধ আর্ত চীৎকার ছাড়া কোন জবাব নাই।

ইস্ট সাইডের পাশ দিয়া দ্রুতবেগে ট্রেনখানি বাহির হইয়া গেল। ইহাই সহরের পচা ডোবা, সহরের সমস্ত ময়লা এখানে আসিয়া জমা হইতেছে। এখানেই সহরের গরীবদের বাস। এখানকার রাস্তার গভীর নর্দমাগুলি ধরিয়া গেলে সহরের ঠিক মাঝখানে পেঁছান যায়। মনে হয়, সহরের ঐ কেন্দ্রস্থলে একটি বিশাল অতলস্পর্শ গহ্বর অথবা একটি কড়াই কিম্বা ঐ প্রকারের কোন প্রকাণ্ড পাত্র রহিয়াছে, যেখানে এই লোকগুলিকে সিদ্ধ করিয়া সোনা তৈরী করা হইতেছে। রাস্তার নর্দমাগুলিতে শিশুরা কিলিবিলি করিয়া বেড়াইতেছে।

দারিদ্র্য জীবনে কম দেখি নাই, দারিদ্র্যের রক্তহীন, বর্ণহীন সবুজ মুখ আমার কাছে অপরিচিত নহে। যেখানে গিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি দারিদ্র্যের চোখ— কখনও ক্ষুধায় নিষ্প্রভ, কখনও লোভে জ্বলিতেছে, কখনও চতুর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ, কখনও ক্রীতদাসের মত ভীত, সশংক; সে চাহনি কোনদিন মানুষের চাহনি নহে। কিন্তু ইস্ট সাইড অঞ্চলে দারিদ্র্যের যে রূপ দেখিলাম, দারিদ্র্যের এত ভয়াবহ রূপ আর কোথাও দেখি নাই।

খাবারের থলির মত ভীড়ঠাসা রাস্তাগুলিতে শিশুরা লুব্ধদৃষ্টিতে ফুটপাথের ডাস্টবিনে পচা সব্জী খুঁজিতেছে এবং এক টুকরা পাইবামাত্র সেখানে, সেই ধুলা ও গরমের মধ্যে দাঁড়াইয়াই নোংরাসমেত গিলিয়া খাইতেছে।

এক টুকরা ছাতাপড়া রুটি লইয়া তাহাদের মধ্যে হিংস্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়; কে গিলিবে তাহা লইয়া কুকুরের মত মারামারি করে তাহারা। তাহারা ফুট-পাত ছাইয়া থাকে একদল লোভী পায়রার মত। রাত্রি একটা দুটো, এমন কি তার পরও আবর্জনাস্তূপের মধ্যে দারিদ্র্যের এই করুণ জীবাণুগুলি ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘুরিয়া বেড়ায় পীতদানবের ধনী ক্রীতদাসদের লালসার জীবন্ত ধিক্কারের মত।

সংকীর্ণ রাস্তাগুলির কোণে কোণে এক ধরনের উনুন রহিয়াছে। তাহাতে

কি যেন রান্না হইতেছে। একটা সরু নলের মধ্য দিয়া আকাশে বাষ্প বাহির হইয়া যাইতেছে এবং ইহারই ডগায় একটি ছোট বাঁশী বাজিতেছে। এই বাঁশীর বাতাসকাঁপানো তীব্র তীক্ষ্ম শব্দে রাস্তার অন্য সব শব্দ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বাঁশী বাজিয়াই চলিয়াছে। মনে হইতেছে, ঠান্ডা ঝক্‌ঝকে সাদা সুতো দিয়া কে যেন গলায় ফাঁস জড়াইয়া চলিয়াছে, তালগোল পাকাইয়া দিতেছে চিন্তায়, পাগল করিয়া তুলিতেছে, কোথাও কাহাকে দিয়া কিছু করাইয়া বসিতেছে, থামিতেছে না এক মুহূর্তও। পচাগন্ধভরা বাতাসকে কাঁপাইয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, ধূলিকলঙ্কিত জীবনকে সে ধ্বংসের পরোয়ানা লইয়া আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

ধূলা, ধূলা, এই ধূলা আচ্ছন্ন করিয়াছে সব কিছুকেই,—আচ্ছন্ন করিয়াছে বাড়ীর দেয়াল, জানলার কাঁচ, মানুষের পোষাক, তাহার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ, তাহার মস্তিষ্ক, তাহার বাসনাকামনা, তাহার চিন্তাভাবনা......

গৃহের প্রবেশদ্বারের আঁধার গহ্বরগুলি যেন দেয়ালের পাথরের বুকে পচা ক্ষত। এই গহ্বরের মধ্য দিয়া তাকাইলেই চোখে পড়ে জঞ্জাল-ছড়ানো সিঁড়ির ময়লা ধাপগুলি। মনে হয়, ভেতরের সব কিছুই যেন পচা লাসের মত পচিয়া গলিয়া পড়িতেছে। আর মানুষ সেখানে কৃমির মত কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে......

একটি দোরগোড়ায় এক দীর্ঘাঙ্গী নারী একটি শিশু কোলে লইয়া বড় বড় কালো চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার বুকের জামাটি খোলা, লম্বা থলির মত দুটি নীলাভ স্তন ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শিশুটি চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, মায়ের ক্ষুধাশীর্ণ দেহটিকে কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া একাকার করিতেছে, মুখে দুধ চুষিবার শব্দ করিতেছে, তারপর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আবার আরও বেশী জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, হাত দিয়া পা দিয়া মারিতেছে মায়ের বুকে। মা পাথরের মূর্তির মত নির্বিকার নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে। সামনের কোন একটি বিন্দুতে পেচকের মত গোল দুইটি চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া আছে নির্বিকার মা। মনে হয়, ওই চোখ দুইটি রুটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছে না। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সবটুকুই চলিয়াছে নাক দিয়া; রাস্তার পচাগন্ধময় বাতাস টানিবার সময় তাহার দুইটি নাসাপথ কাঁপিয়া উঠিতেছে। গতকাল যাহা খাইয়াছে তাহার স্মৃতি ও ভবিষ্যতে কোনদিন যে খাওয়া জুটিতে পারে তাহার স্বপ্ন লইয়া বাঁচিয়া আছে এই নারী। চীৎকার করিতেছে কোলের শিশুটি, ক্ষুধায়-কান্নায়-রাগে আথালি-পাথালি করিতেছে তাহার ছোট বিবর্ণ দেহখানি। কিন্তু কান্না, চীৎকার কিছুই মার কানে যাইতেছে না, শিশুর হাতের কোন আঘাতই সে অনুভব করিতেছে না...

লম্বা, রোগা, ফ্যাকাসে একটি বৃদ্ধ। মাথায় টুপি নাই। লুঠেরার মত মুখ। সন্তর্পণে আবর্জনাস্তূপ ঘাঁটিতেছে এবং রুগ্ন চোখের লাল দুটি পাতা কুঁচকাইয়া কয়লার কুচি তুলিতেছে। কেহ কাছে গেলে সে নেকড়ের মত ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে ও বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে।

অত্যন্ত ফ্যাকাসে ও রোগা একটি যুবক ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া

ধূসর দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে রাস্তার দিকে। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া চুলের মাথাটি সে ঝাঁকুনি দিতেছে। তার হাত দুটি ট্রাউজারের পকেটে অনেকখানি ঢুকানো, আঙগুলগুলি কাঁপিতেছে।

এই রাস্তায় একটি লোক দেখা গেল। তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ, বিরক্তি ও প্রতিহিংসা। ক্ষুধা, উত্তেজনা, যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মুখে। মানুষগুলির যে বোধশক্তি আছে তা বোঝা যায়। জলমগ্ন জাহাজের ভাসিয়া-যাওয়া মালের মত পরস্পরের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া তাহারা এই ঘোলা জলের নোংরা নর্দমায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ডুবিতেছে, উঠিতেছে, পাক খাইতেছে ক্ষুধার তাড়নায়, খাদ্যের আকাঙ্ক্ষাই তাহাদের প্রাণশক্তি যোগাইতেছে।

একমুঠো অন্নের প্রতীক্ষায় থাকিয়া যখন তাহারা পরিতৃপ্তির স্বপ্ন দেখে, তখন বুক ভরিয়া টানে এই বিষাক্ত বাতাস আর তাহাদের মনের অন্ধকার পাতালে শক্ত হইয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে নানা ভাবনা, জন্ম নেয় চতুর কামনা ও পাপ প্রবৃত্তি।

সহরের পাকস্থলীতে তাহারা রোগের বীজাণুর মত, অবিশ্রাম তাহাদের যে মারাত্মক বিষের যোগান দিয়া চলিয়াছে এই সহর একদিন সেই বিষই সারা সহরকে সংক্রামিত করিবে।

ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া যুবকটি মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকুনি দিতেছে। ক্ষুধায় দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে। সে কি ভাবিতেছে, সে কি চায় আমি যেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। সে চায় প্রচণ্ড শক্তিশালী দুইটি বিশাল হাত ও পিঠের উপর দুইটি ডানা। হ্যাঁ, ঠিক এই-ই সে চায়। যদি এই হাত ও ডানা সে পায় তবে একদিন উড়িয়া সহরের মাথায় উঠিয়া লোহার ডাণ্ডার মত হাত দুখানি দিয়া সে সহরটিকে ধরিবে ও সারা সহরটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভস্ম ও আবর্জনাস্তূপে পরিণত করিবে, ইটের সহিত বিকাইয়া দিবে মুক্তা, সোনাকে মিশাইয়া দিবে ক্রীতদাসের রক্তমাংসের সাথে; কাঁচ ও কোটিপতি, জঞ্জাল, নির্বোধ মানুষের দল, মন্দির, ধূলিবিষাক্ত গাছপালা, এই অর্থহীন অনেক তলার স্কাইস্ক্রেপার,—সব কিছুই ও সমগ্র সহরটিকেই সে পরিণত করিবে আবর্জনা ও মানুষের রক্তের এক মিশ্রিত মণ্ডস্তূপে—পরিণত করিবে এক কদর্য বিশৃঙখলায়। রোগশয্যাশায়ী মানুষের গায়ে যেমন ক্ষত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তেমনই এই যুবকের মনে এই ভীষণ ইচ্ছার উদ্রেক হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। যেখানে ক্রীতদাসের কাজই বেশী, সেখানে স্বাধীন, সৃজনশীল চিন্তার কোন স্থান থাকিতে পারে না। ধ্বংস ও প্রতিহিংসার বিষাক্ত ফুল ও পশুর প্রচণ্ড প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই সেখানে জন্মিতে পারে না। ইহা সহজেই বুঝা যায়,—মানুষের অন্তরাত্মাকে অন্ধকারে রাখিয়া তুমি তাহার নিকট হইতে মার্জনা প্রত্যাশা করতে পার না।

প্রতিহিংসার অধিকার আছে মানুষের। মানুষই মানুষকে এই অধিকার দিয়াছে।

* * *

ধোঁয়ার কালির মত মেঘে ঢাকা আকাশে ধীরে ধীরে দিন মিলাইয়া গেল। বড় বড় বাড়ীগুলি আরও বিষণ্ন, আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। এক অদ্ভুত

জানোয়ারের হলদে চোখের মত অন্ধকারের গভীরে এখানে সেখানে আলো জ্বলিতে লাগিল। কবরগুলির মৃত সম্পদ সারা রাত জাগিয়া পাহারা দিবে যেন এই জানোয়ারটি।

দিনের কাজ শেষ করিয়াছে লোকেরা। কেন এই কাজ, কোন্ প্রয়োজন ছিল এই কাজের—তাহাদের জীবনে সেকথা একবারও না ভাবিয়া ঘরের দিকে ছুটিয়াছে তাহারা খাদ্য গ্রহণের জন্য। ফুটপাথ ভাসাইয়া চলিয়াছে মানুষের কালো বন্যা, সকলের মাথায় একই গোল টুপী, চোখ দেখিলেই বুঝা যায় সকলের মগজই ইতিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাজ সারা হইয়াছে, আর ভাবিবার কিছু নাই। তাহারা শুধু তাহাদের মনিবের কথাই ভাবে, নিজেদের কথা ভাবিবার সময় কোথায় তাহাদের। যদি কাজ থাকে, তবে রুটি মিলিবে আর মিলিবে জীবনের সস্তা স্ফুর্তি। পীত দানবের সহরের মানুষেরা এর বেশী কিছু চায় না।

বিছানায় যায় সবাই, নারী যায় পুরুষের কাছে, পুরুষ যায় নারীর কাছে। তারপর, রাত্রে বাতাসহীন রুদ্ধ ঘরে ঘামে ভিজিয়া তাহারা চুম্বন করিবে যাহাতে সহরের আহার ও পুষ্টির জন্য নতুন তাজা খাদ্যের জন্ম হয়।......

চলিয়াছে তাহারা। কোন হাসির শব্দ বা খুশির কথা শোনা যায় না; হাসি ভাসিয়া ওঠে না কোন মুখে।

ভেঁপু বাজাইয়া চলিয়াছে মোটরগাড়ী, সপাৎ সপাৎ উঠিতেছে চাবুকের শব্দ, বিদ্যুৎতারে বাজিতেছে গুঞ্জনধ্বনি; ঝমঝম করিয়া চলিয়া যাইতেছে ট্রেনগুলি। কোথাও না কোথাও সংগীতের আওয়াজ হইতেছে নিশ্চয়।

খবর কাগজের হকার ছোকরারা কাগজের নাম ধরিয়া চেঁচাইতেছে। সারেংগীর একঘেয়ে ইতর আওয়াজ মিশিয়া গেল এক হঠাৎ-আর্তনাদে, রাস্তার ভাঁড় যেন এলাইয়া পড়িল খুনীর বাহুবন্ধনে—তেমনি করুণ আর হাস্যকর। পাথর যেমন করিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া গড়াইয়া চলে, তেমনই চলিয়াছে ইচ্ছাশক্তিহীন মানুষের দল.........

আরও অনেক হলদে আলো জ্বলিয়া উঠিল—দেয়ালগুলির সর্বাংগ জ্বলিয়া ওঠে আগুনের অক্ষরে লেখা বিয়ার, হুইস্কি, সাবান, নতুন ক্ষুর, সিগার ও থিয়েটারের বর্ণনায়। লোহার ঝনঝনানি কখনও থামে না। স্বর্ণদেবতার অতৃপ্ত ক্ষুধার অবিশ্রান্ত তাড়নায় রাস্তায় রাস্তায় এক মুহূর্তও কোথাও লোহার আর্তনাদ থামে না। এখনও আলোকে আলোকে যখন সারা সহর উদ্ভাসিত তখন এই অবিশ্রাম গোঙানির নূতন অর্থ, নূতন তাৎপর্য ধরা পড়ে। উৎপীড়নশক্তির এক ভীষণতর নূতনরূপে সে দেখা দেয়।

বাড়ীর দেয়াল, রেস্তোরাঁর জানলা হইতে এই গলিত সোনার চোখধাঁধানো রূপ ঝরিয়া পড়িতেছে। এই উদ্ধত নির্লজ্জের দিগ্বিজয়ী রূপ দেখিয়া চোখ জ্বালা করে, তার শীতল খরপ্রভার যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হইয়া আসে। জনসাধারণের উপার্জ্জনের নগণ্য কণামুষ্টিকে আত্মসাৎ করিবার এক অদম্য বাসনা জাগিয়া থাকে

তাহার দুই চোখের ধূর্ত উজ্জ্বলতার মধ্যে। তাহার চোখের ইসারাই আগুনের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়া সস্তা স্ফূর্তির দিকে মজুরদের হাতছানি দিয়া ডাকে...

আলোর এক উদ্দাম বন্যা চলিয়াছে সারা সহরের বুকে। প্রথমে বড় মনোরম লাগে, আনে উত্তেজনা, আনে আনন্দ। আলো ত স্বাধীন, সূর্যের গর্বিত সন্তান সে। এই আলো যখন প্রাচুর্যে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, জীবনের স্পন্দনে কাঁপিতে থাকে তাহার পাপড়িগুলি তখন পৃথিবীর যে কোন ফুলের চেয়ে সে মনোহর, লোভনীয় হইয়া ওঠে। সমস্ত আবর্জনা ধুইয়া মুছিয়া জীবনকে সে নির্মল করিয়া তোলে, যাহা মৃত, অতীত ও মলিন তাহাকে ধ্বংস করে।

কিন্তু এই সহরের স্বচ্ছ কাঁচের কারাগারে বন্দী আলোর দিকে তাকাইলে বোঝা যায়, অন্য সব কিছুর মত আলোও এখানে বন্দী। আলোকে এখানে সোনার সেবা করিতে হয়, এখানে সোনার জন্যই আলো। শত্রুর মত জনজীবন হইতে এখানে সে বিচ্ছিন্ন......

লোহা, পাথর, কাঠ সব কিছুর মত আলোও এখানে মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। চোখ ঝলসাইয়া দিয়া সে মানুষকে ডাকে,

"এখানে এসো।"

তারপর মিষ্ট কথায় মন ভুলাইয়া বলে,

"টাকাপয়সা যা' আছে সব দাও।"

সে কথায় মানুষ ভোলে, সে ডাকে মানুষ সাড়া দেয়। প্রয়োজন নাই এমন সব বাজে জিনিস সে কেনে আর তাকাইয়া থাকে সেই তামাসার দিকে যাহা তাহার বুদ্ধিকে আরও অসাড়, আরও নিষ্প্রভ করিয়া দেয়।

সহরের ঠিক মধ্যখানে কোথাও যেন বিরাট এক তাল সোনা মদালসকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে ও সোনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় সমস্ত পথ-ঘাট ঢাকিয়া যাইতেছে। লোকেরা সারাদিন ধরিয়া তাহাই খুঁজিতেছে ও কুড়াইতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সোনার তালটি ঠিক উল্টা দিকে ঘুরিতে শুরু করে, সৃষ্টি হয় এক ঠাণ্ডা ঘূর্ণী ঝড়ের। সেই ঝড়ের টানে জড়াইয়া পড়ে সমস্ত মানুষ, সারাদিন ধরিয়া যে সোনার কণা কুড়াইয়াছে সব ফিরাইয়া দেয়। যাহা কুড়াইয়া পাইয়াছে দেয় তাহার চেয়ে বেশী। সকালে দেখা যায় সোনার তাল আরও বড় হইয়াছে, আরও বেগে ঘুরিতেছে এবং তাহার ক্রীতদাস লোহার উল্লসিত চীৎকার এবং তাহার শৃঙ্খলিত সমস্ত শক্তিরই ঝনৎকার আগের চেয়ে বেশী হইয়াছে।

তখন দেখা যায় আগের দিনের চেয়ে আরও বেশী করিয়া সে মানুষের রক্ত ও মগজ গিলিয়া খাইতেছে যাহাতে সন্ধ্যায় এই একই রক্ত ও মগজ এক শীতল হলদে ধাতুতে পরিণত হইতে পারে। এই সোনার তালই সহরের হৃৎপিণ্ড। ইহার স্পন্দনেই সহরের সমস্ত জীবনের স্পন্দন, এই সোনার তালকে বাড়াইয়া তোলাই সহরের জীবনের চরিতার্থতা।

ইহার জন্যই দিনের পর দিন মানুষ মাটি খুঁড়িতেছে, লোহা বানাইতেছে, বাড়ী তৈরী করিতেছে, বুক ভরিয়া কারখানার ধোঁয়া টানিতেছে, শরীরের রোমকূপ দিয়া

টানিয়া লইতেছে দূষিত বিষাক্ত বাতাস। এই জন্যই তাহারা তাহাদের সুন্দর দেহ-গুলি বিক্রয় করিতেছে।

এই মোহিনী মায়ায় অসাড় হইয়া পড়িতেছে তাহাদের মন, পীত দানবের হাতের যন্ত্রে পরিণত হইতেছে তাহারা। ইহা দিয়াই সে অবিশ্রাম সোনা তৈয়ারী করিয়া চলিয়াছে,—সোনাই তাহার রক্তমাংস।

* * *

সমুদ্রের সীমাহীন বুক থেকে রাত্রি উঠিয়া আসে, সহরের উপর ধীরে ধীরে বিছাইয়া দেয় ঠাণ্ডা নোনা বাতাস। শীতল আলোগুলি হাজার হাজার শিখার তীর দিয়া বিন্ধ করে তাহাকে। কিন্তু সে আগাইয়া চলে, কালো অঙ্গরাখা দিয়া গভীর স্নেহে ঢাকিয়া দেয় বাড়ীগুলির কদর্যতা ও রাস্তাগুলির সংকীর্ণতা, ঢাকিয়া দেয় দারিদ্র্যের মলিন ছিন্নবাস। লুব্ধ উন্মাদের এক পাশবিক গর্জন ছুটিয়া আসে তাহার দিকে, ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় তাহার নীরবতাকে। তবু সে আগাইয়া চলে, বন্দী আলোর উদ্ধত উজ্জ্বলতাকে ধীরে ধীরে নিভাইয়া দিয়া, কোমল হাতে সহরের পুঁজে-ভরা ঘাগুলিকে ঢাকিয়া দিয়া সে আগাইয়া চলে।

কিন্তু সহরে যেখানে বহু রাস্তার গোলকধাঁধা, সেখানে প্রবেশ করিয়া সে দেখে যে সমুদ্রের তাজা হাওয়া দিয়া সহরের বিষবাষ্পকে সরাইয়া দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। রৌদ্রতপ্ত দেয়ালগুলির পাথরে গা ঘেঁষিয়া, ছাদের মরচে-ধরা লোহার উপর দিয়া গুঁড়ি মারিয়া, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত ধূলিধূসরিত ফুটপাতের নোংরা আবর্জনার উপর দিয়া পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া, অবশেষে সে বাড়ীগুলির মাথার উপর ও নর্দমাগুলির বুকে-বুকে নিস্পন্দ নিথর হইয়া থমকিয়া থাকে। যে টাটকা, তাজা, ঠাণ্ডাটুকু সে আনিয়াছিল পাথর, লোহা, কাঠ ও মানুষের দূষিত নাসারন্ধ্র তাহার সবটুকু শুষিয়া নেয়, শুধু জাগিয়া থাকে অন্ধকার। কোথায় সে রাত্রির নীরবতা, কোথায় তাহার কবিতা......

অন্ধকারের গুরুভার বুকে নিয়া সহর ঘুমাইয়া পড়ে, মাঝে মাঝে গোঙাইয়া ওঠে যেন বিশাল জন্তুর মত। সারাদিন সে এত বেশী খাইয়াছে যে তাহার গরম ও অস্বস্তি বোধ হয়। দুঃস্বপ্নে বার বার ঘুম ভাঙিয়া যায়।

প্ররোচনার কাজ ও বিজ্ঞাপনের দালালি দিনের মত শেষ হইয়া গেলে আলো-গুলি নিবিয়া যায়। এক এক করিয়া বাড়ীগুলি পাথরের জঠরে মানুষগুলিকে পুরিয়া ফেলে।

একটি রোগা, লম্বা, কুঁজো লোক একটি রাস্তার কোণে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে মাথাটি ঘুরাইয়া ভাবলেশহীন বিবর্ণ চোখে ডাইনে ও বামে তাকায়। কোথায় যাওয়া যায়? সমস্ত রাস্তাই এক রকমের; সমস্ত বাড়ীগুলি, সমস্ত জানলাগুলি একই প্রাণহীন ঔদাসীন্য লইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছে।

গরম হাত দিয়া কে যেন তাহার কণ্ঠনালী ধরিয়াছে, তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। বাড়ীগুলির ছাদের উপর একখণ্ড ঝাপ্‌সা মেঘ ঝুলিয়া আছে—এই হতভাগ্য, অভিশপ্ত সহরের সারাদিনের বাষ্পই এই মেঘ। এই ঝাপ্‌সা ঢাকনার

মধ্য দিয়া শান্ত তারাগুলির সামান্য দীপ্তি দেখা যাইতেছে আকাশের সুদূর অসীমে।

লোকটি টুপীটি খুলিয়া মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। এই সহরের বাড়ীগুলির বিশাল দৈর্ঘ পৃথিবী হইতে আকাশকে যত দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, এতদূরে ঠেলিয়া দিতে দুনিয়ার আর কিছুই পারে নাই। তারাগুলিকে দেখাইতেছে কয়েকটি নিঃসঙ্গ বিন্দুর মত।

দূর হইতে ভাসিয়া আসিল কর্কশ কাংস্যধ্বনি। শুনিলে ভয় করে। মানুষটির লম্বা লম্বা পা দু'খানি অদ্ভুতভাবে নড়িয়া ওঠে। সে একটি রাস্তায় নামিয়া পড়ে এবং দুই হাত দোলাইয়া মাথা নীচু করিয়া হাঁটিতে থাকে। বেশ রাত্রি হইয়াছে। ক্রমেই রাস্তা নির্জন হইয়া আসে। মানুষ মাছির মত অদৃশ্য হইয়া যায়, অন্ধকার তাহাদের গিলিয়া ফেলে। ধূসর টুপী-পরা পুলিশেরা লাঠি হাতে লইয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা তামাক চিবায়, চোয়ালগুলি ধীরে ধীরে নড়ে। লোকটি তাহাদের পাশ দিয়া, টেলিফোনের খুঁটির পাশ দিয়া, বাড়ীগুলির কালো কালো দরজার পাশ দিয়া হাঁটিয়া যায়। দূরে কোথায় একটি রাস্তার মোটরগাড়ী গোঙাইয়া ওঠে। রাস্তার খাঁচাগুলির মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রাত্রি মরিয়া যায়।

মাপা মাপা পা ফেলিয়া দীর্ঘ কুঁজো দেহখানি দোলাইয়া লোকটি হাঁটিয়া চলে। দেখিলেই মনে হয়, তাহার মনটি কাজ করিতেছে, এখনও কিছু ঠিক করিতে পারে নাই কিন্তু চূড়ান্ত কিছু সে করিবেই......

আমার মনে হয় লোকটি চোর।

সহরের এই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে একটি মানুষের মধ্যেও যে বোধশক্তি জাগিয়া রহিয়াছে ভাবিতেও ভাল লাগে।

খোলা জানলা দিয়া মানুষের ঘামের দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আসে।

এই শ্বাসরোধকারী ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত একঘেয়ে শব্দ শোনা যায়।

পীত দানবের পাণ্ডুর সহর ঘুমাইতেছে ও ঘুমের মধ্যে গর্জন করিয়া উঠিতেছে।

॥ শূন্যতার স্বপ্নপুরী ॥

রাত্রি আসে। সমুদ্রের বুক হইতে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এক আলো-ঝলমল মায়ানগরী। অন্ধকারের বুকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ওঠে লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ, আকাশের কালো পটভূমিকায় অপূর্ব সূক্ষ্মতায় ফুটিয়া ওঠে অনিন্দ্যসুন্দর হর্ম্য-রাজির গম্বুজকোণ, রঙিন স্ফটিকের প্রাসাদ ও মন্দির। আকাশের বুকে সোনালি সুতোর জালে বোনা আগুনের নকশা নীচের জলে নিজের প্রতিচ্ছায়ার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে নিথর নিস্পন্দ হইয়া থাকে। এ আগুনের রূপে চোখে নেশা লাগে, এ আগুনের গতিপ্রকৃতি বুদ্ধির অতীত। এ আগুন জ্বলে কিন্তু জ্বালায় না। এ আগুনের মহিমা যে কী সুন্দর তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সূক্ষ্মতম, সামান্যতম আলোর দোলা লাগিয়া আকাশ ও সমুদ্রের সীমাহীন ব্যাপ্তির বুকে এক আগুনের মায়াপুরী জাগিয়া ওঠে। মাথার উপর থমকিয়া থাকে একটি লাল আভা, জলের বুকে নগরীর ছায়াখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া গলিত সোনার ঢেউয়ের মধ্যে মিশিয়া যায়।......

এই আলোর খেলা দেখিতে দেখিতে মনে অদ্ভুত চিন্তা আসে। মনে হয়, দূরে ওই প্রাসাদগুলির কক্ষে কক্ষে এক আগ্নেয় উদ্দীপনার আলোকোদ্ভাসের মধ্যে গর্বোন্নত কোমল কণ্ঠে এমন গান উঠিতেছে যাহা কেহ কোনদিন শোনে নাই। তার অপূর্ব মনোহর সুরতরঙ্গের মধ্য হইতে জন্ম নিতেছে এই পৃথিবীর মহত্তম চিন্তা-ধারা। স্পর্শ করিতেছে তাহারা পরস্পরকে, জ্বলিয়া উঠিতেছে ক্ষণিক আলিঙ্গনে, জন্ম দিতেছে নূতন অগ্নিশিখার, নূতন চিন্তাধারার।

মনে হয়, ঐ মখমলের মত নরম অন্ধকারের মধ্যে ঊর্মিচঞ্চল সমুদ্রের বুকে

ধীরে ধীরে দ্নলিতেছে সোনার স্নতো, ফ্নল ও তারা দিয়া তৈয়ারী একটি বিশাল দোলনা। আর সেই দোলনার মধ্যে স্নর্য ঘ্নমাইয়া থাকেন সকাল পর্যন্ত।

* * *

স্নর্যই মান্নষকে জীবনের বাস্তবতার কাছাকাছি আনিয়া দাঁড় করায়। দিনের আলোকে দেখা গেল এই আগ্ননের মায়াপ্নরী কতকগ্নলি সাদা দালানের জড়াজড়ি ছাড়া কিছ্নই নয়।

সম্নদ্রের ব্নকের নীল আস্তরণ সহরের গাঢ় সাদা ধোঁয়ার সাথে আসিয়া মিশিয়াছে। সাদা দালানগ্নলিকে ঢাকিয়া আছে একটি স্বচ্ছ আবরণ। মরীচিকার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহারা যেন হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, এখানে আসিলে চমৎকার কিছ্ন পাইবে, পাইবে শান্তি।

দ্নরের পটভূমিকায় ধ্নলো ও ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে গ্নঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে সহরের চতুষ্কোণ বাড়ীগ্নলি, অবিশ্রাম আকাশ ভরিয়া উঠিতেছে তাহাদের অতৃপ্ত ক্ষ্নধার গর্জনে। এই নীরস ও কর্কশ শব্দে, লোহার তারের এই আর্ত চীৎকারে কাঁপিয়া ওঠে বাতাস, কাঁপিয়া ওঠে অন্তরাত্মা। স্বর্ণদেবতার কশাজর্জর প্রাণশক্তির আর্তবিলাপে, পীতদানবের বিদ্রূপের বাঁশীতে এই প্নথিবী অসহ্য মনে হয়। এই সহরের দ্নর্গন্ধময় দেহের দ্বারা পিষ্ট ও কল্নষিত প্নথিবীকে সত্যিই অসহ্য মনে হয়। তাই মান্নষ যায় সম্নদ্রের তীরে, ভাবে সম্নদ্রতীরের ঐ স্নন্দর সাদা বাড়ীগ্নলির মধ্যে আছে শান্তি ও বিশ্রাম।

সম্নদ্রের ব্নকে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ লম্বা বাল্নভূমির উপর জড়াজড়ি করিয়া বাড়ীগ্নলি দাঁড়াইয়া আছে। বাল্নভূমিটি যেন সম্নদ্রের কালো জলে গভীরভাবে প্রোথিত একটি ধারালো ছ্নরি। সে বাল্নভূমি স্নর্যালোকে জ্বলিতেছে। হলদে মখমলের উপর অপ্নর্ব স্নন্দর সাদা সিল্কের কাজের মত দেখাইতেছে এই বাড়ীগ্নলিকে। কেউ যেন এই বাল্নভূমিতে আসিয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছে, এবং তাহার দামী পোষাকটি বাল্নভূমির উপর দোল খাইতেছে।

ইচ্ছা হয় এই কোমল সিল্কের স্ত্নপ স্পর্শ করি, ইহার গভীর গহনে নিশ্চিন্ত আলস্যে শ্নইয়া দ্নই চোখ মেলিয়া দেখি সেই বিশাল বিস্তৃতি যেখানে সাদা পাখীগ্নলি নিঃশব্দে দ্রুত উড়িয়া যাইতেছে, সম্নদ্রের জ্বলন্ত আভার মধ্যে আকাশ ও সম্নদ্র ঘ্নমাইয়া আছে।

ইহাই কোনি দ্বীপ।

সোমবারের সহরের সংবাদপত্রগ্নলি গর্বের সঙ্গে পাঠককে জানাইয়াছে ঃ "গতকাল ৩০০,০০০ লোক কোনি দ্বীপে গিয়াছিল। তেইটি শিশ্ন মারা গিয়াছে।"

...বেশ লম্বা রাস্তা। ব্রুকলীন ও লং আইল্যান্ডের ধ্নলো ও গোলমালে ভরা রাস্তা দিয়া গাড়ীতে অনেকটা পথ যাইবার পর চোখে পড়িবে কোনি দ্বীপের চোখ-ধাঁধানো র্নপ। সত্যই এই অগ্নিপ্নরীর প্রবেশদ্বার দাঁড়াইয়া তাকাইলে চোখ ঝলসিয়া

যায়। লক্ষ লক্ষ সাদা স্ফুলিঙ্গ চোখে আসিয়া লাগে; এই লক্ষ ধূলিকণার মধ্যে বহুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই ঠাহর করা যায় না। চারিপাশের সবকিছুই যেন এই আগুনের ফেনার ঘূর্ণীঝড়ের মধ্যে পড়িয়াছে। সবকিছুই ঘুরিতেছে, জ্বলিতেছে, হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। মুহূর্তে লোক হতভম্ব হইয়া যায়, আলোর ঝলসানিতে তাহার মন অসাড় হইয়া পড়ে, মাথা হইতে সমস্ত চিন্তা মুছিয়া যায়, সে জনতার একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হইয়া যায়। এই লক্ষ আলোর ঝলকানির মধ্যে মানুষ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার মন অস্বচ্ছ, সাদা কুয়াশার স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা মস্তিষ্ক, একটা অধীর প্রত্যাশা তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। আলোর ঝলসানিতে অন্ধ একটি কালো জনস্রোত চারিপাশে রাত্রির কালো সীমান্তে সীমাবদ্ধ এক নিথর নিস্পন্দ আলোর সরোবরে গিয়া পড়ে।

ছোট ছোট বাতি হইতে শুষ্ক ঠান্ডা আলো ঝরিয়া পড়িতেছে সবকিছুর উপর। দেয়াল, জানালা, বাড়ীর কার্ণিশ ও খুঁটিগুলিতে ঝুলানো রহিয়াছে এই আলোগুলি। বিদ্যুৎ স্টেশনের লম্বা চিমনিগুলিতে পর্যন্ত সারি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে এই দীপমালা। সব বাড়ীর ছাতের উপরই এই আলো জ্বলিতেছে, মানুষের চোখে বিঁধিতেছে তাহাদের নিষ্প্রাণ উজ্জ্বলতার তীক্ষ্ম সূচীমুখ। চোখ পিট পিট করিয়া তাকাইতেছে তাহারা, হাসিতেছে বোকার মত, জড়াইয়া যাওয়া শিকলের ভারী কড়াগুলির মত ধীরে ধীরে নিজেদের টানিয়া ফিরিতেছে তাহারা।

জীবনের আনন্দ ও উল্লাস হইতে বঞ্চিত, ভীতিবিস্ময়ে অভিভূত এই মানুষের ভীড়ের মধ্যে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে কেহ নিজের সত্তা দেখিতে পায় না। ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের চেতনাকে যে জাগ্রত রাখিতে পারে সে দেখে এই লক্ষ লক্ষ প্রদীপ হইতে বিচ্ছুরিত এক আনন্দহীন আলোর আঘাতে সব কিছুই নগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং সৌন্দর্যের সম্ভাবনার একটা ক্ষীণ আভাস মাত্র দিয়া এই আলো চারিপাশে এক নির্বোধ কদর্যতাকে প্রকট করিয়া তুলিতেছে। দূর হইতে মায়াপুরী মনে হয়, কাছে আসিলে দেখা যায় সে এক কাঠের তৈরী সরলরেখার অর্থ-হীন গোলকধাঁধা, শিশুদের মন ভুলাইবার জন্য তাড়াতাড়িতে তৈয়ারী সস্তা ইমারত; কোন কোন খুঁতখুঁতে স্বভাবের বৃদ্ধ শিক্ষক শিশুদের পলায়নে বিব্রত হইয়া খেলার মধ্য দিয়াও যেন তাহাদের বিনয় ও দীনতা শিখাইতে চাহিতেছেন। অনেক সাদা বাড়ীতে একটা বিচিত্র কদর্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের একটিতেও সৌন্দর্যের আভাসমাত্র নাই। বাড়ীগুলি কাঠের তৈরী, সারা গায় এমনভাবে সাদা রঙ মাখানো যে, মনে হয় সবগুলিই একই চর্মরোগে ভুগিতেছে। লম্বা চূড়া ও নীচু থামের সারি চলিয়া গিয়াছে বৈচিত্রহীন সমান রেখায়, এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে পরস্পরের সহিত যে রুচিতে বাধে। লম্বা চূড়া ও নীচু থামের আলোকসম্পাতে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে সব কিছুই। সর্বত্রই সমান আলো, কোথাও ছায়া নাই। প্রত্যেক বাড়ীটিকেই মনে হয় যেন কোন নির্বোধ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে চলিয়াছে ব্যাণ্ডের কাংস্যধ্বনি, অর্গানের আর্তনাদ, কালো কালো মনুষ্যদেহের চলাফেরা। চলিয়াছে পানভোজন, ধূমপান।

কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। তীর্যক আলোগুলির একটানা শিসের শব্দ, সঙ্গীতের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কর্কশ টুকরা, কাঠের অর্গান পাইপের একটানা কান্না মিশিয়া বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা মোটা, শক্ত, অদৃশ্য রজ্জু ঘুরাইবার বিরক্তিকর শব্দ উঠিতেছে সব কিছু মিলিয়া। এই অবিশ্রাম শব্দের মধ্যে যদি কোন মানুষ কথা বলিয়া উঠে, তবে তাহাকে নীচুগলার ভীত ফিস্‌ফিসানি বলিয়াই মনে হয়। আপনার কদর্য কুশ্রীতাকে উন্মুক্ত করিয়া সব কিছুই যেন এক নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য লইয়া জ্বলিতেছে।...

অন্ধ ও বধির-করা এই অসহ্য শূন্যতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষকে মুক্ত করিতে পারে এমন একটি জীবন্ত রক্তবর্ণ অগ্নিশিখার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে।...মনে হয় এইসব ক্ষুদ্রতায় আগুন লাগাইয়া দিই, তারপর সেই জীবন্ত অগ্নিশিখার বিচিত্রবর্ণা রসনার নৃত্যছন্দে তাল মিলাইয়া উন্মাদ উল্লাসে নৃত্য করি, গান গাই; আত্মিক দৈন্যের প্রাণহীন মহিমার ধ্বংস মহোৎসবের ভূরিভোজে মাতালের মত উদ্দাম হইয়া উঠি।

সত্যই এ শহর লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করিয়াছে। এ শহরের সমগ্র বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে খাঁচার মত বাড়ীগুলি। বাড়ীগুলির সব হলঘরেই কালো মাছির ঝাঁকের মত এই মানুষেরা ঘোরাফেরা তেছে। সামনে চলিয়াছে গর্ভভার বহন করিয়া গর্ভিনী নারীর দল। শিশুরা নিঃশব্দে, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে। সে চোখে এত আগ্রহ, এত কৌতুহল, যে সত্যই করুণা হয় তাহাদের জন্য। আহা! সৌন্দর্য বলিয়া ভুল করিয়া কদর্যতা দিয়াই তাহারা মনের ক্ষুধা মিটাইতেছে। পরিচ্ছন্ন করিয়া কামানো পুরুষদের মুখগুলির সবগুলিই যেন এক রকমের—ভারী ও নির্বোধ। সকলেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে আনিয়াছে; শুধু ভরণপোষণ নহে, বাহিরের চমৎকার দর্শনীয় বস্তুগুলিও দেখাইতে আনিয়াছে ভাবিয়া নিজেদের তাঁহারা পরিবারের মঙ্গলময় রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিতেছে। তাঁহারা নিজেরাও এই চাকচিক্যই পছন্দ করে। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিলে পাছে গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়া যায়, তাই ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া তাঁহারা এমন ভাব দেখাইতেছেন যেন কোন কিছুই তাঁহাদের মনে দাগ কাটে না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাঁহাদের এই অটুট গাম্ভীর্যের পশ্চাতে শহরের সমস্ত আনন্দ সম্ভোগের যে উদগ্র বাসনা রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাই এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যখন বৈদ্যুতিক নাগরদোলার ঘোড়া ও হাতীর পিঠে বসিয়া ঘন ঘন ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেগে শূন্যে ঘুরিবার তীব্র আনন্দের জন্য উত্তেজিত হইয়া অপেক্ষা করেন, তখনও উল্লাসের দীপ্তি ঢাকিবার জন্য মুখের উপর তাঁহারা অবজ্ঞার হাসি টানিয়া আনেন। এই ওঠা-নামার পাক খাওয়া শেষ হইয়া গেলে মুখগুলি তাঁহাদের আবার গাম্ভীর্যে কঠিন হইয়া ওঠে, তাঁহারা অন্য স্ফূর্তির দিকে আগাইয়া যান......

এ মেলায় খেলার শেষ নাই। লোহার চূড়ার মাথায় দুইটি সাদা ডানা ঝুলিতেছে। ডানা দুইটির সাথে বাঁধা দুইটি খাঁচা। খাঁচার মধ্যে মানুষ। একটা আকাশে উঠিতে থাকে, তখন খাঁচার লোকগুলির মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে, তাহারা সকলেই একইভাবে, নিঃশব্দে চোখ বড় বড় করিয়া ক্রমে-দূরে-সরিয়া-যাওয়া মাটির দিকে তাকাইয়া থাকে। একটি খাঁচা আকাশে উঠিবার সংগে সংগে দ্বিতীয় খাঁচাটি ধীরে ধীরে মাটির দিকে নামিতে থাকে। খাঁচার মানুষগুলির মুখ হাসিতে ভরিয়া যায়, শোনা যায় উল্লাসের চীৎকার। কোন কুকুরের বাচ্চাকে গলার বকলেশ ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরার পর মেঝেতে নামাইয়া দিলে সে যেমন আনন্দে চীৎকার করিতে থাকে, এ চীৎকারও ঠিক তেমনই।

আরেকটি চূড়ার মাথার চারিপাশে কতকগুলি নৌকা শূন্যে ঘুরিতেছে। আরেকটি চূড়া এমনভাবে ঘুরিতেছে যে সংগে সংগে ঘুরিতেছে কতকগুলি ধাতব নল। আরও আরও অনেক চূড়া ঘুরিতেছে, জ্বলিতেছে, শীতল আলোর নিঃশব্দ চীৎকারে ডাকিতেছে মানুষকে। সব কিছুই ঘুরিতেছে, শব্দ উঠিতেছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ, গুম গুম। আলোর অসহ্য ঝলসানিতে মানুষের মাথা ঘুরিতেছে, স্তিমিত হইয়া আসিতেছে চেতনা, অবসাদে ভাঙিগয়া পড়িতেছে স্নায়ু। পাতলা দৃষ্টি আরও পাতলা হইয়া আসিতেছে, রক্তশূন্য হইয়া মস্তিষ্ক যেন ফ্যাকাশে হইয়া আসিতেছে। আত্মঘৃণার গুরুভারে মরণোন্মুখ শূন্যতার এই অসহ্য অবসাদ যেন অবিরাম এক স্তিমিত যন্ত্রণা বহন করিয়া ঘুরিতেছে; বৈশিষ্ট্যহীন, বৈচিত্র্যহীন লক্ষ লক্ষ কালো কালো মানুষকে সে আপনার বিষণ্ণ নৃত্যের আবর্তে টানিয়া আনিয়া, বাতাস যেমন পথের আবর্জনাকে উড়াইয়া লইয়া যায়, তেমনই উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, এবং আবার তাহাদের ছড়াইয়া দিতেছে আর একবার টানিয়া জড়ো করিবার জন্য।......

ঘরের মধ্যেও আনন্দের ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ গুরুগম্ভীর আনন্দ, এ আনন্দের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান। এখানে দেখান হইতেছে নরক, দেখান হইতেছে তাহার কঠোর শাসনব্যবস্থা; আইনের পবিত্রতা ভঙ্গকারী নরনারীর জন্য যে হরেক রকমের শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে রহিয়াছে, ফলাও করিয়া দেখান হইতেছে তাহাও।

গাঢ় লাল রঙের কাগজের উপর কাগজ সাঁটিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে এই নরক। সমস্ত জিনিসটা বসান হইয়াছে একটা অগ্নিনিবারক বস্তুর মধ্যে। এই বস্তুটি হইতে একটা ভারী চর্বির দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। অত্যন্ত বিশ্রীভাবে তৈয়ারী হইয়াছে এই নরক, যে দর্শক সব কিছু যাচাই করিয়া দেখে সেও বিরক্ত হইবে এই নরক দেখিয়া। একটি গুহার মধ্যে ইতস্তত বিশৃংখলভাবে কতকগুলি 'পাথর' ছড়ানো রহিয়াছে। গুহার মধ্যে একটা নিরানন্দ লালচে আভা। লাল আঁটোসাঁটো পোশাক পরিয়া একটি পাথরের উপর বসিয়া আছে শয়তান। তাহার রোগা হলদে মুখের উপর নানা ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিতেছে। যেন একটা মোটা লাভের

কারবার সুসম্পন্ন হইয়াছে এইভাবে শয়তান হাতে হাত ঘষিতেছিল। পিচবোর্ডের তৈরী 'পাথরখণ্ডের' উপর বসিয়া থাকিতে নিশ্চয়ই তাহার অস্বস্তি লাগিতেছিল, কারণ তাহার এই অাসনটি দুলিতেছিল কড় কড় শব্দ করিয়া। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, এদিকে তাহার মোটেই নজর ছিল না। তাহার পায়ের তলায় পাপীদের উপর তাহার চরেরা যে অত্যাচার চালাইতেছিল, অখণ্ড মনোযোগের সহিত শয়তান তাহাই দেখিতেছিল।

একটি তরুণী নূতন টুপী কিনিয়া আর্শিতে খুশীমনে নিজের চেহারা দেখিতেছিল। তাহার পিছন হইতে আস্তে আস্তে আসিল শয়তানের দুইটি খর্বকায় চর; দেখিলে মনে হয় অনেকদিন তাহারা কিছু খায় নাই। পিছন হইতে আসিয়াই তাহারা দুইজনে মেয়েটির দুটি হাত ধরিল। চীৎকার করিয়া উঠিল মেয়েটি। কিন্তু তখন আর সময় নাই। একটি লম্বা, মসৃণ চোঙের মধ্যে ভরিয়া মেয়েটিকে তাহারা খাড়া নামাইয়া দিল গুহার মধ্যে। খাদ হইতে বাহির হইয়া আসিল সাদা বাষ্প, লক্‌লক্ করিয়া উঠিল লাল কাপড়ের তৈয়ারী অগ্নিশিখার রসনা এবং টুপী ও আর্শিসমেত চোঙ্ বাহিয়া খাদের মধ্যে নামিয়া গেল মেয়েটি।

একটি যুবক এক গ্লাস হুইস্কি পান করিতেই সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের চরেরা তাহাকে ধরিয়া মঞ্চের নীচের একটি গর্তে চালান করিয়া দিল।

নরকের আবহাওয়া গুমোট গরম। শয়তানের চরেরা বেঁটে, দুর্বল। কাজ করিতে করিতে যেন তাহারা একদম অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই কাজের একঘেয়েমি ও অর্থহীনতায় স্পষ্টই তাহারা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। তাই পাপীদের লইয়া তাহারা সময় নষ্ট করে না। হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একখণ্ড কাঠের মত চোঙের মধ্যে তাহাদের গড়াইয়া দিতেছে। তাহাদের দিকে তাকাইলে চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "যথেষ্ট হয়েছে। তোমরা ধর্মঘট করছ না কেন?"

প্রতিবেশীর থলি হইতে একটি তরুণী দুই-একটি মুদ্রা চুরি করে; সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের চরেরা তাহাকে পাচার করিয়া দেয়। শয়তান খুশীতে পা নাড়ে ও নাকিসুরে হাসিতে থাকে। এই অলস, অকর্মণ্য শয়তানের দিকে শয়তানের চরেরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় এবং কোন কাজে কিম্বা বিনিকাজের কৌতুহলে যে কেউ তাকাইতেছে নরকের মধ্যে তাহাকেই তাহারা জ্বলন্ত খাদের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে।

জনসাধারণ নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে এই সব ভয়াবহ অত্যাচার দেখিতেছে। হলের মধ্যে অন্ধকার। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল মাথায়, পুরু জ্যাকেট গায় একটা মোটা ভারী চেহারার যুবক বিষণ্নগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা দিতেছে।

মঞ্চের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া সে বলিতেছে যে, এই লাল পোশাকপরা বাঁকা-পাওয়ালা শয়তানের হাতে যদি না পড়িতে চাও তবে জানিয়া রাখ, কোন মেয়েকে বিবাহ না করিয়া চুম্বন করা অন্যায়, কারণ এই ধরনের চুম্বনের ফলে মেয়েরা গণিকা হইয়া যাইতে পারে; গীর্জার অনুমতি ছাড়া কোন যুবককে কোন মেয়ের চুম্বন করা উচিত নহে, কারণ এই চুম্বনের ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্ম হইতে

পারে; খরিদ্দারের পকেট হইতে টাকা চুরি করা গণিকাদের উচিত নহে; মদ অথবা কামনা জাগ্রত করে এমন অন্য কোন তরল পদার্থ কাহারও পান করা উচিত নহে। বিয়ারের দোকানে না গিয়া তাহাদের উচিত গীর্জায় যাওয়া। গীর্জায় যাওয়া ভালও বটে, সস্তাও বটে।

অবসন্ন একঘেয়ে গলায় যুবকটি বলিয়া চলে এইসব কথা। স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ধরনের জীবন সম্পর্কে প্রচার করিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে ধরনের জীবনে নিজে সে বিশ্বাস করে না।

পাপীদের চরিত্র সংশোধনমূলক এই প্রমোদব্যবস্থার মালিকদের উদ্দেশ্যে বলিতে ইচ্ছা করে :

"হে ভদ্রমহোদয়গণ! মানুষের আত্মার উপর যদি তোমাদের এই নীতিকথার বিন্দুমাত্র ফল দেখিতে চাও, অন্তত জোলাপ-প্রয়োগের ফলটুকুও যদি চাও, তবে তোমাদের নীতিপ্রচারকদের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা কর।"

এই রোমহর্ষক অনুষ্ঠানের শেষে গুহার এক কোণ হইতে উঠিয়া আসে এক দেবদূত। তাহার চেহারার উগ্র সৌন্দর্যে মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে। একটা তার দিয়া তাহাকে টানিয়া তোলা হয়; গিল্টিকরা কাগজে ঢাকা একটা কাঠের শিঙা দুই পাটি দাঁতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে শূন্য দিয়া গুহার এপাশ হইতে ওপাশ চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া শয়তান হঠাৎ সড়াৎ করিয়া পাপীদের পিছু পিছু খাদের মধ্যে চলিয়া যায়, চড় চড় করিয়া শব্দ ওঠে। পিচ্‌বোর্ডের তৈরী 'পাথর'গুলি এ ওর গায় গড়াগড়ি যায়, শয়তানেরর চরেরা ছুটি পাইয়া আনন্দে ছুটিয়া পালাইয়া যায়, তারপর যবনিকা নামিয়া আসে। দর্শকেরা উঠিয়া হল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দুঃসাহসী দু'একজন একটু হাসে। কিন্তু অধিকাংশই গম্ভীর। হয়ত তাহারা ভাবে, "নরক যদি এত ভয়ঙ্কর হয়, তবে হয়ত পাপ না করাই ভাল।"

চলিতে থাকে তাহারা। পাশের বাড়ীটিতে দেখান হইতেছে 'পরলোক'। পরলোক একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, নরকের মত এটিও কাগজে কাগজ সাঁটিয়া তৈরী। এখানেও অনেক খাদ। বিশ্রী জামাকাপড় পরা আত্মার দল এই খাদগুলির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের দিকে চোখ টিপিয়া চাওয়া চলে, কিন্তু তাহাদের খিমচি কাটা চলিবে না। এই পাতালপুরীর গোলকধাঁধার দেয়ালগুলি ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ভিজিয়া রহিয়াছে। এই বিষণ্ণ নিরানন্দ আবহাওয়ার মধ্যে থাকা কষ্টকর, বিরক্তিকর। আত্মাদের অনেকে অনবরত কাসিতেছে, অন্যেরা নিঃশব্দে তামাক চিবাইতেছে এবং মাটিতে হলদে পিক্ ফেলিতেছে। একটি আত্মা এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়া চুরোট টানিতেছে।...

পাশ দিয়া যাইবার সময় বিবর্ণ চোখ মেলিয়া তাহারা তোমার দিকে তাকাইবে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া অপার্থিব পোশাকের সাদা ভাঁজের মধ্যে ঠাণ্ডা হাত দুখানি ঢাকিয়া ফেলিবে। এই অভাগা আত্মার দল ক্ষুধার্ত। তাহাদের অনেকেই বাতে ভুগিতেছে। দর্শকেরা তাহাদের দিকে নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকে, বুক ভরিয়া ভিজা বাতাস টানে, নিরানন্দ শূন্যতা লইয়া বাঁচিয়া থাকে। নোংরা ভিজা ন্যাক্‌ড়া

দিয়া চাপিয়া ধরিলে ধীরে ধীরে ধিকি-ধিকি-করিয়া জ্বলা কয়লার টুকরাগুলি যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই এই শূন্যতা নিবাইয়া দিতেছে তাহাদের চিন্তাকে।......

আরেকটি বাড়ীতে রহিয়াছে 'বন্যা'। সকলেই জানেন, পাপের জন্য মানুষকে শাস্তি দিবার জন্য এই 'বন্যা'কে পাঠানো হইয়াছিল।...

এই শহরের সমস্ত দর্শনীয় বস্তুর একটি মাত্র লক্ষ্য। মৃত্যুর পর পাপের জন্য মানুষকে কিভাবে, কি দিয়া শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিভাবে ইহজীবনে শান্ত, নিরীহ ও আইন-অনুগত হইয়া বাঁচিতে হয়, মানুষকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নাই প্রদর্শনীর।

"করিবে না!"—ইহাই একমাত্র নির্দেশ। কারণ, জনসাধারণের অধিকাংশই মেহনতী মানুষ।

* * *

কিন্তু টাকা চাই, টাকা না হইলে চলিবে না। তাই, পৃথিবীর সর্বত্র যেমন ঠিক তেমনই এই আলো-ঝলসিত শহরের নিঃশব্দ কোণে কোণে মিথ্যা ও কপটতাকে বিদ্রূপ করিতেছে লালসা। অবশ্য প্রকাশ্যে নহে, তাই এ বিদ্রূপে তীক্ষ্ণতা নাই। কারণ ইহাও "জনসাধারণের জন্যই"। লাভের কারবার হিসাবে ইহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে, ব্যবস্থা হইয়াছে মানুষের পকেট কাটিবার। সমস্ত ব্যাপারটা টাকার লালসায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাই এই চোখঝলসানো নির্জীব জড়ত্বের চোরাবালির মধ্যে ইহাকে আরও অনেক বেশী ঘৃণ্য ও বীভৎস মনে হইতেছে।......

তবু মানুষ সেখানেই যায়, তাই চায়।......আলোয় আলোময় বাড়ীগুলির মধ্য দিয়া ঘন স্রোতের মত চলিয়াছে তাহারা। বাড়ীগুলি যেন ক্ষুধিত রসনা মেলিয়া তাহাদের মুখের মধ্যে টানিয়া লইতেছে। ডানদিকের বাড়ীগুলি অনন্ত নরক-যন্ত্রণার বিভীষিকা দেখাইয়া বলিতেছে :

"পাপ করিও না। পাপ করিলে বিপদে পড়িবে।"

বাঁ দিকে একটি বিস্তীর্ণ নাচের হলঘরে মেয়েরা মেঝের উপর গোল হইয়া ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে। চারি পাশে সব কিছুই যেন বলিতেছে :

"পাপ কর! পাপ করা বড় আনন্দের।......"

সুতীব্র আলোর চোখধাঁধানো ঝলসানিতে, সস্তা অথচ চমকলাগানো বিলা-সিতার প্রলোভনে, হাজার শব্দের নেশায় মানুষ মর্মান্তিক শূন্যতার শ্লথ নৃত্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। নাচিতেছে তাহারা অন্ধের মত। তাহাদের বাঁ পাশে পাপ, ডান পাশের বাড়ীতে নীতিবাগীশের বক্তৃতা।

মানুষের ভীড়ের এই অবিশ্রাম স্রোত মানুষের চিন্তা-চেতনাকে অসাড় করিয়া দিতেছে। নীতির কারবারী ও পাপের কারবারী উভয় পক্ষেই ইহা সমান লাভজনক।

যে নিয়ম জীবনে চলিতেছে তাহা হইল এই : মানুষ ছয় দিন কাজ করিবে এবং সপ্তম দিনে পাপ করিবে, পাপের মূল্য দিবে, স্বীকার করিবে, স্বীকৃতির মূল্য দিবে। ব্যাস্।

লক্ষ সাপের হিস্‌হিসানির মত শব্দ উঠিতেছে তির্যক আলো হইতে। ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে মানুষের মাছির ঝাঁক; একটা নির্জীব নিরানন্দ অক্ষমতার গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিতেছে সে ঝাঁকের বুক হইতে। এই মানুষ-মাছির ঝাঁক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরা পড়িতেছে মাকড়সার উজ্জ্বল সূক্ষ্ম জালের মতো এই বাড়ীগুলিতে। কোন তাড়া নাই, পরিষ্কার করিয়া কামানো মুখে কোন হাসি নাই। অলস অবসাদে ঘুরিতে ঘুরিতে ঢুকিতেছে তাহারা প্রত্যেক দরজা দিয়া। ঘুরিতে ঘুরিতে দাঁড়ায় পশুর খাঁচাগুলির সম্মুখে, তামাক চিবায়, থুথু ফেলে।

খাঁচার মধ্যে একটি লোক রিভলবারের আওয়াজ করিতে করিতে ও নির্মম ভাবে চাবুক চালাইতে চালাইতে কতকগুলি বেঙ্গল টাইগারকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। ভয়ে উন্মাদ, আলোয় অন্ধ এবং সঙ্গীতের ও গুলীর শব্দে বধির হইয়া এই সুদর্শন জানোয়ারগুলি গর্জন করিতে করিতে লোহার ডাণ্ডাগুলির মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের সবুজ চোখগুলি জ্বলিতেছে, ঠোঁট কাঁপিতেছে, রাগে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের দাঁতগুলি; কখনও এ পা, কখনও ও পা দিয়া শূন্যে থাবা মারিতেছে। লোকটি রিভলবার চালাইতেছে জানোয়ারগুলির চোখ লক্ষ্য করিয়া, এই ফাঁকা আওয়াজে ও চাবুকের তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া জানোয়ারটির বলবান বাঁকা দেহটি খাঁচার এক কোণে আশ্রয় লইতেছে। রাগে, ক্ষোভে, বলবানের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে, অপমানের যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া বন্দী জানোয়ারটি কোণে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্ত একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে; আঁকিয়া বাঁকিয়া এধার-ওধার করিতে থাকে তাহার সাপের মত লেজটি।

তাহার প্রসারণ-সঙ্কোচনশীল দেহটি সঙ্কুচিত হইয়া একটি পেশীপিণ্ডে পরিণত হইয়া কাঁপিতে থাকে; শূন্যে লাফ দিয়া চাবুক-হাতে লোকটির মাংসে নখর বসাইয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হয়।

পিছনের পা দু'খানি স্প্রিং-এর মত দুলিতে থাকে, ঘাড় লম্বা হইয়া যায়, চোখের সবুজ মণি দুইটি হইতে উল্লাসের গাঢ় নীল স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে।

বিবর্ণ, শীতল দৃষ্টিতে নির্নিমেষ প্রত্যাশা লইয়া তাকাইয়া থাকে বৈচিত্র্যহীন হলদে মুখগুলি; হাজার হাজার নির্মম ছুরিকাঘাতের মত সেই দৃষ্টিশলাকাগুলি জানোয়ারটির চোখের মণি দুইটিকে বিদ্ধ করিতে থাকে।

ভীড়ের মুখ প্রাণহীন অসাড়তায় ভীষণ হইয়া ওঠে; রক্ত দেখিতে চায় সে ভীড়, রক্তের জন্য অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করিয়া থাকে প্রতিহিংসার কামনা লইয়া নহে; বহুদিন ধরিয়া পোষমানা কোন বুনো জানোয়ার যেভাবে শুধু কৌতূহল লইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে, এ প্রতীক্ষাও সেই কৌতূহলের প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নহে।

মাথাটি আবার দুই ঘাড়ের মধ্যে টানিয়া লয় বাঘটি, যন্ত্রণায় বিস্ফারিত করে চোখ দুইটি, তারপর মৃদু শব্দ করিয়া শরীরটিকে পিছু টানিয়া লয়। প্রতিহিংসার তৃষ্ণায় গরম হইয়া ওঠা চামড়ার উপর কে যেন হঠাৎ বরফ-জল ঢালিয়া দিয়াছে।

লোকটি আবার রিভলবার ছুটায়, চাবুক চালায়, পাগলের মত চীৎকার করে। বাঘের সামনে দাঁড়াইয়া আতঙ্কে সে অভিভূত হইয়াছে। এই আতঙ্ককে সে ঢাকিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে, গভীর ধৈর্যে অপেক্ষমান রুদ্ধশ্বাস জনতাকে সে খুশি করিতে চায়। তাই সে চীৎকার করিয়া ওঠে। জনতা অপেক্ষা করিয়া থাকে, জানোয়ারটি কখন তাহার মারাত্মক লাফ মারিবে। একটা আদিম প্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠে জনতার মধ্যে, একটা লড়ায়ের আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হইয়া ওঠে, এক পরম আরামের স্নায়বিক অনুভূতির আশায় বসিয়া থাকে তাহারা সেই মুহূর্তটির জন্য, যখন দুইটি দেহ জড়াইয়া যাইবে, রক্ত বাহির হইবে ফিনকি দিয়া, ছিন্নভিন্ন নর-মাংস ছড়াইয়া পড়িবে খাঁচার মেঝেতে, একটি গর্জন ও একটি চীৎকারে কাঁপিতে থাকিবে বাতাস।......

কিন্তু জনতার মস্তিষ্ক নানা নিষেধ, নানা ভয়ের বিষে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। রক্ত সে চায় বটে, কিন্তু ভয়ও আছে। রক্ত সে চায় এবং চায়ও না এবং নিজের সহিত এই ভীষণ সংঘাতের মধ্যেই সে তীব্র উল্লাস অনুভব করে—সে বাঁচে।......

সমস্ত জানোয়ারগুলিকেই মানুষটি সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে; বাঘগুলি নিঃশব্দে খাঁচার পেছনে পিছু হটিয়া যায়, লোকটির সারা গায়ে ঘাম ঝরে। আজিকার মত বাঁচিলাম ভাবিয়া সে আশ্বস্ত হয়; বিবর্ণ ঠোঁটে সে হাসে ও কাঁপুনি ঢাকিবার চেষ্টা করে এবং জনতার তামাটে মুখের সম্মুখে মাথা নত করিয়া প্রণাম জানায়। জনতা যেন দেবমূর্তি।

উল্লাসে চীৎকার করিয়া জনতা হাততালি দিতে থাকে। তারপর তাহারা কালো কালো দলায় বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিপাশের শূন্যতার চটচটে কাদার মধ্যে ঘুরিতে থাকে।...

জানোয়ারের সহিত মানুষের লড়ায়ের দৃশ্যটি প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া জনতা অন্য স্ফূর্তি ও আমোদের খোঁজে যায়। সামনে সার্কাস। রিং-এর মাঝ-খানে একটি লোক লম্বা দুইটি পা দিয়া দুইটি শিশুকে শূন্যে ছুঁড়িয়া দেয়। লোকটির মাথার উপর ডানাভাঙ্গা দুইটি সাদা কপোতের মত উড়িয়া যায় বাচ্চা দুইটি, প্রত্যেক বারই তাহারা লোকটির পায়ের উপর আসিয়া পড়িতে পারে না, মাটিতে পড়ে। বাবা অথবা মালিকের রক্তবর্ণ উঁচু মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে ভয়ে আবার তাহারা শূন্যে উঠিয়া যায়।

রিং এর চারিপাশে ভীড় জমিয়াছে। একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে সকলেই। শিশুদের একটি যখন খেলোয়াড়ের পায়ের উপর পড়িতে পারে না, লোকগুলির মুখের উপর দিয়া একটা উল্লাসের ঢেউ বহিয়া যায়, পাঁকে ভরা ডোবার ঘুমন্ত জলের উপর দিয়া লঘু ঢেউ বহিয়া যাওয়ার মত।

গড়াইতে গড়াইতে, ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, গাহিতে গাহিতে, চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিতেছে এক মাতাল। তাহাকে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিল সকলেই।

মাতাল নিজে সুখী কারণ সে মাতাল। অন্তরের অন্তস্তল হইতে সব মানুষের জন্যই সে এই সুখ কামনা করিতেছে।...

হঠাৎ শুরু হয় সংগীত, কাঁপিতে থাকে ছিন্নভিন্ন বাতাস। ব্যান্ড খারাপ, বাদকেরা ক্লান্ত, যে সুর বাহির হইতেছে তাহাতে সংহতি নাই, যেন তাল রাখিতে না পারিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে। এই সুরগুলি যেন একটা ভাংগা লাইন ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—ছুটিয়া চলিয়াছে পরস্পরকে মারিয়া, ঠেলিয়া, উল্টাইয়া দিয়া। কেন যেন মনে হয়, সুরগুলি মানুষের চেহারায় তৈয়ারী এক একটি টিনের পাত—কাটিয়া চোখ, মুখ, নাক তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং দুইটি লম্বা সাদা কান বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যান্ড-বাদকদের মাথার উপর যে লোকটি ডান্ডা ঘুরাইতেছে সে এই ধাতুখণ্ডগুলিকে তাহার হাতলের মত কান দিয়া ধরিতেছে এবং অদৃশ্যভাবে ঊর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিতেছে। ব্যান্ড-বাদকেরা তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছে না। পরস্পরের সহিত সংঘাত শুরু হইয়াছে এই সুরগুলির; ফুঁ দিবার গর্তের মধ্যে বাতাস শিস্ দিতেছে এবং এমন সংগীতের সৃষ্টি হইতেছে যাহার ফলে সার্কাসের ঘোড়ার মত অনুভূতিহীন জানোয়ারও ভয়ে পিছু হটিতেছে এবং যেন এই তীব্র তীক্ষ্ম শব্দ কান হইতে ঝাড়িয়া ফেলার জন্য ঘন ঘন কান নাড়িতেছে।...

ক্রীতদাসদের আমোদ দিবার জন্যই এই ভিক্ষুকের সংগীত হইতে মনে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। মনে হয় বাদ্যকরদের হাত হইতে পিতলের শিঙ্গাগুলির সব চেয়ে বড় শিঙ্গাটি কাড়িয়া আনি এবং প্রাণপণ শক্তিতে উহা বাজাই।

বহুক্ষণ ধরিয়া অবিশ্রান্ত এমন ভীষণভাবে এই শিঙ্গা বাজাইতে ইচ্ছা করে, যে ইহার বুনো শব্দের ভয়ে কয়েদখানা ছাড়িয়া সকলেই পালাইয়া যাইবে।...

ঐক্যতান বাদন চলিয়াছে যেখানে তাহার কাছেই ভালুকের খাঁচা। ছোট ছোট কুটিল চোখওয়ালা একটা মোটা বাদামী রঙের ভালুক খাঁচাটির ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া তালে তালে মাথা দোলাইতেছে। মনে হয় সে ভাবিতেছে :

"মানুষকে অন্ধ, বধির ও বিকলাংগ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইহা যদি কেহ আমাকে বুঝাইতে পারো শুধু সে ক্ষেত্রেই আমি এই ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিব। সে ক্ষেত্রে অবশ্য, উদ্দেশ্যই হইবে উপায়ের সমর্থক।...কিন্তু মানুষ যদি সত্যই বিশ্বাস করে যে এ সবই আমোদের, তবে তাহাদের চিন্তাশক্তির প্রতি আমাদের কোন আস্থা থাকিবে না।..."

আর দুইটি ভালুক মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে, যেন দাবা খেলিতেছে। আর একটি ভালুককে দেখা যায়। মুখ তাহার গম্ভীর। খাঁচার এক কোণে একটা খড়কে সে থাবা দিয়া ধরিয়াছে; কালো কালো নখ দিয়া সে খাঁচার শিক ধরিয়া আছে। তাহার মুখে একটা শান্ত ঔদাসীন্য। স্পষ্ট মনে হয়, জীবন হইতে কিছুই সে আশা করে না এবং ঘুমাইবে বলিয়া সে মনস্থির করিয়াছে।

জানোয়ার সম্পর্কে গভীর কৌতূহল মানুষগুলির। সিংহ ও বাঘের সুন্দর সুঠাম দেহের শক্তিমত্ত গতিবিধি মধ্যে অর্ধবিস্মৃত কি যেন তাহারা দুই চোখ

দিয়া খুঁজিয়া ফেরে। খাঁচাগুলির সামনে দাঁড়াইয়া লোকগুলি খাঁচার শিকের মধ্য দিয়া নীরবে কাঠি চালাইয়া জানোয়ারগুলির পেটে ও গায়ে খোঁচা মারে, কি হয় দেখার জন্য।

যে সব জানোয়ার এখনও মানুষের চরিত্র চেনে নাই, তাহারা রাগিয়া ওঠে, থাবা দিয়া আঘাত করে খাঁচার গায়, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখব্যাদান করিয়া গর্জন করিয়া ওঠে। খুশী হয় জনতা।

জানোয়ারের থাবার আঘাত হইতে লোহার দ্বারা সুরক্ষিত নিশ্চিন্ত নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া লোকগুলি জানোয়ারের লাল চোখের দিকে তাকাইয়া খুশিতে হাসে। কিন্তু অধিকাংশ জানোয়ারই মানুষকে গ্রাহ্য করে না। গায়ে থুথু পড়িলে অথবা লাঠির খোঁচা খাইলে ধীরে ধীরে উঠিয়া নির্যাতনকারীর দিকে মুহূর্তমাত্র না তাকাইয়া খাঁচার দূরের কোণে চলিয়া যায়। সেখানে সেই অন্ধকারে পড়িয়া থাকে সিংহ, বাঘ, চিতা, প্যান্থারের সুষমাময়, সুঠাম, শক্তিমান দেহগুলি এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে মানুষের প্রতি ঘৃণায় তাহাদের সবুজ চোখ জ্বলিতে থাকে।

জানোয়ারগুলির দিকে আর একবার তাকাইয়া লোকে বলিতে বলিতে চলিয়া যায়—

"ঐ জানোয়ারটা একদম বাজে..."

প্রবেশ পথটি যেন হাঁ-করা মুখের অন্ধকার গহ্বর, সে গহ্বরের মধ্যে সাজানো চেয়ারের পিঠগুলিকে দেখাইতেছে দাঁতের সারির মত। আধখোলা এই প্রবেশদ্বারের সম্মুখে বসিয়া ব্যান্ড-বাদকেরা বেপরোয়া উৎসাহ লইয়া বাজাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে একটি খুঁটিতে পাতলা শিকল দিয়া বাঁধা রহিয়াছে দুইটি বানর—একটি মা, আর একটি তাহার বাচ্চা। বাচ্চাটি মার বুক আঁকড়াইয়া আছে, লম্বা চর্মসার হাত দু'খানি ও ক্ষুদে ক্ষুদে আঙ্গুলগুলি দিয়া মার বুক-পিঠ জড়াইয়া ধরিয়া আছে। মা এক হাতে বাচ্চাটিকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাগে, ক্ষোভে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়া মারিবার ও আঁচড়াইবার সুযোগ খুঁজিতেছে। উত্তেজনায় বড় বড় হইয়া গিয়াছে মার চোখ দু'টি, সে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা অক্ষম হতাশা, অনিবার্য আঘাতের একটা যন্ত্রণাময় প্রত্যাশা, একটা ক্লান্ত ক্রোধ ও অসহায় বিদ্বেষ। বাচ্চাটি মায়ের বুকে মুখ চাপিয়া ধরিয়া ভয়ে হিম হইয়া চোখ পিট্ পিট্ করিয়া লোকজনকে দেখিতেছে। বুঝিতে কষ্ট হয় না, জন্মের দিন হইতেই ভয় তাহার জীবনে ঢুকিয়াছে এবং বাকী সারা জীবনের মতো এই ভয় সেখানে দানা বাঁধিয়া থাকিবে। ছোট ছোট সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া এবং বাচ্চাটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে হাতটি দিয়া, সে হাতটি এতটুকু না সরাইয়া মা-বানরটি অন্য হাতে তাহার দুর্দশার দর্শকদের লাঠি ও ছাতার খোঁচা অবিরাম ঠেকাইয়া চলিয়াছে। দর্শক জুটিয়াছে অনেক। বানর-মা কি করিয়া

বুকের বাচ্চাটিকে তাহাদের আঘাত হইতে রক্ষা করে তাহা পরম উল্লাসে উপভোগ করিতেছে পালক লাগানো টুপীপরা সাদা চামড়ায় ঢাকা এইসব অসভ্য বর্বর নরনারীর দল।

একটা গোলাকার থালার মত বস্তুর উপর দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে বানরটি। দর্শকদের পায়ের তলায় সে যে-কোন মুহূর্তে পড়িয়া যাইতে পারে। তাহার শিশুর গায় যে হাত দিতে যাইতেছে তাহাকে সে প্রাণপণে বাধা দিতেছে। আঘাত ঠেকাইতে না পারিয়া মাঝে মাঝে করুণ আর্তকণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। চাবুকের মত চারিপাশে দুলিতেছে তাহার হাত। কিন্তু দর্শক জুটিয়াছে অনেক এবং সকলেই চায় তাহাকে খোঁচা মারিতে, লেজ ধরিয়া টানিতে, গলার শিকল ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে। এত লোকের একসঙ্গে অত্যাচার সে একা ঠেকাইবে কেমন করিয়া? তাই মার চোখে একটা করুণ বেদনা, মুখের রেখায় রেখায় ফুটিয়াছে ব্যথা ও যন্ত্রণা।

বাচ্চাটি তাহার হাত দু'খানি মার বুকের সাথে চাপিয়া রাখিয়াছে। মাকে সে এত শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে যে, মার চামড়ার উপরকার পাতলা লোমের মধ্যে হাতের আঙ্গুলগুলি ঢাকিয়া গিয়াছে। বাচ্চাটির দু'টি চোখ একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে দর্শকদের হলদে মুখগুলির দিকে। তাকাইয়া আছে তাহাদেরই ক্ষীণদৃষ্টি চোখের দিকে যাহারা নিজেদের ভয়ের পাত্র ভাবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

মাঝে-মাঝে বাদ্যকরদের একজন তাহার শিঙ্গার পিতলের মুখটি বানরটির কাছে লইয়া শব্দের তরঙ্গে তাহাকে ডুবাইয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে কুঁকড়াইয়া যাইতেছে, দাঁত বাহির করিতেছে, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাইতেছে বাদ্যকরের দিকে।

হাসিয়া উঠিতেছে দর্শকের দল, বাহবা দিতেছে বাদ্যকরকে। খুশি হইয়া কিছুক্ষণ পরেই আবার সে এই খেলা দেখাইতেছে।

দর্শকদের মধ্যে অনেকে মহিলা রহিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ নিশ্চয়ই মা। কিন্তু এই বীভৎস আমোদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কেহ একটি কথাও বলিতেছেন না। তাঁহারা সকলেই ইহাকে উপভোগ করিতেছেন।

মা-বানরের যন্ত্রণা ও বাচ্চা-বানরের আতঙ্ক একমনে দেখিতে দেখিতে অনেকের চোখই ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

ব্যান্ড-বাদকদের পাশেই হাতীর খাঁচা। যেন একটি বয়স্ক ভদ্রলোক,—মাথাটি জীর্ণ কুঞ্চিত চকচকে চামড়ায় ঢাকা। খাঁচার শিকগুলির মধ্য দিয়া শুঁড়টি বাহির করিয়া দিয়া দর্শকদের দেখিতে দেখিতে সে যেন দুলিয়া দুলিয়া কি ভাবিতেছে। দয়ালু, বুদ্ধিমান প্রাণী এই হাতী, তাই সে ভাবিতেছে :

"নিরানন্দ শূন্য জীবনের নোংরা ঝাঁটা এই আবর্জনাকে এখানে ঝাঁটাইয়া আনিয়াছি। কিন্তু প্রবীণ হাতীদের মুখে শুনিয়াছি, ইহারা নিজেদের পয়গম্বরদেরও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু বানরের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। শুনিয়াছি

শেয়াল ও হায়নার মত মানুষও মাঝে মাঝে পরস্পরকে ছেঁড়াছেঁড়ি করে। কিন্তু বানরের তাতে সুবিধা হয় না।"

বুকের শিশুকে রক্ষা করিতে অক্ষম, অসহায় বেদনার্ত মায়ের চোখের দিকে তাকাই, তাকাই মানুষের আতঙ্কে আধমরা শিশুর চোখের দিকে। আর তাকাই তাদের দিকে জীবন্ত প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়া যাহারা আনন্দ পায়। বানরটিকে দেখিয়া মনে মনে বলি,

"হে প্রাণি! এদের ক্ষমা কর। একদিন আসবে যেদিন এরা ভাল হবে।"

বলি বটে, কিন্তু জানি এ বলা আমার অর্থহীন, হাস্যকর মূঢ়তা। বুকের শিশুর নির্যাতনকারীকে ক্ষমা করিতে পারে কোন্ মা? এমন কোনও মা নাই, এমন কি কুকুরদের মধ্যেও নাই।......

শূকরদের মধ্যে হয়ত......

* * * *

থাক, থাক,...

যখন রাত্রি নামিয়া আসে, সমুদ্রের কূলে জ্বলিয়া ওঠে আলোঝলসিত এক মুগ্ধ মায়াপুরী। রাত্রির আকাশের অন্ধকার পটভূমিকায় অনেকক্ষণ ধরিয়া না জ্বলিয়াই আভা বিচ্ছুরিত করিতে থাকে মায়াপুরী। সমুদ্রের বুকে ছায়া পড়ে তাহার সৌন্দর্যের।

স্বচ্ছ অট্টালিকাগুলির প্রদীপ্ত তন্তুজালের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিবর্ণদৃষ্টি ধূসর মানুষ ভিক্ষুকের ছেঁড়া কাপড়ে উকুনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই হীন, লুব্ধ মানুষের দল এখানে দেখিতে পায় নিজেদের মিথ্যার কদর্য নগ্নতা, নিজেদের ধূর্ততার কৌশলহীনতা, নিজেদের কপটতা, নিজেদের অতৃপ্ত লালসার শক্তি। মৃত আলোকের শীতল দীপ্তি নগ্ন করিয়া ধরে ভাবদৈন্যকে। এই মানুষগুলির চারিপাশে যা কিছু আছে, সব কিছুকেই বিজয়ীর দম্ভ লইয়া উন্মুক্ত করিয়া দেয় এই দীপ্তি।

কিন্তু এই মানুষের দল একেবারেই অন্ধ হইয়া গিয়াছে, নিঃশব্দে খুশিমনেই তাহারা এই বিষ গিলিয়া খায়।

শিথিল শ্লথনৃত্যে নাচিয়া চলে এই শূন্যতা আপন অক্ষমতার মর্মযন্ত্রণার মৃত্যুগহ্বরের দিকে।

এই আলোর শহরে শুধু একটি জিনিস ভালো—মূঢ়তার শক্তির প্রতি আজীবন ঘৃণায় তোমার মন ও আত্মাকে তুমি পূর্ণ করিয়া লইতে পারো এখান হইতে।

॥ [illegible] ॥

...আমার ঘরের সম্মুখে একটি চারিপাশ-ঘেরা মাঠ। অনেকটা বস্তা হইতে আলু গড়াইয়া পড়ার মত সারাদিন ধরিয়া পাঁচটি রাস্তা হইতে হুড় হুড় করিয়া সেখানে মানুষ ঢুকিতেছে। প্রথমে তাহারা মাঠটির চারিপাশে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিতেছে, তারপর হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, রাস্তাগুলি আবার তাহাদের শুষিয়া লইতেছে। মাঠটি গোল ও নোংরা। যে প্যানটিতে বহুদিন ধরিয়া মাংস ভাজা হইতেছে, অথচ যাহা কোনদিন পরিষ্কার করা হয় না, অনেকটা সেই প্যানের মত। রাস্তায় মোটরগাড়ী রাখিবার চারিটি সারি আসিয়া এই জনাকীর্ণ গোল মাঠটিতে মিশিয়াছে এবং প্রায় প্রতি মিনিটেই গাড়ী আসিতেছে আকণ্ঠ মানুষে ভর্তি হইয়া, তীব্র চীৎকার করিতেছে মোড়ের মুখে আসিয়া। দ্রুত, ক্ষুব্ধ লোহার ঝনৎকারে রাস্তা কাঁপাইয়া গাড়ীগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে, গাড়ীগুলির উপরে ও নীচে বিদ্যুৎশক্তির অসহ্য গোঙানির শব্দ। ধুলোয় ভর্তি রাস্তার বাতাসে লাগিতেছে গাড়ীগুলির জানালার কাঁচের কম্পন, চাকা হইতে উঠিতেছে তীব্র আর্তনাদ। নগরীর এই নারকীয় সঙ্গীতের বিরাম নাই—নিরস কর্কশ শব্দগুলির এ এক হিংস্র সংগ্রাম; পরস্পরকে যেন তাহারা ছুরি মারিতেছে, গলা টিপিয়া ধরিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে এক অদ্ভুত গম্ভীর মায়ালোকের।

......একদল উন্মত্ত দানব। হাতে তাহাদের বড় বড় সাঁড়াশী, ছোরা, করাত, লোহার তৈরী যা কিছু হইতে পারে সব কিছু। এক দলা পোকার মত কিলবিল করিতে করিতে একটি নারীদেহ লইয়া তাহারা অন্ধ উন্মত্ততায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। লুব্ধহাতে জড়াইয়া ধরিয়া এই নারীদেহকে তাহারা ধুলা ও আবর্জনার মধ্যে ধরাশায়ী করিয়াছে—তাহারা স্তন দু'টি টানিয়া ছিঁড়িতেছে, দাঁতে ছিঁড়িয়া

নিতেছে তাহার মাংস, শুষিয়া খাইতেছে তাহার রক্ত, বলাৎকার করিতেছে তাহার উপর—এক অন্ধ ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া অবিরাম মারামারি করিতেছে তাহাকে লইয়া।

কে এই নারী চিনিবার জো নাই। ময়লা-মাখা মানুষের একটা বিরাট দল চারিপাশ হইতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, হাড়মোটা দেহ দিয়া যে যেখানে পারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, লালসাতপ্ত অধর দিয়া যে যেখানে যতটুকু পারে এই নারীদেহের প্রতিটি রোমকূপ হইতে প্রাণরক্ত শুষিয়া খাইতেছে।......এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ও অদম্য লালসায় অন্ধ হইয়া শিকারের উপর হইতে তাহারা পরস্পরকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, মারিতেছে, মাড়াইতেছে, পিষিতেছে, শেষ করিয়া দিতেছে একেবারেই। প্রত্যেকেই চায় যতখানি পারে ছিনাইয়া লইতে এবং পাছে কিছু না পায় সেই ভয়ে তাহারা জ্বরে কাঁপিবার মত কাঁপিতেছে। তাহারা দাঁতে দাঁত ঘসিতেছে, ঝনাক্ ঝন্ বাজিতেছে তাহাদের হাতের লোহার হাতিয়ারগুলি; যন্ত্রণার গোঙানি, লালসার চীৎকার, হতাশার আর্তনাদ, ক্ষুধিত ক্রোধের গর্জন—সব কিছু যেন মিশিয়া যাইতেছে নিহত শিকারের মৃতদেহের চারিপাশে মথিত হইয়া-ওঠা এক তীব্র শোকের আর্তবিলাপের মধ্যে। হাজার হাজার বলাৎকারে বিধ্বস্ত ও কলুষিত, পথের মাটির নানা রঙের ময়লায় কলঙ্কিত এই মৃতদেহ।

আর এই হিংস্র বর্বর বিলাপের সহিত মিশিতেছে পরাজিতের করুণ মর্ম-যন্ত্রণা। অন্যেরা যাহাদের দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, ভরা পেটের উল্লাসের উগ্র প্রত্যাশায় যাহারা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া, দুর্বল ও কাপুরুষ বলিয়া হানাহানিতে যোগ দিতে পারিতেছে না।

শহরের সঙ্গীত এই ছবিই আঁকিয়াছে।

* * * *

আজ রবিবার। লোকেরা আজ কাজ করে না। তাই অনেকের মুখেই আজ কেমন যেন উদ্বিগ্ন, দিশাহারা দৃষ্টি। গতকালের দিনটার একটা সোজা ও স্পষ্ট মানে ছিল—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা কাজ করিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ে তাহারা ঘুম হইতে উঠিয়াছে, কারখানায় কিম্বা অফিসে গিয়াছে, কিম্বা পথে নামিয়া পড়িয়ছে। নির্দিষ্ট, অভ্যস্ত স্থানে অতএব আরামের স্থানেই তাহারা দাঁড়াইয়াছে, কিম্বা বসিয়াছে। তাহারা টাকা গণিয়াছে, জিনিস বেচিয়াছে, মাটি খুঁড়িয়াছে, কাঠ কাটিয়াছে, পাথর কাটিয়াছে, তপ্ত লোহার উপর হাতুড়ি চালাইয়াছে —সারাদিন ধরিয়া দুইহাত দিয়া তাহারা কাজ করিয়াছে। শয্যাগ্রহণ করিয়াছে তাহারা চিরাভ্যস্ত, চিরপরিচিত ক্লান্তিতে—আর আজ তাহারা জাগিয়া উঠিয়া দেখে কিছু করিবার নাই। একটা অসহ্য অলস শূন্যতা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।......

তাহাদের কাজ করিতে শেখান হইয়াছে। শেখান হয় নাই কিভাবে বাঁচিতে হয়, তাই বিশ্রামের দিনটি তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন দিন। যন্ত্র, গীর্জা, বড় বড় জাহাজ, ছোট ছোট সোনার টুকিটাকি তৈরী করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হাতিয়ার তাহারা; তাহারা ভাবে, প্রতিদিনের যান্ত্রিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু দিয়া কোন

একটি দিন ভরিয়া তোলার সামর্থ তাহাদের নাই। চাকা ও চাকার দাঁত তাহারা; কারখানায় কারখানায়, অফিসে অফিসে, দোকানে দোকানে তাহারা শান্তভাবে কাজ করিয়া যায় আর ভাবে তাহারা মানুষ; অন্যান্য দাঁত ও চাকার সাথে মিশিয়া তাহারা একটা সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ জীবদেহ গড়িয়া তোলে। এই জীবদেহ নিজের স্নায়ুগুলির জীবন্ত তরল পদার্থ হইতে দ্রুতগতিতে মূল্যবোধ গড়িয়া তোলে—কিন্তু তাহা এই মানুষদের জন্য নহে।

সপ্তাহের ছয়টি দিন জীবন সহজ। তাহারা যেন একটি বিরাট যন্ত্রের চাকার দাঁত; যন্ত্রের মধ্যে তাহার স্থান কোথায় প্রত্যেকে তাহা জানে এবং প্রত্যেকেই মনে করে যন্ত্রটির অন্ধ ক্রুদ্ধ মুখটিকে সে চেনে, বোঝে। কিন্তু সপ্তম দিনে, অর্থাৎ বিশ্রাম ও অবকাশের দিনে জীবন তাহাদের সম্মুখে এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন, বিশিলষ্ট বেশে উপস্থিত হয়। তাহার মুখখানি ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে—মুখ বলিয়া আর কিছু থাকে না।......

তাহারা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সেলুনে, পার্কে বসে, গীর্জায় যায়, রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও গতি থাকে। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই কিম্বা হয়ত এক ঘণ্টার মধ্যেই এই গতি থামিয়া যাইবে—জীবনে কি যেন নাই, নূতন কিছু যেন তাহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অনুভূতি সম্পর্কে কাহারও স্পষ্ট চেতনা নাই, কেহ ইহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু অদ্ভুত অস্বস্তিকর কোন কিছুর অস্তিত্ব সবাই যেন যন্ত্রণার সহিত অনুভব করে। সমস্ত ছোট ছোট সহজবোধ্য অর্থগুলি যেন হঠাৎ মাড়ি হইতে দাঁতের মত জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

তাহারা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা গাড়ীতে ওঠে, কথাবার্তা বলে; বাহির হইতে মনে হয় তাহারা ঠিকই আছে—বছরে বাহান্নটি রবিবার আছে এবং সব রবিবারকেই তাহারা একই ভাবে কাটাইয়া দিবার অভ্যাসে দীর্ঘদিন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকেই অনুভব করে, কাল সে যাহা ছিল আজ সে তাহা নাই এবং তাহার সহকর্মীও বদলাইয়াছে—ভিতরে কোথায় যেন একটা তীব্র যন্ত্রণাকর শূন্যতা এবং সে শূন্যতার মধ্য হইতে অস্পষ্ট, পীড়াদায়ক, ভীষণ কিছু হঠাৎ বাহির হইয়া আসিতে পারে।......

প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সন্দেহের স্পন্দন অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাকে এড়াইতে চাহে......

হঠাৎ কিসের আবেগে পরস্পরের কাছে তাহারা ঘন হইয়া আসে, দলে দলে ভাগ হইয়া যায়; নিঃশব্দে তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকে, চারিপাশে কি চলিয়াছে স্থিরদৃষ্টিতে তাহা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে; জীবন্ত অংশগুলি ক্রমেই বেশী করিয়া তাহাদের কাছে আসে এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পূর্ণাঙ্গকে গড়িয়া তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করে জনতার।

* * * *

মন্থর গতিতে ইহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া দাঁড়ায়। সকলের বুকে একই

অনুভূতি, একই যন্ত্রণাকর শূন্যেতা পরস্পরকে পরস্পরের কাছে টানিয়া আনে, চুম্বক যেমন করিয়া টানিয়া আনে লোহার টুকরাগুলিকে। কেহ কাহারও দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া পর্যন্ত দেখে না, অথচ পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, আরও ঘন আর ঘনিষ্ঠ হইয়া তাহারা দাঁড়ায়—রাস্তার মোড়ে হাজার মাথা-ওয়ালা একটি ঘন কালো দেহ ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে। নিঃশব্দে প্রতীক্ষারত, ক্ষুব্ধগম্ভীর, প্রায় গতিহীন এই দেহ। এই দেহটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাতে প্রাণের চিহ্ন ফুটিয়া ওঠে। সে ভাবলেশহীন মুখটি মিলাইয়া যায়, হাজার হাজার শূন্য চোখে একটা সাধারণ ভাব ও সাধারণ একাগ্র দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে—ফুটিয়া ওঠে একটি সতর্ক সন্দিগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টি; নিজের অজ্ঞাতেই সে দৃষ্টি খুঁজিয়া ফেরে এমন একটি বস্তুকে মনে মনে যাহাকে সে ভয় করে।

এইভাবে জন্ম নেয় সেই ভয়াবহ জীব, যাহার স্থূল পরিচয়—জনতা।

......যখন রাস্তা দিয়া এমন কেহ হাঁটিয়া যায় যাহাকে সাধারণের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র মনে হয়, যাহার পরনের পোশাক সাধারণের চেয়ে অন্যরূপ অথবা যে অন্যদের চেয়ে দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে, জনতা তাহার হাজার মাথা ঘুরাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করে, একটা সর্বব্যাপী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করে।

আর পাঁচজনের মত সে পোশাক পরে নাই কেন? সন্দেহের ব্যাপার। যেদিনটিতে সবাই ধীরে ধীরে হাঁটে, সেইদিন সে রাস্তা দিয়া এত দ্রুত চলিয়াছে কেন? আশ্চর্য......

উচ্চৈস্বরে হাসিতে হাসিতে দুইটি যুবক হাঁটিয়া চলিয়াছে। অমনি জনতা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। করিবার মত কাজ না থাকায় সব কিছুই যেখানে দুর্বোধ্য সেখানে হাসিবার মত জীবনে কি থাকিতে পারে? হাসি পশুর বুকে একটু রাগের ভাব সৃষ্টি করে, সে স্ফূর্তি সহ্য করিতে পারে না। কতকগুলি মাথা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধভাবে যুবক দুইটিকে ঘুরিয়া দেখে। বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে এই স্ফূর্তিবাজ ছেলে দুইটিকে দৃষ্টি দিয়া অনুসরণ করে।......

কিন্তু এই জনতা যখন দেখিতে পায় একটি খবরের কাগজের হকারের উপর তিন পাশ হইতে রাস্তার গাড়ী আসিয়া পিষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে আর সে প্রাণপণে গাড়ীগুলিকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সে নিজেই হাসিতে ভাঙিয়া পড়ে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া মানুষের ভয় পাওয়াকে সে বোঝে, এবং এই রহস্যময় জীবনকোলাহলের মধ্যে যেটুকু সে বুঝিতে পারে তাহাতেই সে আনন্দ পায়।......

ঐ মোটরে চাপিয়া চলিয়াছেন যিনি তাঁহাকে শহরের সকলেই চেনে, শুধু শহরের কেন, দেশের সকলেই চেনে। ইনি মালিক। গভীর আগ্রহ লইয়া জনতা তাঁহাকে দেখে, তাঁহার হাজার চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া একটি দৃষ্টি-রশ্মিতে পরিণত হয়, মালিকের কুঁচকানো, হাড়-বাহিরকরা ফ্যাকাশে মুখখানি জনতার

মূঢ় সম্ভ্রমের প্রভাহীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। জনতা মালিককে বোঝে —মালিকই শক্তি। মালিক মহাপুরুষ—তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই হাজার হাজার মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। এই মালিকের মধ্যে জনতা একটি পরিপূর্ণ স্পষ্ট অর্থ খুঁজিয়া পায়,—মালিক কাজ দেন। কিন্তু রাস্তার একটি গাড়ীর মধ্যে আর একটি লোক বসিয়া আছে—তাহার চুলগুলি সাদা, মুখ রুক্ষ, দৃষ্টি কঠিন। তাঁহাকেও জনতা চেনে। সংবাদপত্রে প্রায়ই তাঁহার বর্ণনা বাহির হয়। তাঁহাকে বর্ণনা করা হয় এমন এক পাগল বলিয়া যে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চায়; সমস্ত কারখানা, রেলপথ, জাহাজ কাড়িয়া লইতে চায়, কাড়িয়া লইতে চায় সব কিছু ......সংবাদপত্রে ইহাকে বলা হয় উন্মাদের হাস্যকর পরিকল্পনা। ঘৃণা, ধিক্কার ও বিদ্বেষপূর্ণ কৌতূহলের সহিত জনতা লোকটির দিকে তাকাইয়া থাকে। যে পাগল সে সব সময়ই দেখার মত সামগ্রী।

জনতা শুধু দেখে, শুধু অনুভব করে। এই অনুভূতিকে সে চিন্তায় পরিণত করিতে পারে না। মন তাহার অসাড়, হৃদয় তাহার অন্ধ।

মানুষ চলিয়াছে একের পর আর। কোথায় তাহারা যাইতেছে, কেনই বা যাইতেছে? অদ্ভুত, অবোধ্য, ব্যাখ্যার অতীত। একজন দুইজন নহে, অগণিত মানুষ। লোহা, কাঠ, পাথর, টাকাপয়সা, হাতিয়ার যা' কিছু লইয়া জনতা-পশু গতকাল কাজ করিয়াছে তাহা হইতে ইহাদের অনেক অনেক তফাৎ। ইহাতে জনতা বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করে যে, তাহাদের জীবন হইতে স্বতন্ত্র আর একটি জীবন আছে, সে জীবনের অভ্যাস ও আচরণ পৃথক, অদ্ভুত সে জীবনের আকর্ষণ।...

রাগ ও বিরক্তির এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া একটা বিপদের সন্দেহ ধীরে ধীরে ঘনাইয়া ওঠে; আর সন্দেহের সূক্ষ্ম সূচীমুখ জনতা-পশুর অন্ধ হৃদয়ে বিঁধিতে থাকে। পশুটির চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া ওঠে, তাহার অবয়বহীন দেহ দেখিতে দেখিতে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, কঠিন হইয়া ওঠে, এক অজানা উত্তেজনায় তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে।...

মানুষ, গাড়ী, মোটর বিদ্যুৎগতিতে চলিয়া যায়।...দোকানের জানালায় জানালায় তুচ্ছ খেলনার আলোর বাহার চোখে লাগে। কি কাজে সে লাগে, কেহ জানে না। তবু যেন ঐ খেলনা হইতে চোখ ফেরান যায় না, পাইবার বাসনা মনে জাগে। জনতার মনে দুশ্চিন্তা জাগে...অস্পষ্টভাবে সে অনুভব করে, জীবনে সে বড় নিঃসঙ্গ, ঐ সুবেশ মানুষের দল তাহাকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করে না। সে দেখে কত পরিষ্কার তাহাদের ঘাড়, কত কোমল, কত শুভ্র তাহাদের হাত; কত মসৃণ কত উজ্জ্বল তাহাদের শান্ত সুভুক্ত মুখ। এরা রোজ যে খাদ্যে উদর পূর্ণ করে, জনতা শুধু তাহা কল্পনা করিতে পারে। যে খাদ্য চামড়াকে এত মসৃণ সুন্দর করে, পেটটিকে করে পৃথিবীর মত সুন্দর গোলাকার, সে খাদ্যের আস্বাদ না জানি কী চমৎকার!...

পাকস্থলীকে তাড়া দিয়া জনতার দেহে ঈর্ষা জাগিয়া ওঠে।

হাল্কা দামী গাড়ীতে চড়িয়া মহিলারা চলিয়া যান। চমৎকার তাঁহাদের রূপ, মসৃণ তাঁহাদের দেহ। কুশনের উপর উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা একটি বিশেষ ভঙ্গীতে দেহ এলাইয়া থাকেন; পা দুটি ছড়াইয়া থাকেন পায়ের ছোট ছোট পাতাদুটি দেখাইবার জন্য; মুখগুলি তাঁহাদের তারার মত, সুন্দর চোখের দৃষ্টি দিয়া তাঁহারা লোককে হাসিতে বলেন।

তাঁহারা যেন নিঃশব্দে ডাকিয়া বলেন, "দেখ, আমরা কী সুন্দর!"

জনতা গভীর মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই মহিলাদের দেখে ও নিজেদের স্ত্রীদের সহিত তাহাদের তুলনা করে। তাহাদের স্ত্রীরা অস্থিসার অথবা অতিমাত্রায় কাঠিন্য ভরা। লোভ তাহাদের প্রতি মুহূর্ত্তের সাথী, প্রায়ই তাহারা অসুখে ভোগে। সবচেয়ে বেশী ভোগে তাহারা দাঁতের যন্ত্রণায়, ফলে হয় পেটের রোগ। তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি তো লাগিয়াই আছে।

উগ্র লালসায় অধীর হইয়া জনতা গাড়ীর ভিতরের মহিলাদের মনে মনে উলঙ্গ করে, হাত দেয় তাহাদের বুকে, পায়। তারপর মনে মনে এই নগ্ন, গোল, নিটোল, উজ্জ্বল নারী দেহগুলির ছবি আঁকিয়া তাহাদের তারিফ করে— তারিফ করে গরম, তৈলাক্ত ঘাম মেশানো এমন কতকগুলি শক্ত, সংক্ষিপ্ত, রুক্ষ শব্দের সাহায্যে যে মনে হয় কে যেন নোংরা ভারী হাত দিয়া চড় মারিতেছে।...

জনতা চায় নারী। চলন্ত গাড়ীর সুন্দরীদের তন্বী, নিটোল কঠিন দেহ-গুলিকে লুব্ধ আদরে ভরিয়া দিতে দিতে তাহাদের চোখের দৃষ্টি জ্বলিতে থাকে।

এই নারীদের শিশুগুলিও কী চমৎকার! তাহাদের হাসি ও কলরবে বাতাস কাঁপিতে থাকে। কী স্বাস্থ্যবান শিশু, কী চমৎকার পোশাক, কী নরম, নিটোল, সোজা তাহাদের পাগুলি।...

আর জনতার শিশুগুলি রুগ্ন, বিবর্ণ তাদের মুখ, কি কারণে জানি না, পাগুলি তাহাদের বাঁকিয়া গিয়াছে। শিশুদের মধ্যে এই বাঁকা পা খুব বেশী দেখা যায়। মায়েদের দোষ নিশ্চয়ই। প্রসবের সময় হয়ত তাহারা এমন কিছু করে যাহা করা তাহাদের উচিত নয়।...

এই তুলনা করিতে গিয়া জনতার অন্ধকার হৃদয়ে ঈর্ষা মাথা তোলে।

বিরক্তি ও রাগের সঙ্গে আসিয়া মেশে শত্রুতা। ঈর্ষার উর্বর জমিতে সে শত্রুতা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া ওঠে। সেই বিরাট কালো দেহটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাড়িতে থাকে; অদ্ভুত, অর্থহীন, দুর্বোধ্য সব কিছুকেই হাজার হাজার চোখের তীক্ষ্ম নির্ণিমেষ দৃষ্টি বিদীর্ণ করিতে থাকে।

জনতা বুঝিতে পারে তাহার একটি শত্রু আছে। ধূর্ত্ত ও পরাক্রান্ত সে শত্রু ছড়াইয়া আছে সর্বত্র, তাই সে ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। সে নিকটেই কোথাও আছে, অথচ সে কোথাও নাই। দুনিয়ার সমস্ত সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দরী নারী, ফুলের মত সুন্দর শিশু, গাড়ী, রেশমের পোশাক—সবকিছুই সে আত্মসাৎ করিয়াছে—এইগুলি সে যাহাকে খুশি তাহাকে দেয়, কিন্তু জনতাকে দেয় না। জনতাকে সে ঘৃণা করে,

অস্বীকার করে। জনতাকে সে দেখিতে পায় না, যেমন তাহাকে জনতা দেখিতে পায় না।...

সর্বত্র গন্ধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া জনতা এই শত্রুকে খুঁজিয়া বেড়ায়। সবকিছু সে লক্ষ্য করে। কিন্তু কোথাও বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। রাস্তার জীবনযাত্রার বহু কিছু যদিও নতুন ও অদ্ভুত, সে জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলে, বহিয়া চলে জনতারই পাশ দিয়া অথচ জনতার শত্রুতার বাঁধা তারে বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া, কোন কিছুকে দুহাতে ধরিয়া পিষ্ট করিবার তাহার অস্পষ্ট কামনাকে বিন্দুমাত্র দোলা না দিয়াই এই জীবনপ্রবাহ চলিয়া যায়।

গোলাকার মাঠটির ঠিক মাঝখানে সাদা টুপী মাথায় একটি পুলিশ দাঁড়াইয়া। তাহার পরিষ্কার করিয়া কামানো মুখ তামার মতো ঝক্‌ঝক করিতেছে। এই মানুষটির শক্তি দুর্জয়। লোকটির হাতে একটি ছোট মোটা লাঠি। লাঠিটি সীসা ভর্তি।

চোখের কোণ দিয়া জনতা এই লাঠিটিকে দেখে। লাঠি সে চেনে। লক্ষ লক্ষ লাঠি সে দেখিয়াছে। কাঠ কিম্বা ধাতু ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু এই ছোট মোটা লাঠিটির মধ্যে এমন এক দানবীয় শক্তি নিহিত আছে, যাহার সম্মুখীন হওয়া যায় না।

সব কিছুর বিরুদ্ধেই জনতার একটা অন্ধ, অস্পষ্ট শত্রুতা। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে সাংঘাতিক কিছু করিতে চায়। চোখ দিয়া এই ছোট মোটা লাঠিটিকে সে মাপিয়া লইতেছে।...

তাহার অচেতন মনের অন্ধকার গুহায় গুঁড়ি মারিয়া থাকে ভয়।...

শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন গতিতে অবিশ্রাম গর্জন করিয়া ছুটিয়াছে জীবন। যেদিন জনতা কাজ করিতেছে না, সেদিন সে এই গতির শক্তি কোথা হইতে পাইতেছে?

সে যে কত একাকী জনতার কাছে ক্রমেই তাহা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। সে বুঝিতে পারে কেহ তাহাকে কিছু হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাহার বিরক্তি ও রাগ বাড়িতে থাকে, প্রখর সতর্ক দৃষ্টিতে সে দেখিতে থাকে হাতের কাছে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

জনতার মনে এখন অনুভূতি ও ধারণা জাগিতেছে। নতুন কোন কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বিদ্রূপগুলি তাহার তীক্ষ্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অতি বিস্তৃত কিনারাওয়ালা সাদা টুপী পরিয়া যে লোকটি চলিয়াছে জনতার বিদ্রূপ দৃষ্টি ও বাক্যবাণের খোঁচা খাইয়া সে তাড়াতাড়ি পা ফেলিতে থাকে। মাঠটি পার হইবার সময় এক মহিলা তাহার স্কার্টটি একটু তুলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন জনতা কিভাবে তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়া আছে, তিনি হঠাৎ, কেহ যেন তাহার হাতে মারিয়াছে এইভাবে, আঙুল ছাড়িয়া দিলেন, স্কার্টটি নামিয়া গেল।...

কোথা হইতে এক মাতাল টলিতে টলিতে মাঠটির মধ্যে প্রবেশ করিল। মাথাটি তাহার বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সে হাঁটিয়া চলিয়াছে; তাহার মদে ভেজা শরীরটি টলিতেছে, যে কোন মুহূর্তে সে ফুটপাথ কিংবা রেলিং-এর উপর পড়িয়া মরিতে পারে।...

এক হাত তাহার পকেটে ঢুকানো, অন্যহাতে দোমড়ানো ধুলামাখা টুপীটি ধরিয়া আছে। টুপীটিকে সে মাথার উপর তুলিয়া দোলাইতেছে। সে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না।

ধাতব শব্দের বুনো কোলাহলের মধ্যে, লোকটি মাঠটিতে একটু ঘুরিয়া আসে, তারপর থামে; ভেজা ফোলা চোখে চারিদিকে তাকায়। গাড়ীগুলি চারিদিক হইতে তাহার দিকে ছুটিয়া আসে, কালো কালো রুদ্রাক্ষের একটি দীর্ঘ চলন্ত মালার মতো। ক্রুদ্ধ হুঁশিয়ারীতে রাস্তার গাড়ীগুলির মধ্য হইতে ঘণ্টা বাজিতে থাকে; শব্দ উঠিতে থাকে ঘোড়ার নালের; সব কিছুই চীৎকার, গর্জন, ঝঙকার করিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়।

একটা আমোদের কিছু ঘটিবার সম্ভাবনায় জনতা চাঙ্গা হইয়া ওঠে। আবার সে তার হাজার হাজার চোখের চাহনি একটিমাত্র তীক্ষ্ণ একাগ্র চাহনিতে পরিণত করিয়া তীব্র প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে।...

রাস্তার মোটর গাড়ীর চালক ঘণ্টা বাজাইতে থাকে; তারপর রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া মাতালটির উদ্দেশ্যে চীৎকার করিতে থাকে, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠে। অমায়িকভাবে তাহার দিকে টুপিটি নাড়িয়া মাতালটি রাস্তার উপর গিয়া গাড়ীর ঠিক সামনে দাঁড়ায়। সমস্ত দেহটিকে পিছনে হেলিয়া, চোখ বুজিয়া চালক হাতলটিতে এক ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়া ঘুরাইয়া দেয়। গাড়ীখানি কাঁপিয়া উঠিয়া থামিয়া যায়।...

মাতাল হাঁটিয়া চলে। সে মাথায় টুপি দিয়াছে। তাহার মাথাটি আবার বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু প্রথম গাড়ীখানির পিছন হইতে আর একখানি গাড়ী নিঃশব্দে আসিয়া ধাক্কা দিয়া মাতালটিকে ফেলিয়া দেয়। সে হুমড়ি খাইয়া পড়ে, তারপর টলিয়া পড়ে রেলিং-এর উপর। তাহার মোচ্‌ড়ান দেহটি মাটির উপর দিয়া কিছুদূর হেঁচড়াইয়া যায়।...

মাতালের হাত-পাগুলি মাটির উপর ছটফট করিতেছে দেখা গেল। ঠোঁটের কোণে মোহন হাসির মত একটা সূক্ষ্ম লাল রেখায় রক্ত বাহির হইয়া আসিল।...

গাড়ীর ভিতরে মহিলারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু সব শব্দ ছাপাইয়া উঠিল জনতার গম্ভীর জয়ের গর্জন। ভিজা ও ভারী একটা খুব বড় বিছানার চাদর কে যেন তাঁহাদের উপর ফেলিয়া দিয়াছে। ঘণ্টার ঝন্‌ঝনানি, ঘোড়ার খুরের শব্দ, বিদ্যুতের গোঙানি— সবকিছু ডুবিয়া গেল জনতার আতঙ্কে। জনতার এক কালো উত্তাল ঢেউ জানোয়ারের মত গর্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীটির উপর ভাঙিয়া পড়িল, শুরু করিল তাহার কাজ।

গাড়ীটির জানালার কাঁচ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া গেল। কিছুই দেখা যায় না, শুধু দেখা যায় জনতার বিরাট দেহ ভাঙনের কাজে মাতিয়াছে; শুধু শোনা যায় তার গর্জন ও উন্মত্ত চীৎকার; সে যেন উল্লাসের সহিত নিজেকে শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, ঘোষণা করিতেছে শেষ পর্যন্ত করিবার মতো কিছু পাওয়া গিয়াছে।

আকাশে উঠিয়াছে হাজার হাজার বড় বড় হাত; একটা অদ্ভুত তীব্র ক্ষুধার লুব্ধ আভায় হাজার হাজার চোখ জ্বলিতেছে।

এই কালো জনতা কাহাকেও মারিতেছে, দু'হাতে ছিঁড়িতেছে কাহাকেও বা,—প্রতিশোধ লইতেছে কালো জনতা। এই মিশ্রিত চীৎকার-গর্জনের ঝড়ের মধ্য হইতে সাপের ফোঁসানির মত একটা কথা দীর্ঘ উজ্জ্বল ছুরিকা ফলকের মত ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে :

"পুড়িয়ে মার।"

জনতার একটা অংশ গাড়ীগুলির ছাতের উপর উঠিয়া গেল, এবং সেখান হইতে বাতাসে চাবুক হানার শব্দের মত বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল :

"পুড়িয়ে মার!"

*　　*　　*　　*

জনতার ঠিক মাঝখানে একটা গোল বলের মত তৈয়ারী হইয়াছে। কিছু যেন সে গিলিয়া, শুষিয়া খাইয়া গতির মাথায় বাহিরে খোলা জায়গায় আসিতেছে।

মাঝখান হইতে আসা এই চাপকে জনতা পথ ছাড়িয়া দিতেছে। সে যেন দু'ভাগ হইয়া নিজের জঠর হইতে এই কালো দলাটি—তার মাথা ও চোয়ালটি—বাহির করিয়া দিল।

তাহার দাঁত হইতে ঝুলিতেছে একটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত দেহ—তাহার উর্দির অবশিষ্ট অংশের ডোরাকাটা দাগ দেখিয়া বুঝা গেল এ সেই রাস্তার গাড়ীর চালক।

এখন সে এক টুকরো চিবানো মাংস ছাড়া আর কিছুই নহে—রক্তে মাখা হইয়া তাজা মাংসের এই টুকরাটি যেন লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

দুটি কালো চোয়াল দিয়া আটকাইয়া জনতা তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিতেছে। আসিতে আসিতে চিবাইতেছে। অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো হাত দুখানি দেহটির চারিপাশে জড়াইয়া আছে। দেহটিতে মুখ নাই।

জনতা চীৎকার করিয়া ওঠে,

"পুড়িয়ে মার!"

সঙ্গে সঙ্গে জনতা দেহটির মাথার পশ্চাতে দীর্ঘ পুরু সারিতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ায় বিপুল পরিমাণে টাটকা মাংস গিলিবার জন্য।

কিন্তু হঠাৎ সামনে আসিয়া দাঁড়ায় একটি লোক। তামার মতো মুখখানি তাহার পরিষ্কার করিয়া কমানো। সাদা টুপিটি চোখের উপর টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে আকাশে হাতের লাঠিটি তুলিয়া সাদা পাহাড়ের মত জনতার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়।

লাঠির আঘাত হইতে বাঁচিবার জন্য জনতার মাথাটি কখনও দক্ষিণে কখনও বামে হেলিতে থাকে।

পুলিসটি পাথরের মত নিঃস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার হাতের লাঠিটি এতটুকু নড়ে না। তাহার কঠিন চোখ দুইটি শান্ত ও নির্নিমেষ।

পুলিসের এই নিজের শক্তিতে এত বিশ্বাস দেখিয়া জনতার মনে আতঙ্কের শিহরণ জাগিয়া উঠে। জনতার বিপুল, প্রচণ্ড, লাভার মত ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে যদি একটি লোক এইভাবে দাঁড়াইতে পারে এবং এত শান্তভাবে দাঁড়াইতে পারে, তবে নিশ্চয়ই সে অজেয়।

জনতা চীৎকার করিয়া কী যেন তাহাকে বলে, শুঁড়গুলি নাড়িতে থাকে যেন এখনই পুলিসটিকে জড়াইয়া জাপটাইয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেও এই চীৎকারের মধ্যে একটা করুণ বিলাপের ধ্বনি বাজিতে থাকে এবং পুলিসটির তামার মতো মুখখানি যখন কঠিন ও অন্ধকার হইয়া উঠিল, যখন সে তার খাটো, মোটা লাঠিটি শুদ্ধ হাতখানি আরও উপরে তুলিল, অদ্ভুতভাবে জনতার গর্জন থামিয়া আসিতে লাগিল। জনতার দেহটি ধীরে ধীরে সরিয়া গেল; কিন্তু মাথাটি তখনও গর্জন করিতে লাগিল, এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। সে চলিতে চায়।

লাঠিধারী আরও দুইজন লোক ধীর পায়ে নিকটে আসিল। জনতার শুঁড়-গুলি হঠাৎ দুর্বল ও শিথিল হইয়া পড়িল; মুঠি হইতে দেহটিকে ছাড়িয়া দিল। আইনের প্রতিনিধিদের পদতলে দেহটি জানুর উপর ভর দিয়া ভাঙিয়া পড়িল; পুলিসটি তার কর্তৃত্বের এই খাটো ও মোটা প্রতীকটি তখন দেহটির উপর তুলিয়া ধরিল।...

জনতার মাথাটিও ধীরে ধীরে টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। দেহহীন, ক্লান্ত, শঙ্কিত হইয়া তাহারা মাঠ পার হইয়া চলিল। এক বিরাট কণ্ঠহারের কালো কালো অংশের মত তাহারা মাঠটির মলিন বুকে ছড়াইয়া পড়িল।

নর্দমার মতো রাস্তাগুলিতে এই মানুষগুলি নিঃশব্দে, কঠিন মুখে ঘুরিতে লাগিল। ছন্নছাড়া, দলভাঙ্গা মানুষের দল।...

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

॥ রাজা ॥

হাতে লম্বা তরোয়াল, বহু পদকশোভিত বুক, একজন খাস খানসামা আমাকে মহারাজার খাস কামরায় লইয়া গেল এবং প্রবেশদ্বারে আমার হাত দু'খানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা ঘরে ছিলেন না। আমি ঘরটিকে মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এ সেই গবেষণাগার যেখানে বসিয়া এই মহাপুরুষ এমন সব পরিকল্পনা তৈয়ারী করেন যাহা সারা পৃথিবীকে তাক লাগাইয়া দেয়। মহারাজার কাজকর্ম করিবার এই ঘরটি প্রায় দুইশত ফুট লম্বা ও অন্তত একশত ফুট চওড়া।

মাথার উপরের ছাদটা কাঁচের। বাঁ পাশের দেয়ালের কাছে একটি জল শুকাইয়া-যাওয়া পুকুরে কতকগুলি যুদ্ধজাহাজের মডেল ভাসিতেছে। চারিপাশের দেয়াল ঘিরিয়া শেলফ্, তাহার উপর নানা বিচিত্র উর্দিপরা সৈনিকের খুদে খুদে মূর্তি পরিপাটি করিয়া সাজানো। ডানদিকের সারা দেয়ালটার গায়ে রহিয়াছে এক সারি ছবি আঁকিবার ইজেল, তাহার উপর রহিয়াছে কতকগুলি অসমাপ্ত চিত্র; চিত্রগুলির সম্মুখের মেঝেতে আবলুশ কাঠ ও হাতীর দাঁতের কাজ, পিয়ানোর চাবির মত সাজানো।

ঘরটিতে অন্য যা' কিছু আছে সবই ঠিক এমনই বিপুল সমারোহের সাথে সাজানো। পরিচারকের দিকে তাকাইয়া বলিলাম,

"শুনছেন, বন্ধু।"

তরবারিতে ঝনৎকার তুলিয়া সে জবাব দিল, "আমি হচ্ছি সমস্ত অনুষ্ঠানের কর্তা।"...

আমি বলিলাম, "শুনে খুশি হলুম, কিন্তু বলতে পারেন......"

সে বাধা দিয়া বলিল, "মহারাজা যখন ঘরে ঢুকে আপনাকে অভিনন্দন জানাবেন, তখন আপনি কী বলবেন?"

আমি তাহাকে জবাব দিলাম : "কেমন আছেন?"

"সেটা হবে ঔদ্ধত্য"—

আমাকে ভালভাবেই হুঁশিয়ার করিয়া দিল পরিচারক এবং রাজার প্রশ্নের জবাবে আমাকে কি বলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতে লাগিল।

মহারাজা ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিলেন ভারী পদক্ষেপে। তাঁহার প্রাসাদটি যে খুব শক্তভাবে তৈয়ারী সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, ইহাই যেন তিনি দেখাইতে চাহিলেন পদক্ষেপের মধ্য দিয়া। মহারাজা পা ভাঙিয়া বসেন না, হাত দুটি দুই পাশে শক্ত করিয়া স্থির রাখেন, একটিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহার নড়ে না। ইহাতে তাঁহার ভঙ্গিমার মহিমা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। গতিস্পন্দনহীন তাঁহার চোখ দুটি যেন ভবিষ্যতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত কোন অনড় অসাড় মানুষের চোখের মতো।

আমি মাথা নত করিলাম, আমাকে যে লইয়া আসিয়াছে সে নমস্কার করিল। মহারাজা কৃপা করিবার ভঙ্গীতে গোঁফে চাড়া দিলেন।

গম্ভীর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জন্য কী করতে পারি?"

আমাকে যাহা শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই অনুসারে বলিলাম, "মহারাজ, আপনার জ্ঞানের সমুদ্র থেকে দুএক ফোঁটা অমৃত আহরণের জন্য এসেছি।"

"আমি আশা করি, জ্ঞান আমার তাতে কিছু কমে যাবে না।"—পরিহাস-তরল কণ্ঠে জবাব দিলেন মহারাজা।

"তা' অসম্ভব, মহারাজ!"—তাঁহার সূক্ষ্ম পরিহাস-রসের যোগান দিয়া জবাব দিলাম আমি।

তিনি বলিলেন, "বেশ, কথাবার্তা শুরু করা যাক। কোনো মহারাজার সাথে কথা বলবার সময় দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত, কিন্তু আপনি বসতে পারেন...অবশ্য যদি অস্বস্তি বোধ না করেন।"...

এই নূতন অবস্থায় নিজেকে দ্রুত অভ্যস্ত করিয়া লইতেছিলাম, তাই বসিলাম। মহারাজা নিঃশব্দে কাঁধ দুটি উঁচু করিয়া আবার নামাইয়া নিলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, রাজা যখন কথা বলেন তখন তাঁহার জিহ্বাটি নড়ে, কিন্তু শরীরের বাকী অংশে এক রাজকীয় অসাড়তা বিরাজ করে। দুইবার সমান মাপের পা ফেলিয়া একপাশে আগাইয়া গেলেন তিনি, তারপর ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে স্মৃতিস্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া বলিতে শুরু করিলেন,

"তাহলে, আপনার সামনে আপনি এখন দেখছেন একজন রাজাকে, অর্থাৎ আমাকে। রাজাকে দেখেছে, এ-গর্ব সবাই করতে পারে না! আপনি কী জানতে চান?"

"আপনার কাজ আপনি কতখানি পছন্দ করেন?"

"রাজা হওয়া কাজ নয়, এ এক পেশা!" আলঙ্কারিকের ভাষায় কথা

কহিলেন তিনি। "ঈশ্বর ও রাজা এমন দুই জিনিস যাঁদের প্রকৃতি কেউ বুঝতে পারে না।"

তিনি একটি হাত এমনভাবে ঊর্ধ্বে তুলিলেন যে হাতটি তাঁহার শরীরের সহিত এক রেখায় আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কাঁচের ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,

"এই ছাদ কাঁচের তৈরী, যাতে ঈশ্বর সব সময় দেখতে পান রাজা কি করছেন। তাহলেই ঈশ্বর রাজাকে বুঝতে পারবেন। তিনিই শুধু পারেন রাজাকে বাগে রাখতে।......রাজা ও ঈশ্বর হচ্ছেন স্রষ্টা। এক! দুই!—ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন জগৎ। এক! দুই! তিন!—আমার ঠাকুর্দা সৃষ্টি করলেন জার্মানি! আমি তাকে সম্পূর্ণ করে তুলছি। গ্যেটে নামে আমার পূর্বপুরুষদের একজন অনুগত ভৃত্য এবং আমি জার্মানির জন্য যা করেছি কেউ তা করেনি, একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। হয়ত আমি গ্যেটের চেয়ে একটু বেশীই করেছি। কিন্তু তার চেয়ে আমার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য যে অনেক বেশী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার ফাউস্ট শেষ পর্যন্ত একটা সন্দেহজনক নৈতিক চরিত্রের লোক ছাড়া আর কি? কিন্তু আমি জগতের সামনে তুলে ধরেছি এক রক্ষাকবচ-পরা ফাউস্টকে। জিনিসটা প্রত্যেকে ধরতে পেরেছে, এবং সংগে সংগেই ধরতে পেরেছে। গ্যেটের বইএর দ্বিতীয় পর্বের চাইতেও বেশী কিছু বলা চলে এ ব্যাপারে। হ্যাঁ তাই-ই......"

"আপনি কি আপনার অনেকটা সময় শিল্পচর্চায় ব্যয় করেন?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"সারা জীবন!" তিনি জবাব দিলেন, "সারা জীবন। একটা জাতিকে শাসন করা সমস্ত কলাবিদ্যার সেরা কলাবিদ্যা। একে সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করতে হলে, সব কিছু জানা দরকার। আমি সব কিছু জানি। কাব্য তো রাজার অস্থি-মজ্জায় মিশে থাকে। কোন কুচকাওয়াজে আপনি যদি আমাকে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন, যা' কিছু সুন্দর ও সুসমঞ্জস তাকে আমি কত ভালোবাসি। জেনে রাখবেন, সত্যিকার কাব্য হচ্ছে শৃঙ্খলানিষ্ঠার কাব্য। এ বোঝা যায় শুধু কুচ-কাওয়াজে ও কবিতায়। সৈন্যদের একটা রেজিমেন্ট,—তাকে আপনি কবিতা বলতে পারেন। এক লাইন কবিতার ভেতর একটি শব্দ ও এক সারির ভেতর একজন সৈন্য একই জিনিস। সনেট কি? হৃদয় আক্রমণের জন্য সারি দিয়ে দাঁড় করানো শব্দের একটা পল্টনবাহিনী। বাগিয়ে ধরো সঙ্গীন, ঝাঁপিয়ে পড়, আক্রমণ কর! —সংগে সংগে সুললিত একতান সংগীতের সুরধারা তোমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করবে। চালাও গুলী—সংগে সংগে তোমার মগজ শতচ্ছিন্ন হয়ে গেল কথার বুলেটে।......... জেনে রাখবেন, কবিতা ও সৈনিক একই জিনিস্। রাজাই দেশের প্রথম সৈনিক, রাজা একটি ঐশ্বরিক শব্দ। রাজাই দেশের প্রথম কবি। তাইতো আমি এত চমৎকার পা ফেলতে পারি, আর এত সহজে আমার কবিতা আসে। চেয়ে দেখুন, "মা-র্চ!"

তাঁহার বাঁ পা-খানি উপরে উঠিল, তারপর তাঁহার ডান হাতখানি দ্রুত উঠিয়া কাঁধের সাথে সমান হইল।

রাজার কণ্ঠে গর্জিয়া উঠিল সামরিক নির্দেশ,—"শান্"! সঙ্গে সঙ্গে হাত ও পা নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিল। মহারাজা বলিয়া চলিলেন :

"একেই বলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাধীন শৃঙ্খলানিষ্ঠা। এ সচেতনতার উপর নির্ভরশীল নয়। পায়ের ঝাঁকুনিতেই উঠে আসে হাতখানি। মস্তিষ্কের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। এ প্রায় দৈব ব্যাপার। এইজন্যই তো সবচেয়ে ভাল সৈন্য হল সেই যার মস্তিষ্ক একেবারেই কাজ করে না। সৈন্যকে চালিত করে মন নয়, হুকুমের শব্দ।......'মা...র্চ...!'—সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে, রসাতলে যে কোন জায়গায় সে যাবে। সঙ্গীন বাগিয়ে ধরো, ঝাঁপিয়ে পড়ো!—সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাপের বুক বিদীর্ণ করবে—যদি সে বাপ সোশ্যালিস্ট হয়—কিম্বা ভায়ের বুক, কিম্বা মায়ের বুক—তার কাছে সব সমান। 'থামো'—হুকুম যতক্ষণ সে না শুনছে ততক্ষণ সে থামবে না। চমৎকার! কী চমৎকার মনছাড়া দেহের এই গতিক্রিয়া।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি সেই দৃঢ় কণ্ঠস্বরে একইভাবে বলিয়া চলিলেন :

"হয়ত আমি একটি আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টি করব।......আমি যদি না পারি, তবে আমার অধস্তন পুরুষেরা কেউ করবে। দেশের প্রত্যেকটি লোক শৃঙ্খলানিষ্ঠার সৌন্দর্য উপলব্ধি করবে—শুধু এইটুকুই চাই, শুধু এইটুকুই প্রয়োজন। মানুষ যখন চিন্তা করা একদম বন্ধ করবে, তখন রাজারা হবেন মহান, আর দেশগুলো হবে সুখী। টাকা!—রাজা দেবেন হুকুম, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুগত প্রজারা দাঁড়িয়ে যাবে এক সারিতে। এক!—সঙ্গে সঙ্গে একটি বাক্য উচ্চারণ না করে চার কোটি হাত ঢুকবে চার কোটি পকেটে। দুই!—চার কোটি হাতের প্রত্যেক হাত রাজাকে দেবে দশ মার্ক। তিন!—চার কোটি মানুষ তাদের রাজাকে কুর্নিশ করে নিঃশব্দে কাজে ফিরে যাবে। কী চমৎকার! আপনি নিজেই দেখুন, সুখী হবার জন্য মানুষের মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না; চিন্তার কাজটা রাজাই তাদের জন্য করছেন। জীবনের প্রত্যেক দিকটাই দেখার ক্ষমতা আছে রাজার।...আমি এই লক্ষ্য লাভের চেষ্টা করছি। আজ পর্যন্ত আমিই একমাত্র লোক, রাজার কার্য ও কর্তব্য সম্পর্কে যার এই ধরনের গভীর মতামত আছে। সব রাজাই মর্যাদা রক্ষা করে চলেন না। রক্তের বন্ধন থাকলেও সব সময় তাদের মনের বন্ধন থাকে না। তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, একটা একক শক্তিতে পরিণত হতে হবে। একাজ সহজেই করা যায় এবং এখনই হচ্ছে এই কাজের উপযুক্ত মুহূর্ত। সোশ্যালিজমের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। এর ভেতর এমন কিছু আছে যা' রাজাদের কাজে লাগবে। সোশ্যালিজমের লালাতঙ্ক সব দেশেরই সভ্য মানুষের বুকে ত্রাসের সৃষ্টি করে। সভ্য সমাজের প্রাণ যে সম্পত্তি তাকে এ গিলে খেতে চায়। এই দানবের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য রাজাদের এখনই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং প্রাচীনকালের সর্দারদের মত মানুষকে এই লড়াইয়ের পরিচালনা করতে হবে। সোশ্যালিজমের ভয় জাগিয়ে তুলতে হবে। তারপর যখন সমাজ আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যাবে, তখনই রাজারা হবেন স্ব-মহিমায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত। এক সময় রাজারা প্রজাদের দিতেন

সংবিধান। সেদিন আর নেই। এখন ঐ সংবিধান ফিরিয়ে নেবার সময় এসেছে।"

দম লইবার জন্য একটু থামিয়া তিনি আবার আরম্ভ করিলেন। শুধু তাঁহার জ্ঞান উপভোগ করিবার জন্যই আমি হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলাম :

"বর্তমান যুগের প্রত্যেক রাজার জন্য এই হল আমার কর্মসূচী। আমার নৌবাহিনী যখন এত শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে ইউরোপের সমস্ত রাজাদের কাছে আমি আমার এই কর্মসূচী উপস্থিত করতে পারব, তখন তাঁরা যে একে গ্রহণ করবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।...ইতিমধ্যে নিজেকে আমি শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মে নিযুক্ত রাখব, আমার অনুগত প্রজাদের আমি সুশিক্ষিত করে তুলব। আমি সমস্ত কলাবিদ্যা আয়ত্ত করেছি। রাজার শক্তির ঐশ্বরিক উৎসের ধারণা মানুষের মনে বলবৎ রাখার কাজে সমস্ত কলাবিদ্যাকেই আমি নিয়োগ করেছি। আপনি আমার 'সিয়েগেসালী' দেখেছেন? সেখানে ভাস্কর্য শিল্প জার্মানদের দেখিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীতে কতজন 'হাপ্স্বুর্গ' ও 'হোহেনজোলার্ন' হয়েছেন। ডাইনে, বাঁয়ে, ডাইনে, বাঁয়ে—সারির ভেতর দিয়ে মাত্র দু'বার যাতায়াত করলেই যে কেউ জানবে আমার পূর্বপুরুষেরা সবাই ছিলেন মহাপুরুষ। এতে তাদের মনে নিজের দেশের রাজাদের সম্পর্কে গর্বের ভাব জেগে উঠবে এবং নিজের অজ্ঞাতেই সে রাজতন্ত্রের একজন আন্তরিক সমর্থক হয়ে উঠবে। যথাসময়ে আমি আমার সমস্ত শহরগুলির প্রতিটি রাস্তায় আমার পূর্বপুরুষদের মূর্তি স্থাপন করব। মানুষ দেখবে অতীতে ক'জন রাজা ছিলেন, তখন বুঝবে ভবিষ্যতেও রাজা না হলে তাদের চলবে না। ভাস্কর্য শিল্প মানুষের কাজে লাগে। কিন্তু এ কথা আমিই প্রথম দেখিয়ে দিলুম জোরের সাথে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা মহারাজ! আপনার পূর্বপুরুষদের অধিকাংশের পা বাঁকা কেন?"

"তাঁরা সকলেই একই কবরের পাথর তৈরীর কারখানায় তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁদের আত্মার মহিমা বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো!...কিন্তু আপনি আমার সঙ্গীত শুনেছেন কি? শোনেন নি? আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

খাড়া শরীরটিকে এক রাজকীয় কায়দায় তিনি সঙ্গীনের মত করিয়া ফেলিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং একখানি পা ছড়াইয়া দিয়া যে পরিচারকটি আমাকে লইয়া আসিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

"কাউন্ট, আমার বুট খুলে দাও। মোজাও খুলে দাও। ধন্যবাদ......যদিও সেবার জন্য প্রজাদের রাজারা ধন্যবাদ দেন না, তবু সৌজন্যের খাতিরেই এটা বলা গেল।"

ট্রাউজারটি হাঁটু পর্যন্ত গুটাইয়া ও ঘাড়টি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করিয়া বাঁকাইয়া তিনি পা' দুটি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বলিলেন, "পা দুখানির জন্য ব্রোঞ্জের ছাঁচ তৈরি করতে জীবিত থাকতেই আমি হুকুম দিয়ে যাব। ভবিষ্যৎ মূর্তির জন্য অনেকগুলো ছাঁচ গড়িয়ে রাখতে হবে। ঠিকই, রাজার পা সোজা হওয়াই উচিত। বাঁকা পা দেখে ধারণা হতে পারে, এ পুরো ও খাঁটি রাজা নয়।"

ডান দিকের দেয়ালের কাছে গিয়া তিনি একটি তুলি হাতে লইলেন এবং বাঁ দিকে অর্ধেক ঘুরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :

"সংগীত ও চিত্রবিদ্যা আমার একই সংগে চলে। চেয়ে দেখুন, মেঝেতে এই চাবিগুলি বসানো আছে। যন্ত্রটি আছে মেঝের নীচে। সুরগুলিকে রেকর্ড করা হচ্ছে একটি যন্ত্রে। সে যন্ত্রটিও রয়েছে মেঝের নীচে। আমি একখানি ছবি আঁকছি—এক!"

ইজেলের উপর রাখা একখানি ক্যানভাসের উপর দিয়া তিনি তুলিটি বুলাইয়া লইলেন।

"আর এই চাবির উপর পা দিয়ে চাপ দিই—দুই!"

সংগে সংগে একটা জোরালো শব্দ বাহির হইয়া আসিল।

"দেখলেন তো! কত সহজ, আর কত সময় বাঁচে। সব সময়ই রাজার সময়ের যে বড় অভাব। ঈশ্বরের উচিত জাতির নায়কদের পার্থিব জীবনকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া। প্রজাদের সুখবৃদ্ধির কাজে আমরা সব সময়ই এত ব্যস্ত থাকি যে, আমরা এর বিনিময়ে অনন্ত জীবনের আনন্দলাভের জন্য খুব ব্যস্ত নই।......কিন্তু আসল বিষয়টি থেকে যে দূরে সরে যাচ্ছি। নদীর জলের মত চিরন্তন বয়ে চলেছে রাজাদের চিন্তা-ধারা। সমস্ত প্রজাদের জন্যই রাজাকে চিন্তা করতে হয়। একাজে আর কারও অধিকার নেই, যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।......একটা নতুন রচনা আপনাকে শোনাব। এই গতকাল এটাকে তৈরী করেছি।......"

সংগীতের এক শীট্ কাগজ হাতে লইয়া লাইনগুলির উপর দিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন :

"মুদারার ঘাটে এটি একটি সুরের স্বরলিপি।...দেখুন কী কড়া পর্যায়ে সাজানো। ট্রা-টা-টাম্, ট্রা-টা-টাম্। পরের লাইনে সুরগুলো যেন একটা ঢালু বেয়ে উঠছে, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গ দখল করবে। তারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, খন্ড খন্ড লড়ায়ের কায়দায় তারা ছড়িয়ে পড়ছে,......রা-টা-টা-টা! এটা খুব যুৎসই সুর। আপনাকে মনে করিয়ে দেবে পেটের ভিতর কলিক যন্ত্রণার কথা—কেন তা পরে জানতে পারবেন। এই সুরের হুকুমে তারা আবার সারিবন্দী হয় দাঁড়িয়ে গেল। গুড়ুম্। অনেকটা কামানোর সংকেতধ্বনির মতো অথবা পাকস্থলীতে একটা হঠাৎ-যন্ত্রণার মতো। এবার তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেল। অনেক অনেক পদধ্বনি। হাড় ভাঙার শব্দ। এই শব্দ চলল অবিশ্রান্ত, যেন খুলে-যাওয়া অস্থি-গ্রন্থির যন্ত্রণা। সব-শেষে সমস্ত শব্দের আঘাত পড়ল একটি বিন্দুতে। র্-রাম! র্-রাটা-টাম্! গুড়ুম! এখানে সুরগুলো ভেঙে গেল একটা চরম বিশৃংখলার মধ্যে। কিন্তু এই হওয়া উচিত। এই-ই চরম সুর—সর্বজনীন উল্লাসের দৃশ্য।"

বর্ণনায় গভীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এর নাম কী?"

রাজা বলিলেন, "এর নাম 'রাজার জন্ম।' সংগীতের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের প্রচারের এই আমার প্রথম প্রচেষ্টা।...খুব খারাপ হয়নি, কী বলেন?"

নিজের সৃষ্টিতে রাজা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। খুশিতে তাঁহার গোঁফজোড়া নাচিতে লাগিল।

"আমাদের প্রজাদের মধ্যে বেশ ভালো কয়েকজন সংগীতকার আছেন, কিন্তু আমি নিজেই হাত দেব ঠিক করলুম, যাতে অন্যেরা আমাকে অনুসরণ করতে পারে।"

তাঁহার গোঁফজোড়া নড়িতে লাগিল। নিশ্চয়ই তিনি হাসিতে চাহিতেছেন। তারপর ডাইনে অর্ধেক ঘুরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন :

"এবার এদিকে দেখুন। বলুন তো এটা কী?"

একটা বিরাট ক্যানভাসের উপর গাঢ় লাল রঙে একটা কবন্ধ দৈত্য আঁকা রহিয়াছে। তাহার অনেক হাত এবং প্রত্যেক হাতেই বিদ্যুতের বর্শা। একটি বর্শার উপর কালো অক্ষরে লেখা, "নৈরাজ্যবাদ", আরেকটিতে, "নাস্তিক্যবাদ", তৃতীয়টিতে লেখা "ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংসসাধন", চতুর্থটিতে লেখা "অত্যাচার"। শহর ও গ্রামের মধ্য দিয়া দেহের আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে দৈত্য ছুটিয়া চলিয়াছে আর সর্বত্র আগুন জ্বলিতেছে। আতঙ্কে, বিস্ময়ে দৈত্যের সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইতেছে ছোট ছোট কালো মানুষেরা। দৈত্যের পশ্চাতে আসিতেছে লাল মানুষের একটি উল্লসিত জনতা। তাহাদের চোখ নাই, মাথা হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত নামিয়াছে আগুনের মত লাল চুল—গোরিলার মত। লাল রঙ খরচ করিতে শিল্পী এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই। ছবিখানির বিশালত্বে চোখ ঝলসিয়া যায়।

"বীভৎস?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বীকার করিলাম, "বীভৎসই বটে।"

তিনি বলিলেন, "চাই ঠিক এই বীভৎসতাই।" বলিয়া তঁাহার চোখ ডান হইতে একেবারে বাঁ দিকে ফিরিয়া গেল।

"আমার বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এই হ'ল সোশ্যালিজম। দেখুন, এর মাথা নেই, এ পাপের বীজ বপন করে, বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে যায়, মানুষকে পশুতে পরিণত করে। হ্যাঁ, এই হল সোশ্যালিজম। হ্যাঁ বলতে পারেন, বড্ড জোরের কাজ হয়েছে। আমার শরীরের নীচের অংশটা যখন রাজার শক্তির পরিচয় ঘোষণা করছে, শরীরের উপরের অংশ তখন রাজার শক্তির প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। আমার রাজত্বকালের মত এত উৎসাহের সাথে শিল্পকলা আর কোনদিন তার কর্তব্যপালন করেনি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজার প্রজারা কি মহারাজার এই প্রাণপাত পরিশ্রমের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে?"

"তারা আমার কাজের মূল্য বুঝতে পারে?" রাজা আমার কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। মনে হইল তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু ক্লান্তির আভাস পাওয়া গেল।

"মূল্য বোঝা তাদের উচিত। তাদের জন্য আমি কত যুদ্ধজাহাজ তৈরী করেছি। সারা রাস্তা আমি ভরে দিয়েছি প্রস্তরমূর্তিতে। আমি গান বানাই, ছবি আঁকি, আমি উপাসনা পরিচালনা করি।......কিন্তু মাঝে মাঝে একটা পাপচিন্তা আমার মাথায় ঢোকে। আমার সন্দেহ হয়, আমার প্রজাদের মধ্যে যারা বোকা তারাই আমাকে ভালবাসে, যারা চালাক তারা সবাই সোশ্যালিস্ট। লিবারেলরাও আছে। কিন্তু তারা সবটুকুই নিজেদের জন্যই চায়, রাজার জন্য কিছু রাখতে

চায় না। এক কথায় তারা একটা আপদ। রাজার সর্বময় ক্ষমতাই শুধু জনসাধারণকে সোশ্যালিজমের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু মনে হয় কেউ তা বোঝে না।......"

শরীরের দু' জায়গায় সমকোণে ভাঙিয়া রাজা বসিলেন। তাঁহার চোখ দু'টি চিন্তিতভাবে গর্তের মধ্যে এদিক ওদিক করিতে লাগলি। তাঁহার সর্বাঙ্গে একটা বিমর্ষতার ছাপ পড়িয়াছে। তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া আমি আমার শেষ প্রশ্ন করিলাম :

"রাজশক্তির ঐশ্বরিক উৎস সম্পর্কে আপনার আর কি বলার আছে, মহারাজ?"

"যা খুশি", দ্রুত জবাব দিলেন মহারাজা। "প্রথমত, এ শক্তি অটল এবং এক ও একমাত্র সত্য। কারণ এ শক্তি দৈবশক্তি। যখন হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ একটিমাত্র লোকের সীমাহীন ক্ষমতাকে স্বীকার করে আসছে, তখন তাকে অস্বীকার করবে শুধু নির্বোধেরা। এটা জলের মত সোজা। আমি রাজা বটে, কিন্তু আমি মানুষ। তাই যখন দেখি জনসাধারণ আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করছে, তখন স্বীকার না করে পারি না যে, এ দৈব ঘটনা।...তাই নয় কি? আমি ধরে নিতে পারি না যে, এই লক্ষ লক্ষ লোকের সবাই নির্বোধ। আমি তাদের আত্মসম্মান বাঁচাতে চাই, এবং ভাবতে চাই এরাই বুদ্ধিমান। নিজের প্রজাদের সম্পর্কে নীচু ধারণা হওয়া ভালো রাজার লক্ষণ নয়। আর ঈশ্বর ছাড়া যখন কেউ দৈবঘটনা ঘটাতে পারে না তখন আমি যে তাঁর শক্তি ও আমার গুণাবলী প্রচারের জন্য ঈশ্বরেরই নির্বাচিত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এর বিরুদ্ধে কি বলার আছে? সত্য তো এখানেই। এ সত্য হীরার মত কঠিন কারণ অধিকাংশ মানুষই এতে বিশ্বাস করে।......"

খুশির একটা আভাস তাঁহার চোখে খেলিয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মিলাইয়া গেল। যুদ্ধজাহাজের ইঞ্জিনের বাষ্প ছাড়ার মত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন মহারাজা।

আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলাম, "আমি আর মহারাজার সময় নষ্ট করব না।"

মহান জাতির নেতা করুণার্দ্র কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আচ্ছা বেশ! আসুন তবে। আশীর্বাদ করি......কী আশীর্বাদ আপনাকে করতে পারি? আশীর্বাদ করি রাজা দেখার সৌভাগ্য আপনার জীবনে আবার আসুক।"

মহারাজা রাজকীয় কায়দায় নীচের ঠোঁটটি ঝুলাইয়া দিলেন ও অনুগ্রাহকের ভঙ্গীতে গোঁফটি উপরে তুলিলেন। ইহাকে নমস্কার বলিয়া মনে করিয়া আমি বুদ্ধিমান পশু দেখিবার জন্য পশুশালার দিকে রওনা হইলাম।...

কেন জানি না এমন অনেক লোক আছে যাহাদের সহিত কথা বলিবার পর আপনার প্রবল ইচ্ছা হইবে পোষা কুকুরটিকে আদর করিতে, একটা বানরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতে অথবা একটি হাতী দেখিয়া সম্ভ্রমসহকারে মাথার টুপীটি তুলিতে।

॥ প্রজাতন্ত্রের একজন রাজা ॥

...লোহা ও তেলের রাজারা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত রাজাই সব সময়েই আমার কল্পনাকে পীড়িত করিয়াছেন। যাঁদের এত টাকা তাঁহারা যে সাধারণ মানুষের মত হইতে পারেন, ইহা আমি ভাবিতেই পারিতাম না।

আমার মনে হইত, ইঁহাদের প্রত্যেকের অন্তত তিনটি পাকস্থলী ও প্রায় দেড়শ' দাঁত আছে। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, সারাদিন ধরিয়া অর্থাৎ ভোর ছয়টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একজন কোটিপতি অবিশ্রাম খাইয়াই চলিয়াছেন এবং খাইতেছেন সবচেয়ে দামী খাবার—পনীর, টার্কি। শূকর-ছানা, মাখন মাখানো মূলো, পুডিং, কেক ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের সুস্বাদু খাবার। সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার চোয়াল দুইটি এত শক্ত হইয়া যায় যে, নিগ্রোদের তিনি হুকুম করেন তাঁহার জন্য খাবার চিবাইয়া দিতে, তিনি শুধু সেই চিবানো খাবার গিলিয়া ফেলেন। সবশেষে, ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন হইয়া তিনি যখন পরিশ্রমে হাঁপাইতে ও ঘামিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। পরদিন সকালে ছয়টায় উঠিয়া তিনি আবার তাঁহার দিনের কঠিন কার্যসূচী আরম্ভ করেন।

কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি তাঁহার পুঁজির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সুদও খরচ করিতে পারেন না।

এই জীবনযাত্রা যে কঠোর সে সম্পর্কে যুক্তির অভাব নাই। উপায় কি? যদি একজন সাধারণ মানুষ যাহা খায় তার চেয়ে বেশী না খাইতে পারেন তবে কোটিপতি হইয়া লাভ কি?

আমি ভাবিতাম, কোটিপতির অন্তর্বাস নিশ্চয়ই ব্রোকেডে তৈয়ারী, তাঁহার বুটের গোড়ালিতে সোনার পেরেক মারা; টুপীর পরিবর্তে তিনি হীরকের

শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকেন। তাঁহার জ্যাকেট নিশ্চয়ই সবচেয়ে দামী মখমলে তৈয়ারী, অন্তত পঞ্চাশ ফুট লম্বা, চারিপাশে অন্তত তিনশ' সোনার বোতাম বসানো। ছুটির দিনে তিনি আটটি জ্যাকেট পরেন, প্যান্ট পরেন পর পর ছয় জোড়া। নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর।...কিন্তু ধনবান ব্যক্তির তো আমার-আপনার মতো পোশাক পরিলে চলে না।...

আমি ভাবিতাম, কোটিপতির পকেটটি এমন একটি গর্ত যাহার মধ্যে একটা গীর্জা, একটি সেনেট-ভবন ও প্রয়োজনীয় যা কিছু সব ঢুকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদিও ভাবিতাম, এই ভদ্রলোকটির পাকস্থলীর ধারণক্ষমতা একটা বড় রকমের সমুদ্রগামী জাহাজের মত, কিন্তু ভদ্রলোকের পা ও ট্রাউজার কতখানি লম্বা হইতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইতাম না। আমি অবশ্য ভাবিতাম, যে-লেপটির নীচে তিনি শোন তাহা নিশ্চয়ই এক বর্গমাইল হইবে। যদি তামাক চিবাইবার অভ্যাস তাঁহার থাকে, তবে সে-তামাক নিশ্চয়ই সবচেয়ে উঁচুদরের এবং একবারে দুই-এক পাউন্ডই তিনি চিবাইয়া থাকেন। যদি তিনি নস্য নেন, তবে একটিপে অন্তত এক পাউন্ড তুলিয়া নেন। টাকা যখন আছে তখন খরচ করিতে হইবে ত?...

অদ্ভুত স্পর্শপ্রবণ তাঁহার আঙুলগুলি এবং সে আঙুলগুলি ইচ্ছামত লম্বা করিবার দৈবশক্তি তাঁহার আছে। যেমন, নিউইয়র্ক হইতে তিনি যদি দেখিতে পান সাইবেরিয়ার কোথাও মাটি ফুঁড়িয়া একটি ডলার উঠিতেছে, তবে আসন হইতে এতটুকু না নড়িয়া বেরিং প্রণালীতে উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া সেই প্রিয় চারাগাছটিকে তিনি তুলিয়া আনিতে পারেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এত কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু দৈত্যের মাথাটি কেমন তাহা কোনদিন কল্পনা করিতে পারি নাই। তার উপর, মনে হইত পেশী ও হাড়ের এই বিশাল তালটির যখন সব কিছু হইতে সোনা নিংড়াইয়া আনা ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই, তখন মাথার কি প্রয়োজন? সাধারণভাবে কোটিপতি সম্পর্কে আমার ধারণাটি ছিল কিছুটা অস্পষ্ট। মনশ্চক্ষে আমি যাহা দেখিতাম তাহা এক কথায় দুইটি গতিশীল হাত। সেই হাত দুইটি দিয়া সমস্ত পৃথিবীটি তিনি জড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং নিজের অন্ধকার মুখ-গহ্বরের দিকে টানিয়া আনিতেছেন। সেই মুখ আমাদের এই গ্রহটিকে ভাজা আলুর মত চুষিয়া, কামড়াইয়া, চিবাইয়া খাইতেছে।......

কোটিপতির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মনে মনে এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাই যখন দেখিলাম অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতই তিনি, তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আমার সম্মুখে আরাম-কেদারার গভীরে বসিয়া আছেন এক দীর্ঘাকৃতি শুষ্কদেহ বৃদ্ধ। হলুদ রঙের কুঞ্চিত দুইখানি হাত তিনি শান্তভাবে পেটের উপর রাখিয়া বসিয়া আছেন। হাত দুইখানিতে অসাধারণ কিছু নাই। পুরু গাল দুইটি পরিষ্কার করিয়া কামানো, নীচের ঠোঁটটি ঝুলিয়া পড়ায় সোনাবাঁধানো চমৎকার একপাটি দাঁত দেখা যাইতেছে। উপরের ঠোঁটটি কামানো, পাতলা, রক্ত

নাই। এই ঠোঁটটি চিবাইবার যন্ত্রটির সহিত আঁটা এবং কথা বলিবার সময় সে ঠোঁট একেবারেই নড়ে না। বিবর্ণ চোখ দুইটির উপর কোন ভ্রূ নাই, মাথায় নাই একটিও চুল। মনে হয়, মুখে আরেকটু চামড়া থাকা উচিত ছিল—গতিহীন, মসৃণ, রক্তিম মুখখানি, নবজাত শিশুর মুখের মত। এইমাত্র পৃথিবীতে আসিল অথবা পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেছে, বলা শক্ত।

তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ মানুষের মত। শরীরে যত সোনা, সবই আংটিতে, ঘড়িতে ও দাঁতে। সব শুদ্ধ বোধ হয় আধ পাউণ্ডেরও কম হইবে। সাধারণভাবে লোকটিকে দেখিতে ইউরোপের কোন অভিজাত পরিবারের পুরাতন ভৃত্যের মত।

যে-ঘরটিতে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন, সে-ঘরে না ছিল বিলাসিতা, না ছিল সৌন্দর্য। আসবাব ছিল বড় বড়, ইহা ছাড়া ঘরটি সম্পর্কে বর্ণনার কিছু নাই।

আসবাবগুলি দেখিয়া মনে হয় এই বাড়ীটিতে বোধ হয় কখনও হাতী আসিয়াছিল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আপনি, আপনিই কি কোটিপতি?"

"হ্যাঁ, আমিই"—এমনভাবে মাথাটি নাড়িয়া জবাব দিলেন তিনি যাহাতে অবিশ্বাসের অবকাশ থাকে না।

তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবার ভান করিলাম কিন্তু ঠিক করিলাম তাঁহার ভাঁওতা আমি তখনই ধরিয়া ফেলিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রাতরাশের সময় আপনি কতটা মাংস খান?

তিনি বলিলেন, "মাংস আমি খাই না। এক টুকরা কমলা, একটা ডিম, ছোট এক কাপ চা, এই......"

ঘোলা জলের দুইটি বড় বড় ফোঁটার মত তাঁহার নিরীহ শিশুর মত চোখ দুইটি চকচক করিতে লাগিল। সে চোখে আমি বিন্দুমাত্র মিথ্যার আভাস পাইলাম না।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল কথা! কিন্তু দয়া করিয়া খোলাখুলি বলুন দেখি, দিনে ক'বার আপনি খান?"

"দু'বার"—শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি। "প্রাতরাশ ও ডিনার। আর আমার খাবার দরকার হয় না। এক প্লেট সুপ, কিছু সাদা মাংস, আর একটা মিষ্টি—এই আমার ডিনার। ফল, এক কাপ কফি, একটা চুরুট......

আমার বিস্ময়ের মাত্রা দ্রুত বাড়িতেছিল। নিষ্পাপ সাধুর মত দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকাইলেন। দম লইবার জন্য একটু থামিয়া আমি বলিতে লাগিলাম :

"কিন্তু যদি তাই হয়, তবে এত টাকা দিয়ে আপনি কী করেন?"

ঘাড় দুইটি সামান্য একটু দোলাইলেন তিনি। গর্তের মধ্যে চোখের মণি দুইটি তাঁহার একটু ঘুরিল। তারপর তিনি জবাব দিলেন :

"আরও টাকা করবার জন্য এই টাকা আমি ব্যবহার করি।"

"কিসের জন্য?"

"আরও টাকা করার জন্য।"

"কিসের জন্য?"—আবার জিজ্ঞাসা করিলাম আমি।

সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চেয়ারের হাতার উপর কনুই দুইটি রাখিয়া একটু কৌতূহলের সংগে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি কি পাগল?"

"আপনি কি পাগল?" পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলাম আমি।

মাথাটা একটু সামনে নোয়াইয়া সোনার দাঁতের ফাঁক দিয়া টানিয়া টানিয়া বলিলেন বৃদ্ধ :

"লোকটি তো বড় মজার...আগে এমন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে বলে মনে পড়ে না..."

তারপর মাথাটি তুলিয়া, প্রায় আকর্ণ বদন বিস্তার করিয়া নীরবে তিনি আমাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া মনে হইল নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই মনে করেন। লক্ষ্য করিলাম তাঁহার টাইটিতে একটি ছোট হীরকবসানো পিন। এই পাথরখানি যদি গোড়ালির মত বড় হইত তবে বুঝিতে পারিতাম কোথায় আসিয়াছি।

"নিজেকে দিয়ে আপনি কি করেন?"—জিজ্ঞাসা করিলাম আমি।

"টাকা বানাই"—ঘাড় দুইটিতে দোলা দিয়া সংক্ষেপে জবাব দিলেন তিনি।

"ও, মেকী টাকা তৈরী করেন? জালিয়াৎ আপনি?"—আনন্দে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মনে হইল রহস্যের কিনারা পাইয়া গিয়াছি। কিন্তু তখনই তিনি হিক্কা তুলিতে শুরু করিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, যেন কোন অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে সুড়সুড়ি দিতেছে। চোখ দুইটি তাঁহার পিট্‌পিট করিতে লাগিল।

ঠাণ্ডা হইয়া আমার দিকে খুশির দৃষ্টিতে তাকাইয়া তিনি বলিলেন "বেশ মজা তো! আচ্ছা এখন আমাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করুন।" এই বলিয়া কেন জানি না তিনি গালগুলি ফুলাইয়া বসিলেন।

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া আমি দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম :

"কিভাবে আপনি টাকা তৈরী করেন?"

মাথা নাড়িয়া তিনি জবাব দিলেন, "খুব সোজা ব্যাপার। আমার রেলওয়ে আছে। চাষীরা মাল উৎপাদন করে। সেই মাল আমি বাজারে আনি। হিসাব করে দেখি চাষীকে ঠিক কত দিলে সে না খেয়ে মরবে না এবং কাজ করে যেতে পারবে। সেই টাকা চাষীকে দিয়ে বাকীটা ফ্রেট চার্জ বলে পকেটস্থ করি। খুব সোজা ব্যাপার।"

"চাষীরা খুশি থাকে?"

"মনে হয় সবাই নয়।"—শিশুর মত সরলভাবে জবাব দিলেন তিনি। "কিন্তু

জানেন তো, লোক কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এমন পাগল আপনি সব সময়েই পাবেন যারা নালিশ জানিয়েই চলেছে।..."

দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করিলাম, "সরকার আপনার কাজে বাধা দেন না?"

"সরকার?"—চিন্তিতভাবে কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমারই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া চলিলেন, "ওঃ আপনি ওয়াশিংটনের ঐ লোকদের কথা বলছেন? না, তারা আমাকে বিরক্ত করে না। তারা লোক ভাল।...তাদের অনেকেই আমার ক্লাবের সভ্য। আর, তাছাড়া তাদের সঙ্গে সম্পর্কও এমন কিছু নেই। তাইত মাঝে মাঝে তাদের কথা মনে থাকে না। না, তারা কোন বাধা দেয় না।"

হঠাৎ আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলতে চান, এমন সরকার আছে যারা লোককে টাকা করতে বাধা দেয়?"

তাঁহার জ্ঞান ও আমার অজ্ঞতায় আমি বিব্রত বোধ করিলাম। আস্তে আস্তে বলিলাম, "না, আমি তা' বলতে চাই নি। আমি ভেবেছিলুম......খোলাখুলি ডাকাতিটা বন্ধ করা মাঝে মাঝে সরকারের উচিত।"

বাধা দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছেন আপনি? এ তো আদর্শবাদ। এ এখানে চলে না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাত দেবার কোন অধিকার সরকারের নেই।..."

এই ধীর শান্ত শিশুসুলভ বিজ্ঞতার সম্মুখে আমি ক্রমেই নিজেকে বেশী করিয়া ছোট মনে করিতেছিলাম। বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম, একজন লোক যখন অনেকের সর্বনাশ করে, তখনও কি সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার?"

"সর্বনাশ!" চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া আমার কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন তিনি। "সর্বনাশ বলে তাকেই যখন মজুরী বাড়ে কিম্বা ধর্মঘট হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বহিরাগতেরা আছে। তারা সব সময়েই মজুরী কমিয়ে দেয় ও স্বেচ্ছায় ধর্মঘটীদের জায়গা নেয়। যখন এদেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বহিরাগত এসে যাবে, কম মজুরীতে কাজ করবে ও অনেক জিনিস কিনবে, তখন সব কিছুই চমৎকার চলবে।"

তিনি একটু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহাকে আর ততটা বৃদ্ধ ও শিশুর সংমিশ্রণ মনে হইল না। তাঁহার রোগা হলদে আঙুলগুলি নড়িতে লাগিল; তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠস্বর আসিয়া আমার কাণে বাজিতে লাগিল।

"সরকার? প্রশ্নটা সত্যিই কৌতূহল জাগাবার মতো। ভালো সরকারের সত্যিই প্রয়োজন। এই সরকারকে দেখতে হবে, যত লোক আমার প্রয়োজন দেশে তত লোকই থাকে, যাতে যা আমি বিক্রী করতে চাই সবই তারা কিনতে পারে। এই সরকারকে দেখতে হবে যত মজুরের আমার প্রয়োজন, সংখ্যায় মজুর তার কম না হয়। কিন্তু তার বেশী হলে চলবে না! সোশ্যালিস্ট থাকতে পারবে না, ধর্মঘট হ'তে পারবে না। সরকার বেশী ট্যাক্স বসাবেন না। জনসাধারণ যা দেবে সব আমিই নেব। একেই আমি বলি ভালো সরকার।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "লোকটি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে—নিজের

বিরাটত্ব সম্পর্কে সে যে সচেতন তার স্পষ্ট লক্ষণ এই। লোকটি নিশ্চয়ই রাজা..."

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের কণ্ঠে তিনি বলিয়া চলিলেন :

"আমি চাই দেশে শৃঙ্খলা থাকিবে। সরকারকে অল্প বেতনে যত প্রকারের দার্শনিক আছেন সবাইকে ভাড়া করে আনতে হবে। তারা প্রতি রবিবার অন্তত আট ঘণ্টা লোককে আইন মান্য করতে শিক্ষা দেবে। দার্শনিকেরা যদি না পারেন, তবে সৈন্য তলব করতে হবে। পদ্ধতি নয়, ফলাফল দেখেই বিচার করতে হবে। মজুর ও ক্রেতা সবাইকেই আইন মেনে চলতে হবে। বাস্ এই!"

আমি ভাবিলাম, "না, ইনি তো নির্বোধ নন, তাই রাজা হতে পারেন না ইনি!" জিজ্ঞাসা করিলাম, "বর্তমান সরকারের প্রতি আপনি কি সন্তুষ্ট?"

তিনি চট করিয়া জবাব দিলেন না।

"যা করতে পারে এ সরকার, তার চেয়ে কমই করছে। আমি বলি : বহিরাগতদের আপাতত দেশে ঢুকতে দেওয়া হোক। কিন্তু আমাদের যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তারা ভোগ করে, তার জন্য তাদের দাম দিতে হবে। তাদের প্রত্যেককে অন্তত পাঁচশ' ডলার সঙ্গে আনতে হবে। যার পঞ্চাশ ডলার আছে তার চেয়ে দশগুণ ভালো যার আছে পাঁচশ' ডলার। আর বদ্ লোকদের অর্থাৎ ভবঘুরে, ভিখেরী, রুগী ও নিষ্কর্মাদের দিয়ে কোথাও কোন কাজ হয় না।"

আমি সাহস করিয়া বলিলাম, "কিন্তু এর ফলে যে বহিরাগতের সংখ্যা কমে যাবে।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়াইয়া জানাইলেন, ঠিকই।

"যথাসময়ে আমি প্রস্তাব করব এদের প্রচেষ্টা একদম বন্ধ করে দেওয়া হোক। ......কিন্তু ইতিমধ্যে এদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু সোনা নিয়ে আসুক। দেশের মঙ্গল হবে। তা ছাড়া, নাগরিকত্বের শিক্ষানবিশীর সময়টা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হোক। সময় মত এই নাগরিকত্বলাভের ব্যাপারটা একদম তুলে দেব। আমেরিকানদের জন্য যারা কাজ করতে চায় করুক, কিন্তু তাদের মার্কিন নাগরিক অধিকার দেবার কোনই দরকার নেই। এমনিতেই আমেরিকানদের সংখ্যা যথেষ্ট। প্রত্যেকেই দেশের জনসংখ্যা বাড়াতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এসবই সরকারের দেখবার ব্যাপার। কিন্তু এক স্বতন্ত্র ভিত্তিতে একে সংগঠিত করে তুলতে হবে। সরকারের সভ্যদের শিল্পকারবারের অংশীদার হতে হবে; তা'হলে তারা আরও সহজে ও তাড়াতাড়ি দেশের স্বার্থ বুঝতে পারবেন। বর্তমানে এটা ওটা চাই বোঝাতে হলে আমাকে সেনেটরদের কিনতে হয়। তখন আর তার দরকার হবে না......"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, পা দুইটি নাচাইতে নাচাইতে তিনি আবার শুরু করিলেন :

"সোনার পাহাড়ের চূড়ো থেকেই জীবনটা ঠিকভাবে দেখা যায়।"

রাজনৈতিক মতামত তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম : "ধর্ম সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

হাঁটুতে একটি চাপড় মারিয়া ভ্রূ নামাইয়া তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

"ধারণা খুবই উঁচু। জনসাধারণের পক্ষে ধর্ম একান্ত প্রয়োজনীয়। এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস। সত্যি কথা বলতে কি, প্রতি রবিবারে আমি গীর্জায় গিয়ে নিজেই প্রচার করে থাকি। হ্যাঁ, নিজেই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী বলেন?"

প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন : "একজন খাঁটি ক্রীশ্চান গীর্জায় দাঁড়িয়ে যা কিছু বলতে পারে, সবই বলি। ছোটখাট গ্রামের গীর্জায় আমি প্রচার করি। করুণার কথা ও পিতৃসুলভ উপদেশ গরীবদের সব সময়ই প্রয়োজন। আমি তাদের বলি......"

মুহূর্তের জন্য তাঁহার মুখখানা শিশুর মুখের মত দেখাইল। তারপর তিনি ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বসিলেন; তাঁহার দৃষ্টি ঘুরিতে লাগিল ছাদের গায় যেখানে একটি স্থূলাঙ্গিনী নারীর নগ্নদেহকে প্রেমের দেবতা ঢাকিয়া আছেন ইয়র্কশায়ার শূকরীর লালচে চামড়া দিয়া। ছাদের রংগুলি প্রতিভাত হওয়ায় বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চোখ দুইটি ঝলমল করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে শুরু করিলেন :

"খৃষ্টের বুকের ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! পরশ্রীকাতরতার চতুর দানব যেন তোমাদের প্রলুব্ধ করতে না পারে। পার্থিব জিনিসে লোভ কোরো না। পৃথিবীতে এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ ভাল মজুর থাকে, চল্লিশ বছরের পর তাকে আর কারখানার কাজে রাখা চলে না। জীবন নিরাপদ নয়। কাজের সময় তোমার হাতের একটা ভুলের ফলে যন্ত্র তোমার হাড়গুলো চূর্ণ করে দেবে। একবার সর্দি-গর্মি লাগলেই ব্যস্, খতম হয়ে গেলে। তোমার প্রতি-পদক্ষেপে রোগ ও দুর্ভাগ্য। গরীব লোকের অবস্থা উঁচু বাড়ীর ছাদে অন্ধ লোকের অবস্থার মত—যেদিকেই যাবে পড়ে খতম হবে। জুডাসের ভাই প্রচারক জেমস্ এই কথাই বলে গেছেন। ভাইসকল! পার্থিব জীবনকে মূল্য দিও না। এ জীবন শয়তানের কাজ, মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে এই শয়তান। হে খৃষ্টের প্রিয় সন্তান-সন্ততিরা! তোমাদের রাজ্য তোমাদের পিতার রাজ্য। সে রাজ্য ইহলোক নয়, পরলোক—স্বর্গ। যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও, যদি তোমরা ধীর শান্ত-সহিষ্ণুভাবে কোন অভিযোগ না করে মুখ বুজে জীবন কাটিয়ে দাও, যীশু তোমাদের স্বর্গে আমন্ত্রণ করে নেবেন ও পৃথিবীতে তোমাদের সুকর্মের জন্য চিরন্তন শান্তি দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। এ জীবন আত্মার শোধনাগার ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে যত তুমি কষ্ট সহ্য করবে, ততই সেখানে তোমার জন্য সুখ অপেক্ষা করবে। প্রচারক জুডাস্ নিজে এই কথা বলে গেছেন।"

তিনি ছাদের দিকে দেখিলেন, তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শীতল-কঠিন স্বরে বলিতে লাগিলেন :

"হে প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! প্রতিবেশীকে ভালবেসে যদি এ জীবন দান করতে না পার, তবে জীবন তুচ্ছ অর্থহীন—সে প্রতিবেশী যেই হোক্ না কেন! পরশ্রীকাতরতার দানবের পদতলে নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিও না। ঈর্ষা করবার কি আছে? পার্থিব সম্পদ মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সবই শয়তানের খেলনা।

বড়লোক ও গরীব, রাজা ও খনি-শ্রমিক, ব্যাঙ্ক-মালিক ও ঝাড়ুদার, সকলকেই একদিন মরতে হবে। হয়ত স্বর্গের শীতল উদ্যানে খনি-মজুরেরা হবে রাজা আর ঝাড়ুহাতে রাজা সেই বাগানের ঝরাপাতা ঢাকা রাস্তা ঝাঁট দেবেন, আর ঝাঁট দেবেন রোজ তোমরা যে মিঠাই খাবে তার কাগজগুলো। হে ভাইসকল! এই পৃথিবীতে পাপের এই অন্ধকার অরণ্যে যেখানে আত্মা শিশুর মত বার বার পথ হারিয়ে বসে, সেখানে কামনা করবার মত কি আছে? দীনতা, নম্রতা, প্রেমের পথে চলো স্বর্গে যাই। ভাগ্যে যা ঘটে সব কিছু নিঃশব্দে শান্তভাবে সহ্য করে যাও। মানুষকে ভালবাস, যারা তোমাদের অপমান করে তাদেরও ভালবাস।......"

তিনি আবার চোখ বুজিলেন ও চেয়ারে দুলিয়া দুলিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :

"একের দারিদ্র্যের সাথে অপরের ঐশ্বর্যের তুলনা করে যারা তোমাদের অন্তরে ঈর্ষার পাপ মনোভাব জাগিয়ে তোলে তাদের কথায় কান দিও না। এরা শয়তানের দূত। প্রতিবেশীকে ঈর্ষা করতে ঈশ্বর তোমাদের নিষেধ করেছেন। ধনীকে ভালবাস, কারণ ধনী ব্যক্তি ঈশ্বরের নির্বাচিত।—একথা বলে গেছেন প্রভুর ভ্রাতা ও গীর্জার প্রধান যাজক জুডাস্। সাম্য ও শয়তানের অন্যান্য বচনে কান দিও না। এই পৃথিবীতে সাম্য কি? তোমার ঈশ্বরের সম্মুখে শুধু মাত্র আত্মার পবিত্রতায় একে অপরের সমান হতে চেষ্টা করবে। ধৈর্য সহকারে বহন করো তোমার ক্রুশ-কাঠখানি, আনুগত্য তোমার ভার লাঘব করবে। হে আমার সন্তানগণ! ঈশ্বর তোমাদের সাথে আছেন। তোমাদের আর কিছুর দরকার নেই।"

বৃদ্ধ নীরব হইলেন; তাঁহার মুখ বিস্তৃত হইল, ঝলসিয়া উঠিল সোনার দাঁতগুলি; তিনি বিজয়ীর মত আমার মুখের দিকে তাকাইলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি তো ধর্মের খুব সদ্ব্যবহারই করছেন।"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, ধর্মের মূল্য আমি জানি। আমি আবার বলি, গরীবদের জন্য ধর্মের প্রয়োজন। আমি ধর্ম পছন্দ করি। ধর্ম বলে, এ পৃথিবীর সব কিছুই শয়তানের। হে মানুষ, তুমি যদি তোমার আত্মাকে রক্ষা করতে চাও, তবে এ পৃথিবীর কোন জিনিস চাইবে না, ছোঁবে না। মৃত্যুর পর তোমরা জীবনের সমস্ত আনন্দ পাবে—স্বর্গে সব কিছুই তোমাদের জন্য। মানুষ যখন একথা বিশ্বাস করবে তখন তাদের নিয়ে কারবার করা অনেক সহজ হবে। হ্যাঁ তাই। ধর্ম হচ্ছে তেল। জীবনের যন্ত্রকে মসৃণ করার জন্য যতই আমরা এর ব্যবহার করব, ততই এ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘর্ষণ কম হবে, সোজা হবে যন্ত্রচালকের কাজ।......"

"ইনি সত্যিই একজন রাজা।"—আমি মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলাম। শূকরপালকের এই আধুনিক বংশধরটিকে আমি সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম : "আপনি নিজেকে ক্রীশ্চান মনে করেন?"

পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই।" সঙ্গে সঙ্গে ভারিক্কী চালে উপরের দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি একজন আমেরিকান, অতএব, একজন কড়া নীতিবাদী।......"

তাঁহার মুখে এক নাটকীয় ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিল। তিনি ঠোঁট দুখানি চাপিয়া ধরিলেন ও তাঁহার কান দুইটি নাকের কাছে চলিয়া আসিল।

আমি গলার স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন?"

অত্যন্ত নীচু গলায় আমাকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিলেন, "খবরদার আর কেউ না জানে, আপনাকে বলছি। খৃস্টকে স্বীকার করা একজন আমেরিকানের পক্ষে অসম্ভব।"

একটু থামিয়া আমিও নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অসম্ভব?"

"নিশ্চয়ই অসম্ভব"—নিম্নস্বরে তিনি জানাইয়া দিলেন।

"অবিবাহিতের সন্তান তিনি।"—বৃদ্ধ আমার দিকে চোখ টিপিলেন, তাঁহার দৃষ্টি সারা ঘর ঘুরিতে লাগিল : "বুঝলেন? বিবাহবন্ধনের বাইরে যার জন্ম, আমেরিকায় সে একজন কর্মচারীই হতে পারে না, দেবতা হবার কথা ছেড়েই দিলাম। কোন ভদ্রসমাজে তার স্থান হয় না। একটি মেয়েও তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় না। আমরা খুব কড়া। খৃস্টকে যদি আমাদের স্বীকার করতে হয়, তবে যাদের জন্ম অবৈধ তাদের সকলকেই সম্মানিত লোক বলে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।......এমন কি যদি বাপ নিগ্রো ও মা শ্বেতাঙ্গিনী হয়, তবু তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হয়। ভাবুন তো একবার তাহলে কী ভয়ানক ব্যাপার হত!"

ভয়ানক কথা যে সন্দেহ নাই, কারণ এই কথা ভাবিতেই বৃদ্ধের চোখ দুইটি সবুজ ও পেঁচার চোখের মত গোল হইয়া গেল। নীরবে ঠোঁটটি টানিয়া তুলিয়া তিনি দাঁতে চাপিয়া ধরিলেন। বোঝা গেল, এই মুখবিকৃতিতে তাঁহার মুখখানিকে গম্ভীর ও কঠিন দেখাইতেছে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা।

একটি গণতান্ত্রিক দেশের নীতিজ্ঞানে পীড়িত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নিগ্রোকে কি মানুষ বলে স্বীকার করতে আপনারা খোলাখুলি অস্বীকার করেন?"

"আপনি দেখছি কিছুই বোঝেন না।"—করুণার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন বৃদ্ধ। "তারা যে কালো। তাদের গায়ে যে গন্ধ। আমরা যখনই জানতে পারি কোন নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ নারীকে বিবাহ করছে, তখনই তাকে ফাঁসি দিয়ে মারি। গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে সবচেয়ে কাছের গাছটিতে তাকে আমরা ঝুলিয়ে দিই...মোটেই সময় নষ্ট করি না। নীতির ব্যাপারে আমরা খুবই কড়া।"

পচিয়া গলিয়া-যাওয়া লাশের প্রতি মানুষের মনে যে ভাব জাগিয়া উঠিবেই, তিনি তাঁহার প্রতি আমার মনে সেই ভাবই জাগাইয়া তুলিলেন। কিন্তু যখন একটা কাজে হাত দিয়াছি, তখন শেষ পর্যন্ত যাইতে সংকল্প করিলাম। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া চলিলাম। সত্য, স্বাধীনতা, যুক্তি যা কিছু সুন্দর ও মহান, যা কিছুতে আমি বিশ্বাস করি, সব কিছুকেই এইভাবে দলিত মথিত করিবার জন্য আমার আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল।

"সোশ্যালিস্টদের সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী?"

"তারাই হল শয়তানের আসল চাকর!"—হাঁটু নাচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব

দিলেন তিনি। "জীবনের যন্ত্রে সোশ্যালিস্টরা হল বালি। সব কিছুর মধ্যে তারা ঢুকে ঢুকে আছে। যন্ত্রটিকে অবাধে কাজ করতে দেয় না তারা। দেশে ভাল সরকার থাকলে কোন সোশ্যালিস্টের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবু, আমেরিকায় সোশ্যালিস্টরা জন্মাচ্ছে। তার মানে হল এই যে, ওয়াশিংটনের লোকেরা তাদের কাজ ঠিকমত বুঝছে না। তাদের উচিত সোশ্যালিস্টদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। সেটা হবে একটা কাজের মত কাজ। আমার মতে সরকারকে জীবনের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে হবে। সমাজের সকলেই যখন কোটি-পতি হবে তখনই এটা হবে। এই হল কথা।"

"আপনার কোন কথার সাথে কোন কথার অমিল নেই।"—আমি বলিলাম।

"নিশ্চয়ই।"—মাথা নাড়িয়া তিনি আমার উক্তিকে অনুমোদন জানাইলেন। তাঁহার মুখে আর সে শিশুসুলভ ভাব নাই, তাঁহার গালে ফুটিয়া উঠিয়াছে গভীর বলিরেখা।

শিল্প সম্পর্কে তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব ঠিক করিলাম।

"আপনার মনোভাব......" আমি আরম্ভ করিলাম কিন্তু তিনি একটি আঙুল তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :

"মাথায় নাস্তিকতা, পাকস্থলীতে নৈরাজ্যবাদ—তাকেই বলে সোশ্যালিস্ট। তার আত্মাকে শয়তান দিয়েছে দুটি ডানা—উন্মত্ততা ও ক্রোধ।......সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে চাই আরও বেশী ধর্ম, আরও বেশী সৈন্য। নাস্তিকতার বিরুদ্ধে ধর্ম, নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সৈন্য। প্রথমে সোশ্যালিস্টদের মাথায় ভরে দাও গীর্জার উপদেশাবলীর সীসে; তাতেও যদি তার রোগ না সারে তবে সৈন্যেরা তার পাকস্থলীতে কিছু সীসে ঢুকিয়ে দিক্।"

গভীর বিশ্বাসে তিনি মাথা নাড়িলেন ও দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন : "শয়তানের শক্তি বিপুল!"

সংগে সংগে স্বীকার করিলাম, "তা বটে।"

এই আমি প্রথম সুযোগ পাইলাম পীতদানব সোনার প্রচণ্ড প্রভাবকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিবার। বৃদ্ধের শুষ্ক, জীর্ণ, চলচ্ছক্তিহীন হাড়গুলি বাতব্যাধিতে অসাড়; পুরানো চামড়ার থলিতে ভরা দুর্বল বিবর্ণ দেহ। সব কিছু মিলিয়া যেন পচা জঞ্জালের একটা ছোট স্তূপের মত এই বৃদ্ধকে দেখিলাম মিথ্যা ও আত্মিক দুর্নীতির প্রতিমূর্তি পীতদানবের শীতল নিষ্ঠুর কামনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের চোখ দুইটি নূতন মুদ্রার মত চকচক্ করিতে লাগিল, মনে হইল সে আরও শক্তিশালী, আরও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ভৃত্যরূপটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন জানিয়াছি তাহার প্রভু কে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিল্প সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?"

তিনি আমার দিকে তাকাইলেন এবং মুখের উপর দিয়া একখানি হাত বুলাইয়া উগ্র রাগের ভাবটি মুছিয়া লইলেন। আবার তাঁহার মুখখানিতে শিশুর মুখের মতো একটি ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"আপনি কি বলছেন?"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শিল্প সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?"

তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, "ও! শিল্প সম্পর্কে আমি কিছু ভাবি না, আমি সোজা ওকে কিনে নিই..."

"তা আমি জানি। কিন্তু হয়ত শিল্প সম্পর্কে আপনার নিজের কোন মত আছে। শিল্পের কাছ থেকে আপনি কি চান?"

"নিশ্চয়ই, শিল্পের কাছ থেকে কি আমি চাই, তা আমি জানি। শিল্প দেবে আমোদ—এই আমি চাই। আমাকে হাসাবে শিল্প। আমার কারবারে হাসির বিশেষ কিছু নেই। মাঝে মাঝে মগজকে একটু বিরাম দেবার দরকার হয়—মাঝে মাঝে শরীর চায় কিছু উত্তেজক। ছাদের কিম্বা দেয়ালের শিল্পসজ্জা যেন ক্ষুধার উদ্রেক করতে পারে।...সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রং দিয়ে বিজ্ঞাপন আঁকতে হবে। দূর থেকে, এক মাইল দূর থেকে এই বিজ্ঞাপন তোমাকে ভুলিয়ে আনবে এবং যেখানে তার খুশি তখনই সেখানে তোমাকে নিয়ে ফেলবে। তা হলেই শিল্প সার্থক হল। মূর্তি ও পাত্র, মার্বেল পাথর বা চীনামাটি থেকে ব্রোঞ্জের হওয়াই সব সময়ে সবচেয়ে ভাল। কারণ চাকরেরা ব্রোঞ্জ থেকে চীনে মাটি তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। মোরগের লড়াই ও ইঁদুর শিকার খুব ভালো। লন্ডনে দেখেছি। চমৎকার! মুষ্টিযুদ্ধও ভাল, কিন্তু তাকে খুনখারাপীতে শেষ হতে দেওয়া চলবে না। সংগীতকে দেশপ্রেমের সংগীত হতে হবে। কুচকাওয়াজ সব সময়েই ভাল সংগীত, কিন্তু আমেরিকার কুচকাওয়াজ সবচেয়ে ভাল। দুনিয়ায় আমেরিকাই শ্রেষ্ঠ দেশ। ভালো জাতির মধ্যেই সর্বদা ভালো সংগীতের সন্ধান মেলে। আমেরিকানরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাত। তাদের সবচেয়ে বেশী টাকা। আমাদের মত এত টাকা আর কারও নেই। তাইত সারা দুনিয়া শিগ্‌গীরই আমাদের কাছে আসবে।..."

এই রুগ্ন শিশুর বকবকানি শুনিতে শুনিতে আমি তাসমানিয়ার অসভ্যদের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিলাম। শোনা যায় তাহারাও নরখাদক। কিন্তু তাহাদের সৌন্দর্যবোধ উন্নত।

নিজের জীবনের অশুচি স্পর্শ দিয়া যে দেশকে সে কলুষিত করিয়াছে সেই দেশ লইয়াই তাঁহার এই দাম্ভিক বাচালতায় বাধা দিবার জন্য পীতদানবের বৃদ্ধ ক্রীতদাসটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি থিয়েটারে যান?"

"হ্যাঁ, তা যাই। জানি সেও তো শিল্প।"—আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিলেন তিনি।

"থিয়েটারে আপনার কি ভাল লাগে?"

এক মুহূর্ত ভাবিয়া তিনি জবাব দিলেন, "নীচুগলা গাউন-পরা অনেক তরুণী যখন আসেন তখন সত্যিই ভাল লাগে। উপর থেকে তাদের দেখা যায়।"

মরিয়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু থিয়েটারে সবচেয়ে কী আপনার ভাল লাগে?"

প্রায় কান পর্যন্ত ঠোঁট দুইটি বিস্তৃত করিয়া তিনি জবাব দিলেন, "কেন? —অন্য সবার মত আমারও সবচেয়ে ভাল লাগে অভিনেত্রীদের।...তাঁরা যদি সুন্দরী ও তরুণী হন, তবে সব সময়েই তাঁরা ভাল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে সত্যিই তরুণী তা চট্ করে বলা শক্ত। বাইরেটা তাঁরা এমন চমৎকার রাখেন! বুঝি, ঐ তাঁদের পেশা। কখনও কখনও মনে হবে, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। তারপর জানা যাবে, ওর বয়েস পঞ্চাশ বছর আর ওর অন্তত দু'শ প্রেমিক আছে। ব্যাপারটা সত্যিই খারাপ। সার্কাসের মেয়েরা অভিনেত্রীদের চেয়ে ভাল। অভিনেত্রীদের চেয়ে প্রায় সব সময়েই তাদের বয়স থাকে কম, শরীরও থাকে অনেক বেশী নমনীয়......"

স্পষ্ট বোঝা গেল, এ ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। বয়সকালে অনেক কুকর্ম করা আমার মত ঝানু পাপীকেও তিনি শিখাইতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনি কবিতা কেমন পছন্দ করেন?"

নিজের জুতার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইয়া তিনি আমার কথার প্রতিধ্বনি করিলেন, "কবিতা?" এক মুহূর্ত কি ভাবিলেন তিনি, তারপর মাথা তুলিয়া, একসঙ্গে সব কয়টি দাঁত বাহির করিয়া বলিতে লাগিলেন : "কবিতা? ও—হ্যাঁ! কবিতা আমি ভালবাসি। যদি সবাই কবিতা ছাপতে শুরু করে, তাহলে সত্যিই জীবনটা খুব আনন্দের হয়।......"

"আপনার প্রিয় কবি কে?"—আমি তাড়াতাড়ি পরবর্তী প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধ আমার দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকাইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বললেন আপনি?"

প্রশ্নটি আবার বলিলাম।

"হুম্! আপনি তো বড় মজার লোক।" সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি দোলাইয়া বলিলেন তিনি। "যে কোন একজন কবিকে আমি পছন্দ করব কেন? বিশেষ কোন কবি আমার প্রিয় হতে যাবেন কেন?"

কপাল হইতে ঘাম মুছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। আমি জানতে চেয়েছিলাম কোন্ বইখানি আপনার প্রিয়—অবশ্য চেক-বই ছাড়া।......"

তিনি বলিলেন, "ওঃ, সে অন্য ব্যাপার। দু'খানা বই আমি সবচেয়ে ভাল-বাসি, বাইবেল আর লেজার। দু'খানাই মনকে সমান চাঙ্গা রাখে। বই দু'খানাতে যখনই হাত দেওয়া যায়, তখনই মনে হয় এমন শক্তি এদের ভেতর আছে যে তুমি যা চাও তাই তাদের মধ্যে পেতে পার।"

আমি ভাবিলাম লোকটি আমাকে লইয়া খেলা করিতেছে। তাই, সোজা তাকাইলাম তাহার মুখের দিকে। না।. শিশুটির আন্তরিকতা সম্পর্কে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, তাহার চোখ দুইটি দেখিয়া তাহা কাটিয়া গেল। খোলার মধ্যে শুকনো বাদামটির মত ঐ তো লোকটি চেয়ারে বসিয়া আছে। যাহা সে বলিতেছে তাহার প্রতিটি কথাই যে সে সত্য বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বৃদ্ধ বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ, বই দু'খানি চমৎকার। একখানা লিখেছিলেন পয়গম্বরেরা, অপরখানা আমি নিজে তৈরী করেছি। আমার বইয়ে আপনি প্রতিটি কথা খুঁজে পাবেন। এতে অঙ্ক আছে। এই অঙ্কই দেখিয়ে দেবে, সাধুতা ও অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করার ইচ্ছা থাকলে মানুষ কি না করতে পারে। সরকারের উচিত আমার বইখানা প্রকাশ করা। আমার মত উন্নত অবস্থায় উঠতে গেলে কি করতে হবে, লোকে তা জানুক।"

বিজয়ীর মত ডানে ও বামে তিনি হেলিতে লাগিলেন।

আমি ঠিক করিলাম এইবার সাক্ষাৎকার শেষ করি। দলন সহ্য করিবার শক্তি সব মাথার থাকে না।

"বিজ্ঞান সম্বন্ধে হয়ত আপনি কিছু বলতে চান।"—ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম।

"বিজ্ঞান?"—একটি আঙ্গুল তুলিলেন তিনি; তারপর তাকাইলেন ছাদের দিকে। তারপর তিনি ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন, ঘড়ির ডালাটি বন্ধ করিলেন, আঙুলের চারিপাশে ঘড়ির চেনটি ঘুরাইতে লাগিলেন এবং ঘড়িটি দোলাইতে লাগিলেন শূন্যে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :

"বিজ্ঞান।...হ্যাঁ আমি জানি! বই! বইয়ে যদি আমেরিকা সম্পর্কে ভাল কথা লেখা থাকে তবে সে বই উপকারী বই। কিন্তু বইয়ে সত্যিকথা খুব কম থাকে। এই কবিরা যারা বই লেখে তারা খুব সামান্য রোজগার করে বলে আমার বিশ্বাস। যে দেশে সবাই কারবার নিয়ে ব্যস্ত, সে দেশে বই পড়ার মত সময় কারো নেই।...... জানি বই বিক্রী হয় না বলে কবিরা ক্ষেপে গিয়েছে। সরকারের উচিত বইয়ের লেখকদের ভাল টাকা দেওয়া। যে লোক ভাল খেতে পায়, তার মনে সব সময়ে দয়া ও স্ফূর্তি থাকে। আমেরিকা সম্পর্কে বইয়ের যদি একান্ত দরকার হয়, তবে ভাল ভাল কবিদের ভাড়া করা উচিত। তাহলে আমেরিকার যত বইয়ের দরকার সবই তৈরী হয়ে যাবে।...এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই!..."

আমি বলিলাম, "আপনার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা খুবই সংকীর্ণ।"

চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে তিনি কি ভাবিলেন। চোখ খুলিয়া আবার আরম্ভ করিলেন :

"হ্যাঁ, শিক্ষক, দার্শনিক......এ-ও বিজ্ঞান। অধ্যাপক, ধাত্রী, দাঁতের ডাক্তার, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। ঠিকই তো। সবারই প্রয়োজন আছে। ভাল বিজ্ঞানের পক্ষে...খারাপ কিছু শেখানো উচিত নয়।...কিন্তু আমার মেয়ের শিক্ষক একবার আমাকে বলেছিল সমাজবিজ্ঞানও আছে। সেটা কি আমি বুঝি না। মনে হয় সেটা ক্ষতিকর। সোশ্যালিস্টরা কখনও ভাল বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে না। বিজ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্কই থাকতে পারবে না সোশ্যালিস্টদের। এডিসন যে বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছেন তা উপকারীও বটে, আমোদদায়কও বটে। ফোনোগ্রাফ, সিনেমা—এই সব হল প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অতো বইয়ের কী দরকার!

যেসব বই পড়লে মাথায় নানা সন্দেহ আসে সে সব বই কারও পড়া উচিত নয়। পৃথিবীতে সব কিছু যেমন আছে তেমনই থাকা উচিত—বইয়ের সাথে সব কিছু গুলিয়ে ফেলার কোন দরকার নেই।"

আমি উঠিলাম।

"ওঃ, আপনি যাচ্ছেন?"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হ্যাঁ! যাচ্ছি যখন তখন হয়ত আপনি আমাকে বলবেন কোটিপতি হলে কেমন লাগে!"

তিনি হিক্কা তুলিতে লাগিলেন ও জবাব না দিয়া পা নাড়িতে লাগিলেন। এই কি তাঁর হাসির ধরন?

দম লইয়া তিনি বলেন—"ও একটা অভ্যাস।"

"কী অভ্যাস?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"কোটিপতি হওয়া। ও একটা অভ্যাস।"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমি আমার শেষ প্রশ্ন করিলাম :

"তাহলে আপনি মনে করেন, ভবঘুরে, আফিংখোর ও কোটিপতি একই জাতের জীব?"

এই কথায় নিশ্চয়ই তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। তাঁহার চোখ দুইটি গোল হইয়া রাগে সবুজ হইয়া গেল। তিনি কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মনে হয়, আপনি ভাল শিক্ষা পান নি।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আসি।"

তিনি সৌজন্য সহকারে আমাকে বারান্দা পর্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিলেন এবং নিজের জুতা জোড়ার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বাড়ীর সামনে সমান করিয়া ছাঁটা পুরু ঘাসে ঢাকা একটি চত্বর। আর এই লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিব না এই ভাবিয়া উল্লসিত হইয়া যখন চত্বরের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি, পিছন হইতে কে ডাকিল,

"শুনছেন?"

আমি ফিরিলাম। তিনি তখনও সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া আমার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ইউরোপে আপনাদের যত রাজার দরকার, তার চেয়ে বেশী আছে কি?"

জবাব দিলাম, "রাজার আমাদের মোটেই দরকার নেই।"

একপাশে মুখ ফিরাইয়া তিনি থুথু ফেলিলেন।

তিনি বলিলেন, "নিজের জন্য দুজন ভাল রাজা ভাড়া করার কথা ভাবছিলাম। আপনি কি বলেন?"

"কিসের জন্য?"

"ব্যাপারটা খুব আমোদের হবে। আমি ঠিক এই জায়গাটায় ওদের মুষ্টি-যুদ্ধ করতে হুকুম দেব।..."

বাড়ীর সম্মুখস্থ চত্বরের দিকে দেখাইয়া তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বলিলেন,

"রোজ একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। কী বলেন? খাবার পর আধঘণ্টা শিল্পচর্চা খুব আরামের হবে। খুব ভাল হবে, কি বলেন?"

তিনি ঠাট্টা করিতেছেন না। বুঝিতে পারিলাম নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য সব কিছু করিতে তিনি প্রস্তুত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"কিন্তু রাজার কী দরকার?"

"এর আগে এ ব্যাপার আর কারও মাথায় আসেনি!"

"তা ঠিক! কিন্তু রাজারাও নিজেদের যুদ্ধ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে অভ্যস্ত।"—বলিয়াই আমি চলিতে শুরু করিলাম।

"শুনছেন?" তিনি আবার আমাকে ডাকিলেন।

আমি আর একবার থামিলাম। পকেটে হাত দিয়া তিনি তখনও ঠিক একই জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। মুখে তাঁহার কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব।

"ডাকলেন কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

যেন কিছু চিবাইতেছেন এইভাবে ঠোঁট দুটি নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন :

"কি মনে করেন আপনি? দুজন রাজা তিনমাস ধরে রোজ আধঘণ্টা বক্সিং লড়বে—কত পড়বে বলে আপনার মনে হয়?"

॥ নীতির পালা ॥

...গভীর রাত্রিতে সে আমার কাছে আসিল ও সন্দেহের চোখে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল :

"আপনার সঙ্গে আধঘণ্টা একলা কথা বলতে পারি কি?"

তাহার কণ্ঠস্বরে ও নুয়ে-পড়া রোগা চেহারাটিতে একটা যেন রহস্য ও গোপন ভাব। খুব সন্তর্পণে সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, যেন চেয়ারখানি তাহার লম্বা ও তীক্ষ্ম হাড়গুলির ভারে ভাঙিয়া যাইতে পারে।

নীচুগলায় জিজ্ঞাসা করিল, "পর্দাটা নামিয়ে দেওয়া যায়?"

"নিশ্চয়!" তাড়াতাড়ি পর্দাটা নামাইয়া দিলাম।

কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া জানালার দিকে চোখ দিয়া ইশারা করিয়া আরো আস্তে বলিল :

"সব সময় নজর রাখছে।"

"কে?"

"কেন, রিপোর্টাররা।"

লোকটির দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। বেশ ভদ্র, ফিটফাট বেশভূষা—কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হইল লোকটি গরীব। টাক-পড়া কোণাটে ধরনের মাথাটায় যে উজ্জ্বলতা তাহাতে নিরভিমান বিনয়ই প্রকাশ পাইতেছে। পরিষ্কারভাবে কামানো অত্যন্ত পাতলা মুখ। পাতলা পল্লবে আধ-ঢাকা ধূসর চোখ দু'টি যেন মার্জনার হাসি হাসিতেছে। চোখ দু'টি তুলিয়া সে যখন আমার মুখের দিকে তাকাইতেছিল, মনে হইতেছিল এক অস্পষ্ট অগভীর শূন্যতার সম্মুখে বসিয়া আছি। সে বসিয়াছিল পা দুইটি চেয়ারের তলায় টানিয়া লইয়া, হাত দুইটি

রাখিয়াছিল হাঁটুর উপর এবং বাঁ হাতে ডার্বি টুপীটা লইয়া মেঝের উপর দোলাইতে-ছিল। লম্বা লম্বা আঙুলগুলি তাহার একটু একটু কাঁপিতেছিল। শক্ত করিয়া চাপিয়া-ধরা ঠোঁটের কোণ দুইটি বেশ একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল পোশাকের জন্য লোকটিকে যথেষ্ট খরচ করিতে হইয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া সে বলিতে শুরু করিল, "আমার পরিচয়টা দিই...বলতে গেলে...আমি একজন পেশাদার পাপী।........."

যেন শুনিতে পাই নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া সরাসরি জিজ্ঞাসা করিলাম :

"কি বললেন ?"

"আমি একজন পেশাদার পাপী"—প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিল লোকটি। "সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে অপরাধের ব্যাপারেই আমি বিশেষজ্ঞ।..."

কথাগুলি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বরে দীনতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং কথায় বা মুখে অনুতাপের কোন আভাসই দেখিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি...জল খাবেন না ?"

"না, ধন্যবাদ।" মার্জনা ভিক্ষার হাসিভরা চোখে সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারছেন না ?"

অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য ইউরোপীয় সাংবাদিকদের প্রচলিত কায়দায় একটু জোরের সহিত জবাব দিলাম, "কেন পারব না ?" কিন্তু মনে হইল, সে আমার কথা বিশ্বাস করিল না। বাতাসে ডার্বি টুপীটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিনীত হাসি হাসিয়া সে বলিতে শুরু করিল :

"আমি কি কাজ করি সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি, তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কে।"

এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মাথাটি নীচু করিল। তাহার দীর্ঘ-শ্বাসে শুধু ক্লান্তির আভাস পাইয়া আমি আবার বিস্মিত হইলাম।

আস্তে আস্তে টুপীটি দোলাইতে দোলাইতে সে বলিতে শুরু করিল, "খবরের কাগজে একটি লোকের কাহিনী বেরিয়েছিল মনে আছে বোধ হয় আপনার ? ......মানে একজন মাতালের সম্পর্কে ? থিয়েটারে সেই গণ্ডগোলের কথা ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ঠিক মাঝখানে সামনের সারিতে যে ভদ্রলোক মাথায় টুপী পরে হঠাৎ চীৎকার করতে শুরু করেন, তার কথা বলছেন আপনি ?"

সে জবাব দিল, "আমিই সেই লোক।" তারপর বিনীতভাবে বলিয়া চলিল, "'শিশু-প্রহারকারী জানোয়ার' শিরোনামায় যে খবর বেরিয়েছিল সেও আমার সম্পর্কে। আর একটা খবর ছিল—'স্বামীর পত্নী-বিক্রয়'। কুশ্রী ইঙ্গিত করে রাস্তায় একজন ভদ্রমহিলার শ্লীলতাহানি করেছিল যে, সেও আমি। সাধারণত

সপ্তাহে অন্তত একবার করে ওরা আমার সম্পর্কে লেখে, বিশেষ করে যখন দেখাবার চেষ্টা করে সাধারণ নৈতিক চরিত্র কিভাবে নেমে যাচ্ছে।......"

শান্তভাবে ও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, বিন্দুমাত্র হামবড়াই ভাব না দেখাইয়া সে কথাগুলি বলিল। তাহার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু ধরা দিলাম না আমি। জীবন ও মানুষ আমার নখদর্পণে, এ ভাবটি আমি 'সব লেখকের মতই' সব সময়ই দেখাইয়া থাকি।

দার্শনিকের মত ভাব দেখাইয়া বলিলাম, "এইভাবে সময় কাটানোটা উপভোগ করেন আপনি?"

সে উত্তর দিল, "বয়স যখন কম ছিল, তখন অবশ্য মজা পেতাম স্বীকার করি। কিন্তু এখন আমার বয়স প'য়তাল্লিশ। বিয়ে করেছি, দু'টি মেয়ে আছে.........। কাজেই নৈতিক ভ্রষ্টাচারের উৎস বলে সপ্তাহে দু'তিনবার খবরের কাগজে আমার নামে লেখা বের হওয়া খুবই অস্বস্তিকর। তা' ছাড়া রিপোর্টাররা সব সময় নজর রাখছে কাজগুলো যাতে সময়মত ও ঠিকমত করা হয়।......"

আমার হতবুদ্ধি ভাবটা গোপন করিবার জন্য একটু কাশিলাম। তারপর সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম :

"এটা বোধ হয় আপনার একটা অসুখ, তাই না?"

সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল এবং টুপী দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে জবাব দিল :

"না, এ আমার পেশা। আপনাকে তো বলেছি, আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি হল রাস্তায় ও প্রকাশ্য স্থানে ছোটখাট গোলমাল বাধান।......আমার 'ব্যুরোর' অন্য লোকেরা বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলো চালান, যেমন ধর্মভাবকে আঘাত করা, মহিলা ও মেয়েদের ফুসলানো, চুরি—অবশ্য হাজার ডলারের বেশী নয়।........." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া বলিল : "নীতিবাদের বিরুদ্ধে এই রকম আরও অনেক অপরাধ।......আমি তো শুধু ছোটখাট গোলমাল বাধাই।......"

ব্যবসায়ী তাহার কারবার সম্পর্কে যেভাবে কথা বলে, লোকটি সেইভাবেই কথা বলিতেছিল। বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। বিদ্রুপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম :

"এতে আপনি খুশি নন?"

উত্তরে সে শুধু বলিল, "না।"

তাহার এই সরলতা আমাকে একদম নিরস্ত্র করিয়া দিল ও আমার মধ্যে এক তীব্র কৌতূহল জাগাইয়া তুলিল। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :

"আপনি কোনদিন জেলে গিয়েছেন?"

"তিনবার। যদিও সাধারণত জরিমানার সীমার মধ্যেই আমি থাকি। জরিমানার টাকাটা অবশ্য ব্যুরোই দেয়।"

"ব্যুরো?"—যন্ত্রের মত প্রতিধ্বনি করিলাম।

"হ্যাঁ। জরিমানার টাকাটা যে আমি দিতে পারি না, এটা নিশ্চয়ই স্বীকার

করবেন ?"—একটু থামিয়া আবার বলিল, "চারজনের পরিবারের পক্ষে সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার খুবই কম।"

"এ সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"নিশ্চয়ই", সে সম্মতি জানাইল।

লোকটির পাশ দিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে যত প্রকারের উন্মাদ রোগ আছে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রোগটি নির্ণয় করিবার জন্য সত্যই আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু পারিলাম না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট হইয়াছিল—এ 'আত্মম্ভরিতা-ব্যাধি' নয়। পাতলা, ফ্যাকাসে ঠোঁটে এক বিনীত হাসি লইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল ও ধৈর্যসহকারে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

"তাহলে একটা ব্যুরো আছে ?"—তাহার সামনে আসিয়া থামিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল, "হ্যাঁ।"

"অনেক লোক খাটে সেখানে ?"

"এই শহরেই খাটে একশ' পঁচিশ জন পুরুষ আর পঁচাত্তর জন মেয়ে।"

"এই শহরে ? তাহলে অন্য শহরেও এইরকম ব্যুরো আছে ?"

"নিশ্চয়ই, সমস্ত দেশ জুড়েই আছে"—সে জবাব দিল মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া।

নিজের জন্য আমার দুঃখ হইতে লাগিল। দ্বিধার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম :

"কি করে এরা......এই ব্যুরোগুলির কাজ কি ?"

"নীতির আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করে।" সে বিনীতভাবে জবাব দিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া হাত-পা ছড়াইয়া আরাম-কেদারায় শুইল। স্পষ্ট ঔৎসুক্যের সংগে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বুঝিলাম সে আমাকে অসভ্য বুনো বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, তাই আর ভদ্র ব্যবহার করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছে না।

আমি ভাবিলাম, "চুলোয় যাক্। এ ব্যাপারে যে কিছু জানিনে তা ওকে জানতে দেওয়া চলবে না।" হাতে হাত ঘষিয়া বেশ উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলাম,—

"বেশ মজার ব্যাপার তো! খুবই মজার ব্যাপার। কিন্তু বুঝতে পারছি না কী দরকার ও-গুলোর।"

"কোন্‌গুলোর ?" হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল।

"নীতির আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য এই ব্যুরোগুলোর।"

শিশুদের বোকামি দেখিয়া বয়স্কেরা যেভাবে কৌতুকের হাসি হাসিয়া ওঠেন ঠিক তেমনভাবেই লোকটা হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি তাহার দিকে তাকাইলাম; আমি তখন ভাবিতেছিলাম, সত্যই তো, অজ্ঞতাই জীবনের সমস্ত অপ্রীতিকর জিনিসের মূলে।

"লোকে বাঁচতে চায়, তাই না ? কী বলেন আপনি ?"—সে জিজ্ঞাসা করিল।

"তা' বৈকি ?"

"বাঁচতে চায় উপভোগ করবে বলে, কেমন তো?"

"নিশ্চয়ই।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর আমার কাছে আসিয়া আমার কাঁধে একটা চাপড় মারিয়া বলিল :

"নীতির আইন ভংগ না করে ভালভাবে বাঁচবেন কি করে?"

পিছনের দিকে সরিয়া আমাকে একবার চোখ টিপিয়া বারকোষের উপর সিদ্ধ মাছের মত আরাম-কেদারায় সে এলাইয়া পড়িল এবং একটি চুরোট বাহির করিয়া আমার অনুমতি না লইয়াই সেটা ধরাইল। তারপর বলিল :

"কার্বলিক এসিডে ভিজিয়ে কি আর কেউ কুল খায়?"

দিয়াশলায়ের জ্বলন্ত কাঠিটি সে মেঝেতেই ফেলিল। ইহাই নিয়ম। যখনই লোক বুঝিতে পারে সে অপরকে বাগে পাইয়াছে তখনই সে তাহার সহিত শুকরের মত ব্যবহার করিতে থাকে।

"আপনার কথা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে।"—তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি স্বীকার করিয়া ফেলিলাম।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া সে বলিল :

"আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার আরও উঁচু ধারণা ছিল।......"

ব্যবহার ভদ্র রাখিবার দিকে ক্রমেই কম নজর দিতেছিল সে। মেঝেতে চুরোটের ছাই ঝাড়িয়া চোখ দু'টি অর্ধেক বুজিয়া চুরোটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখিতে দেখিতে সে বিশেষজ্ঞের ভংগীতে আমাকে জানাইল :

"আপনি নীতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না? তাই তো......"

"মাঝে মাঝে ব্যাপারটার মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে।"—বিনীতভাবে প্রতিবাদ জানাইলাম আমি।

মুখ হইতে চুরোটটি বাহির করিয়া চুরোটের মাথাটির দিকে তাকাইয়া দার্শনিকের মত সে বলিল :

"দেয়ালে মাথা ঠুকেছেন বলে ধরে নিতে পারেন না যে দেয়ালটাকে আপনি ভালভাবে জেনেছেন।"

"হ্যাঁ, আপনার সংগে আমি একমত। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক, নীতির গায়ে ঘা খেয়ে আমি চিরদিন ফিরে এসেছি, দেয়ালে ঘা খেয়ে যেমন রবারের বল ফিরে আসে।..."

"যেভাবে মানুষ হয়েছেন ওটা তারই দোষ।"—আলংকারিকের ভাষায় সে জবাব দিল।

আমি স্বীকার করিলাম, "খুব সম্ভব তাই। সবচেয়ে বেপরোয়া নীতিবাগীশ দেখেছি আমার ঠাকুর্দাকে, স্বর্গে যাবার সব ক'টা রাস্তাই তাঁর জানা ছিল। আর সকলকেই তিনি সেই পথ অনুসরণ করতে বলতেন। সত্যটা শুধু তাঁর কাছেই প্রকাশিত ছিল, আর হাতের কাছে যা কিছু পেতেন তাই দিয়েই তিনি সেটা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন পরিবারের অন্যান্যদের মাথায়। ঈশ্বর কী চান, সেটা তিনি

পুরোপুরি জানতেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ পেতে হলে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, কুকুর বেড়ালকেও শিক্ষা দিতেন। হলে কি হবে, তিনি ছিলেন লোভী, ঈর্ষা-পরায়ণ, বিবেকহীন, মিথ্যাবাদী ও সুদখোর এবং সমস্ত নীতিবাগীশদের মতই কাপুরুষ নির্দয়তার সংগে নিজের অবসর সময়ে বাড়ীর অন্যান্য লোকজনদের উপর যথেচ্ছ ও যৎপরোনাস্তি মারধোর করতেন।...বৃদ্ধকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতাম আমি, ভাবতাম কিছুটা নরম করা যাবে; একবার তো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আর একবার একটা আয়না দিয়ে মাথায় দিয়েছিলাম এক ঘা। জানলা আর আয়নাটা ভেঙে চুরমার হযে গেল, কিন্তু কোন কাজ হল না, কোন উন্নতিই হল না বুড়োর। ছিলেন নীতিবাগীশ, মরলেনও সেই নীতিবাগীশই হয়ে। আর সেই থেকে নীতিবাদের প্রতি কেমন একটা বিরুদ্ধভাব আছে আমার, এটা কাটিয়ে ওঠা যায় কি করে, তা বোধ হয় কিছু বলতে পারবেন আপনি?"

ঘড়িটা বাহির করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া সে বলিল,—"বক্তৃতা দেবার মত সময় আমার নেই।...তবু যখন এসেছি কিছু বলতে পারি। একটা জিনিস শুরু করলে শেষ করতে হয়। হয়ত আপনি আমার জন্য কিছু করতে পারবেন......খুব সংক্ষেপে বলছি......"

চোখ দুইটি অর্ধেক বুজিয়া সে সরাসরি বলিতে শুরু করিল বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিবার মত করিয়া।

"নীতিজ্ঞান আপনাকে বজায় রাখতেই হবে—এটা কখনো ভুলবেন না। কেন রাখতে হবে? কারণ, এতে আপনার ঘর, আপনার অধিকার, আপনার সম্পত্তি, সবই রক্ষা পায়,—অর্থাৎ এতে 'আপনার প্রতিবেশীর' স্বার্থরক্ষা হয়। 'আপনার প্রতিবেশী' হচ্ছেন সব সময় আপনি নিজেই, আর কেউ নয়, বুঝলেন? ধরুন, আপনার যদি সুন্দরী স্ত্রী থাকে, তাহলে আশেপাশের সকলকে বলতে হবে, 'প্রতি-বেশীর স্ত্রীর উপর অন্যায় লোভ করো না।' যদি কোনো লোকের টাকা, বলদ, ক্রীতদাস, গাধা ইত্যাদি থাকে, আর যদি সে বোকা না হয় তবে তাকে নীতিবাগীশ হতেই হবে। আপনার যা কিছু প্রয়োজন তা যদি থাকে, আর সেগুলো যদি শুধু আপনার জন্যই রাখতে চান, তাহলে নীতিবাগীশ হওযাটা আপনার পক্ষে সুবিধা-জনক। তবে মাথার চুল ছাড়া খরচা করার মত আর কিছু আপনার যদি না থাকে, তবে অবশ্য নীতিবাগীশ হয়ে কোন লাভ নেই।"

টাক-পড়া মাথায় ধীরে ধীরে টোকা মারিতে মারিতে সে বলিয়া চলিল :

"নীতিজ্ঞানটা হচ্ছে আপনার স্বার্থের রক্ষাকর্তা। অতএব এই জ্ঞানটাকে আপনার আশেপাশের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। রাস্তার উপর আপনি দাঁড় করিয়ে দিন পুলিশ ও গোয়েন্দা আর মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি নীতি ঢুকিয়ে দিন যে-গুলো তার মাথার মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে ও আপনার অধিকারের পক্ষে বিপজ্জনক ও আপনার স্বার্থবিরোধী যত কিছু চিন্তাভাবনাকে টুঁটি টিপে গুঁড়ো করে দেয়। অর্থনৈতিক বিরোধ যেখানে যত প্রকট, নীতিবাদ সেখানে তত কড়া। যার যত টাকা, সে তত কড়া নীতিবাগীশ। তাই আমেরিকাতে

বেশী বড় লোক আছে বলে তারা গোঁড়া নীতিবাগীশ। বুঝলেন?"

"বুঝলাম। কিন্তু এর ভেতর ব্যুরো কি করে আসছে?"

"দাঁড়ান বলছি।" গম্ভীরভাবে হাত তুলিয়া সে জবাব দিল : "নীতিবাদের আসল উদ্দেশ্য হল সকলকে বোঝান যে তারা যেন আপনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। ধরুন আপনার টাকা আছে প্রচুর, বাসনা আছে প্রচুর, আর সেগুলো পূর্ণ করার সুযোগও আছে প্রচুর। কিন্তু অধিকাংশ বাসনাই নৈতিক কানুন না ভেঙে চরিতার্থ করার উপায় নেই।...তাহলে কি করবেন আপনি? আপনি নিজে যা অসঙ্গত বলে থাকেন, সেটা তো আর প্রচার করতে পারেন না। সেটা দেখায় খারাপ —আর লোকে হয়ত আপনাকে বিশ্বাস করবে না। যতই হোক সবাই তো আর বোকা নয়। যেমন ধরুন, একটা রেস্তোরাঁয় বসে আপনি শ্যাম্পেন খাচ্ছেন, আর এমন একটি সুন্দরী নারীকে চুমু খাচ্ছেন যিনি আপনার স্ত্রী নন।...যে নৈতিক মান জনসাধারণের পক্ষে পালনীয় বলে আপনি মনে করেন—সে অনুসারে এ কাজ নীতি-ভ্রষ্টতা। কিন্তু আপনার পক্ষে এই ধরনের অবসর যাপন একান্ত আবশ্যক, এটা আপনার একটা আনন্দজনক অভ্যাস। আপনি এটা যথেষ্ট উপভোগ করেন। কাজেই আপনার সামনে সমস্যা হল আনন্দজনক ব্যভিচারটা নিজের ভালো লাগলেও সে সম্পর্কে সংযমের প্রচারের কাজটা কি করে মানিয়ে নেওয়া যায়। আর একটা উদাহরণ দিই.—আপনি সকলকেই বলে থাকেন 'চুরি কোরো না'। কারণ কেউ আপনার সম্পত্তি চুরি করতে শুরু করুক এটা আপনি চান না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার টাকা থাকা সত্ত্বেও, আরও কিছু অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য আপনার অদম্য স্পৃহা। তারপর ধরুন.—'কাহাকেও হত্যা কোরো না' এই নীতি আপনি খুব কড়াভাবেই মানেন। কারণ জীবনকে আপনি খুব মূল্যবান মনে করেন, মনে করেন এ জীবন আনন্দের ও ভোগের। এদিকে একদিন আপনার কয়লাখনির মজুরেরা মজুরীবৃদ্ধি দাবী করল। আপনি সৈন্য ডাকালেন, উপায় নেই। তারপর গুড়ুম। কয়েকজন মজুর খুন হল। কিম্বা ধরুন, আপনার পণ্যের জন্য বাজার নেই। আপনি ব্যাপারটা আপনার সরকারের নজরে আনলেন এবং আপনার মাল বিক্রীর জন্য নতুন বাজার খুলতে তাদের রাজী করালেন। সরকার বাধিত হয়ে এশিয়া কিম্বা আফ্রিকার কোন জায়গায় একটা ছোট সৈন্যদল পাঠাল এবং কয়েক শ' বা কয়েক হাজার নেটিভকে গুলি করে মেরে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করল। এ সব ব্যাপারের সঙ্গে আপনার ভ্রাতৃপ্রেম, সংযম বা সততা প্রচারের খুব বেশী মিল নেই। কিন্তু মজুর বা নেটিভদের গুলি করে খুন করার ব্যাপারে আপনি আত্মসমর্থন করতে পারেন রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখিয়ে—যে রাষ্ট্র টিকতে পারে না যদি জনসাধারণ আপনার স্বার্থের কাছে মাথা নত না করে। রাষ্ট্রের অর্থ আপনি, অর্থাৎ শাঁসালো লোক। অসংযত জীবন যাপন করা, চুরি করা ইত্যাদি ছোট ছোট কাজগুলো আপনার পক্ষে অনেক বেশী শক্ত। সাধারণত বড়লোকের অবস্থা খুবই করুণ। সকলে তাকে ভালবাসবে, কেউ তার সম্পত্তিতে হাত দেবে না, তার স্ত্রী, বোন মেয়েদের শ্লীলতা সম্পর্কে সবাই যথাযোগ্য সম্মান দেখাবে, এগুলো তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তার নিজের পক্ষে কিন্তু মানুষকে ভালবাসা, চুরি না করা বা মেয়েদের ইজ্জতের প্রতি সম্ভ্রম দেখানো, ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। বরং ঠিক উল্টো। এ সবের দ্বারা তার কাজকর্ম ব্যাহত হয়, এগুলো যে তার সিদ্ধিলাভে বাধা সৃষ্টি করে তাতে সন্দেহ নেই। আসলে তার সারা জীবনটাই চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়; সে লুণ্ঠন করে হাজার হাজার লোককে, সমস্ত দেশকে। পুঁজি বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ দেশের উন্নতির জন্য এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বুঝলেন? ডজন ডজন মেয়েকে সে অসৎপথে চালিত করে—যে লোকের অবসর আছে এইভাবে স্ফূর্তি করে সময় কাটায় সে। আর কাকেই বা সে ভালবাসবে? তার কাছে সমস্ত মানুষই দুই ভাগে বিভক্ত—একদলকে সে লুণ্ঠন করে, আর একটা দল এই কাজে তার সংগে পাল্লা দেয়।"

বিষয়টি সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের বহর দেখে লোকটি খুশি হইয়া উঠিল এবং চুরোটের গোড়াটা ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার সে শুরু করিল :

"কাজেই নীতিবাদটা বড়লোকের পক্ষে সুবিধাজনক কিন্তু অবান্তর, আর সাধারণ লোকের পক্ষে খারাপ কিন্তু বাধ্যতামূলক। সেইজন্যই নীতিবাগীশেরা নীতিবাদের আইনকানুনগুলো জনসাধারণের মাথা ফুটো করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে আর নিজেরা টাই-দস্তানার মত সেগুলো বাইরেই ব্যবহার করে। এর পর প্রশ্ন হল : জনসাধারণকে কীভাবে নীতিবাদের আইনকানুনের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী করানো যায়। সব চোরের মাঝে একজন সাধু হবার জন্য কেউ তোয়াক্কা করে না। কিন্তু যদি রাজী না করাতে পার, তবে তাদের সম্মোহিত করে রাখ। এতে সব সময়ই কাজ হয়।"

জোরের সহিত ঘাড় নাড়িয়া ও আমার দিকে একটু চোখ টিপিয়া সে আবার বলিল :

"যদি রাজী না করাতে পার, সম্মোহন কর!"

তারপর আবার হাঁটুর উপর দু'খানি হাত রাখিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া খাটো গলায় বলিল :

"এর পরেরটা শুধু আপনার-আমার মধ্যে থাকবে—রাজী?"

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

"যে ব্যুরোতে আমি কাজ করি, সেটা জনমতকে সম্মোহিত করে রাখে। এটি আমেরিকার সবচেয়ে মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি, জেনে রাখবেন।"—শেষের কথাটি সে গর্বের সাথেই বলিল।

আমি আবার মাথা নাড়িলাম।

সে বলিয়া চলিল :

"জানেন তো, আমাদের দেশ একটিমাত্র আদর্শ নিয়ে বেঁচে আছে—সেটা হচ্ছে অর্থোপার্জন। এখানে প্রত্যেকেই ধনী হতে চায় এবং একজনের সঙ্গে আর এক-জনের সম্পর্ক হচ্ছে, কি করে তার কাছ থেকে কতকগুলো সোনার দানা ছিনিয়ে নেওয়া যায়। সমস্ত জীবনটাই হল মানুষের রক্ত আর মাংস থেকে সোনা বের করার

একটা পদ্ধতি। এ দেশের জনসাধারণ এবং শুনেছি সব দেশের জনসাধারণ হচ্ছে সেই অপরিশুদ্ধ বস্তুপিণ্ড যা থেকে সেই হলদে ধাতুটি বের করা যায়। প্রগতি হচ্ছে জনসাধারণের শারীরিক শক্তিকে ঘনীভূত করা অর্থাৎ মানুষের মাংস-হাড় ও স্নায়ুকে সোনার দানাতে পরিণত করা। জীবনটাকে খুব সহজভাবেই সাজানো হয়েছে......"

জিজ্ঞাসা করিলাম : "এটা কি আপনার নিজের মত?"

"এই মত? না মোটেই আমার নিজের মত নয়।" গর্বের সংগে সে জবাব দিল : "এটা অন্য লোকের খেয়াল।.. জানি না কি করে আমার মাথায় ঢুকল।...... এটাকে আমি ব্যবহার করি তখনই যখন এমন লোকের সাথে কথা বলি যারা ঠিক স্বাভাবিক নয়।...যাক, যা বলছিলাম। ব্যভিচারে মন দেবার মত সময় এখানকার জনসাধারণের নেই—সে রকম অবসরই নেই তাদের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম মানুষকে এমনই ক্লান্ত করে দেয় যে, অবসর সময়ে পাপ কাজ করার মত শক্তি বা ইচ্ছাও তাদের থাকে না। জনসাধারণের ভাববার মত না আছে সময়, না আছে উৎসাহ—তারা বেঁচে থাকে কাজের মধ্যে কাজ করার জন্য—আর তাতেই তাদের জীবনের নৈতিক মান উঁচু থাকে। শুধু হয়ত ক্বচিৎ কদাচিৎ কোন ছুটির দিনে কয়জনে মিলে দু'জন নিগ্রোকে ধরে সাবাড় করে দেয়। তাতে অবশ্য নীতি ভংগ করা হয় না, কারণ নিগ্রোরা তো আর সাদা মানুষ নয়। আর তাছাড়া এদিকে নিগ্রো আছেও অনেক। সবাই কম-বেশী ভদ্র ব্যবহার করে থাকে। আর এই বিবর্ণ জীবনের কদর্য পটভূমিকায়, পুরানো গোঁড়া নীতিবাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আটক অবস্থায় কোন রকমের নীতিভ্রষ্টতাকে দেখায় যেন কালিঝুলিমাখা ময়লা দাগের মত। এটা ভাল, আবার খারাপও বটে। সমাজের অভিজাতেরা নিম্নশ্রেণীর ব্যবহারে গর্ববোধ করতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের ব্যবহার আবার বড়লোকদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে ব্যাহত করে। তাদের অর্থ আছে অর্থাৎ নীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খুশিমত জীবন যাপন করবার অধিকার ওদের আছে। ধনীরা হল লোভী, পেটুকেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, আর অলসগুলো লম্পট। উর্বর জমিতে আগাছা জন্মায়, ভোগবৃত্তি থেকে আসে দুশ্চরিত্রতা। তাহলে কি করা যাবে? নীতিকে অগ্রাহ্য করা? অসম্ভব, কারণ সেটা হবে বোকামি। জনসাধারণ নীতিবান্ হোক, এই যদি আপনার স্বার্থ হয়, তাহলে আপনার নিজের নীতিভ্রষ্টতা লোকচক্ষুর অগোচরে রাখুন।...ব্যস্! এতে নূতনত্ব কিছুই নেই।......"

ঘাড় ফিরাইয়া একবার তাকাইয়া লইয়া সে আরও নীচু গলায় বলিতে লাগিল :

"তাই, নিউইয়র্কের বড় ঘরের কিছু লোক একটা আইডিয়া বের করল। নৈতিক নিয়মগুলো প্রকাশ্যে ভাঙার জন্য দেশে একটা গোপন সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত করল তারা। চাঁদা নিয়ে একটা চলনসই পুঁজি গড়ে তোলা হল এবং জনমতকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন শহরে 'ব্যুরো' তৈরী করা হল,—গোপনে। এরা ভাড়া করল কয়েকজন অনুগত ভৃত্যকে—এই যেমন আপনার এই অধমটি—আর তাদের দিল নীতির বিরুদ্ধে অপরাধ করার কাজ। প্রত্যেক ব্যুরোর মাথায় আছে

একজন করে নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ লোক—এ'রা কাজকর্ম পরিচালনা করেন, কাজ ভাগ করে নেন।......সাধারণত এ'রা হলেন সংবাদপত্রের সম্পাদক......

মনটা খারাপ হইয়া গেল। বলিলাম, "কিন্তু, এই ব্যুরোগুলোর উদ্দেশ্য তো কিছুই বুঝলাম না।"

সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিল, "উদ্দেশ্য খুবই সহজ।" হঠাৎ তাহার মুখে একটা অস্বস্তি ও উদ্বেগের আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর হাত দুটি পিছনে দিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল :

"খুব সোজা! আপনাকে বলছি, নীচুতলার লোকেরা খুব বেশী পাপ কাজ করে না, সে সময়ই নেই তাদের। অথচ নীতিবাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। ব্যাপারটাকে আপনি বয়স্কা অনূঢ়া বন্ধ্যার মত ফেলে রাখতে পারেন না তো। নীতিবাদ সম্পর্কে অহরহ এমন চেঁচামেচি চালাতে হবে, যাতে জনসাধারণ বধির হয়ে যায়, যাতে সত্যটা তারা শুনতে না পায়। নদীতে যদি প্রচুর কাঠের টুকরো ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে বড় একটা গুঁড়ি তার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে ভেসে চলে যেতে পারে। কিম্বা, হয়ত অসাবধানে পাশের লোকের পকেট থেকে থলিটা তুলেছেন, কিন্তু চট্ করে সকলের মনোযোগটা ঘুরিয়ে দিলেন একটা ছোকরার একমুঠো বাদাম চুরির দিকে—অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। শুধু 'চোর চোর' বলে যথাসাধ্য জোরে চীৎকার করুন। আমাদের ব্যুরো যা করে সেটা হচ্ছে—বড় বড় অপরাধ ঢাকার জন্য অসংখ্য ছোটখাট অপরাধ সৃষ্টি করা।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ঘরের মাঝখানে থামিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

"যেমন ধরুন শহরে গুজব রটল যে, কোন একজন বিশিষ্ট সম্মানী লোক তার স্ত্রীকে মারধোর করে। ব্যুরো অমনি চট্ করে আমাকে এবং আরও কয়েকজন দালালকে ডেকে আমাদের স্ত্রীদের ধরে মারতে বলে দিল। আমরাও যথাযথভাবে ওদের ঠেঙালাম। আমাদের স্ত্রীরা অবশ্য সবই জানে, আর তাই তারাও চেঁচাল যথাসাধ্য। খবরের কাগজগুলো লিখে ফেলল গল্পটা এবং ফলে যে হৈ-চৈ সৃষ্টি হল তাতে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তিটির স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের গুজব চাপা পড়ে গেল। সামনে প্রকৃত ঘটনা থাকতে গুজব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কিম্বা ধরুন, কথা উঠল সিনেটের কোন সভ্য ঘুষ নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যুরো থেকে পুলিশ-অফিসারদের ঘুষ খাবার কয়েকটা কেস সাজানো হল এবং জনসাধারণের সামনে ঐ অসাধুতা প্রকাশ করে দেওয়া হল। আবার ঘটনার তলায় গুজব চাপা পড়ে গেল। ধরুন, অভিজাত সমাজের কোন লোক কোন মহিলাকে অপমান করেছেন! সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল, রেস্তোরাঁয়, রাস্তায় কয়েকজন মহিলাকে অপমান করতে হবে। ফলে বড়ঘরের ভদ্রলোকটির অপরাধ একই রকমের কয়েকটি অপরাধের আড়ালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। সব সময় সব ব্যাপারেই এইরকম ঘটে।

একটা বড় চুরির মাথায় অসংখ্য ছোট ছোট চুরি চাপিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত বড় বড় অপরাধ সাধারণত চাপা দেওয়া হয় ছোট ছোট অপরাধের নীচে, এই হচ্ছে ব্যুরোর কাজ।"

জানালার কাছে গিয়া সাবধানে রাস্তাটা উঁকি মারিয়া দেখিয়া সে আবার আসিয়া বসে ও নীচু গলায় বলিতে শুরু করে :

"জনসাধারণের বিচার থেকে আমেরিকার সমাজের অভিজাতদের রক্ষা করে এই ব্যুরো; সঙ্গে সঙ্গে নীতিভ্রষ্টতা সম্পর্কে চব্বিশ ঘণ্টা একটা হৈ-চৈ জাগিয়ে রেখে জনতার মাথায় ঢুকিয়ে দেয় বড়লোকদের ব্যভিচার ঢাকার জন্য তৈরী করা ছোটখাট কলঙ্কগুলো। জনসাধারণ একটা একটানা সম্মোহনের মধ্যে রয়েছে, নিজেদের কথা ভাববার মত সময় নেই তাদের, তারা খবরের কাগজগুলো যা বলে তাই শোনে। খবরের কাগজগুলো হচ্ছে কোটিপতিদের; ব্যুরোটাও তাদেরই তৈরী।......বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা? একটা দারুণ আইডিয়া।......"

এই পর্যন্ত বলিয়া সে থামিল ও মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বলিলাম : "ধন্যবাদ। আপনি আমাকে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কিছু শোনালেন।"

মাথা তুলিয়া সে আমার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে বলিতে লাগিল :

"হ্যাঁ,—কৌতূহলোদ্দীপক নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে ক্লান্ত করে ফেলছে। আমি গৃহস্থ লোক। বছর তিনেক আগে একটা বাড়ী তৈরী করেছি .. এখন একটু বিশ্রাম পেলে ভাল হত। ভীষণ ক্লান্তিকর আমার এই কাজ—বিশ্বাস করুন, নৈতিক আইনকানুনের সম্মান রক্ষা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। দেখুন না, মদ আমার পক্ষে খারাপ, তবু আমাকে মাতাল হতে হবে। আমার স্ত্রীকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি শান্ত গৃহস্থ জীবন অথচ আমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয়, হৈ-চৈ সৃষ্টি করতে হবে...এবং চিরকালটা খবরের কাগজে আমার নাম বেরুবে...অবশ্য জাল নাম...কিন্তু তা' হলেও......। একদিন আসল নামটা প্রকাশ পাবে। তখন,......তখন তো পালাতে হবে শহর ছেড়ে।...কিছু পরামর্শের প্রয়োজন আমার...আপনার কাছে এলাম একটা বিষয়ে মত নেবার জন্য।... অত্যন্ত গণ্ডগোলের ব্যাপার।"

"বলুন।"—আমি বলিলাম।

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই : আজকাল দক্ষিণের স্টেটগুলোতে অভিজাতেরা নিগ্রো উপপত্নী রাখতে শুরু করেছে।...একসাথে দুটো তিনটে করে। স্ত্রীরা এটা চান না। কয়েকটা খবরের কাগজ ইতিমধ্যেই মেয়েদের কাছ থেকে তাদের স্বামীদের কীর্তিফাঁস করা চিঠি পেয়েছে। একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারী ঘটাতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যুরো থেকে আমরা যাকে বলি পাল্টা ঘটনা, তাই ঘটাচ্ছে। তেরজন দালাল এবং তার মধ্যে আমিও,—আমাদের নিগ্রো উপপত্নী রাখতে হবে। একসঙ্গে দু'টো তিনটে করে।..."

অস্থিরভাবে সে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বুকপকেটে হাতটা ঢুকাইয়া বলিল :

"এ আমি পারব না। আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি। তা'ছাড়া সে একাজ আমাকে করতে দেবে না। তাও যদি অন্তত একটা রাখার কথা হত!"

বলিলাম, "আপনি অস্বীকার করুন না কেন?" করুণার দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিল।

"সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার তাহলে কে দেবে শুনি? আর কাজটা ভালমত চললে বোনাসই বা দেবে কে? না, না, এ-উপদেশ আপনি নিজের জন্য রাখতে পারেন...একজন আমেরিকান মরার পরের দিনও টাকা নিতে অস্বীকার করতে পারে না। অন্য কিছু ভেবে দেখুন।"

আমি বলিলাম, "খুবই কঠিন মনে হচ্ছে।"

"কঠিন? কঠিন মনে হচ্ছে কেন? আপনারা ইউরোপীয়েরা নীতির দিক থেকে খুবই শিথিল—আপনাদের নৈতিক ব্যভিচার তো প্রসিদ্ধ।"

কথাগুলি সে বলিল পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত। আবার আগাইয়া আসয়া বলিল, "শুনুন, আপনার হয়ত কোন ইউরোপীয় বন্ধু আছে,—আমি জানি নিশ্চয়ই আছে।"

"তাদের দিয়ে কি দরকার আপনার?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

"কি দরকার? নিগ্রো মেয়েদের সম্পর্কিত এই কাজ আমি কিছুতেই নিতে পারব না, আপনাকে বলে দিচ্ছি। নিজেই বিচার করে দেখুন, আমার স্ত্রী এ কিছুতেই হতে দেবে না, আর আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি। না কিছুতেই পারব না আমি।......"

জোরে মাথা নাড়িল সে। তারপর টাকের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে অনুগ্রহ প্রার্থনার মত বলিল :

"আপনি হয়ত কোন ইউরোপীয়কে এই কাজের জন্য ঠিক করে দিতে পারেন। ওদের তো নীতির বালাই নেই, কাজেই এতে ওদের কিছু যায় আসে না। কোনও গরীব বাস্তুত্যাগী? আমি সপ্তাহে দশ ডলার করে দেব তাকে—ঠিক হবে, কি বলেন? নিগ্রো মেয়েগুলোর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার কাজটা আমি নিজেই করব—তাকে শুধু দেখতে হবে যাতে ছেলেপুলে হয়।......আজ রাত্রেই ঠিক করে ফেলতে হবে......ভেবে দেখুন দক্ষিণের ব্যাপারটা সময়মত প্রচুর বাজে ঘটনার মধ্যে চাপা দিতে না পারলে কি কলঙ্কই না রটবে। নীতিকে জয়ী করাতে হলে নষ্ট করার মত সময় মোটেই নেই......"

...সে যখন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, আমি জানালার কাছে গিয়া জানলার কাঁচের উপর হাতখানা ঠাণ্ডা করিবার জন্য ধরিলাম। তাহার মাথার আঘাত লাগিয়া হাতখানা আমার ছড়িয়া গিয়াছিল।

জানালার নীচে দাঁড়াইয়া সে আমার দিকে ইশারা করিতেছিল।

জানলা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি চাই?"

বিনীতভাবে সে বলিল, "টুপীটা ভুলে ফেলে এসেছি।" মেঝে হইতে ডার্বি টুপীটা কুড়াইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম। জানলাটা বন্ধ করিবার সময় শুনিতে পাইলাম সে ব্যবসায়ীসুলভ প্রস্তাব করিতেছে,—"যদি সপ্তাহে পনের ডলার করে দিই? মোটা টাকা কিন্তু।"

॥ জীবনের প্রভু যারা ॥

"চলো, তোমাকে সত্যের উৎসমুখে নিয়ে যাই।"

হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া শয়তান আমাকে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া আসিল।

পুরনো কবরগুলির পাথর ও ঢালাই লোহার ফলকগুলির মধ্য দিয়া সরু সরু পথ। আমরা দুইজন ধীরে ধীরে সেই পথে হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় নিষ্ফল জ্ঞানের প্রচারে পরিশ্রান্ত একজন বৃদ্ধ অধ্যাপকের মতো ক্লান্ত কণ্ঠে শয়তান বলিতে লাগিল :

"যে-আইনে তোমরা শাসিত হচ্ছ, সেই আইন যারা তৈরী করেছে তারা শুয়ে আছে তোমার পায়ের তলায়। তোমার মধ্যে যে পশু আছে তার জন্য খাঁচা তৈরী করেছিল যে মিস্ত্রি ও কামারেরা তাদেরই ভস্মশেষ মাড়িয়ে চলেছে তোমার জুতোর তলা।"

এই কথা বলিয়া শয়তান হাসিতে লাগিল। মানুষের প্রতি তীব্র অবজ্ঞাভরা সে হাসি। তাহার সবুজ দুটি চোখের শীতল, ভীষণ আলোকে কবরের ঘাস ও সমাধিশিলার ছাতা-পড়া নরম মাটি ভরিয়া গেল। মৃতদের উর্বর মাটির ভারী দলাগুলি আমার পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। সমাধিগুলিকে চিহ্নিত করিতেছিল যে কবরের পাথর, সেগুলির মধ্যকার এই সংকীর্ণ পথ বাহিয়া হাঁটা আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল।

"তোমার আত্মাকে যাঁরা ছাঁচে ফেলে গড়েছেন তাঁদের এই ধূলির সামনে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করছ না কেন হে?"—শরতের আর্দ্র বাতাসের ঝাপ্টার মত শয়তানের কণ্ঠস্বর। আমার শিরদাঁড়া দিয়া যেন একটা হিমপ্রবাহ নামিয়া গেল,

হৃৎপিণ্ড যেন জমিয়া গেল, মন ভরিয়া উঠিল একটা অশুভ অস্বস্তিতে। গোর-স্থানের বিষণ্ণ গাছগুলি ধীরে ধীরে মাথা দোলাইতে লাগিল, তাহাদের ঠাণ্ডা ভেজা ডালগুলি আমাদের মুখে আসিয়া লাগিতে থাকিল।

"নমস্কার কর এই জালিয়াতদের! শ্রদ্ধা নিবেদন কর এই মেকীর কারবারী-দের পায়ে! এরাই তৈরী করেছে তোমাদের ধূসর চিন্তার ধোঁয়াটে মেঘ, তোমাদের বুদ্ধির টাকা-আধুলিগুলোকে। তোমাদের অভ্যাস, তোমাদের কুসংস্কার, যা' কিছু নিয়ে বেঁচে আছ সব কিছুই তৈরী করেছে এরা। অন্তরের ধন্যবাদ জানাও এদের। মৃতেরাই তোমাদের জন্য রেখে গেছেন বিপুল উত্তরাধিকার!"

হলদে পাতাগুলি ধীরে ধীরে আমার মাথায় ও পায়ে পড়িতে লাগিল। শরতের মরা পাতার এই নূতন আহার গিলিবার সময় গোরস্থানের মুখ দিয়া একটা লালসা-তৃপ্তির শব্দ বাহির হইতে লাগিল।

"এখানে শুয়ে আছেন একজন দর্জি। কুসংস্কারের ভারী সাদা পোশাকে ইনি মানুষের আত্মাকে ঢেকে দিতেন। তাঁকে দেখতে চাও?"

আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইতে শয়তান একটি কবরের পুরানো মরচে-ধরা ঢাকনাটায় লাথি মারিতে লাগিল।

"এই যে, লেখক মশাই! ওঠো..." ঢাকনাটা উঠিয়া আসিল, অস্বস্তি ও বিরক্তির একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। তারপর পোকায়-কাটা টাকার থলির মত একটা অগভীর কবর দেখা গেল। সেই কবরের আর্দ্র অন্ধকার হইতে একটা বিরক্ত কোপন কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল :

"রাত বারোটার পর মরাকে জাগাবার কথা কে কবে শুনেছে?"

আকণ্ঠবিস্তৃত হাসি হাসিয়া শয়তান বলিল, "দেখছ তো? জীবনের আইন যারা তৈরী করেছে তারা নিজেরা পচতে শুরু করলেও আদর্শের খেলাপ করে না।"

"প্রভু, আপনি?—কবরের এক কোণে উঠিয়া বসিয়া মাথার শূন্য খুলিটি নোয়াইয়া শয়তানকে শ্রদ্ধা জানাইল কঙ্কালটি।

শয়তান উত্তর দিল,

"হ্যাঁ আমিই। একজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি তোমাদের দেখাতে।...তোমরা যাদের জ্ঞান দিয়েছিল তাদের ভেতরে থেকেও এ নির্বোধ হয়েছে। তাই এখন জ্ঞানের উৎসমুখে এসেছে রোগমুক্ত হতে।..."

যথাযোগ্য সম্ভ্রমসহকারে আমি তাকাইলাম এই ঋষির দিকে। মাথার খুলিতে কোথাও এতটুকু মাংস নাই কিন্তু একটা পরিপাটি আত্মতুষ্টির ভাব সে মুখ হইতে মুছিয়া যায় নাই। একটি অপূর্ব নিখুঁত সুসম্পূর্ণ অস্থিবিন্যাসের অংশ হইয়া থাকিবার চেতনায় প্রত্যেকটি হাড় জ্বলিতেছে।

"পৃথিবীতে তুমি কি করেছিলে আমাদের বল।"—শয়তান বলিল।

সদম্ভে ও সাড়ম্বরে এই মৃত ব্যক্তিটি বাহুর হাড় দিয়া চাদর ও মাংসের কালো ছেঁড়া টুকরাগুলো পরিষ্কার করিয়া লইল। ভিখারীর ছেঁড়া ন্যাতার মত এই টুকরাগুলো তাহার পাঁজরে লাগিয়া ছিল। তারপর গর্বভরে ডান হাতের হাড়-

গুলি কাঁধের সমান তুলিয়া এবং আঙুলের মাংসহীন গ্রন্থি দিয়া গোরস্থানের অন্ধকারের দিকে দেখাইয়া ধীর শান্তকণ্ঠে সে বলিতে লাগিল,

"দশখানি বড় বড় বই লিখেছিলুম আমি। এই রচনার দ্বারা কৃষ্ণজাতির চেয়ে শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠতার মহান্ তত্ত্বটি আমি মানুষের মনে গেঁথে দিয়েছি।

শয়তান টিপ্পনি কাটিল,

"অর্থাৎ সত্যের ভাষায় দাঁড়ায় এই যে, আমি এক বন্ধ্যা অনূঢ়া মহিলা সারা জীবন আমার মনের ভোঁতা সূঁচ চালিয়ে সুতা-ওঠা তত্ত্বের রেশম দিয়ে পাতার পর পাতা বুনে গিয়েছি তাদের জন্যই যারা মাথার খুলি শান্ত রাখতে চায়।......"

"ওকে চটাতে আপনার ভয় করছে না?"—শয়তানকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম আমি।

"ভয়! জ্ঞানী লোকেরা তাঁদের জীবিতকালেও সত্যের কথায় কান দেন না।"

ঋষি বলিয়া চলিলেন, "এত উন্নত সভ্যতা ও এত কঠোর ন্যায়নীতি সৃষ্টি করা শুধু শ্বেতজাতির পক্ষেই সম্ভব। তাদের গায়ের রং ও রক্তের রাসায়নিক প্রকৃতির দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। সেটাই আমি প্রমাণ করেছি।..."

"প্রমাণ সে করেছে ঠিকই!" সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল শয়তান : "নিষ্ঠুরতা যে তার অধিকার, এ বিষয়ে একজন ইউরোপীয়ানের বিশ্বাস যতটা দৃঢ় ততটা দৃঢ় কোন অসভ্যের নয়।..."

মৃতব্যক্তি বলিতে লাগিল, "খৃষ্টধর্ম ও মানবিকতা শ্বেতজাতির সৃষ্টি।"

শয়তান বলিয়া উঠিল, "দুনিয়া শাসনের একমাত্র অধিকার যাদের সেই দেব-দূতদের জাতি এরা। সেই জন্যই তো পৃথিবীকে এরা লাল রঙে, রক্তের রঙে, তাদের প্রিয় রঙে এত গভীর আগ্রহ নিয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে।"

"এরাই সৃষ্টি করেছে মহান্ সাহিত্য, স্থাপন করেছে যন্ত্রজগতের অলৌকিক কীর্তি......" আঙুলের হাড় টানিয়া টানিয়া মৃতব্যক্তি বলিয়া চলিল।...

"মানুষকে শেষ করবার জন্য খান ত্রিশেক ভাল বই ও অসংখ্য কামান।"—হাসিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিল শয়তান :

"শ্বেতজাতির মধ্যে জীবন যত বিশিষ্ট ও মানুষ যত নীচু, আর কোথাও তুমি তা' পাবে না।"

আমি সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে শয়তান সব সময় নির্ভুল নয়?"

"ইউরোপীয়দের শিল্পকলা এত উঁচুতে উঠেছে যে তার পরিমাপ করা যায় না।" নির্জীব কর্কশকণ্ঠে বলিয়া চলিল কঙ্কাল।

"বরঞ্চ বল, শয়তান চায় তার ভুল হোক!" বলিয়া উঠিল আমার সঙ্গী। "সব সময় নির্ভুল হওয়া অসহ্য বিরক্তিকর! কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা আমার ঘৃণায় ইন্ধন জোগায়।...অসভ্যতা ও মিথ্যার ফসলই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী। তোমার সামনেই রয়েছে তাদেরই একজন যারা এই বীজ বপন করে এসেছে। তাদের

সবার মত এও নতুন কিছু ফলায় নি; এ শুধু নতুন কথার পোশাক পরিয়ে পুরানো কুসংস্কারের মড়া বাঁচিয়ে তুলেছে।......কী হয়েছে দুনিয়ায়? প্রাসাদ তৈরী হয়েছে মুষ্টিমেয়ের জন্য, আর গীর্জা ও কারখানা তৈরী হয়েছে বাকী অসংখ্যের জন্য। গীর্জায় জবাই করা হচ্ছে আত্মাকে, আর কারখানায় দেহকে, যাতে প্রাসাদগুলো ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কয়লা ও সোনার জন্য মানুষকে পাঠানো হচ্ছে ধরিত্রীর জঠর-গহ্বরের অন্ধকারে—আর এই হীন অবমাননাকর কাজের পরিবর্তে তারা পাচ্ছে সীসার—লোহার শক্ত এক টুকরো রুটি।"

"আপনি কি সোশ্যালিস্ট?"—শয়তানকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আমি চাই সামঞ্জস্য।"—জবাব দিল শয়তান। "যে মানুষ স্বভাবত অখণ্ড তাকে যখন দেখি দিয়াশলাই-তৈরীর কাঠের মত হাজার টুকরো হয়ে লুব্ধ হাতের যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, তখন সে দৃশ্য আমার অসহ্য মনে হয়। আমি ক্রীতদাস চাই না। দাসত্ব আমার কাছে অসহ্য।...তাই স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছি। যেখানে দেবমূর্তি, সেখানে আত্মার দাসত্ব অনিবার্য, সে স্থান মিথ্যার শ্যাওলায় ঢেকে যাবেই...। পৃথিবী বাঁচুক, সবটুকু বাঁচুক এই পৃথিবীর। রাত্রে যদি ভস্ম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাও থাকে, তবু সারাদিন ধরে জ্বলুক এই পৃথিবী। জীবনে একবার প্রত্যেক মানুষের প্রেমে পড়া উচিত।..প্রেম মানুষের জীবনে মুগ্ধ স্বপ্নের মত মাত্র একবারই আসে কিন্তু এই একটি মুহূর্তেই অস্তিত্বের সমস্ত অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।..."

একখানা কালো পাথরে হেলান দিয়া কঙ্কালটি দাঁড়াইয়াছিল। তার পাঁজরের শূন্য খাঁচার ভিতর দিয়া মৃদু বিলাপধ্বনিতে বাতাস বহিয়া যাইতেছিল।

শয়তানকে আমি বলিলাম, "ওর নিশ্চয়ই শীত করছে, খারাপ লাগছে।"

"সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত একজন বৈজ্ঞানিককে দেখতে আমার বেশ ভালই লাগে। ওই কঙ্কাল হচ্ছে তার তত্ত্বেরই কঙ্কাল।...কী মৌলিক সেই সব তত্ত্ব!...... এইটির পাশেই শুয়ে আছেন আর একজন সত্যের বীজ বপনকারীর কঙ্কাল। তাঁকেই এবার জাগান যাক। জীবিতকালে এরা সবাই শান্তি ও আরাম ভালোবাসে; চিন্তা, আবেগ আর জীবনের নীতি ও কানুন তৈরী করে যায় এরা—নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাবধারাকে বিকৃত করে নিজেদের জন্য তারা ছোট ছোট আরামের কফিন বানায়। কিন্তু মৃত্যুর পর এরা স্মরণীয় হতে চায়।...এই ওঠো হে, দেখ একজনকে সঙ্গে করে এনেছি—চিন্তার জন্য একটা কফিন চায় সে।"

আবার একটি উলঙ্গ অন্তঃসারশূন্য নরকপাল মাটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হলদে রঙের সে মুণ্ডুতে দাঁত নাই, তবু আত্মসন্তোষে সে-মুখ চকচক করিতেছে। সে নিশ্চয়ই বহুকাল মাটির তলায় আছে। তার হাড়ে মাংস নাই। কবরের পাথরের পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল। কালো পাথরে পাঁজরের হাড়-গুলির ছায়া পড়িয়া দেখাইতেছিল আদালতের কর্মচারীর উর্দির উপরের ডোরা দাগগুলির মত।

"তত্ত্বগুলি কোথায় রাখেন উনি?"—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"হাড়ের ভেতর হে, হাড়ের ভেতর। ওর তত্ত্বগুলো বাতের মত, পাঁজরার ভেতর ঢুকে যায়।"

"আমার বই কেমন বিক্রী হচ্ছে, প্রভু?"—কঙ্কালটি জিজ্ঞাসা করিল একঘেয়ে ধরনের গলায়।

"এখনও তাকের উপর পড়ে রয়েছে অধ্যাপকমশাই।" উত্তর দিল শয়তান।

এক মুহূর্ত ভাবিয়া অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন? লোকে কি পড়তে ভুলে গেছে?"

"না, আবোল-তাবোল এখনও মানুষ খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে। কিন্তু বিরক্তিকর আবোল-তাবোলকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়।"

আমার দিকে ফিরিয়া শয়তান বলিল, "নারী যে মানুষ নয় এইটে প্রমাণ করার জন্য এই অধ্যাপকটি সারা জীবন মেয়েদের মাথার খুলি মেপে কাটিয়েছেন। তিনি মেপেছেন হাজার হাজার মাথার খুলি, হাজার হাজার দাঁত, হাজার হাজার কান, ওজন করে দেখেছেন মৃতের মগজ। মৃতের মগজ নিয়ে গবেষণা করা ছিল এই অধ্যাপকটির প্রিয় কাজ। তার সব বইতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পড়েছ তার বইগুলো?"

আমি জবাব দিলাম, "পুঁথি পড়ে মানুষ সম্পর্কে কী করে জ্ঞানলাভ করা যায় আমি জানিনে। পুঁথিতে মানুষ সব সময়ই ভগ্নাংশ, আর আমিও অঙ্কে খুব দুর্বল। কিন্তু আমার ধারণা যে-মানুষের দাড়ি নেই ও যে স্কার্ট পরে বেড়ায় সে-মানুষ যার দাড়ি-গোঁফ আছে ও যে প্যান্ট পরে তার চেয়ে কোন অংশে ভাল বা খারাপ নয়।"

শয়তান বলিল, "হ্যাঁ, তুমি কি পরো বা না পরো ও তোমার মাথায় কতটা চুল আছে বা না আছে তার দিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়েই অসভ্যতা আর নির্বুদ্ধিতা মানুষের মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে। কিন্তু তবুও, নারী-সমস্যাটি বেশ পরিষ্কার-ভাবে তোলা হয়েছে।" এই বলিয়া শয়তান তাহার অভ্যস্ত হাসি হাসিতে লাগিল। এই জন্যই তাহার সহিত কথা বলিতে এত ভাল লাগে। গোরস্থানে দাঁড়াইয়া যে হাসিতে পারে সে যে জীবন ও মানুষকে ভালবাসে তাহাতে সন্দেহ নাই।......

শয়তান বলিয়া চলিল :

"যারা নারীকে স্ত্রী ও দাসী হিসেবে পেতে চায় তারা বলে নারী মানুষই নয়। আর যারা নারীকে নারী হিসাবে ব্যবহার করতে অস্বীকার না করে তার কর্মশক্তি শোষণ করতে চায়, তারা বলে পুরুষের তুলনায় নারীর কাজের যোগ্যতা কম নয় এবং পুরুষের সঙ্গে—অর্থাৎ পুরুষের জন্য—একই ভিত্তিতে সে কাজ করতে পারে। এই দুই দলের কেউই কিন্তু সেই নারীকে সমাজে স্থান দেবে না, যাকে তারা বলাৎকার করেছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে-নারীকে একবার স্পর্শ করা হয়েছে, সে চির-দিনের মত কলুষিত হয়ে গিয়েছে।...সত্যি, মেয়েদের সমস্যা ভয়ঙ্কর মজার! লোকে

যখন এই নির্জলা মিথ্যেগুলো বলে, তখন সত্যিই আমার খুব মজা লাগে। তখন তাদের শিশুর মত মনে হয়, মনে হয় সময়ে বড় হবে তারা।..."

শয়তানের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, ভবিষ্যতের মানুষ সম্পর্কে প্রশংসা-সূচক কিছু বলিবার ইচ্ছা তাহার নাই। কিন্তু বর্তমানের মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছুই আমার বলিবার আছে যাহা মোটেই প্রশংসাসূচক নহে এবং এই আনন্দময় কাজে অবসরবিনোদনে শয়তানের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই বাধা দিয়া বলিলাম :

"একটা কথা আছে—যেখানে শয়তান নিজে যাবার সময় পায় না, সেখানে সে একটি মেয়েকে পাঠায়। সত্যি কি তাই?"

ঘাড় নাড়িয়া শয়তান বলিল, "তা' বটে।...কাছাকাছি যখন কোন পুরুষ পাই না যে যথেষ্ট ধূর্ত ও হীন, তখনই......

"আমার ধারণা হচ্ছে মন্দকে তুমি আর ভালবাস না।"—শয়তানকে আমি চ্যালেঞ্জ করিলাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে জবাব দিল: "মন্দ বলে আর কিছু নেই। আছে শুধু শস্তা নোংরামি। এক সময় মন্দের শক্তি ছিল, ছিল তার শক্তির সৌন্দর্য। আজ মানুষকে হত্যাও করা হয় স্থূলভাবে—আগে তার হাতদুটি বেঁধে নিয়ে। কোন দুর্জন আর নেই, আছে শুধু হুকুমের দালাল। আর দালাল হচ্ছে ক্রীতদাস—একখানি হাত ও একখানি কুঠার চালিত হচ্ছে আতঙ্কের শক্তিতে, ভয়ের তাড়নায়। যাদের তারা ভয় করে, মানুষ তাদেরই হত্যা করে।"

নিজ নিজ কবরে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিল দুইটি কঙ্কাল। শরতের ঝরা পাতাগুলি ধীরে ধীরে নামিতেছিল তাহাদের হাড়ের উপর দিয়া। তাহাদের পাঁজরের তন্ত্রীতে বাতাস লাগিয়া করুণ সংগীত উঠিতেছিল, সে বাতাস আর্তনাদ করিতেছিল তাহাদের নরকঙ্কালের শূন্য গহ্বরে। তীব্র গন্ধে আমন্থর আর্দ্র অন্ধকার তাহাদের চোখের গভীর গহ্বর হইতে বাহিরে তাকাইয়াছিল। তাহারা দুইজনেই কাঁপিতেছিল। তাহাদের জন্য দুঃখ হইল।

"ওদের নিজেদের যায়গায় ফিরে যেতে দিন।" শয়তানকে অনুরোধ জানাইলাম।

"তুমি দেখছি গোরস্থানে এসেও মানবতাবাদী! তা বেশ। মৃতদের মধ্যেই মানবতাবাদ খাপ খায় ভাল; এখানে কারও এতে আপত্তি থাকতে পারে না। জেলে, খনিতে, কারখানায়, শহরের রাস্তায়, পার্কে, যেখানেই জীবন্ত মানুষ সেখানেই মানবতা উপহাসের বস্তু; এমন-কি ক্রোধও উদ্রেক করে। কিন্তু এখানে মানবতাকে পরিহাস করবার কেউ নেই। মৃতেরা সব সময়ই অরসিক, গম্ভীর। শুধু তাই নয়, মানবতার কথা শুনতে তারা যে ভালবাসে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ—কারণ মানবতা তাদেরই মৃতজাত শিশু। সমস্ত মানুষের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষ মানুষের উপর যে নির্মম নৃশংসতা ও অন্ধ পৈশাচিকতা চালাচ্ছে

তাকে ঢাকবার জন্য জীবনের রঙ্গমঞ্চে এই অপূর্ব উপদৃশ্যটির অবতারণা যারা করতে চেয়েছিলেন তারা তো নির্বোধ ছিলেন না।......"

এই বলিয়া এক অশুভ সুতোর কর্কশ হাসিতে শয়তান ফাটিয়া পড়িল।

অন্ধকার আকাশে তারাগুলি কাঁপিতে লাগিল। অতীতের কবরগুলির উপর কালো পাথরগুলি দাঁড়াইয়া রহিল নিস্পন্দ হইয়া। একটা পচা গন্ধ বাহির হইয়া আসিল মাটির ভিতর হইতে। রাত্রির স্তব্ধতাবিজড়িত সহরের ঘুমন্ত রাস্তাগুলিতে মৃতের নিঃশ্বাস বহিয়া আনিল বাতাস।

চারিপাশের কবরগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া শয়তান বলিয়া চলিল, "বেশ কিছু মানবতাবাদী শুয়ে আছেন এখানে। এদের কেউ কেউ সত্যিই আন্তরিক ছিলেন—জীবনে অন্তর্বিরোধিতার তো অন্ত নেই, হয়ত এর চেয়েও মজার ব্যাপার জীবনে আছে। এদের পাশেই শান্তভাবে নির্বিরোধে শুয়ে আছেন আর এক ধরণের লোক। হাজার হাজার মৃত এত কষ্টে, এত যত্নে, এত পরিশ্রমে মিথ্যার যে পুরাণো ইমারত গঠন করে গেছেন, তার একটা শক্ত বনিয়াদ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন জীবনের এই শিক্ষকরা।.. .."

দূর হইতে গানের শব্দ ভাসিয়া আসিল। দু' তিনটি উল্লসিত কণ্ঠস্বর সমাধিভূমি কাঁপাইয়া চলিয়া গেল। হয়ত পানোন্মত্ত কেউ হালকা হৃদয়ে অন্ধকারে হাঁটিতে হাঁটিতে নিজের কবরের দিকে চলিয়াছে।

"এই ভারী পাথরখানার নীচে এক প্রাজ্ঞ ঋষির দেহ গর্বভরে পচে যাচ্ছে। ইনি শিখিয়েছিলেন, বানর কিম্বা শুয়োরের—ঠিক মনে নেই কিসের—দেহের মতই সমাজ একটি জীবদেহ। যারা জীবদেহের মস্তিষ্ক ব'লে নিজেদের মনে করতে ভালবাসে এটা তাদেরই যোগ্য কথা। প্রায় সমস্ত রাজনীতিবিদ ও অধিকাংশ গুণ্ডার সর্দার এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। আমি যদি মগজ হই, তবে ইচ্ছামত আমি হাত দুটো নাড়াতে পারি এবং আমার রাজশক্তির বিরুদ্ধে পেশীগুলির সহজাত প্রতিরোধও আমি দমন করতে পারি। নিশ্চয়ই পারি। এখানে শুয়ে আছেন এমন একজন যিনি মানুষকে সেই যুগে ফিরে যেতে বলেছিলেন যখন তারা চার পায়ে হাঁটত ও পোকা খেত। তিনি জোরের সাথে বলেছিলেন, তখনই নাকি জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন গেছে। গায়ে চমৎকার ফিটকরা একটা ফ্রক-কোট পরে দু'পায়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো ও লোককে পূর্বপুরুষের মত আবার সারা গায়ে লোম গজাতে উপদেশ দেওয়া—সত্যিই কি মৌলিক! কবিতা পড়া, গান শোনা, যাদুঘর দেখা, একদিনে হাজার হাজার মাইল চলে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে উপদেশ দেওয়া আদিম অরণ্য জীবনে ফিরে যেতে ও চার পায়ে হামা দিয়ে বেড়াতে—সত্যিই খুব খারাপ নয়। কি বল? এই যে লোকটি এখানে শুয়ে আছেন, ইনি মানুষকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন ও তাদের বর্তমান জীবন-যাত্রার সাফাই গাইতে গিয়ে এই ঘোষণাই করেছিলেন যে, অপরাধীরা অন্য লোক থেকে স্বতন্ত্র, তাদের মন রুগ্ন, তারা এক বিশেষ ধরণের সমাজবিরোধী মানুষ। তার মতে যেহেতু তারা সমাজের নীতি ও আইনের স্বাভাবিক শত্রু সেহেতু তাদের

সম্পর্কে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, অপরাধপ্রবণদের রোগমুক্ত করতে পারে একমাত্র মৃত্যু। চমৎকার তত্ত্ব। কোন ব্যক্তিবিশেষকে স্বভাবপাপী ও অনিষ্টের জৈবিক বাহক বলে ধরে নিয়ে তাকে সকলের পাপের জন্য দায়ী করো—ব্যাপারটা মোটেই বোকার মত নয়। এই কদর্য, আত্মাবিকৃতকারী জীবন-ব্যবস্থার সমর্থন করার জন্য লোকের অভাব কখনও হবে না। কারণ ছাড়া বিজ্ঞেরা একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়বেন না। সত্যিই, সহরের জীবনযাত্রাকে উন্নত করার বহু তত্ত্বই এই কবরখানায় রয়েছে।......"

শয়তান একবার চারিপাশে তাকাইল। বিরাট একটি কংকালের আঙুলের মত একটি সাদা গির্জা এই মৃতপ্রান্তর হইতে নিঃশব্দে উঠিয়াছে তারাভরা অন্ধকার আকাশের বুকে। জ্ঞানের উৎস-মুখের উপর শ্যাওলাভরা একটি পুরু সাদা দেওয়াল এই চিমনিটিকে ঘিরিয়া আছে, আর এই চিমনিটির মুখ হইতে মানুষের অভিযোগ ও প্রার্থনার শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া বাহির হইয়া বিশ্বের বিশাল প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তৈলাক্ত পচা গন্ধে নেশাগ্রস্ত বাতাস ধীরে ধীরে গাছের ডালগুলি দোলাইতেছে ও জীবনস্রষ্টাদের বাসগৃহগুলির উপর নিঃশব্দে মরা পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে।......

সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢিবি ও পাথরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে একটি পথ। আমার আগে আগে সেই পথে চলিতে চলিতে শয়তান বলিতে লাগিল, "এস, মৃতদের একটা ছোট খাট প্যারেডের ব্যবস্থা করা যাক অর্থাৎ 'শেষ বিচারের দিনের' মহড়ার ব্যবস্থা! বিচারের দিন আসবেই জেনো। আসবে এখানেই, এই পৃথিবীতেই। দিনটি হবে মানুষের সবচেয়ে সুখের দিন। সেদিনই আসবে এই মহাদিন যেদিন মানুষ বুঝবে জীবনের শিক্ষাদাতা ও আইনস্রষ্টাদের পাপের পরিমাণ কি বিপুল! হাড় ও মাংসের খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে তারাই মানুষকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে। আজ মানুষ বলতে যা বোঝায় তা মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র। পূর্ণ মানুষ এখনও সৃষ্টি হয় নি। সারা দুনিয়ার অর্জিত অভিজ্ঞতার ভস্ম থেকে সে মানুষ একদিন উঠে আসবে এবং সমুদ্র যেমন করে সূর্যরশ্মি শুষে নেয় তেমনি করে দুনিয়ার অভিজ্ঞতা শুষে নিয়ে পৃথিবীর উপর সে দ্বিতীয় সূর্যের মত জ্বলতে থাকবে। আর আমি তা চেয়ে দেখব! আমিই সেই মানুষকে সৃষ্টি করছি, তার আবির্ভাব হবেই!"

কাব্যের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল বৃদ্ধ। কথায় সামান্য অহংকারও ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার। শয়তানের পক্ষে এই মনোভাব কিছুটা অস্বাভাবিক। আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম। কি আর করা যায়? শয়তানকে পর্যন্ত বিকৃত করিয়াছে জীবন এবং বিষাক্ত অম্লরস দিয়া তাহার শক্ত-সমর্থ আত্মাকে পর্যন্ত পরিপাক করিতে শুরু করিয়াছে। তাহা ছাড়া, মাথা সকলেরই গোল, কিন্তু চিন্তা ভাবনা তো বাঁকাচোরা, এবং আরশিতে তাকাইলে প্রত্যেকেই একটি সুন্দর মুখ দেখিতে পায়।

কবরগুলির মাঝখানে থামিয়া রাজকীয় গলায় শয়তান হাঁক দিল, "জ্ঞানী সৎলোক কে আছে তোমাদের মধ্যে?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটিল। তারপর হঠাৎ র পায়ের তলায় মাটি কাঁপিতে লাগিল, যেন হাজার হাজার বজ্রশিখা ভিতর হইতে মাটিকে চষিয়া ফেলিতেছে, যেন কোন বিরাট দৈত্য মাটির মধ্যে মাথা তুলিতেছে। আমাদের চারিপাশের সব কিছুই একটা নোংরা হলদে আলোয় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল এবং বাতাসে শুকনো ঘাসের শীষের মত সর্বত্র কঙ্কালগুলি দুলিতে লাগিল; গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে ও গ্রন্থিতে-সমাধিশিলায় ঘা লাগিয়া এবং হাড়গুলির খট খট শব্দে চারিপাশের নিঃশব্দতা ভরিয়া উঠিল। ঠেলাঠেলি করিয়া পাথরের উপর বাহির হইয়া আসিল কঙ্কালগুলি, এখানে-ওখানে উঁকি মারিতে লাগিল নরকপালগুলি ডাণ্ডেলিয়ন ফুলের মত; সরু খাঁচার মত পাঁজরের একটি পুরু জাল ঘিরিয়া ধরিল আমাকে; কটিদেশের হাঁ-করিয়া থাকা হাড়গুলির গুরুভারে কঙ্কালগুলির জঙ্ঘার হাড় টান টান হইয়া কাঁপিতেছিল; আমাদের চারিপাশের সব কিছুই যেন একটা নিঃশব্দ কর্মতৎপরতায় উদ্বেল হইয়া উঠিল।

সমস্ত নৈর্ব্যক্তিক শব্দ ছাপাইয়া উঠিল শয়তানের শীতল অট্টহাসি।

"দেখ দেখ! সবাই বেরিয়ে এসেছে, কেউ বাকী নেই। সহরের হাবারা পর্যন্ত এসেছে। বমি পেয়েছিল ধরিত্রীর, তাই পেট থেকে সে উগরে দিয়েছে মানুষের মৃত জ্ঞানের অজীর্ণভার।"......

এই আর্দ্র কোলাহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; মনে হইল ঝাড়ুদারের ঝাঁটায় উঠানের এক কোণে কুড়াইয়া ফেলা ভিজা আবর্জনাস্তূপের মধ্যে একটি অদৃশ্য লুব্ধ হাত কি যেন হাতড়াইয়া খুঁজিতেছে।

'চেয়ে দেখ, পৃথিবীতে যারা বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে কত ছিল জ্ঞানী ও সৎ!" —চারিপাশে ভীড় করিয়া আসা হাজার হাজার ভাঙ্গা টুকরার উপর বিশাল পাখা দুইখানি বিস্তার করিয়া বলিয়া উঠিল শয়তান।

উঁচুগলায় সে জিজ্ঞাসা করিল : "তোমাদের মধ্যে কে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করেছ?"

বড় একটা কড়াইয়ে টক-মাখনে ব্যাঙের ছাতা ভাজা হইবার সময় যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন একটি শব্দ উঠিল। "পথ ছাড়!"—রুক্ষ তিক্তকণ্ঠে কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল। "আমি আপনারই লোক কর্তা, আমি আপনারই লোক। আমিই প্রমাণ করেছিলাম যে, সমাজের যোগফলে ব্যক্তিবিশেষ একটা 'শূন্য' ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দূর হইতে আর একটি কণ্ঠে প্রতিবাদ আসিল, "আমি ওর থেকে অনেক বেশী এগিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, সমগ্র সমাজই শূন্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, অতএব দল যা চাইবে জনসাধারণকে তাই করতে হবে।"

"আর এই দলকে চালনা করে ব্যক্তিবিশেষ—অর্থাৎ আমি!"—কে যেন বলিয়া উঠিল ভারিক্কী গলার স্বর খাদে নামাইয়া।

সংগে সংগে ভীত প্রশ্ন উঠিল বহুস্থান হইতে, "তুমি কেন?"

"আমার খুড়ো একজন রাজা ছিলেন!"

"ও, মহারাজেরই খুড়োর মাথাটা তাহলে এমন অকালে কাটা গিয়েছিল?"

"রাজারা সব সময়েই মাথা হারান, যখন মাথা হারানোই তাদের উচিত।"—যে হাড়গুলি একদিন সিংহাসনে বসিয়াছিল তাহাদেরই একজন বংশধরের হাড় জবাব দিল গর্বিত কণ্ঠে।

উল্লসিত নীচু গলায় একজন বলিয়া উঠিল "ওঃ-হো, তা হলে আমাদের মধ্যে একজন রাজা আছেন দেখছি! ক'টা কবরখানায় রাজা থাকে বলতে পার?'...

অর্থপূর্ণ গুঞ্জনধ্বনি ও হাড়ের খটখট শব্দ মিশিয়া একটা জটিল শব্দের সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়াছিল এবং সেই শব্দ ক্রমেই ভারী ও ঘন হইয়া উঠিতেছিল।

"আচ্ছা দেখুন! একথা কি সত্যি যে, রাজবংশের হাড়ের রং নীল?"—বাঁকা শিরদাঁড়াওয়ালা একটি বামন কঙ্কাল রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল।

একটি স্মৃতিস্তম্ভের দু'পাশে ভারিক্কী চালে পা দিয়া বসিয়াছিল একটি কঙ্কাল। সে বলিতে শুরু করিল :

"তবে শুনুন.........

পেছন হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "পায়ের কড়ার সবচেয়ে ভাল মলম আবিষ্কার করেছিলাম আমিই।"

"আমি একজন স্থপতি।......"

একটি বেঁটে মোটা কঙ্কাল হাতের বেঁটে বেঁটে হাড়গুলি দিয়া অন্য সকলকে ঠেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অন্য মৃতদের কণ্ঠস্বরে তাহার কথা কিছুটা চাপা পড়িয়া যাইতেছিল।

"হে খৃষ্টান ধর্মভাইগণ! আমি কি তোমাদের আত্মার চিকিৎসক নই? জীবনের দুঃখদুর্দশার জন্য তোমাদের আত্মার উপর যে কড়া পড়েছিল তা' সারবার জন্য আমি কি সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাই নি?"

বিরক্তিভরা কণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল, "দুঃখদুর্দশা বলে কিছু নেই। সব কিছুই কল্পনা।"

"যে স্থপতি নীচু-কাঠামোর দরজা আবিষ্কার করেছিল......"

"আমি মাছিমারা কাগজ আবিষ্কার করেছিলাম!"

বাধা উপেক্ষা করিয়া বিরক্তিভরা কণ্ঠ বলিয়া চলিল, "...নীচু দরজা আবিষ্কার করেছিলাম যাতে দরজার মালিকের সামনে মাথা নত না করে লোকের উপায় থাকে না।......"

"হে ভ্রাতাগণ! কাজটা আমিই আগে করেছিলাম কিনা আপনারাই বলুন। যারা ভুলে থাকতে চেয়েছে তাদের তো আমিই দিয়েছি পার্থিব সব কিছুর নশ্বরতা সম্পর্কে আমার ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের সারবস্তু।"

"যা আছে, তাই থাকবে!" নির্জীব কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল একজন।

সাদা পাথরের উপর বসিয়াছিল একটি এক-পা-ওয়ালা কঙ্কাল। পাখানি

তুলিয়া সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া কেন জানি না সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

দেখিতে দেখিতে সমাধিক্ষেত্র বাজার হইয়া উঠিল, প্রত্যেকেই নিজের নিজের জিনিসের তারিফ করিতে লাগিল। চাপা চীৎকারের একটা ঘোলা নদী, কদর্য নির্লজ্জ অহমিকার একটা বন্যাস্রোত রাত্রির শব্দহীন অন্ধকার বুকের মধ্যে তীব্রবেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। বদ্ধ পচা জলার উপর যেন একঝাঁক ডাঁশ মাছি একঘেয়ে করুণ সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া উড়িতেছে; বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে কবরের বিষবাষ্পে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে। প্রত্যেকেই আসিতেছে শয়তানের চারিপাশে ভীড় করিয়া; আসিতেছে দাঁতে দাঁত চাপিয়া, অন্ধকার অক্ষিকোটর শয়তানের মুখের উপর স্থির রাখিয়া। মৃত চিন্তাগুলি এক এক করিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল, বাতাসে উড়িতে লাগিল হলদে পাতার মত।

সবুজ চোখ দুটি দিয়া শয়তান এই চঞ্চলতা ও উম্মত্ততা লক্ষ্য করিতে লাগিল; তাহার শীতল নির্নিমেষ দৃষ্টি কঙ্কালগুলিকে এক প্রকারের দীপক-আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

তাহার পায়ের নীচে যে কংকালটি বসিয়াছিল সে তাহার বাহুর হাড়গুলি খুলির উপর তুলিয়া ছন্দভরে দোলাইতে দোলাইতে বলিল :

"প্রত্যেক নারীর এক-একটি পুরুষের অধিকারে থাকা উচিত।"

তাহার কণ্ঠস্বরে আরেকটি শব্দ আসিয়া মিশিয়া গেল। জড়াইয়া গেল দুইজনের কথা।

"শুধুমাত্র মৃতেরাই সত্যকে জানে!"...

আসিল আরও অনেক শব্দ :

"আমি বলেছিলাম, বাপ হল মাকড়সার মত।......"

"এই পৃথিবীতে আমাদের চরম জীবন হল বিভ্রান্তি ও মায়ার শৃংখলাহীন, মিশ্রণ, অন্ধ অজ্ঞানতার জলাভূমি।"

"আমি তিনবার বিয়ে করেছি। তিনবারই আইনসঙ্গতভাবে......"

"সারা জীবন ধরে সে অবিশ্রাম বুনে চলে পরিবারের কল্যাণের তন্তুজাল।..."

"...এবং প্রত্যেকবারই মাত্র একটি নারীকে ."

হঠাৎ একটা কংকাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার ঝাঁঝরা-হইয়া-যাওয়া হলদে হাড়গুলি কড় কড় করিয়া উঠিল। অর্দ্ধেক ক্ষয়-পাওয়া মুখখানি শয়তানের মুখের সামনে তুলিয়া সে বলিল :

"আমি সিফিলিসে মরেছিলুম, ঠিকই।. কিন্তু আজও আমি সমাজের নৈতিক নিয়মকে শ্রদ্ধা করি। যখন দেখলাম আমার স্ত্রী আর আমার প্রতি অনুরক্ত নন, তখন তার মামলাটি আমি নিজেই আইনের আদালতে সমাজের দরবারে উপস্থিত করলাম এবং এই ব্যভিচারী আচরণের জন্য তার বিচার করালাম।"

চারিপাশ হইতে অন্যান্য কঙ্কালের হাড়গুলি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল এবং একসঙ্গে বহু কণ্ঠস্বর কথা বলিয়া উঠিল, ফলে চিমনির মধ্য দিয়া ঝোড়ো

হাওয়া বহিলে যেমন নীচু গর্জনের মত শোনা যায় ঠিক তেমনই একটি শব্দ উঠিল।

"আমি বৈদ্যুতিক চেয়ার আবিষ্কার করেছিলাম। একদম বিনা যন্ত্রণায় প্রাণ হরণ করা যায় এতে!"

"আমিই মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, মৃত্যুর পর চিরন্তন শান্তি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।..."

"পিতা সন্তানদের দেন জীবন ও আহার...। মানুষ যখন পিতা হল তখনই হল সে পূর্ণ মানুষ। তার পূর্ব পর্যন্ত সে শুধু পরিবারের একজন।"

অন্য কঙ্কালগুলির মাথার উপর দিয়া একটি কঙ্কালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কঙ্কালটির মাথার খুলি ডিমের মত এবং মুখে তখনও মাংসের টুকরা রহিয়াছে:

"আমি প্রমাণ করেছিলাম যে, সমাজের সমস্ত মতামত, অভ্যাস ও প্রয়োজনের জটিল ব্যবস্থার সাথে সংগতি রক্ষা করে চলতে হবে শিল্পের।..."

ভাঙা-গাছের প্রতিকল্প একটি স্তম্ভের দুইপাশে পা দিয়া আরেকটি কঙ্কাল বসিয়াছিল; সে বলিয়া উঠিল :

"অরাজকতা ছাড়া স্বাধীনতা থাকতে পারে না!"

"জীবনে ও কাজে পরিশ্রান্ত আত্মার চমৎকার ওষুধ এই শিল্প।..."

দূর থেকে কে বলিয়া উঠিল, "আমিই বলেছিলাম, জীবনই হচ্ছে কাজ।"

"বই হবে ওষুধের দোকানের ছোট্ট বড়ির বাক্সের মত চমৎকার...।"

"সবাইকে কাজ করতে হবে, আর কেউ কেউ করবে কাজের তত্ত্বাবধান।...... গুণের জন্য যারা যোগ্যতা অর্জন করেছে তারাই ফল ভোগ করবে এদের কাজের।"

"শিল্পকে হতে হবে নিঃস্বার্থপরতা ও সামঞ্জস্যের বাহক।...আমি যখন ক্লান্ত হই, শিল্পের কাছে আমি চাই অবকাশের গান।..."

শয়তান বলিল, "আমি চাই স্বাধীন শিল্প, যে শিল্প সৌন্দর্যদেবী ছাড়া আর কোন দেবতাকে পূজা করে না। যে পবিত্র তরুণ অমর সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে ও সে-সৌন্দর্যে অবগাহন করতে চায় তারই মতো আমিও ভালবাসি যে-শিল্প জীবনের দেহ থেকে উজ্জ্বল পোষাকটি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, সেই শিল্পকে।......জীবন আজ শিল্পের সামনে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধা বেশ্যার মত। তার স্খলিত কুঞ্চিত চামড়ার সারা স্থানে ঘা। একটা উদ্দাম ক্রোধ, সৌন্দর্যের জন্য একটা তীব্র কামনা, জীবনের বদ্ধ-জলার প্রতি একটা জ্বলন্ত ঘৃণা—শিল্পে এই আমি খুঁজে বেড়াই।...উঁচুদরের কবির বন্ধু হচ্ছেন শয়তান ও নারী।"

হঠাৎ গীর্জার চূড়ার ঘণ্টা হইতে একটা উচ্চ বিলাপের কাংস্যধ্বনি উঠিল, স্বচ্ছ ডানাওয়ালা এক বিরাটকায় পাখীর মত তাহা ধীরে ধীরে অন্ধকারকে দোলা দিয়া মৃতদের সহরের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল। কোন ঘুমন্ত পাহারাওয়ালা হয়ত আলস্যভরে শিথিলহাতে ঘণ্টার দড়িতে টান দিয়া থাকিবে। ধাতব শব্দটি ধীরে ধীরে বাতাসে মিশিয়া মিলাইয়া গেল। কিন্তু ইহার শেষ কম্পন মিলাইতে না মিলাইতেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট শব্দে বাজিয়া উঠিল রাত্রির জাগ্রত সতর্ক ঘণ্টাধ্বনি। গুমোট

বাতাসে জাগিল ধীর কম্পন এবং কম্পমান তীব্র ঘণ্টার গম্ভীর একঘেয়ে শব্দের সহিত আসিয়া মিশিল হাড়ের খটখটানি ও নানা কণ্ঠস্বরের ঐকতান।

আবার শুনিতে লাগিলাম বিরক্তিকর নির্বুদ্ধিতার সেই অসহ্য বাচালতা, মৃত ইতরতার বাগ্‌বিভূতি, ক্ষমতার আসনে সমাসীন কপটতার উদ্ধত কণ্ঠস্বর, আত্মম্ভরিতার বিরক্তিকর অসন্তোষধ্বনি। সহরের লোকেরা যে সকল চিন্তা ও তত্ত্ব লইয়া বাস করে সব কিছুই জাগিয়া উঠিল। কিন্তু গর্ব করিবার মত কিছুই তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। জীবনের আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে মরিচা-ধরা শৃঙ্খলগুলি তাহাদের সবগুলিই ঝন্‌ঝনাৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু মানুষের আত্মার অন্ধকারকে ভাসিত করিতে পারে এমন কোন আলোর রেখা একবারও চোখে পড়িল না।

শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বীরেরা কোথায়?"

"নম্র তাঁরা, কোথায় তাঁদের সমাধি লোকে ভুলে গেছে। জীবনে তাঁরা ছিলেন পতিতের দলে, কবরেও তাই। মরা হাড়ের তলায় তাঁরা গুঁড়িয়ে গেছেন!"

যে তৈলাক্ত পচাগন্ধ আমাদের চারিপাশে কালো মেঘের মত জমিয়া আসিয়াছিল—উত্তর দিবার সময় শয়তান তাহার ডানা দুইটি দিয়া তাহা দূরে সরাইয়া দিতে চাহিল। নির্জীব, নীরস মৃতের কণ্ঠস্বরগুলি এই মেঘের মধ্যে কৃমিকীটের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

চর্মকার বলিল, তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রথম সরু আঙুল-ওয়ালা জুতা আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া সম্প্রদায়ের সকলেরই তাহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। একজন বৈজ্ঞানিক তাহার বইয়ে হাজার রকম মাকড়শার কথা লিখিয়াছেন। তিনি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া জাহির করিলেন। দ্রুত-গোলাবর্ষী কামান আবিষ্কার করিয়াছেন যিনি তিনি চারিপাশের প্রত্যেককে পৃথিবীতে তাঁহার আবিষ্কারের উপকারিতার কথা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাগে গোঙাইতে লাগিল 'কৃত্রিম দুধের আবিষ্কারক'। মগজটিকে হাজার হাজার সরু ভিজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কে যেন সাপের বিষদাঁত বসাইতে লাগিল। যার যে বিষয়ই হোক না কেন, সব মৃতেরাই কথা বলিতে লাগিল কড়া নীতিবাগীশের মত। তাহারা যেন জীবনের কারারক্ষকদের মতো নিজেদের কাজে নিজেরাই আত্মহারা।

"যথেষ্ট হয়েছে।"—গর্জন করিয়া উঠিল শয়তান। "আর আমি শুনতে চাইনে এসব কথা। এই মৃতদের গোরস্থানে ও সহরে জীবিতদের গোরস্থানে যা' কিছু চোখে পড়ছে সবই অসহ্য মনে হচ্ছে। সত্যের পাহারাওয়ালার দল! কবরে ফিরে যাও!..."

নিজের শক্তির প্রতি বিতৃষ্ণ সম্রাটের ইস্পাতকঠিন কণ্ঠস্বরের মত শোনাইল তাহার কথা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণীবাতাসের মুখে পথের ধুলার মত ঘুরিয়া, উড়িয়া, পাক খাইতে লাগিল সেই ধূসর ও হলদে জনতা। পৃথিবী তার হাজার হাজার কালো চোয়াল খুলিয়া পরম আলস্যভরে উদ্গীর্ণ আহার্যগুলি আবার জঠরস্থ করিয়া নূতন

করিয়া জীর্ণ করিতে লাগিল। সব কিছুই একসঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাথর-গুলি ঘুরিয়া তাহাদের নিজ নিজ স্থানে পড়িল এবং আবার আগের মতই অটল, কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ভারী ভেজা হাতের মত একটা দুর্গন্ধ গলাটি টিপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

একটি কবরের উপর বসিয়া শয়তান এক হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া কালো হাত দু'খানির লম্বা লম্বা আঙুল দিয়া নিজের মাথা টিপিতে লাগিল। চারিপাশের অন্ধকারে পাথর ও কবরের উপর তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। মাথার উপর তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। উপরে আকাশ বেশ ফর্সা হইয়া আসিয়াছে। সেই আকাশের বুকে স্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি শান্তভাবে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, রাত্রিকে জাগাইয়া তুলিল নিদ্রা হইতে।

শয়তান আমাকে বলিল : "লক্ষ্য করেছ? এই শ্যাওলাধরা ছাতাপড়া নির্বুদ্ধিতা নির্লজ্জ কপটতা ও কদর্য ইতরতার বিপজ্জনক, পিচ্ছিল বিষাক্ত জমির উপর জীবনের আইনকানুনের এক অন্ধকার কয়েদখানার ইমারত গড়া হয়েছে। তৈরী হয়েছে এমন একটি খাঁচা যার ভেতর মৃতেরা তোমাদের ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। মানসিক অসাড়তা ও কাপুরুষতা তোমাদের এই জেলের খাঁচাটিকে বেঁধেছে এমন দড়ি দিয়ে যা টানলে বাড়ে। মৃতেরাই তোমাদের জীবনের সত্যকার প্রভু। গোরস্থানই পার্থিব জ্ঞানের উৎস। শোন আমার কথা ঃ তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি ফুল যা' মৃতদেহের রসে পুষ্ট মাটিতে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কবরে শীঘ্রই মৃতদেহের পচন সুরু হয়, কিন্তু জীবিতের আত্মার মধ্যে সে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। মৃত তত্ত্বের সূক্ষ্ম শুকনো ধূলিকণা সহজেই জীবিতের মগজে প্রবেশ করে। তাইতো তোমাদের জ্ঞানের প্রচারকেরা সব সময় আত্মার মৃত্যুর কথাই প্রচার করে থাকেন!"

শয়তান হাত তুলিল। দুইটি শীতল তারার মত তাহার সবুজ চোখ দুইটি রহিল আমার মুখের উপর।

"পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে কী প্রচার করা হচ্ছে? অপরিবর্তনীয় নিয়ম বলে মানুষ কিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায়? তারা জীবনকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করতে চায়; মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে আইনসম্মত করতে চায়, তাদের আত্মাকে এক করবার প্রয়োজন সৃষ্টি করতে চায়; সমস্ত আত্মাকে তারা এক বৈচিত্র্যহীন একত্বে বেঁধে তাদের সুবিধামত এমন কতকগুলি জ্যামিতিক আকারে পরিণত করতে চায় যাতে মুষ্টিমেয় শাসকের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এরা কপটভাবে উপদেশ দেয় শৃংখলধারী প্রভুর নিষ্ঠুর দুমুখো আচরণের সঙ্গে শৃংখলিত ক্রীত-দাসের তিক্ত বিরোধের সমন্বয়সাধনের। প্রতিবাদের স্বাধীন মনোবৃত্তিকে শেষ করে দেবার হীন বাসনা থেকেই এই উপদেশের জন্ম। মানুষের স্বাধীন আত্মাকে শৃংখলিত করে রাখবার জন্য মিথ্যার পাষাণকারা তৈরীর এ এক কদর্য পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।..."

সকাল হইল। সূর্যের আতঙ্কে ম্লান হইয়া ধীরে ধীরে আকাশে মিলাইয়া

গেল তারাগুলি। কিন্তু কথা বলিতে বলিতে শয়তানের চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল আরও উজ্জ্বল হইয়া।

"মানুষকে কী শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের জীবন সম্পূর্ণ ও সুন্দর হতে পারে?—সকলের জন্য সমান অবস্থা ও আত্মার স্বতন্ত্রতা। জীবন তখন হবে ফুল-গাছের ঝোপ, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা থেকে শক্তি আহরণ করবে যার শিকড়। পারস্পরিক মৈত্রী ও উন্নততর জীবনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জ্বলন্ত কয়লা এই জীবনের চুল্লীতে ইন্ধন যোগাবে। তখন লড়াই হবে শুধু তত্ত্বে তত্ত্বে, মানুষেরা চিরদিনই রইবে কমরেড হিসেবে। তুমি কি মনে কর, এ অসম্ভব? আমি বলি, এ সম্ভব হবেই, কারণ এ এখনও হয়নি।"

পূর্বদিকে চাহিয়া শয়তান বলিতে লাগিল, "দিন হচ্ছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন রাত্রি ঘুমিয়ে, তখন সূর্য কি আনন্দ আনতে পারবে? সূর্য উপভোগ করার সময় মানুষের নেই। তাদের অধিকাংশই রুটির খোঁজে ঘুরছে। কেউ কেউ যত কম পারা যায় ততটুকুই দিতে ব্যস্ত। অন্যেরা জীবনের কোলা-হলের মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছে মুক্তিকে, কিন্তু অবিশ্রাম রুটির লড়াইয়ে এ মুক্তি তাদের হাত এড়িয়ে যাচ্ছে। দুঃস্থ, দুর্গত, আশাহত, নিঃসঙ্গতায় তিক্ত এই মানুষগুলি জোড় মেলাতে চায় এমন দুটি জিনিসের যাদের জোড় মেলার নয়। এইভাবেই শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি ইতর মিথ্যার হিমপাঁকে ডুবে যাচ্ছে—প্রথমে অজ্ঞাতসারে নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, পরে জ্ঞাতসারেই আগেকার বিশ্বাস ও ভাবধারাগুলিকে ইচ্ছা করে বিসর্জন দিয়ে।"

শয়তান উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার বিরাট পাখা দুটি মেলিয়া দিল।

"আশা করি, আমিও যাব আমার প্রত্যাশার পথ বেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে...।"

তারপর তামার ঘণ্টা বাজিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে পশ্চিম দিকে উড়িয়া গেল।...

* * *

একজন আমেরিকানকে এই স্বপ্নের কথা আমি বলিয়াছিলাম। লোকটি অন্যদের চেয়ে একটু বেশী মানুষের মতো বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল :

"বুঝতে পেরেছি। মড়া পোড়াইবার চুল্লীর কারবারী কোন ফার্মের দালাল হচ্ছে এই শয়তান। মৃতদেহ পোড়ানো উচিত—এই প্রমাণ করার জন্যই সে এত কথা বলেছে। কিন্তু লোকটি সত্যিই বড় দালাল। ফার্মের নাম কাটানোর জন্যে সে মানুষের ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত যায়।

॥ সুন্দরী ফ্রান্স ॥

...প্যারিসের রাস্তায় বহু হাঁটাহাঁটির পর সেই নারীর সহিত দেখা হইল। সে ঠিক কোথায় থাকিত তাহা কেহ বলিতে পারে নাই।

একজন বৃদ্ধ বোধ হয় আমার সহিত পরিহাস করিল। বলল 'কে জানে কোথায় থাকে? এমন একদিন ছিল যখন সে সারা ইউরোপেই থাকিত।'

পরিহাসের মত কথা বটে কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত কাঁধদুটি একটু ঝাঁকুনি দিয়াই সে কথাগুলি বলিল।

রূঢ়কণ্ঠে একটি শ্রমিকরমণী বলিল, "সে থাকে ঐ ব্যাংকারদের রাস্তায়।"

অন্যেরা বলিল "ডাইনে যান।"

চারিদিকে কোলাহল। অস্বস্তি লাগে। প্রত্যেক পার্কে ও স্কোয়ারে কামান ও সৈন্য, প্রত্যেক রাস্তায় মজুরেরা। আজকাল প্রত্যেক দেশেই যাহা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এঁখানেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম না। রাস্তায় রাস্তায় সৈন্যেরা রাইফেল চালাইতেছে, খোলা তলোয়ার লইয়া অশ্বারোহী সৈন্যেরা ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে জনতার উপর, মজুরেরা সৈন্যদের দিকে ঢিল ছুঁড়িতেছে। ক্রুদ্ধ গালাগালিতে কাঁপিতেছে প্রাচীন নগরীর শ্বাসরোধকারী বাতাস আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাসে সামরিক হুকুমের গর্জনের প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। রাস্তায় রাস্তায় এখানে-ওখানে রক্ত, অক্ষম রোষে মুঠি চাপিয়া মাথা-ফাটা মানুষ কোনমতে পা দুইটি টানিয়া টানিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। যাহারা আর হাঁটিতে পারেনা তাহারা পড়িতেছে রাস্তার উপর, আর পুলিশ দয়া করিয়া ঘোড়া ও সৈন্যদের পায়ের তলা হইতে তাহাদের টানিয়া আনিতেছে। ফুটপাতে দাঁড়াইয়া বহু লোক, তাহারা খৃষ্টীয় শহরের এই অভ্যস্ত দৃশ্যটির খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা করিতেছে।

অবশেষে একজন বলিল :

"ফ্রান্স? ডানদিকে, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের পুলের কাছে।"

যে থানাটিতে সে থাকিত সেটি একটি বেশ প্রাচীন বাড়ী, সেখানে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যের কিছুই ছিল না। যে দরজা দিয়া আমি ঢুকিলাম তাহার কাছে স্বাধীনতার লাল পতাকায় তৈরী পাতলুন পরা দুইজন সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল। প্রবেশদ্বারে কি যেন একটা কথা খোদাই করিয়া লেখা, তাহার অনেকগুলি অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে। শুধু পড়া যায়, "স্বাধী...,সা..., মৈ...ী" সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই ব্যাঙ্কারদলের কথা যাহারা বেরাঁজে ও জর্জ স্যাণ্ডের দেশকে কলুষিত করিয়াছে। দুর্নীতি ও পচনশীলতার বিষবাষ্পে সেখানকার আবহাওয়া আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

আমার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। সমস্ত বিপ্লবীর মত আমিও আমার যৌবনে এই নারীকে ভালবাসিয়াছিলাম। এই নারীর হৃদয়েও ছিল অকপট উদার ভালবাসা। বিপ্লবকে সুন্দর করিয়া তুলিবার নিপুণতা তাহার ছিল।

বিনম্র হাসি হাসিয়া একটি লোক আমাকে একটি ছোট অন্ধকার কুঠুরিতে লইয়া গেল। লোকটির পোশাক একদম কালো। হাবভাবে মনে হয় লোকটি দামী বেশ্যাদের দালাল ছিল, এখন মার্কুইস হইয়াছে। এই ঘরটিতে আসিয়া আমি বর্তমান ফ্রান্সের আধুনিক স্টাইলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইলাম।

ঘরের দেয়ালটি বিচিত্র রঙের রাশিয়ান ঋণপত্রে ঢাকা, উপনিবেশের অধিবাসীদের চামড়া দিয়া ঢাকা মেঝে, তার উপর কারু-কৌশলে লেখা, "মানুষের অধিকারের ঘোষণাবাণী।" ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য প্যারিসের ব্যারিকেডে প্রাণ দিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের হাড় দিয়া তৈরী আসবাবটি বসানো রহিয়াছে একটি কালো জিনিসের উপর, রাশিয়ার জারের সহিত মৈত্রীচুক্তিটি তাহার উপর সূচী-শিল্পের সাহায্যে লেখা। দেয়ালের উপর ঝুলিতেছে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বর্ম; জীবন্ত মানুষের মাংসের মধ্যে লোহা দিয়া সেগুলি বসানো : জার্মানির উদ্ধত মুঠি, রাশিয়ার দড়ি ও চাবুক, ইতালীর ভিক্ষার থলি, স্পেনের অস্ত্র—একজন ক্যাথলিক পাদ্রীর কালো আংরাখা ও মোটা দুইখানি হাত একজন স্পেন-বাসীর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। ইহা ছাড়া ছিল ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রতীক—একটি বুর্জোয়ার বিরাট পাকস্থলী ও তাহার মধ্যে স্বাধীনতার প্রতীক-চিহ্ন ফ্রিজিয়ান টুপি জীর্ণ হইতেছে। ...

ছাদের গায়ে আঁকা রহিয়াছে চৌষট্টিটি দাঁত ও ভীষণ গোঁফসহ জার্মান কাইজারের হাঁ-করিয়া-থাকা মুখ।...জানালাগুলিতে ঘন করিয়া পর্দা দেওয়া। ঘরটি অন্ধকার, ব্যালজাকের আমলের যে মহিলারা পুরুষকে বাদ করিবার আশা ত্যাগ করে নাই তাহাদের ঘরের মতোই অন্ধকার। মিথ্যা শালীনতা ও মানসিক দুর্নীতির একটা শ্বাসরোধকারী মিশ্রিত গন্ধে মাথা ঘোরে, দম বন্ধ হইয়া আসে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সে তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া দেখিয়া লইল—তাহার সেই

অর্ধনিমীলিত চোখের পল্লবের আড়ালে পুরুষ চিনিতে সুদক্ষা কোনও নারীর দৃষ্টি।

আমার নমস্কারে প্রতি-নমস্কার জানাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ফরাসী ভাষায় কথা বলেন?" বলিল এমন অভিনেত্রীর মত, রানীর ভূমিকায় অভিনয় করার দিন যাহার বহু আগেই ফুরাইয়া গিয়াছে।

"না, আমি শুধু সত্যের ভাষায়ই কথা বলি।" আমি জবাব দিলাম।

"সত্যের কী প্রয়োজন?" কাঁধ দুটিতে একটু ঝাঁকুনি দিয়া সে বলিল: "কে শোনে? সত্য কেউ পছন্দ করে না—এমন কি সুন্দর সুন্দর কবিতাতেও না।".

সে উঠিয়া জানালার কাছে গেল, পর্দার ভিতর দিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল।

"দেখছি, রাস্তায় ওরা এখনও ঐসব চালাচ্ছে।" বিরক্তির সাথে সে বলিল "কী চায় ওরা? ছেলেমানুষের মতো। সত্যি আমি বুঝতে পারিনে ওদের। প্রজাতন্ত্র পেয়েছে ওরা, আর পেয়েছে এমন মন্ত্রীমণ্ডলী যার মতো আর কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না। এমন কি মন্ত্রীদের একজন আবার সোশ্যালিস্ট। খুশি হতে লোকের আর এর চেয়ে বেশি কি লাগে বলুন।..."

মাথা দোলাইয়া সে আবার বলিল, "তাই নয় কি? যাক্ গে, আপনি কি বলতে এসেছেন বলুন।"

সে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিল ও কপট আদরের দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ

"কি নিয়ে আমরা আলোচনা করব? প্রেম? কাব্য? হায়-রে আমার আলফ্রেদ দ্য মুসে!...হায় আমার লেক'ৎ দ্য লীল!...রস্তাঁদ!" তাহার চোখদুটি ঘুরিয়া ভুরুতে ঠেকিল কিন্তু মাথার উপর জার্মানটির দাঁত দেখিয়া চোখদুটি আবার তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল।

সে কবিদের বিষয় লইয়া বক্‌বক্ করিয়া যাইতে লাগিল। আমি বাধা দিলাম না, শুধু সে কখন ব্যাংকারদের সম্পর্কে বলিতে আরম্ভ করে তাহার অপেক্ষায় রহিলাম।

যে নারীর মূর্তি একদিন পৃথিবীর প্রত্যেক বীর যোদ্ধা বুকের মধ্যে বহিয়া বেড়াইতেন, সেই নারীর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। তাহার মুখখানি অতি-প্রেমিকা নারীর অসুস্থ মুখের মত। সে উজ্জ্বল বর্ণ আর নাই, হাজার হাজার চুম্বনে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। সুনিপুণ প্রসাধনে তৈরী চোখদুটি এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, শ্রান্তভাবে নামিয়া আসিয়াছে চোখের পক্ষ্ম, স্ফীত পল্লব দুটিকে ঢাকিয়া। ঘাড়ের ও কপালের দুইপাশের বলিরেখা বুকের উদ্দাম কামনার নীরব সাক্ষ্য; ফুলিয়া-ওঠা গলা ও চিবুকে মেদবহুল অধঃপতনের পরিচয়। থলথলে ও ভারী হইয়া উঠিয়াছে সে। স্পষ্ট বুঝা যায়, অন্তরের উদাত্ত কাব্য অপেক্ষা উদরের কাব্যই তাহার নিকট প্রিয়তর; সত্য ও স্বাধীনতার আহ্বানের চেয়ে জঠরের স্থূল আহ্বানেই সে সাড়া দেয় বেশী। অথচ এই সত্য ও স্বাধীনতা একদিন তাহারই

মুখ দিয়া সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহার সে সৌন্দর্য ও কমনীয়তার কিছুই অবশিষ্ট নাই। দুনিয়ার বাজারের এই পসারিণীর আজ আছে শুধু গণিকাসুলভ চটক। মানুষের সুখের জন্য সংগ্রামরত সেই বীরাঙ্গনার কমনীয় সৌন্দর্যের স্থানে আসিয়াছে সহস্র সহস্র উদ্দাম রাত্রির বয়ীয়সী নায়িকার নাক্কারজনক ছলাকলা।

ভারী কালো ফ্রক ছিল তার পরনে। তাহাতে যে লেস লাগানো ছিল তাহা দেখিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল নিউইয়র্কের 'স্বাধীনতামূর্তি'টির কলঙ্ক-চিহ্নের কথা। সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সমবেদনার যে জীর্ণবস্ত্র ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়াছে ফ্রকটি দেখিয়া তাহার কথাও মনে পড়িতেছিল।

ক্লান্ত ছিল তাহার কণ্ঠস্বর। মনে হইতেছিল, সে এমন কিছু ভুলিতে চাহিতেছে গুরুত্বে ও আন্তরিকতায় যাহা মূল্যবান, যাহা মাঝে মাঝে তখনও তাহার শীতল ভগ্ন হৃদয়ে স্মৃতির সূঁচ ফুটাইতেছিল। কিন্তু সে হৃদয়ে তখন আর নিঃস্বার্থ আবেগের কোনো স্থান ছিল না—

আত্মার এই করুণ মৃত্যুযন্ত্রণা চোখে দেখিয়া তীব্র বেদনার একটা আর্তনাদ আমার গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছিল। আমি বহু কষ্টে উহা চাপিয়া নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম নিজেকেঃ 'এই কি ফ্রান্স! এই কি সেই বিশ্বের নায়িকা কল্পনায় যাহাকে চিরদিন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জ্বলন্ত চিন্তাশিখার মহীয়সী মূর্তিরূপেই কল্পনা করিয়া আসিয়াছি?'

"সাথী হিসাবে আপনি তো মোটেই ফুর্তিবাজ নন।"—ক্লান্ত হাসি হাসিয়া বলিল সে।

আমি উত্তর দিলাম, "কোনো সৎ রাশিয়ানই আজ ফ্রান্সের অতিথি হয়ে ফুর্তি অনুভব করতে যাবে না, মাদাম।"

বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া একটু কৃত্রিম হাসি হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কেন? আমার প্যারিসে প্রত্যেকেই ফুর্তিবাজ,...প্রত্যেকেই এবং সব সময়েই!"

"এইমাত্র রাস্তায় যা দেখলাম আমার দেশ রাশিয়াতেও আপনি এই ফুর্তি দেখতে পাবেন। সৈন্যে আর জনতায় এই ধরনের রক্তের খেলা আমাদের রাশিয়ার জারও ভারী পছন্দ করেন—আপনারই তো বন্ধু তিনি...।"

"কী গম্ভীর লোক আপনি!" —বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া সে বলিয়া উঠিল। "রাজার যা কিছু আছে সব তাদের দিতে হবে বলে যখন জনসাধারণ দাবি করে, তখন যতটুকু তিনি দিতে পারেন তাও তাঁর দেওয়া উচিত নয়। রাজারা চিরদিনই এই মতই পোষণ করে এসেছেন, এখন অন্য মত পোষণ করার কোন কারণ নেই। জীবনটাকে আপনার আরও সহজভাবে দেখা উচিত। আপনি তো এখনও বুড়ো হন নি, তবে ভেঙে পড়ছেন কেন? মানুষের যখন ভালবাসার ক্ষমতা থাকে তখন জীবনটা সত্যিই চমৎকার। এই ধরুন আপনাদের দ্বিতীয় নিকোলাস—কিভাবে বলব কথাটা?—খারাপ লোকের প্রভাবে তিনি অবশ্য অত্যন্ত সহজেই পড়ে যান,

কিন্তু সত্যি কথা বলতে লোকটা ততো খারাপ না।...যা হোক স্বাধীনতা তো তিনি আপনাদের দিয়েছেন। দেন নি?..."

"হাজার হাজার জীবনের বিনিময়ে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি এইটুকু। ...ছিনিয়ে আনা হয়েছে বলে আজও তিনি এর দাম হিসাবে আরও বেশী করে রক্ত চাইছেন। চাপে পড়ে যা দিতে হয়েছে তাঁকে, তিনি তা ফিরিয়ে নিতে চায়। আর সে ব্যাপারে আপনি—আপনিই তো টাকা দিয়ে তার জোর বাড়িয়ে দিচ্ছেন।...

"না, না।" প্রতিবাদ করিল সে। "আমার কথা বিশ্বাস করুন, ফিরিয়ে নেবেন না তিনি। তিনি ভদ্রলোক ও কথা-রাখা লোক। আমি জানি. .।"

"আপনি কি বুঝতে পারেন যে আপনি তাকে টাকা দিয়েছেন হত্যার জন্য?" —আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

মাথাটি সে ছায়ার মধ্যে টানিয়া লইল। কালো মুখখানি আর দেখা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে বলিলঃ

"না দিয়ে আমি পারি নি। ঐ মুখটা যখন আমার মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া ঠিক করেছে, তখন একমাত্র নিকোলাসই আমাকে সাহায্য করতে পারে।"

আঙুল দিয়া সে ছাদের দিক দেখাইল। সেখানে জার্মানটির সাজানো দাঁত-গুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

"সত্যি কথা বলতে, ঐ সর্বগ্রাসী জঠরটাই আমাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। কিন্তু কি করা যায় বলুন? তাছাড়া সব বিকৃতিই তো একেবারে খারাপ নয়।..."

"যে বাহু কাঁধ পর্যন্ত নররক্তে নিমজ্জিত সেই বাহুতে হেলান দিতে আপনার মনে কি কোন বিতৃষ্ণাই জাগে না?"

"কিন্তু যদি অন্য কোনো বাহু না থাকে? জনতার রক্তে রঞ্জিত নয় এমন রাজবাহু পাওয়া খুবই শক্ত। আজ যাঁরা এইরকম কাল তাঁরা কি হয়ে দাঁড়াবেন? আমি নারী, একজন বন্ধু চাই আমি। প্রজাতন্ত্র ও এশীয় স্বৈরতন্ত্র বন্ধুরূপে হাত ধরাধরি করে চলবে—এতে নতুনত্ব থাকলেও খুব একটা দেখবার মতো দৃশ্য নয়। কি বলেন? কিন্তু রাজনীতি আপনি বোঝেন না। কোনো কবি...কোনো বিপ্লবীই বোঝে না। রাজনীতিতে সৌন্দর্যের স্থান নেই। রাজনীতি শুধু জঠরের জন্য, আর যে মন জঠরের অনুগত ভৃত্য তার জন্য।..."

"কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারেন না যে স্বর্ণমুদ্রার সাথে সাথে জার-কে আপনি ফ্রান্সের মহিমাও দিয়ে দিয়েছেন?"

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে আমার দিকে চাহিল, তারপর হাসিয়া জিহ্বার তীক্ষ্ম ডগাটি দিয়া রংমাখানো ঠোঁট দু'টি একবার চাটিয়া লইল।

"আপনি কবি ছাড়া আর কিছুই নন! কাব্য এখন অচল, বন্ধু! এমন এক কঠিন যুগে আমরা বাস করছি যখন নিশ্চয়ই কবিতা লেখা চলে, কিন্তু সব কিছুতেই কাব্যিক হয়ে ওঠা আর কিছু না হোক অন্তত ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় নয়।"

তাহার মুখে দম্ভের হাসি ফুটিয়া উঠিল। "মনে হচ্ছে, আমার শাইলকেরা

বেশ ভাল কাজ-কারবারই করেছে। সুদ বাবদ তো[illegible] জারকে গায়ের চামড়ার তিন ভাগের একভাগ তুলে দিতে হবে!"

"কিন্তু এই সুদ দিতে জার যে তাঁর প্রজাদের গায়ের পুরো চামড়াটাই তুলে নেবেন।"

"সেটা অবশ্য খুবই সম্ভব। কিন্তু উপায় কি?"—কাঁধ দুটি একটু ঝাঁকুনি দিয়া প্রশ্ন করিল সে। "রাজনীতি করেন সরকার। জনসাধারণ তার মূল্য দেয় পরিশ্রম ও রক্ত দিয়ে। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। তাছাড়া, আমি প্রজাতন্ত্র আমার ব্যাঙ্কারদের কাজকর্মের স্বাধীনতায় তো আমি বাধা দিতে পারিনে। এটা যে খুবই স্বাভাবিক তা কেবল সোশ্যালিস্টরাই বুঝতে পারে না। ব্যাপারটা এতো সোজা! সাধারণ বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজেকে বিব্রত করছেন কেন? আমার শাইলকেরা তো অনেক দিয়েছে, আরও অনেক দেবে অন্তত কিছুটা ফিরে পাবার জন্য।...সত্যি কথা বলতে, তারা খুবই বিপন্ন অবস্থায় আছে।..যদি জার জিততে না পারেন, যদি..."

যাহা তাহাকে মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছে তাহার নাম উল্লেখ করিতে সে ভয় পাইল।

"......আমার ব্যাঙ্কাররা হয়তো পথের ভিখারী হয়ে যাবে।...আর যদি জার জেতেন, তাহলেও সুদের টাকাটা তারা খুব তাড়াতাড়ি পাবে বলে মনে হয় না।... তারা কি আমার সন্তান নয়?......রাষ্ট্রের ইমারতে ধনীরাই সবচেয়ে শক্ত পাথর।...তারাই এর বনিয়াদ। কবিরা শুধু অলংকার, উপরের সামান্য সাজসজ্জা। ...তাদের না হলেও চলে। তাদের দ্বারা ইমারতের শক্তি বৃদ্ধি হয় না।......জন-সাধারণ তো শুধু জমি মাত্র, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ। বিপ্লবীরা উন্মাদ ছাড়া কিছুই নয়।...আর এই উপমা অনুসারেই বলা যায় সেনাবাহিনী হচ্ছে একপাল শিকারী কুকুর, সম্পত্তি ও বাড়ীর বাসিন্দাদের শান্তিরক্ষা করাই যাদের কাজ।..."

"বাড়ীর বাসিন্দা তো শাইলকেরা?"

"তাঁরা এবং যাঁরা এ বাড়ীতে আরামে থাকেন এমন সবাই। কিন্তু ওকথা থাক। রাজনীতি যখন লাভের হয় না, তখনই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে মাথা নত করিলাম।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?"—নিরাসক্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল।

"এ স্থান আমার উপযুক্ত নয়।"—এই বলিয়া আমি জারের ও ব্যাঙ্কারদের দালালীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

যাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম তাহাকে দেখিতে পাইলাম না; দেখিলাম শুধু একজন ভীরু, হৃদয়হীন, ছলকলাবিলাসিনী গণিকাকে, টাকার জন্য চোর ও জল্লাদদের কাছে আত্মবিক্রয় করিতে যাহার বিবেক এতটুকু দুলিয়া ওঠে না।

প্যারিসের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। ভাড়াটে সৈন্যরা, লালসাময়ী বৃদ্ধা ডাকিনীর কুকুরেরা, আজ এই মহান নগরীকে কামানে-সঙ্গীনে বন্দিনী করিয়াছে। দেখিলাম রাস্তার নানা কোণ হইতে ফরাসীরা উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

সত্য ও স্বাধীনতার এই ছায়া-অনুচরেরা নিঃশব্দে শত্রুর শক্তি মাপিয়া লইতেছে। প্রজাতন্ত্রের মুখের এই কলঙ্কের দাগ বুকের রক্ত দিয়া মুছিয়া দিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত।...অনুভব করিলাম, তাহাদের বুকের গভীরে আবার দুর্জয় শক্তি নিয়া জাগিয়া উঠিতেছে প্রাচীন ফ্রান্সের আত্মা, ভলতেয়ার ও হুগোর মহাজননীর আত্মা, জাগিয়া উঠিতেছে সেই ফ্রান্স যাহার কবি ও যোদ্ধা সন্তানদের কণ্ঠস্বর একদিন দিকে দিকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল স্বাধীনতার রেণু ও বীজ।

প্যারিসের রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে অন্তরে আমার বন্দনা গান রচনা করিলাম সেই ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাহার সহিত অন্ধকার ঘরে বসিয়া আমি কথা বলিয়া আসিলাম। জীবনের প্রভাতকালে সমস্ত হৃদয় দিয়া কে না তোমাকে ভালবাসিয়াছে?

যৌবনে যখন অন্তর সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার দেবীর পদমূলে ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে, হে মহীয়সী ফ্রান্স, হৃদয় তো তোমাকে ছাড়া অন্য কোন মন্দির খুঁজিয়া পায় নাই!

ফ্রান্স! স্বচ্ছ সরলপ্রাণ, দুঃসাহসী প্রত্যেক মানুষের কাণে একদিন তোমার নাম ছিল প্রেয়সী বধূর নামের মত। কত যে মহিমাময় দিন আসিয়াছিল তোমার জীবনে তার সংখ্যা নাই। তোমার সংগ্রাম ছিল জাতির মহোৎসব, তোমার দুঃখ-পরাভব হইতে পরম শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার সংগ্রামের মধ্যে ছিল কী সৌন্দর্য, কী শক্তি! স্বাধীনতাকে বিজয়িনী করার জন্য কত পবিত্র রক্তই না ঢালিয়াছ তুমি মুক্তধারার মত। তোমার সে-রক্ত কি চিরদিনের জন্য মুছিয়া গিয়াছে? তাও কি সম্ভব?

ফ্রান্স! তুমি ছিলে সারা বিশ্বের মহামন্দির। একদিন এই মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা ন্যায়ের ঘণ্টাটিতে তিনটি আঘাত সারা বিশ্বে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশে দেশে মানুষকে জড়নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়াছিল—স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী!

তোমার সন্তান ছিলেন ভলতেয়ার। শয়তানের মত মুখ লইয়া চিরজীবন তিনি দানবের মত সংগ্রাম করিয়া গেলেন সমস্ত হীনতা, ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে। কী শক্তিই না ছিল তাঁর বিদ্রূপের বিষে! হাজার হাজার কেতাব গিলিয়া যাঁহাদের পাকস্থলীর এতটুকু ক্ষতি হয় নাই, সেই সব পাদ্রীরা ভলতেয়ারের গ্রন্থের একটি পাতার বিষে শেষ হইয়া গেলেন। মিথ্যার রক্ষাকর্তা রাজাদের পর্যন্ত তিনি সত্যকে সম্মান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মিথ্যার মুখে তাঁহার চপেটাঘাত শক্তি ও দুঃসাহসে অতুলনীয়। দুঃখ করো, ফ্রান্স, তিনি আর বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া থাকিলে তোমাকে তিনি ভাল শিক্ষাই দিতে পারিতেন। অপরাধ নিও না, ভলতেয়ারের মত সন্তানের হাতের চড় খাওয়া আজ তোমার মত মায়ের পক্ষে গৌরবের কথা হইত।

তোমার মহিমামুকুটের শ্রেষ্ঠ মণি ছিলেন তোমারই পুত্র হুগো। তিনি ছিলেন বিচারক ও কবি। তাঁহার বজ্র গর্জন ঝড়ের মত বেগে ফিরিয়াছিল পৃথিবীর বুকে, উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল মানুষের যা কিছু সুন্দর সব কিছুকেই। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের স্পর্শে সর্বত্র জাগিয়াছিল বীরের দল—সুন্দর মুখে আনন্দের হাসি, অকপট দুই চোখে সত্য ও সাধুতার জয়ের আশা, হাতে স্বাধীনতার পতাকা লইয়া

জাতির মিছিলের সম্মুখে অগ্রসরমান তোমার আহ্বানে একদিন যেমন জাগিয়াছিল বীরের দল। জীবন, সৌন্দর্য, সত্য ও ফ্রান্সকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছিলেন হ্যুগো। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, তিনি আজ বাঁচিয়া নাই। পক্ককেশ বৃদ্ধ হইয়াও তিনি তরুণের মত ফ্রান্সকে ভালবাসিতেন, আবার সেই ফ্রান্সের অপরাধকেও তিনি ক্ষমা করিতেন না।

সৌন্দর্যদেবীর একনিষ্ঠ উপাসক ফ্লবেয়ার। এই কথার যাদুকরই সমস্ত দেশের লোকদের শিখাইয়াছিলেন লেখনীর শক্তিকে সম্মান করিতে ও লেখনীর সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিতে। রাস্তার কাদা ও এক টুকরা দামী লেসের উপর সূর্যের আলো যেমন সমানভাবে পড়ে তেমনই বস্তু-নিরপেক্ষ ছিল তাঁর দক্ষতা। সৌন্দর্যের মধ্যেই সত্য ও সত্যের মধ্যেই সৌন্দর্য ছিল যাঁহার বাণী ও বিশ্বাস সেই ফ্লবেয়ারও তোমার লালসাকে ক্ষমা করিতেন না এবং তোমার পানে চাহিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতেন।

তোমার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্তানই তোমার বিরুদ্ধে। তোমার কলঙ্কের লজ্জায় তাঁহারা আঁখি নত করিয়া আছেন, ব্যাংকারদের রক্ষিতার নির্লজ্জ মুখখানি তাঁহারা দেখিতে চাহেন না। আজ তুমি ঘৃণিত বেশ্যায় পরিণত হইয়াছ। যাহারা একদিন তোমার কাছেই শিখিয়াছিল সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে, আজ তুমি তাহাদের নিকট দুর্বোধ্য। অন্তরে যন্ত্রণা লইয়া তাহারা তোমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে।

ফ্রান্স! সোনার লালসা তোমাকে কলুষিত করিয়াছে, ব্যাংকারদের সহবাস তোমার মনকে করিয়াছে বিকৃত। সে মনের আগুন নিভাইয়াছে আবর্জনা চাপা দিয়া।

স্বাধীনতার মাতা তুমি, তুমিই জোয়ান অব আর্ক। অথচ মানুষকে পিষিয়া মারিবার জন্য তুমিই হিংস্র পশুদের দিয়াছ শক্তি।

হে মহীয়সী ফ্রান্স! একদিন তুমিই ছিলে জগতের সংস্কৃতির নেত্রী। আজ তোমার কীর্তি তোমাকে অধঃপতনের কোন অতলে নামাইয়াছে ভাবিয়া দেখ!

একটা সারা জাতির স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করিয়া আছে তোমার হাত। যদি একদিনের জন্যও হয়, তবু এ-পাপ তোমার কমিবে না। অন্তত একদিনের জন্যও তুমি স্বাধীনতার দিকে পদক্ষেপকে বাধা দিলে। তোমার সোনা আজ আবার রুশিয়ার মানুষের রক্ত বহাইবে।

এই রক্ত যেন তোমার রং-করা মুখের লোল কপোল দুইটিকে চিরন্তন লজ্জার রক্তিমাভায় রাঙাইয়া তুলিতে পারে।

হে প্রেয়সী! রক্ত ও পিত্তে মেশানো একদলা থুথু আমি তোমার চোখে দি।

নিউইয়র্ক, মে মাস, ১৯০৬

॥ মঃ জে. রিশার, জুল ক্লেয়ার্তি, রেনে ভিভিয়ানি প্রমুখ ফরাসী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি ॥

ভদ্রমহোদয়গণ,

রক্তাক্ত প্রতিহিংসা, সামরিক আদালতে বিচার, যত প্রকারের নৃশংসতা কল্পনা করা যায় সব কিছু রাশিয়ার বুকে অনুষ্ঠিত করার জন্য ফরাসী সরকার ও ফ্রান্সের ধনকুবেরের দল নিকোলাই রোমানভকে যে ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে, সে সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া আপনাদের মসীকূপ হইতে যে কথার ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলাম। আমার বিরুদ্ধে আপনারা যে প্রতিবাদগুলি তুলিয়াছেন তাহাও দেখিলাম। আপনাদের অভিনন্দন জানাইতে পারিলাম না।

তথাকথিত রুশ-সরকারের সহিত মিতালিতে আপনাদের উপকার হইতেছে। কসাকেরা মেয়েদের সহিত যে আচরণ করে, যুক্তি, সত্য ও মহিয়সী ফরাসী ভাষাকে লইয়া আপনারা তাহাই করিতেছেন। স্বেচ্ছাচার যে এত বীভৎস, তাহার অন্যতম কারণ, উদ্বেগহীন, উদাসীন দর্শকেরও মন ও মস্তিষ্ককে সে বিকৃত করিয়া তোলে। আপনাদের বেলাতেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।

ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব আমি দিই না। সে আক্রমণ যত রূঢ় হয়, তত দ্রুত তাহার স্মৃতি মুছিয়া যায়। কিন্তু আপনারা আমার বিরুদ্ধে কৃতঘ্নতার অভিযোগ আনিয়াছেন। তাই, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না।

আপনারা বলিতেছেন : "গর্কি যখন জেলে ছিলেন আমরা তখন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলাম, কিন্তু তবুও তিনি........."

প্রসঙ্গত আমি আপনাদের একটি সদুপদেশ দিতে চাই: ভুল করিয়া অথবা অন্য কোন কারণে যদি একবার নিজেদের মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন, তবে তাহা লইয়া দম্ভ করিয়া বেড়াইবেন না। উহা শোভন নহে......

"আমি তোমার উপকার করিয়াছিলাম, অতএব, তোমার উচিত কৃতজ্ঞতা দিয়া আমার ঋণ শোধ করা"—আপনারা এই কথাই বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ নাই। আমি মনে করি, আপনাদের এই করুণা ভুল বোঝার ফল।

আমাকে শহীদ ও নির্যাতিত বানাইবার জন্য আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। আমি শহীদ নই, নির্যাতিতও নই। আমি সামান্য মানুষ, আমার সামান্য কাজ আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই করিয়া থাকি এবং এই কাজে আমি পরিপূর্ণ সন্তোষ লাভ করি। এই কাজের জন্য মাঝে মাঝে অল্পকালের জন্য আমাকে জেলে থাকিতে হইয়াছে। সেখানে নির্যাতন হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ কোন কষ্টই হয় নাই; স্বাভাবিক শ্রান্তি হইতে কিছুটা বিশ্রাম হইয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে আপনাদের উচিত আমার কারাবাস যাহাতে আরও ঘন ঘন ও দীর্ঘ হইতে পারে তাহারই কামনা করা। এই কারাবাসের বিরুদ্ধে আপনারা যখন প্রতিবাদ জানান তখন, মার্জনা করিবেন, আমার হাসি পায়।

কারণ, আমরা যে শত্রু, আপোষহীন শত্রু, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। যে লেখকের কপটতা নাই, সে চিরদিনই সমাজের শত্রু এবং আরও বেশী শত্রু তাহাদের, যাহারা বর্তমানে সমাজসংস্থার মূল দুইটি স্তম্ভ, লোভ ও হিংসাকে সমর্থন করে ও বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। আপনারা আরও বলিয়াছেন, "গার্কিকে আমরা ভালোবাসি, তবু তিনি......"

আজ একটি সত্য কথা আপনাদের বলি : আমি সোশ্যালিস্ট, বুর্জোয়ার ভালোবাসা আমার পক্ষে অসহ্য অপমান!

আমি আশা করি, আমার এই কয়টি কথা চিরকালের জন্য আমাদের সম্পর্কের একটি নির্ভুল সংজ্ঞা হইয়া থাকিবে।

এম. গর্কি

॥ 'ফরেন ক্রনিক্‌ল্‌' হইতে ॥

শুধু চীন নয়, সমগ্র এশিয়াই 'শ্বেত আতঙ্ক' সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠিতেছে। বৃটেনের কঠোর শাসন হ   তের জাতীয় মুক্তি আন্দো   কী দ্রুত ব্যাপ্ত হইতেছে, দেখুন।

'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজি' পত্রিকায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। কৃষ্ণবর্মা নামে একজন জাতীয়তাবাদী প্যারিস হইতে এই পত্রিকা-খানি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণবর্মাকে ভারতীয়েরা মাৎসিনির সহিত তুলনা করিতে ভালোবাসেন এবং মনে করেন গারিবল্ডির ভবিষ্যতের সহিত ইঁহার ভবিষ্যতও মিলিয়া যাইবে। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি বক্তৃতা পত্রিকাখানিতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হার্ডিঞ্জ বলিতেছেন, "আমার বিশ্বাস ভারতের জনসাধারণ মনেপ্রাণে আইনের অনুগত। নয়দিন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আমাদের মধ্যে কাটাইয়া গেলেন। এই নয়দিনে দিন দিন উদ্দীপনা বাড়িতে বাড়িতে শেষে একটা চমৎকার চরমে পৌঁছিয়াছিল। আমি বহু রাজধানীতে গিয়াছি, কিন্তু কলিকাতায় যে আনন্দের স্রোত দেখিয়াছি তাহা আর কোথাও দেখি নাই। আমার মনে হয়, এই রাজকীয় সফর কলিকাতা ও সারা বাংলার জনসাধারণের মনে আশা ও বিশ্বাসের এমন একটি নূতন স্রোত আনিয়া দিয়াছে যাহার সুফল ফলিবেই। গত কয় বৎসরে দিগন্তে সন্দেহের যে কালো মেঘ জমিয়াছিল, এই সফরের ফলে ইতিমধ্যেই তাহা উড়িয়া গিয়াছে।"

কিন্তু এই আশাভরা বক্তৃতার পরই কৃষ্ণবর্মা তাঁহার কলিকাতার সংবাদদাতার প্রেরিত একটি খবর ছাপিয়াছেন। হার্ডিঞ্জ বক্তৃতাটি কলিকাতাতেই দিয়াছিলেন।

"গত সপ্তাহে বড়লাটের ঢাকা সফরকালে চরম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

অবলম্বন করা হইয়াছিল। (ঢাকা হইতে ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে।) বড়লাট যতক্ষণ ধরিয়া গিয়াছেন সেই দুই ঘণ্টা ছাপানো অনুমতিপত্র ছাড়া কাহাকেও বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই।"

যে 'বিশ্বাসের আবহাওয়া'কে পুলিশী ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত করিতে হয় সে আবহাওয়াও ভাল আবহাওয়া নহে। এমন কি রাশিয়াতেও এ আবহাওয়ার সংগে আমাদের

কৃষ্ণবর্মা লিখিতেছেন, "বৃটেন, দুশো জনসাধারণকে গিলিয়া খাইয়া তুমি প্রাচীন রোমের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছ। ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তোমার ভাগ্যেও যে তাহাই ঘটিবে এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকিতে পার।"

ভারত হইতে ক্রমেই বেশী করিয়া বহুকণ্ঠে এই ঘোষণাই জোরের সহিত কাক্ত হইতেছে যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠনের কাজ ভারতীয়দের নিজেদের হাতে লইবার সময় হইয়াছে এবং গংগাতীরে বৃটিশ শাসনের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে।

জাতীয়তাবাদী সাভারকরের বিরুদ্ধে ভারত সরকার যে দমননীতি চালাইতেছেন, এই শাসনব্যবস্থার স্বরূপ তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানি গোপনে তাঁহার বিচার করা হয়, তাঁহার বিচারের সংবাদ বাহিরে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাকে ৪৮ বৎসর অর্থাৎ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়। স্ত্রীর নিকট তাঁহাকে বছরে মাত্র একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে দেওয়া হয়।

বৃটিশের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য লইয়া যাঁহারা গর্ব করেন ব্যাপারটি তাঁহাদের পক্ষে এত অগৌরবের যে আপনা হইতেই মনে পড়িতেছে একটি রাশিয়ান মামলার কথা,—এন, জি, চের্নিশেভস্কির কথা।*

রাজা জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময় বরোদার গায়কোয়াড় একটু স্বাধীনভাবে চলিতে চাহিয়াছিলেন।

মাত্র এইটুকুর জন্যই বৃটিশ রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে স্বার্থপরতা, বাগাড়ম্বর প্রভৃতি দুষ্কৃতির অভিযোগ আনিতে থাকেন।

প্রভাবশালী পত্রিকা 'ডেইলী এক্সপ্রেস্' লিখিলেন যে, বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল বলিয়া ভারত সরকার অনেকদিন হইতে বরোদা রাজ্যকে সন্দেহ করিয়া আসিতেছেন, এবং ইউরোপে বেসরকারী সফরকালে গায়কোয়াড় নিজে প্রায়ই বিপ্লবী কৃষ্ণবর্মার সহিত যোগাযোগ রাখেন। আরও এক ধাপ বেশী গেল 'ডেইলী এক্সপ্রেস্'। সে গায়কোয়াড়ের পদচ্যুতি দাবি করিল। ভয় পাইয়া মহারাজা তারযোগে 'টাইম্স্' পত্রিকাকে জানাইলেন, ১৯০৭ সালে কৃষ্ণবর্মা ইংলণ্ড ছাড়িবার পর কৃষ্ণবর্মার সহিত আর তাঁহার দেখা হয় নাই।

* বিখ্যাত রুশ পণ্ডিত, লেখক, সমালোচক ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক এন, জি, চের্নিশেভস্কিকে কৃষকদের বিদ্রোহ করিতে আহ্বান জানাইয়া বিপ্লবী ঘোষণাবাণী রচনার অভিযোগে জার সরকার অভিযুক্ত করেন। তিনি বিশ বৎসরেরও অধিক কাল জেলে কাটান ও নির্বাসনে কয়েদীর জীবনযাপন করেন।

ইহাই হইল ভারতীয়দের ও বৃটিশদের মধ্যেকার 'রাজনৈতিক' সম্পর্ক। শ্রদ্ধেয় সোশ্যালিস্ট কিয়ের হার্ডির সফর ভারতীয়দের ভয়াবহ অবস্থা ও বৃটিশ শাসনের স্বেচ্ছাচারিতার মুখোস উন্মোচন করিয়া আগুনে ঘি ঢালা ছাড়া কিছুই করিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, সোশ্যালিস্ট ছাড়াও ইংলন্ডে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা চান ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই প্রবল হইতেছে, কিছুতেই তাঁহারা নিরস্ত হইতেছেন না। অনেকে আশা করেন, ভারত সরকার যখন বুঝিবেন রাষ্ট্রের স্বার্থে কিছুটা ছাড়িয়া দেওয়া একান্তই প্রয়োজন, তখন কিছুটা ছাড়িয়া দিবার মত বুদ্ধি তাঁহাদের আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে যখন মুক্তিসংগ্রামের জন্য ভারতীয়েরা নিজেদের সংগঠিত করিয়া তুলিতেছে তখন বৃটিশ পুঁজিবাদসৃষ্ট অবস্থার ফলে তাহারা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় নির্মূল হইতেছে। ভারতে সিল্ক ও কার্পেটের কারখানায় ও তামাকের ক্ষেতে প্রধানত মেয়েরাই কাজ করে। পুঁজিবাদের হাতে সেখানে তাহারা বাস্তবিক-পক্ষে জীবনের উন্মেষকালেই হাজারে হাজারে শেষ হইয়া যাইতেছে। ভারত সরকার কর্তৃক সবেমাত্র গৃহীত আদমসুমারী হইতেই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি স্পষ্ট হইয়া উঠে।

সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধ ও শিশুর সংখ্যা প্রায় স্বাভাবিক অর্থাৎ পুরুষদের বৃদ্ধ ও শিশুর সমসংখ্যক। কিন্তু মধ্য-বয়সের কোঠায় এই সংখ্যা খুবই কম। পূর্বভারতে পাঁচ বছরের নীচু বয়সের ৪৩,০০০,০০০ জনের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ৬৯০,০০০ বেশী। কিন্তু দশ হইতে বার বৎসর বয়স্কদের মধ্যে ১৮,৫০০,০০০ ছেলে ও মাত্র ১৫,২০০,০০০ জন মেয়ে। সবচেয়ে বড় প্রদেশগুলির একটি হইল পাঞ্জাব। এখানে ১৯১০ সালের ১০ই মার্চ অর্থাৎ লোকগণনার দিনে পুরুষের সংখ্যা ১৩,৩১৪,৯১৭ ও মেয়েদের সংখ্যা মাত্র ১০,৮৭২,৭৬৫। এখান হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় হয় যে, প্রত্যেক পঞ্চম পুরুষের অবিবাহিত থাকিতে হইবে। একটা জাতি এইভাবে ধ্বংস হইতেছে।

সংখ্যাতত্ত্ব কমিশনের সভাপতি মিঃ গেট এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, নারী-পুরুষের জন্মকালীন সংখ্যা-অনুপাত ইউরোপ অপেক্ষা বেশী পৃথক নহে, কিন্তু পরবর্তী অবস্থা কায়িক পরিশ্রমে জীবনধারিণী নারীদের পক্ষে খুবই প্রতিকূল এবং দেশের পক্ষে ইহা এক গুরুতর সামাজিক বিপদ।

আমেরিকাতেও পুঁজিবাদের কল্যাণে ঠিক এই ধরনের ঘটনা চোখে পড়ে। মেইন, ইন্ডিয়ানা, ওহিও ও অন্যান্য রাষ্ট্রে পৃথক করিয়া রাখা ইন্ডিয়ানরা অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চল ছাড়িয়া বাহিরে আসা যাহাদের নিষিদ্ধ, তাহারা দ্রুত নির্মূল হইয়া যাইতেছে এবং মার্কিন সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার কোন ঝোঁক তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। অন্য ইন্ডিয়ানরা কঠিন উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ সাস্‌কাচুয়ান, প্রিন্স অব ওয়েলস দ্বীপ ও আলাস্কায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে এবং তাহারাও এই একইভাবে নির্মূল হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু 'অসভ্যদের মনে সংস্কৃতিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইবার' সমস্ত আশা বিফল হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বহু পূর্বেই এই সমস্যাটিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এখন 'বর্ণসমস্যা' লইয়া ব্যস্ত।

১৮৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মোট সংখ্যা ছিল ২৩,০০০,০০০; ইহার মধ্যে নিগ্রো ছিল ৪,০০০,০০০। ১৯১০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৯২,০০০,০০০; নিগ্রোদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০,০০০,০০০। মনে রাখিতে হইবে. এই ৬০ বছরে আমেরিকায় আসিয়াছিল প্রায় ১ কোটি নিগ্রো। হয় আনীত হইয়াছিল, অথবা উত্তর ও দক্ষিণের যুদ্ধের ফলে স্বেচ্ছায় আসিয়াছিল। 'বর্ণসমস্যা'র একজন গবেষণাকারী পণ্ডিত ডাঃ স্তেল্‌সুলে লিখিয়াছেন যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র নিগ্রোকেই আমেরিকায় আনা হইয়াছে। গত ২৫০ বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের অবিরাম আমেরিকায় আমদানি করা হইয়াছে, সবচেয়ে পাকাপোক্ত শরীরওয়ালা লোকদেরই এ ব্যাপারে নির্বাচিত করা হইয়াছে।

এখন এই 'সবচেয়ে পাকাপোক্ত শরীরওয়ালাদের' যক্ষ্মারোগে হত্যা করা হইতেছে। অতি পরিশ্রম ও পরিশ্রমের বীভৎস অমানুষিক অবস্থার সহিত শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা মিশিয়া আবহাওয়া যক্ষ্মার অত্যন্ত অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ স্তেল্‌ৎগুলে লিখিতেছেন, "বড় বড় শহরের নিকৃষ্টতম অঞ্চলে নিগ্রোরা বাস করিতে বাধ্য হয়। প্রায়ই সেখানে জল ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদির মত জনস্বাস্থ্য রক্ষার অত্যন্ত প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিও থাকে না, যাহা না থাকিলে একজন শ্বেতাঙ্গ হিসাবে আমি কিছুতেই সেখানে বাস করিব না। জঘন্যতম পাপ, দৈহিক বিকৃতি ও নৈতিক নীচতা আমরাই নিগ্রোদের মধ্যে ঢুকাইয়া দিই। আবার আমরাই নির্লজ্জের মত বলিয়া বেড়াই নিগ্রোদের কোন যোগ্যতা নাই, ভুলিয়া যাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় শতকরা ৫০ জন শিক্ষক নিগ্রো।"

লজ্জায় অভিভূত হইয়া এই আমেরিকান বলিতেছেন, "বর্ণ ও জাতির প্রতি অসহিষ্ণুতা যথেষ্ট হইয়াছে।"

সত্যই 'যথেষ্ট' বলিবার সময় আসিয়াছে। 'পীত' ও 'কালো' উভয়ের চোখেই শ্বেতাতঙ্ক প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এতখানি মূল্য দিয়া যে-সংস্কৃতিকে আমরা গড়িয়া তুলিয়াছি তাহারা তাহার উল্টা পিঠটাই দেখিতেছে, তাহার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থের কোনও সন্ধানই তাহারা পাইতেছে না। যে-সংস্কৃতির লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যের বাঁধনে বাঁধা সেই সংস্কৃতিকে সন্দেহের চোখে দেখিবার বৈধ অধিকারই যে শুধু তাহাদের আছে তাহা নহে, অসহ্য বোঝা হিসাবে সে-সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলিয়া দিবার অধিকারও তাহাদের রহিয়াছে।

(১৯১২)

॥ "যুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি" ॥

(প্রচার-পুস্তিকাগুলির কর্মসূচীর ছক)

এই প্রচার-পুস্তিকাগুলির মূল তত্ত্বটি এইভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলীর নির্দেশে চালিত হইতেছে : ...যে অবস্থা এই বিপর্যয়কে (যুদ্ধকে) অপরিহার্য ও অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা আধুনিক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সৃষ্টি, শিল্প ও লগ্নী দুই ধরনের পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। এশিয়া ও আফ্রিকাকে দখল করিয়া ভাগ করিয়া লওয়াই যুদ্ধের মূল ও গোপন উদ্দেশ্য। ইহার মূলে প্রেরণা যোগাইতেছে লগ্নী-পুঁজির ক্ষুধা। শিল্পপুঁজি হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা শিল্প পুঁজিকে বাধ্য করিতেছে বিস্ফোরক, গোলা, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধের কাজে প্রয়োজনীয় সবচেয়ে দামী ও সবচেয়ে লাভের জিনিস তৈয়ারী করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী করিতে এশিয়া ও আফ্রিকার সীমাহীন বিস্তারকে বাঁধিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও রেলপথের যন্ত্রপাতি। ঔপনিবেশিক নীতি নূতন বাজার খোঁজার চেয়ে নূতন বাজার তৈরীই করিতে চায় বেশি।...বর্তমান বিশ্ব-বিপর্যয়ের সবচেয়ে উত্তেজনাদায়ক কারণ বলিয়া পুঁজিবাদকে ধিক্কৃত করিতে হইবে, দেখাইতে হইবে, পুঁজির উচ্ছৃংখল কার্যকলাপের মধ্যেই এই ধরনের আরও বিপর্যয়ের বীজ না থাকিয়া পারে না।

॥ শ্রমবন্ধুদের সঙ্গীত ॥

রাত্রি। তবু, দক্ষিণ ইতালীর এই অপূর্ব আকাশ এবং মাটিমায়ের অঙ্গের উষ্ণ সুরভি ও নীলাভায় মেশানো এই বাতাসের সবটুকু শুধু 'রাত্রি' কথাটির মধ্যে ধরা পড়ে না। এ আলো যেন চাঁদের সোনায় প্রতিফলিত সূর্যের আলো নয় এ আলো যেন উঠিয়া আসিতেছে মানুষের অক্লান্ত নিপুণ হাতে চষা চির-উর্বরা মাটির বুক হইতে। জলপাই গাছের রূপালী পাতার উপর হইতে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে পাথরের দেয়ালের উপর হইতে পাহাড়ের ঢালুতে। ধ্বস্ নামা বন্ধ করিবার জন্যই এই দেয়ালগুলি। এই দেয়ালগুলির জন্যই পাহাড়ের পার্শ্বদেশ সমতল ছাতের আকার ধারণ করিয়াছে। এই ছাতের উপর চলিয়াছে শস্য, শিম, আলু, কপির চাষ—মাচা উঠিয়াছে আঙুর, কমলা ও নেবু কুঞ্জের। নিপুণ বাঁধিতে কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিয়াছে মানুষ এখানে! স্বচ্ছ রূপালী আস্তরণ ভেদ করিয়া গোলাপী ও হলদে রঙের ফলগুলির গায়ের আভা বাহির হইয়া আসিতেছে, পৃথিবীকে মনে হইতেছে তারার ফুলে ভরা আকাশের মত। মনে হইতেছে, একটা মহোৎসবের জন্য চাষীরা গভীর স্নেহে ধরিত্রীকে সাজাইয়া দিয়াছে। রাত্রির বিশ্রামের পর সূর্যের সাথে সাথে সকালে উঠিয়া তাহারা 'আনন্দ-উৎসবে মাতিয়া উঠিবে'।

কোথাও এতটুকু শব্দ নাই। স্পন্দন নাই কোথাও। পৃথিবীতে কোনো কিছুই বিন্দুমাত্র নড়িতেছে না। কোনো মহাপ্রতিভাবান শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত অথবা ব্রোঞ্জ ও নীলাভ রূপার ছাঁচে ঢালা মূর্তির মত প্রকৃতি নিস্পন্দ, নীরব, নিথর। প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের এই পরিপূর্ণতার দিকে তাকাইলে মানুষের মেহনতের অনন্ত, অফুরন্ত শক্তির কথা ভাবিয়া আনন্দে মন ভরিয়া ওঠে। জগতের সব কিছু বিস্ময়ের স্রষ্টা এই মেহনতের শক্তি দেখিয়া মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়া

ওঠে যে, এমন দিন আসিবে যখন মেহনতের এই অপরাজেয় শক্তি সুদূর উত্তর অঞ্চলের মাটিকেও বাধ্য করিবে মানুষকে বছরের বারো মাস সেবা করিতে; মানুষের শ্রমশক্তিই এই অবাধ্য মাটিকে পোষমানা পশুর মত পোষ মানাইবে। পরম আনন্দেব সহিত ভাবি সেই মানুষের কথা, স্তব করি সেই মানুষকে, বিস্ময়স্রষ্টা মহাশিল্পী যে-মানুষ সন্তানসন্ততির জন্য পরমোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া চলিয়াছে।

স্মৃতির পটে ভাসিয়া উঠে বিজ্ঞানীদের মুখ ও মূর্তিগুলি।......মনে পড়ে, ডি. এন. প্রিয়ানিশ্নিকভ্ বলিয়াছিলেন কামা পাহাড়ের উপরের দিকে রহিয়াছে পটাসিয়াম। যাহাদের চোখে দেখিয়াছি, সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে তাহাদের মূর্তি। মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই সেই মহাপুরুষ আই. পি. পাভলভকে; দেখিতে পাই ১৯০৬ সালে মন্ট্রিলের গবেষণাগারে কর্মরত রাদারফোর্ডকে, এক এক করিয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠেন রুশ বিজ্ঞানীর দল; মনে পড়ে তাঁহাদের রচনাবলীর কথা। বিশ্বের বিজ্ঞানকর্মীদের চিরবর্ধমান কর্মতৎপরতা ও বিস্ময়কর সৃষ্টিপ্রতিভার এক ছবি ভাসিয়া ওঠে মানসপটে। আমরা বাস করিতেছি এমন এক যুগে, যখন উদ্দামতম কল্পনা ও একান্ত ব্যবহারিক বাস্তবতার ব্যবধান অবিশ্বাস্য দ্রুততার সহিত কমিয়া আসিতেছে।

* * *

বেশিদিনের কথা নহে। আমাদের একজন আঞ্চলিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কজ্লভের কমরেড আন্দ্রিয়েই বাখারেভ একটি চিঠিতে আমাকে দুইজন অদ্ভুত-কর্মা স্রষ্টার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের একজন হইলেন নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত আমেরিকান তরুবিজ্ঞানী লুথার বারব্যাঙ্ক ও অন্যজন আমাদের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ইভান ভ্ল্যাদিমিরোভিচ মিচুরিন। আমি এখানে কমরেড বাখারেভের চিঠির একাংশ উধৃত করিব; আশা করি তিনি এজন্য আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না।

"আমরা জানি, লুথার বারব্যাঙ্ক বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছের মিলন সংঘটনের কতকগুলি গোপন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই আবিষ্কারের সাহায্যে এমন নানা জাতের গাছ তিনি তৈয়ারী করিয়াছিলেন যেগুলি শুধু উর্বরতা, পরিবেশ-সহনক্ষমতা, সুগন্ধ এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ শক্তিতেই নহে, প্রাচুর্যের দিক হইতেও বিস্ময়কর। ইহার ফলে সমৃদ্ধ হইয়াছিল উত্তর আমেরিকার সমগ্র মহাদেশ। 'ক্যাকটাসের' কাঁটা তাড়াইয়া তিনি উহাকে খাদ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; বাদামের পাথুরে খোলাটিকে তিনি পরিণত করিয়াছিলেন পাতার মত পাতলা আবরণে। এই মহাশক্তিমান তরুবিজ্ঞানীর প্রতিভার ইহা দুইটি সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র।

"এখানে সোবিয়েত ইউনিয়নে তামবভ প্রদেশের কজলভ্ শহরের কাছে প্রাচীন পলিমাটির জমির বুকে বুনো উইলো, পপলার, মেপ্ল গাছের প্রাচুর্যের মধ্যে বর্ণসংকরস্রষ্টা উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইভান ভ্ল্যাদিমিরোভিচ মিচুরিনের ছোট্ট অথচ পরমাশ্চর্য উদ্ভিদশালাটি।

"লুথার বারব্যাংকের সৃষ্টি নাতিশীতোষ্ণ কালিফোর্নিয়ার সুসহনীয় জলবায়ুর জন্য; মিচুরিনের সৃষ্টি রাশিয়ার কেন্দ্রবেষ্টনীর দুঃসহ কঠোর জলবায়ুর জন্য।

"নানা প্রকারের ফলের গাছ সৃষ্টি করিয়াছিলেন লুথার বারব্যাংক: বারব্যাংকের সৃষ্টি বিত্তবানের দাবি মিটাইবার জন্য। মিচুরিন সৃষ্টি করিয়াছেন শতাধিক নূতন ধরনের ফল। তাঁহার তৈয়ারী ন্যাসপাতি (বাক্সের মধ্যে অথবা মাটির নীচের ভাঁড়ার-ঘরে থাকিলে) ডিসেম্বরের ক্রীস্টমাস্-টাইড পর্যন্ত অপক্ব থাকে এবং আদিমতম অবস্থার মধ্যেও এপ্রিল পর্যন্ত টাটকা থাকে।

"তামবভ প্রদেশের কঠোর জলবায়ুতে অবস্থিত মিচুরিনের ফলবাগিচায় আপ্রিকট, আঙুর (চার প্রকারের), বাদাম, ওয়ালনাট, মালবেরী, দামাস্ক্ গোলাপ, বিহিফল, চাউল, ধান ইত্যাদি ফলিতেছে প্রচুর পরিমাণে। সব কিছুই মেহনতী মানুষের জন্য, গ্রাম্য জনসাধারণের জন্য, বাগিচা তৈয়ারী করে যে-সব চাষী, অভিজ্ঞতা যাহাদের সামান্য ও জ্ঞান যাহাদের সীমাবদ্ধ, তাহাদের জন্য।

"গায় এতটুকু আঁচড় না লাগে এইভাবে, পরম যত্নে ও আদরে লুথার বারব্যাংক রাখিতেন তাঁহার চারাগুলিকে। মিচুরিন তাঁহার চারাগুলিকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন কঠিন অবস্থা সহ্য করিবার মতো করিয়া, যাহাতে যে কোনো পরিবেশে শুধু টিকিয়া থাকাই নহে, বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক সুফলও দান করিতে পারে।

"লুথার বারব্যাংক কাজ শুরু করিয়াছিলেন দরিদ্র অবস্থায়, কিন্তু যেদিন তিনি নূতনের স্রষ্টা হইলেন সেদিন হইতেই মার্কিন সংস্কৃতির সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই তিনি ভোগ করিতে শুরু করিলেন। আর মিচুরিন—মনে রাখিবেন, পুরাতন রাশিয়ার সেই দুঃসহ অবস্থার কথা—মিচুরিনের দারিদ্র্য ছিল প্রায় নিঃস্বতার পর্যায়ে। কিন্তু, সংগ্রাম, অশান্তি, ব্যর্থতা, হতাশা, পরাজয় ও জয়ের চিহ্নে লাঞ্ছিত দীর্ঘজীবনে মিচুরিন যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা শুধু রাশিয়ার কেন্দ্রীয় পরিবৃত্ত অঞ্চলকেই সমৃদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, সমৃদ্ধ করিবে সমগ্র পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলকে। অর্থাৎ উত্তরের মাটিতে তিনি দক্ষিণকে রোপণ করিতেছেন।

"লুথার বারব্যাংক ও ইভান ভ্লাদিমিরোভিচ মিচুরিন উদ্ভিদবিদ্যার দুই বিপরীত প্রান্তদেশ। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মিলও আছে যথেষ্ট।

"দুইজনেই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন প্রথম যৌবনে, দুইজনই ছিলেন দরিদ্র, দুইজনই ছিলেন মহৎ চিন্তাবীর, শিল্পী, আবিষ্কর্তা। উদ্ভিদ প্রজননক্ষেত্রে দুইজনেরই আবিষ্কার যুগান্তকারী।

"বপনপ্রজনন পদ্ধতির অগ্রগণ্য আবিষ্কারের কীর্তি বিশেষত মিচুরিনের, যে-পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ অদূর ভবিষ্যতে ফলের গাছের শুধু নূতন প্রকার নহে, এমন সব নূতন প্রজাতিও সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারে, যাহা মানুষের জীবনের চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে পারিবে এবং জলবায়ুর অপরিহার্য মর্জির সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

মিচুরিন শিক্ষামন্ত্রীদপ্তরের বৈজ্ঞানিক বোর্ডের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী সংঘের একজন অবৈতনিক সদস্য; তিনি আরও অনেক কিছু।

মিচুরিন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বয়স বাহাত্তর। কিন্তু এখনও তিনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, ছিঁড়িয়া একের পর এক উদ্ভিদজগতের রহস্য-যবনিকাগুলি।

দিনের কাজের অসংখ্য বিচিত্র বিরক্তি-দুশ্চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া রাত্রির এই নীরবতা ক্ষুদ্র-বৃহৎ মানুষের সার্বজনীন মেহনতের গম্ভীর সংগীতে হৃদয় ভরিয়া তোলে। এ সংগীত ইতিহাসের নূতন যুগের পরমমনোহর সংগীত; এই সংগীতই আজ দুঃসাহসের সাথে প্রথম শুরু করিয়াছে আমার দেশের শ্রমজীবী মানুষ।

হঠাৎ রাত্রির এই উৎকণ্ঠ নিঃশব্দতার বুকে কোনো নির্বোধ যেন হাতুড়ি পিটাইতে শুরু করে। এক, দুই, তিন, দশ, বিশ ঘা। তারপর স্ফটিকশুভ্র জলের উপর একতাল কাদার মত নামিয়া আসে একটা বর্বর হুংকার, চীৎকার, গোঙানি ও গর্জন। ঘোড়ার হ্রেষার মত একটা অমানুষিক কণ্ঠস্বরে বিদীর্ণ হইয়া যায় বাতাস; শূকরের ফুৎকার, গাধার আকাশফাটানো ডাক ও কোলাব্যাঙের কামার্ত কান্নায় কাঁপিতে থাকে কানের পর্দা। এই অপমানকর, উন্মাদ বীভৎস সংগীতের মধ্যে একটা ক্ষীণ ছন্দ কানে আসে, এবং দুই-এক মিনিট কান পাতিয়া এই নারকীয় কোলাহল শুনিলে আপনা হইতেই মনে হয়, এ যেন কামের তাড়নায় পাগল হইয়া যাওয়া একদল উন্মাদের ঐক্যতান সংগীত, এবং এই সংগীত পরিচালনা করিতেছে মানুষরূপী একটি পুরুষ ঘোড়া তাহার বিশাল লিঙ্গটি দোলাইয়া।

রেডিও বাজিতেছে। বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, মূক প্রকৃতির হাত হইতে ছিনাইয়া আনা একটি গোপন রহস্য। রেডিও বাজিতেছে পাশের হোটেলে, মেদস্ফীত মানুষের জগতকে, লুণ্ঠনকারীর জগতকে আনন্দ দিবার জন্য। কোথায় কোন্ নিগ্রো অর্কেস্ট্রায় নূতন ফক্সট্রট্ বাজিতেছে, আকাশযোগে তাহাই এখানে আনিতেছে রেডিও। মেদস্ফীতদের সংগীত। সংস্কৃতিবান দেশগুলির হোটেলে-হোটেলে অফুরন্ত প্রমোদোচ্ছ্বাসের মধ্যে মেদস্ফীত নরনারীর দল এই সংগীতের তালে তালে কামলালসায় উরু নাচাইয়া নাচাইয়া অশ্লীলতার ক্লেদাক্ত পঙ্কশয্যায় প্রজননকর্মের অনুকরণ করিতেছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে সমস্ত জাতি ও সমস্ত যুগের মহান কবিরা এই কামটিকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার জন্য, মানব-মর্যাদার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া ইহাকে অলংকৃত করিবার জন্য, মানুষ যাহাতে ছাগ, বৃষ ও শূকরের পর্যায়ে নামিতে না পারে সেজন্য, নিজেদের সৃজনশক্তি নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। প্রেমের স্তবগানে রচিত হইয়াছে লক্ষ লক্ষ অনবদ্য কবিতা। পুরুষ ও নারীর সৃজনীশক্তির প্রেরণা যোগাইয়াছে এই প্রেম। সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীর চেয়েও মানুষকে অপরিমেয়রূপে বেশী সামাজিক করিয়াছে এই প্রেম। নরনারীর

সম্পর্কের মধ্যেকার সক্রিয়, স্বচ্ছ, পার্থিব রোমান্টিকতার সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অসীম মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে।

শিলার বলিয়াছেন, "ক্ষুধা ও প্রেমের জোরেই জগৎ চলিতেছে। সংস্কৃতির ভিত্তি প্রেম, সভ্যতার ভিত্তি ক্ষুধা।"

কিন্তু সেই মেদস্ফীত লুণ্ঠনকারী, সেই পরশ্রমজীবী পরাশ্রয়ী, সেই অর্ধ-মানুষটি আসিয়া বলে, "আমি না থাকিলে সবই অন্ধকার।" মেহনতী মানুষকে, চিন্তাজগতকে যাঁহারা আলোকিত করেন সেই মহান কর্মীদের সূক্ষ্মতম স্নায়ু-তন্তুর আলোড়নে যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে সব কিছুকেই সে গোদা পায়ে দলিয়া যায়।

নারীর প্রয়োজন তাহার কাছে বন্ধু অথবা সাথী হিসাবে নহে। তাহার কাছে নারী অবসর বিনোদনের সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়, অবশ্য যদি সে-নারীও তাহারই লুণ্ঠনকারিণী না হয়। নারীকে সে মাতৃরূপেও দেখিতে চাহে না কারণ যদিও সে ক্ষমতার জন্য লালায়িত তথাপি শিশুকে সে ঘৃণা করে। ক্ষমতার প্রয়োজন যেন শুধু তাহার ফক্সট্রটের জন্য। এই ফক্সট্রট্ ছাড়া তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, কারণ এই মেদস্ফীত মানুষ পুরুষ হিসাবে কিছুই নহে। তাহার কাছে প্রেমের অর্থ অপচয়; আবেগময় দৈহিক প্রেরণার পরিবর্তে প্রেম তাহার নিকট ক্রমেই বেশী করিয়া কল্পনার বিকৃতিতে পরিণত হইতেছে। মেদস্ফীত মানুষের জগতে নারী-পুরুষের প্রেমের পরিবর্তে নারীতে-নারীতে এবং পুরুষে-পুরুষে প্রেম মহামারীর মত বাড়িয়া চলিয়াছে। অধঃপতনই মেদস্ফীত মানুষের 'বিবর্তন'।

এই বিবর্তন মন্থর নৃত্যের সৌন্দর্য ও ওয়াল্ৎস্ নৃত্যের উদ্দীপ্ত আবেগ হইতে ফক্সট্রটের কামার্ততায়, মোজার্ট ও বিটোফেনের সংগীত হইতে নিগ্রোদের জ্যাজ্ সংগীতে; আমেরিকার নিগ্রোরা যে-স্তর বহুদিন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং যে-নাচকে ক্রমেই বেশী করিয়া তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে, সেই বর্বর স্তরেও নাচের সেই ভঙ্গিমায় শ্বেতপ্রভুরা ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া নিগ্রোরা নিশ্চয়ই মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

মেহনতী মানুষের উপর মেদস্ফীত মানুষের প্রভুত্বের স্বপক্ষে যাঁহারা তার-স্বরে ওকালতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়া গেল! শ্রমিকশ্রেণী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে!" মিথ্যাকথা বলিতেছে তাহারা। কারণ, তাহারা কি চোখের উপর দেখিতেছে না যে, বিশ্বব্যাপী এই মেদস্ফীতের পালই আজ সংস্কৃতি পদদলিত করিয়া চলিয়াছে? তাহারা কি বুঝিতেছে না যে, সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার, গভীরতর করিবার, বিস্তৃততর করিবার শক্তি শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই আছে।

অমানুষিক মোটা গলায় কে যেন ইংরাজী ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিল; নির্দয়ভাবে প্রহৃত উটের আর্তনাদের মতো বাজিয়া উঠিল কান-বধিরকরা একটা শিঙা। গমগম করিয়া বাজিয়া উঠিল ভেরী, তীক্ষ্ম নিনাদে বাজিয়া উঠিল বাঁশি, স্যাক্সোফোনের কর্কশ আওয়াজে তালা লাগিয়া গেল কানে। মাংসল উরুগুলি

দুলিতে লাগিল, শুরু হইল লক্ষ লক্ষ মাংসল পায়ের খসখসানি ও দুম্‌দুম্‌ শব্দ।

অবশেষে, মেদস্ফীতদের সংগীত ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠিতে উঠিতে, আকাশ হইতে লোহার বাসন পড়িয়া গেলে যেমন শব্দ হয়, তেমনই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে থামিয়া গেল। আবার সেই পরমমনোরম নীরবতা, আবার চিন্তার গতি ফিরিল স্বদেশের দিকে, মনে পড়িল গ্রাম্য সংবাদদাতা ভ্যাসিলি কুচোরিয়াভেংকোর সংবাদটি। ইনি লিখিয়াছেন :

"আমাদের গ্রামের নাম রসোশিন্‌স্ক্‌। এ গ্রামে তিন শ গৃহস্থের বাস। আগে ইস্কুল ছিল মোটে একটি, এখন হইয়াছে তিনটি। আমাদের আছে একটি সমবায়ী ভাণ্ডার, তিনটি ক্লাবঘর, একটি ক্লাববাড়ী, পড়ার ঘর ও লাইব্রেরী, পার্টি, কমিউনিস্ট যুব সংগঠন, শিশু পায়োনীয়ারের দল, কৃষি ও গ্রাম্যসংবাদদাতাদের শিক্ষাব্যবস্থা, একখানি প্রাচীরপত্র। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা বইয়ের অর্ডার দেয়। অনেক খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকার গ্রাহক আমরা। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাব-বাড়ীটি সবসময় ভর্তি থাকে; পক্ককেশ বৃদ্ধ হইতে শুরু করিয়া লাল-রুমালবাঁধা পায়োনীয়রদের সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। চাষীরা, এমন-কি ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সাগ্রহে সরকারী ঋণ তহবিলে অর্থ দেয়। আমাদের গাঁয়ে ছিলেন বাহাত্তর বছরের এক বৃদ্ধা। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'কমিউনিস্ট যুব লীগে যোগদান করার বড় ইচ্ছে আমার, কিন্তু বয়স যে বড় বেশী হয়ে গেছে। সব কিছুই এত দেরীতে শুরু হল কেন?' মৃত্যুর পূর্বে তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সোবিয়েত পদ্ধতিতে পতাকাসহ যেন তাঁহাকে সমাহিত করা হয়! এই ঠাকুমা নিয়মিতভাবে কয়েক মাইল হাঁটিয়া ক্লাবে, পড়ার ঘরে ও গ্রাম্য সোবিয়েতের সভায় আসিতেন। তিনি ছিলেন তরুণীর মত। আমাদের গ্রাম সম্পর্কে ফটোসহ একটি প্রবন্ধ সম্প্রতি মার্কিন পত্রিকা 'এশিয়া'তে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে এই সকল বর্ণনা করা হইয়াছে।"

এই মজার বৃদ্ধা ঠাকুমাটির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। অবশ্য একটি বৃদ্ধা কৃষকরমণী সংস্কৃতির সব নহে। কিন্তু, গ্রাম্য প্রাচীন-প্রাচীনাদের এই মজার—কি বলিব!—'পুনর্যৌবনলাভের' এমন অনেক কাহিনীই আমি জানি এবং সব কাহিনী হইতেই একটি কথা বাহির হইয়া আসে : রুশ জনসাধারণ ক্রমেই তরুণ হইতেছে। আমাদের কালে বাঁচিয়া থাকা ও কাজ করা সত্যিই চমৎকার।

(১৯২৮)

॥ জোহানেস বেচারের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ॥

আজকাল প্রতিভাবান লোক বড় চোখে পড়ে না। প্রতিভা সৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ বড় কৃপণ। জোহানেস বেচার সর্বোপরি একজন প্রতিভাবান লোক। তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তি বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্য যে তাঁহার গদ্যরচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। তাঁহার 'লেভিসিত্' (একমাত্র ন্যায়যুদ্ধ) চমৎকার বই, ভালোবাসা ও ঘৃণার প্রেরণায় কবির রচনা।

জোহানেস বেচার আজ শাস্তি পাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন ও গভীরভাবে ঘৃণা করেন।

তাঁহার বিচার করিবে খৃস্টের উপাসকেরা, যে খৃস্টকে ভালোবাসিবার ও ঘৃণা করিবার অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল।

হে খৃস্টান মহোদয়গণ, আমার মতে—আমি অবশ্য নাস্তিক—এখানে একটা স্ববিরোধিতা রহিয়া গেল। কিন্তু স্ববিরোধিতা আজ আপনাদের এমন একটি অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে যে, সম্ভবত আপনারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টিই দিবেন না। সাহস, সততা, নির্ভীকতা ও প্রতিভার সহিত যে লোক সত্যকথা বলিতে পারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার মনোভাব লইয়াই আপনারা বেচারের বিচার করিতে বসিবেন।

আমি জানি ইউরোপের বুর্জোয়ারা তাহাদের পাপের জন্য এতটুকু বিচলিত নহে। ফ্রান্সের প্রান্তরে কোটি কোটি জীবন বলি দিবার পর কি ইহারা আর কিছু করিতে দ্বিধা করিবে?

যুদ্ধের মুনাফাখোর রাফকে ও অন্যান্য দানবেরা যাহাতে পৃথিবীতে বিচরণ

করিয়া বেড়াইতে পারে একমাত্র সেইজন্যই কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিষবাষ্পের ধোঁয়ায় জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারা হইতেছে,—'লেভিসিত্' গ্রন্থে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সহিত তাহার বর্ণনা করিয়াছেন বেচার। চারবছরব্যাপী নৃশংসতম যুদ্ধের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিজয়ীদের কেহ কেহ বহু বৎসরের জন্য রক্তহীন হইয়া থাকিবেন অথচ বিজিতেরা একদম নিঃস্বে পরিণত হইয়াছে! একমাত্র জিতিয়াছে শুধু তৃতীয় দল। ইহারা নিজেদের অন্যের চেয়ে চতুর ও শক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস করে, তাই দম্ভে ইহাদের মূঢ়তা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইহাদের সকলেই একটা নূতন সংহারযজ্ঞের প্রস্তুতি চালাইতেছে; গত যুদ্ধ অপেক্ষা এ যুদ্ধ আরও অন্ধ, অর্থহীন ও নির্বোধ হইবে।

'লেভিসিত্' বইএর একজন নায়ক ব্রাৎস নিখুঁত মানববিদ্বেষীর মত বলিতেছে "সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। সংস্কৃতিবান জাতিগুলির ইহা চরম শক্তি ও বলিষ্ঠতার অভিব্যক্তি।"

এই তো এখানে এমন এক শয়তানের সন্ধান পাওয়া গেল যাহার স্থান হওয়া উচিত জেলে। এই ধরনের লোকদেরই বিচার হওয়া উচিত।

যদি জোহানেস বেচারকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তবে তাহা 'ব্রাৎসে'র মত পাষণ্ডদের কার্যকলাপ সমর্থনের সমতুল্য কাজ হইবে।

আমার মনে হয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর বহু আগেই বুঝা উচিত ছিল, বেচারের বিচার অথবা সাত বছর যন্ত্রণা দিয়া সাক্কোভানজেটিকে হত্যার মত 'আত্মরক্ষার ব্যবস্থা' অনিবার্য পরিণতির হাত হইতে তো তাহাদের রক্ষা করিতে পারেই না, উপরন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়া নিজেদের ধ্বংসের দিন ত্বরান্বিত করে।

বুর্জোয়ার আর দিবার কিছু নাই। আগে যে উপায়ে সে শ্রমজীবী জনসাধারণকে শৃঙ্খলিত রাখিতে পারিত সে উপায়ও আজ আর তাহার হাতে নাই। নিজের পাপ সমর্থনের উপযোগী কোন ধর্ম অথবা ভাবাদর্শ তাহার নাই।

যে বৈজ্ঞানিক শক্তি তাহার যন্ত্র-বিজ্ঞান ও শিল্পকে সমৃদ্ধ করে, সেই বৈজ্ঞানিক শক্তির বিবেকহীন ও বিবেচনাহীন প্রয়োগের দ্বারাই সে আজ নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

কিন্তু ইহাও বেশীদিন চলিবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিশক্তি সাধারণ অপেক্ষা বেশী। তাই শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে পরাশ্রয়ীদের জন্য মেহনত করিয়া সংস্কৃতির সেবা করা হইতেছে, জনসাধারণ ও নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। জোহানেস বেচারের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আমি প্রত্যেক সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীর নিকট আবেদন জানাইতেছি। বেচারের একমাত্র অপরাধ, তিনি সৎ ও প্রতিভাশালী।

(১৯২৮)

বুর্জোয়ারা নিজের মুখেই বলিতেছে, যুদ্ধ অনিবার্য এবং মানবসমাজের সামগ্রিক বিনাশ 'জীবনের বিধানের মতই' অলংঘনীয়। বুর্জোয়া খৃস্টীয় সংস্কৃতির অমানুষিকতার ইহা অপেক্ষা নিঃসংশয় প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

এমন অনেক বাচাল মূর্খ আছে যাহারা বলিয়া থাকে, নির্ভীকতা, ইচ্ছাশক্তি আরও অনেক মূল্যবান সদ্‌গুণের জন্ম দেয় যুদ্ধ। কিন্তু, আমরা জানি বুর্জোয়াশ্রেণীর সৃষ্টি ১৯১৪—১৮ সালের ঘৃণিত যুদ্ধ কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষককে হত্যা করিয়া তাহাদের রক্ত হইতে হাজার হাজার নির্লজ্জ পরশ্রমজীবী ও শিকারী পশুর—নূতন ধনী ও হাঙরের জন্ম দিয়াছে।

"যুদ্ধ বীরের জন্ম দেয়, যুদ্ধ সৃষ্টি করে নির্ভীকতা"—এই উক্তি এইটুকুই প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়া দার্শনিক ও নীতিবিদেরা জানেন না কাহাকে বলে লজ্জাহীনতা ও অমানুষিকতা এবং কাহাকে বলে নির্ভীকতা।

বর্তমান যুগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে যে, দুর্বল শত্রুর অর্থনৈতিক লুণ্ঠনরূপ প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছাড়াও বিভিন্ন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যুদ্ধ সত্যই 'নির্ভীক' মানুষের জন্ম দেয়। এই নির্ভীক মানুষেরা 'শান্তির সময়' উচ্ছৃংখলতা ও অমানবিক সরকারের ধ্বজা ধারণ করে। এই মানুষগুলিকে আমরা দেখি ফাশিস্ট সংগঠনের মধ্যে—যেমন জার্মান স্তালহেলম—এবং অন্যান্য দেশের অনুরূপ সংগঠনের মধ্যে। আমরা জানি, 'এই শান্তির কাল' শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রভুশ্রেণীর অবিশ্রান্ত তিক্ত সংগ্রামের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

তাহা ছাড়া, বুর্জোয়াশ্রেণী যতই নৈতিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে, ততই সে বেশী সংখ্যায় চোর, জোচ্চোর ও ডাকাত পুষিতেছে। আধুনিক 'বুক অব জেনেসিসে' বলে, "ব্যাঙ্কার জন্ম দেয় ডাকাতের।" এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে অপরাধ বাড়িয়া যাওয়ায় প্রতিনিয়তই পুলিশবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। চাহিদা বাড়িতেছে নির্ভীক লোকের, যাহারা শ্রমিকদের শুধু প্রহার ও হত্যাই করে না, দস্যুদের সঙ্গেও লড়িতে পারে। নাগরিকদের ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বার্লিনে স্পেশাল 'আক্রমণকারী ব্যাটালিয়ান' তৈয়ারী হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতারণা ও ডাকাতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের বীমা করার ব্যবস্থা আছে। ডাকাত লুটিয়া লইয়াছে এমন লোকদের ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলিকে প্রিমিয়াম দিতে হইয়াছে ১৯১৩ সালে ২,০০০,০০০ ডলার, ১৯২০ সালে ৪,৫০০,০০০ ডলার এবং ১৯২৭ সালে প্রায় ১৭,০০০,০০০ ডলার। বিরাট বিত্তশালী সহর শিকাগো সম্পূর্ণভাবেই ডাকাতদলের হাতে। প্রেসিডেন্ট হুভার সেনেটে অপরাধের প্রসারের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য, আমেরিকাই একমাত্র দেশ নহে যেখানে জীবনের বিরুদ্ধে এবং প্রধানত মধ্যশ্রেণীর 'পবিত্র সম্পত্তি'র বিরুদ্ধে অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই প্রকারের প্রগতিতে ইউরোপ পিছু পড়িয়া নাই। বুর্জোয়ার আজ 'নির্ভীক' লোকের বড় প্রয়োজন।

আর একথা বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের কাছে যুদ্ধ লাভের কারবার। এই শিল্পপতিরাই তাঁহাদের শ্রমিকদের হাত দিয়া কামান ও রাইফেল তৈয়ারী করিতেছেন মজুর ও চাষী যাহাতে পরস্পরকে নির্মূল করিতে পারে।

ইহা এবং আরও অনেক কিছুই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছে বুর্জোয়াশ্রেণীর মানববিদ্বেষী অমানুষিকতা, তাহার অস্তিত্বের পাপিষ্ঠতা, তাহার ক্রমবর্ধমান উন্মত্ততা ও মূঢ়তা, যাহা তাহার অন্তিম পরিণাম অনিবার্য করিয়া তুলিতেছে।

সারা জীবন আমি একজন 'শান্তিবাদী' ছিলাম। যুদ্ধ আমার মনকে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া তুলিত, লজ্জায় মরিয়া যাইতাম মানুষ মানুষকে হানিতেছে দেখিয়া, সামগ্রিক হত্যালীলার যাহারা প্ররোচনা দেয়, জীবনকে যাহারা ধ্বংস করে, ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিতাম তাহাদের প্রতি।

কিন্তু যখন দেখিলাম খালি পেটে, খালি পায়, প্রায় নগ্ন অবস্থায় লড়িয়া আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষকেরা জয়ী হইল এবং আজ যখন দেখিতেছি অবিশ্বাস্য বাধা ঠেলিয়া আমাদের শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন রাষ্ট্র, নিজেদের রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছে এবং রাষ্ট্রচালনা ব্যাপারে নিজেদের বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রমাণ দিতেছে, তখন আমারও এই স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে জীবনমৃত্যুর একটি সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।

আর যে শ্রেণীর শক্তিতে আমি বাঁচিয়া আছি ও কাজ করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে আমিও একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে ইহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিব। যোগদান করিব এই সেনাবাহিনী জিতিবে বলিয়া নহে, যোগদান করিব এই কারণে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর যে মহান ন্যায়ের আদর্শ রহিয়াছে সে আদর্শ আমার নিজের বিধিসম্মত আদর্শ, আমার কর্তব্য। (১৯২৯)

॥ মার্কিন সাময়িকপত্রের প্রশ্নাবলীর জবাবে ॥

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন :

"আপনার দেশ কি আমেরিকাকে ঘৃণা করে এবং মার্কিন সভ্যতা সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন?"

এই ধরনের প্রশ্ন এইভাবে করার মধ্যেই উত্তেজনা ও আতিশয্যের প্রতি একটা সত্যকার বিকৃত ইয়াঙ্কি অনুরাগের আভাস পাওয়া যাইতেছে। শুধুমাত্র 'অর্থোপায়ের জন্য' কোন ইউরোপীয়ান ঐ ধরনের প্রশ্ন করিবে, ইহা আমি ভাবিতেও পারি না। আপনার প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে, এবং অন্যান্য সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কেই, যদি অনুমতি দেন, তবে এই কথাই বলিব যে, আমার দেশের পনের কোটি লোকের পক্ষ হইতে কিছু বলার অধিকার আমার নাই, কারণ আপনার দেশ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব কি তাহাদের তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অবস্থা ও সামর্থ্য আমার নাই।

আমি ধরিয়া লইতেছি, ফিলিপাইনস্, দক্ষিণ আমেরিকান রিপাবলিকসমূহ, চীনের মত যে সকল দেশের রক্ত আপনাদের পুঁজিপতিরা ডলারে পরিণত করিতেছে, সে সকল দেশেও, এমন কি আমেরিকার এক কোটি কালো মানুষের মধ্যেও এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনি পাইবেন না নিজের জাতির নামে এই কথা ঘোষণা করবার প্রমত্ততা যাহার আছে : "হ্যাঁ, আমার দেশ, আমার জাতি, আমেরিকাকে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে তাহার সমস্ত অধিবাসীকে, ঘৃণা করে তাহার শ্রমিকদের, ঘৃণা করে তাহার কোটিপতিদের; ঘৃণা করে শ্বেতাঙ্গদের, ঘৃণা করে কৃষ্ণাঙ্গদের; ঘৃণা করে তোমার দেশের শিশু ও নারীকে; ঘৃণা করে তোমার দেশের নদী, প্রান্তর, অরণ্য, পশু, পাখী, অতীত, বর্তমানকে; ঘৃণা করে তোমার দেশের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানীদের; ঘৃণা করে মহান বৈজ্ঞানিক কীর্তিকে, এডিসনকে, লুথারকে, বারব্যাঙ্ক,

* এই প্রবন্ধটি গর্কি সম্পূর্ণ করেন নাই।

এডগার এলান পো, ওয়াল্ট্ হুইটম্যানকে; ঘৃণা করে ওয়াশিংটন ও লিংকনকে; ঘৃণা করে তোমাদের ড্রেইজার, ওনিল, শেরউড এন্ডার্সন ও সমস্ত প্রতিভাবান শিল্পীকে; ঘৃণা করে জ্যাক লন্ডনের মানসপিতা সেই অপূর্ব রোমান্সস্রষ্টা ব্রেট হার্তেকে; ঘৃণা করে থোরও ও এমার্সনকে; ঘৃণা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলিতে যা কিছু এবং সেখানে যারা বাস করে সকলকেই।"

আশা করি, আপনার প্রশ্নের এই ধরনের উন্মাদ জবাব,—মানুষ ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষবিষজর্জর জবাব,—দিতে পারে এমন কোন মূঢ় নির্বোধের সন্ধান মিলিবে এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আপনি করেন নাই।

বলা বাহুল্য, আপনারা যাহাকে মার্কিন সভ্যতা বলেন তাহার কোন আবেদনই আমার কাছে নাই, তাহার প্রতি কোন সহানুভূতিও আমার নাই। আমি মনে করি, আপনাদের সভ্যতা এ পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত সভ্যতা, কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র ও ন্যক্কারজনক সমস্ত বিকৃতিকেই দানবীয় আকারে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে আপনাদের সভ্যতা। শ্রেণীরাষ্ট্রের মানববিদ্বেষের ফলে ইউরোপের যথেষ্ট মর্মান্তিক বিকৃতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু অযুতপতি, কোটিপতির মত বিষাক্ত ও অর্থহীন জীব আজও ইউরোপে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব; ইহারাই আপনাদের দেশকে উপহার দিতেছে একদল অধঃপতিত। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই বোস্টনের সেই দুইটি ধনীর ছেলের কথা, যাহারা একান্ত কৌতূহলবশেই আর একটি ছেলেকে হত্যা করিয়াছিল। একান্ত কৌতূহলের বশে, ভদ্রবেশী বর্বরতার তাড়নায় এই ধরনের কত অপরাধ আপনাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয় বলিতে পারেন! ইউরোপও তাহাদের নাগরিকদের পদদলিত অসহায় অবস্থা লইয়া গর্ব করিতে পারে, কিন্তু সাক্কো-ভানজেট্টির হত্যার মত এতখানি নির্দয় সে এখনও হইতে পারে নাই। ফ্রান্সে একদিন দ্রেইফু মামলা হইয়াছিল। সেও ছিল এক কলঙ্ককাহিনী। কিন্তু ফ্রান্সে এমিল জোলা ও আনাতোল ফ্রাঁসের মত মানুষেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন নিরপরাধকে রক্ষা করিবার জন্য, আর তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল হাজার হাজার মানুষ। কু ক্লুক্স ক্ল্যানের মত নরঘাতকদের একটি সংগঠন জার্মানীতে গড়িয়া উঠিয়াছিল যুদ্ধের পরে। কিন্তু তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদের দেশের পদ্ধতি তো ইহা নহে। সেখানে কু ক্লুক্স ক্ল্যান কালো-মানুষদের হত্যা করে, নৃশংসভাবে পীড়ন করে, এমন কি মেয়েদেরও গায় হাত দেয় বিনা প্রতিবাদে, যেমন বিনা প্রতিবাদে আপনাদের রাষ্ট্রের গভর্নরেরা হিংস্র অত্যাচার চালান সোশ্যালিস্ট কর্মীদের উপর।

'কৃষ্ণাঙ্গ দলনের' মত ঘৃণিত জিনিষ ইউরোপে নাই, যদিও ইউরোপ আরেকটি লজ্জাজনক ব্যাধিতে ভুগিতেছে। সে ব্যাধি ইহুদিবিদ্বেষ। সে ব্যাধি হইতে অবশ্য আমেরিকা মুক্ত নহে।

ইউরোপেও অপরাধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু আপনাদের সংবাদপত্রে শিকাগোর ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ততদূর সে এখনও যাইতে পারে নাই। স্টক এক্সচেঞ্জ ও ব্যাঙ্ক ছাড়াও ডাকাতের দল শিকাগোতে বন্দুক-বোমা

লইয়া প্রভুত্ব করিয়া বেড়ায়। মদ্যপান বে-আইনী হইবার ফলে আপনাদের দেশে যে রক্তাক্ত হানাহানি দেখা যাইতেছে, ইউরোপে তাহা সম্ভব নহে। এমন মেয়র আপনি ইউরোপে খ‍ুঁজিয়া পাইবেন না যিনি শিকাগোর মেয়রের মত প্রকাশ্য রাজ-পথে বনিয়াদি ইংরাজী গ্রন্থগ‍ুলি পোড়াইবেন।

আমেরিকা ভ্রমণের জন্য নেশন-সম্পাদক ও. জি. ভিলার্ড বার্নার্ড শ'কে আমন্ত্রণ জানাইলে তাহাকে শ' যে তীব্র বিদ্রুপাত্মক জবাব দিয়াছিলেন অন্য কোন দেশ হইতে আমন্ত্রণ আসিলে নিশ্চয়ই তিনি ঐরূপ জবাব দিতে পারিতেন না।

সব দেশেই প‍ুঁজিপতিরা ঘৃণিত অমান‍ুষের দল, কিন্তু প‍ুঁজিপতিদের মধ্যেও আপনাদের দেশের প‍ুঁজিপতিরা নিকৃষ্টতম। মনে হয়, লালসার ক্ষেত্রে তাহাদের মত মূঢ়তা অন্যদের নাই। প্রসংগত, 'ব্যবসায়ী' শব্দটির আমার ব্যক্তিগত তর্জমা হইতেছে, 'পাগল'।

একবার ভাবিয়া দেখ‍ুন কী মূঢ়, কী লজ্জাকর ব্যাপার! আমাদের গ্রহটি, প্রকৃতপক্ষে যাহার সর্বাঙ্গ আমরা কী কষ্টেই না সমৃদ্ধ ও অলংকৃত করিতে শিখিয়াছি, সেই গ্রহটিই আজ এমন নগণ্য ম‍ুষ্টিমেয় কয়েকটি মান‍ুষের ম‍ুঠিতে থাকিবে যাহারা টাকা তৈয়ারী ছাড়া আর কিছ‍ুই করিতে পারে না। যাহারা সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা আমাদের 'দ্বিতীয় প্রকৃতির', সেই বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক ও কবির মহীয়সী সৃজনীশক্তি, রক্ত ও মস্তিষ্ক এই কয়টি নির্বোধ মান‍ুষ হলদে ধাতুর চাকতিতে ও চেকের কাগজে পরিণত করিতেছে।

টাকা ছাড়া আর কি পয়দা করে এই প‍ুঁজিবাদীরা? হতাশা, ঈর্ষা, লোভ ও ঘৃণা, যাহা তাহাদের অনিবার্য ধ্বংসের ম‍ুখে লইয়া যাইবে কিন্তু বিস্ফোরণকালে যাহা মান‍ুষের সাংস্কৃতিক সম্পদের একটা বড় অংশ ধ্বংস করিবে। আপনাদের এই ভুরিভোজস্ফীত বিকৃত সভ্যতা আপনাদের জীবনে আনিয়াছে এক মর্মান্তিক ধ্বংসের অভিশাপ।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত অবশ্য এই যে, সত্যকার সভ্যতা ও দ্রুত সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব কেবল সেখানেই যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরশ্রমজীবী পরাশ্রয়ী-দের হাতে না থাকিয়া সম্প‍ুর্ণরূপে শ্রমজীবী জনসাধারণের হাতে আছে। অবশ্য এই কর্মপন্থা গ্রহণের স‍ুপারিশ জানাইতেছি যে, সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক একদল লোক বলিয়া প‍ুঁজিপতিদের ঘোষণা করা হোক, রাষ্ট্রদ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হোক তাহাদের সম্পত্তি, তাহাদের লইয়া রাখা হোক কোন সাম‍ুদ্রিক দ্বীপে ও সেখানে তাহাদের শান্তিতে মরিতে দেওয়া হোক। একটি সমস্যা সমাধানের ইহাই হইবে অত্যন্ত দয়ার্দ্র পদ্ধতি; 'মার্কিন আদর্শবাদের' সহিত সম্প‍ূর্ণ সংগতিও ইহার থাকিবে। জাতির জীবনরথে নাটক ও মর্মান্তিক দৃশ্যাবলী একত্র করিলে 'জাতির ইতিহাস' হয় সেই নাটক ও দৃশ্যাবলীর মর্মান্তিকতার মধ্য দিয়া যে জাতি এখনও যায় নাই, আজও তাহার মনে যে শিশ‍ুস‍ুলভ আশাবাদ রহিয়াছে 'মার্কিন আদর্শবাদ' তো তাহাই।

(১৯২৭—২৯)

॥ বুর্জোয়া সংবাদপত্র

পুরাতন জিনিষের বাজারে যে আবর্জনা পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইতেই বুঝা যায় গতকাল লোক কিভাবে বাস করিয়াছে; সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপন ও পুলিশী সংবাদ দেখিয়া জানা যায় আজ মানুষ কিভাবে আছে। সংবাদপত্র বলিতে আমি বুঝাইতে চাহি, ইউরোপ ও আমেরিকার 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি'র 'ঘটনাবলী সম্পর্কে জনচিত্তকে পরিজ্ঞাত রাখিবার' আধুনিক 'যন্ত্রবিশেষ'। প্রভুর জীবন সম্পর্কে ভৃত্যের মুখ হইতে খোলাখুলি শুনিবার মতই বুর্জোয়া সংবাদপত্র পড়া কাজে লাগে বলিয়া আমি মনে করি। রোগ সম্পর্কে কখনও সুস্থ মানুষের আগ্রহ জাগে না, জাগা উচিত নয়, কিন্তু রোগ সম্পর্কে আগ্রহ জাগা ও তাহার অনুশীলন করা ডাক্তারের কর্তব্য। চিকিৎসক ও সাংবাদিকের মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল রহিয়াছে। তাঁহারা উভয়েই রোগ নির্ণয় করেন ও রোগের বর্ণনা করেন। বুর্জোয়া সাংবাদিকদের চেয়ে আমাদের সাংবাদিকেরা ভাল অবস্থায় আছেন, কারণ সামাজিক ব্যাধির সাধারণ কারণগুলির সহিত তাঁহারা পরিচিত। চিকিৎসক যেমন রোগীর চীৎকার ও গোঙানির দিকে মনোযোগী হন, সোবিয়েত সাংবাদিককেও তেমনই বুর্জোয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত বস্তুর প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। যদি কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি আমাদের দেশে আসেন এবং কোন 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের' সংবাদপত্র-গুলির পুলিশী কাহিনী হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘটনা সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে খুচরা বিক্রয়ভাণ্ডার, রেস্তোরাঁ, প্রমোদভবনের বিজ্ঞাপন এবং জনসম্বর্ধনা ও জন-উৎসব, জনসমাবেশের বর্ণনার সহিত সেগুলিকে মিলাইয়া দেখেন, যদি তিনি এই সব তথ্যই ব্যবহার করেন তবে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের 'সাংস্কৃতিক জীবনের' একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও ভয়াবহ চিত্র আমরা পাইব।

প্রত্যহ আমরা বুর্জোয়া সংবাদপত্রে কি দেখি? দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত মে মাসের কতকগুলি ঘটনার উপর চোখ বুলানো যাক।

"সংশোধনাগারে বিদ্রোহ"—একটি সংশোধনাগার হইতে চৌদ্দটি ছেলে পালায়। তাহাদের মধ্যে বারটিকে অশ্বারোহী পুলিশ ধরিয়া ফেলিয়াছে, বাকী দুইজনের গতিবিধির কোন সন্ধান মিলিতেছে না। "আর একটি নাবালকের উপর অত্যাচার।" "মাতাকর্তৃক সন্তান হত্যা"—দুইটি সন্তানকে গ্যাসের বিষে হত্যা। কারণ, অনাহার। "আর একটি বিষাক্ত গ্যাস লাগার ব্যাপার।"—পাঁচজনের দম বন্ধ হইয়া মৃত্যু। স্বামী, স্ত্রী, স্বামীর বৃদ্ধা মাতা, তিন বছরের শিশু কন্যা ও কোলের বাচ্চা। "ক্ষুধার জ্বালায় হত্যা।" "আর একটি মহিলাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া হত্যা।" "জেলে অভ্যস্ত"—পাঁচ বছর জেল খাটিবার পর ছাড়া পাইয়া একটি লোক পুলিশের নিকট গিয়া বলে যে সে পীড়িত, কাজ করিতে পারে না, ভিক্ষা করিতেও চায় না, বলে তাহাকে আবার জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হোক; কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 'ন্যায্য আইনে' তাহা হইবার নহে; অতএব জেলে 'অভ্যস্ত' এই লোকটি বাহিরে গিয়া একটি দোকানের জানলা ভাঙ্গে, পুলিশের সঙ্গে মারামারি করে এবং এইভাবে আবার বাঞ্ছিত স্থানে ফিরিয়া যায়। "কোটিপতি পথের ফকির" —আশী বছর বয়সের এক বৃদ্ধ ভিখারী মারা গিয়াছে এবং তাহার জিনিষপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে পঞ্চাশ লক্ষ ক্রোন। "৮৯ বছর বয়সে দুই কোটি ডলার রাখিয়া লর্ড অ্যাশ্টনের মৃত্যু।" "বিরাট মামলা"—শহরের দূষিত জলের পাইপ হইতে জল খাইয়া লায়ন্সে তিনশত লোকের মৃত্যু। "তাসখেলায় বিরাট হার।" "সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গতকল্য কতকগুলি হত্যা অনুষ্ঠিত হয়, ডাকাতরা নিরাপদে পলাইয়া যায়।" এখানে 'নিরাপদে' কথাটি ব্যঙ্গাত্মক নহে; হত্যাকারীদের সৌভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি রহিয়াছে এখানে।

ইহা ছাড়াও আছে প্রতারণা, দুর্নীতি, যৌন অধঃপতন ও তাহার ফলে হত্যা ও আত্মহত্যার বড় বড় মামলার রিপোর্ট। অবশ্য, সারা মাস যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহার একটি নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র আমি এখানে বিবৃত করিয়াছি—বাকীগুলির শতকরা ৯০টিই এই ধরনের অপরাধ ও ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। সব ঘটনাগুলিকেই অত্যন্ত সংক্ষেপে ও নীরসভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; সাংবাদিককে যদি তাঁহার বর্ণনাকে কিছুটা জীবন্ত করিতে হয় তবে আরেকটি স্ত্রীলোককে অসামান্য নিপুণ নৃশংসতায় খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা প্রয়োজন। অথবা প্রয়োজন ডুসেলডর্ফ হত্যাকারী শ্রমিক কুর্টেনের মত আর একজন হত্যাকারী। এই হত্যাকারীটি ৫৩টি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে এবং তারপর হঠাৎ নীরসকণ্ঠে পুলিশ তদন্তকারীকে বলে, "যা কিছু বলিয়াছি ধাপ্পা বলিয়া এখন যদি সব কথা অস্বীকার করি তবে কি করিতে পার?" ইহাই একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কিন্তু বুর্জোয়া দেশগুলিতে পুলিশের কাজ একের পর এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তের ঘটনামালায় পরিণত হইয়াছে। তাই কুর্টেনের ব্যাপারটিতে সোবিয়েত পাঠক বিস্মিত হইবেন না। কেন এসব জিনিষ ছাপা হইতেছে আপনি বুঝিতেই পারিবেন না। পুলিশ

ঘটনাবলীতে বুর্জোয়া সংবাদপত্র কোন 'মন্তব্যই' করে না। বুঝা যায়, ইহা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ আর ইহাতে ভয়ও পায় না, ক্ষুব্ধও হয় না। আগে যুদ্ধের পূর্বে* লোকে ক্ষুব্ধ হইত। 'সমাজের ব্যাধি' সম্পর্কে ভাবালু ব্যক্তিরা জোলো প্রবন্ধ লিখিতেন, নানা মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। এই সমস্ত রচনার মূলে মাঝে মাঝে আতঙ্ক থাকিত বটে, তবে প্রায়ই 'অস্বাভাবিক ঘটনায়' 'সংস্কৃতিবান লোকের' বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাই থাকিত ইহার মূল।

আজকাল, জীবনের সাধারণ মর্মান্তিক ঘটনাগুলিতে বুর্জোয়া সংবাদপত্রের আর কোন আগ্রহ নাই। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যু বহুদিন হইল স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনের উপর এ ঘটনা কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, যাহারা স্ফূর্তিতে ও শান্তিতে থাকিতে চায় এ ঘটনা তাহাদের কাছে কোন আতঙ্কের কারণ নহে। প্রতিদিনই বিলাসিতাপূর্ণ সিনেমাগৃহের সংখ্যা বাড়িতেছে; সৃষ্টি হইতেছে আরও বিলাসব্যবস্থাযুক্ত রেস্তোরাঁ, সেখানে বাজিতেছে জাজ অর্কেস্ট্রা, কাঁপিতেছে দেয়াল ও ছাদ। 'জীবনীশক্তি হ্রাসের' বিরুদ্ধে অব্যর্থ মহৌষধের বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্যে এবং যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞদের খোলাখুলি বিজ্ঞাপনে বিস্মিত হইতে হয়।

আপনি বলিবেন, ১৯১৪ সালের আগেও এই চাঞ্চল্যকর বিষয়গুলি থাকিত! থাকিত বটে, কিন্তু এত উগ্র ছিল না। এখন মনে হয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির বুর্জোয়ারা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছে যে,

> জীবন আসছে ক্রমেই ছোট হয়ে, ক্রমেই দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিন, এসো
> কাটাই দিনরাত্রিগুলো আরও আরও আরও স্ফূর্তি করে।

নাচের মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলিতেছে একটি লোক। তাহার পা দুইখানি মাকুর মত সরু, পেটটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, গাল দুটিতে গাঢ় করিয়া রংমাখানো, চোখ দুটিতে নেশাখোর শয়তানের চাউনি।

আপনি বলিবেন, বড় বেশী রঙের উপর শুইয়া আছেন আপনি। না, এমন কাজ করিবার কোন ইচ্ছাই নাই আমার। কারণ আমি জানি এই শুকনো পচা জিনিষটি বড় সংক্রামক। জীবনের রংগুলিই তো আরও ঘন, আরও পান্ডুর হইয়া উঠিতেছে। হয়ত জীবনের তাপ উঠিতেছে, বুর্জোয়াদের আমোদ, জ্বরের বিহ্বলতায় পরিণত হইতেছে।...যে সর্বনাশা পরিণতি আসিতেছে তাহার আতংক ভুলিয়া থাকিবার জন্যই বুর্জোয়ারা স্ফূর্তিতে দিন কাটাইতে চেষ্টা করে।

* * *

আমেরিকা ও ইউরোপের সাংবাদিকদের কাজের প্রকৃতি, আমার মনে হয়, আমি ভালভাবেই জানি। আমার মতে, তাঁহারা ঠিকা কারিগর ছাড়া আর কিছুই নন এবং তাঁহাদের কাজ এত কঠিন ও বিশ্রামহীন যে, এই কাজের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের মনে মানুষের প্রতি গভীর উদাসীনতার সৃষ্টি হয়। তাঁহারা অনেকটা

---

*১৯১৪—১৮ এর যুদ্ধ।

মানসিক রোগীদের হাসপাতালের সহকারীর মত। এই সহকারীরা রোগী ও ডাক্তার উভয়কেই পাগল মনে করে। জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাহাদের রিপোর্ট যে নিরুদ্বেগ ও ভাবাবেগহীন হয়, এই উদাসীনতাই তাহার কারণ।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি : "গতকাল হ্যান্স মুলার নামে একব্যক্তি বাজী রাখিয়া ১১ মিনিটে ৩৬ জোড়া সসেজ খাইয়াছে।"

"১৯২৮ সালে প্রুশিয়ায় ৯,৫৩০ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬,৬৯০ জন পুরুষ ও ২,৮৪০ জন নারী এবং ৬,৪১৩ জন সহরের লোক ও ৩,১১৭ জন গ্রামের লোক।"

"সাইলেশিয়ার লোয়েনবার্গের মেয়র বিড়ালের উপর ট্যাক্স বসাইয়া শহরের আয় বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌর পরিষদ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মেয়র এখন নূতন ফন্দী বাহির করিয়াছেন। রাত্রে তিনি সহরের পার্কে ঘুরিয়া বেড়ান—বিড়াল ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছেন। বিড়াল প্রতি তিন মার্ক করিয়া দিলে বিড়ালের মালিক বিড়াল ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।"

"সেচ কোম্পানীর টাকা বাকী পড়ায় বেলিফরা হামবুর্গের নিকটবর্তী নিয়েনডর্ফ গ্রামে সম্পত্তি ক্রোক করিতে আসিলে, চাষীরা সশস্ত্র প্রতিরোধ চালায়। ফলে বেলিফদের পালাইয়া আসিতে হয়।"

বার্লিনের কাছাকাছি বাস করেন এমন এক গ্রাম্য যাজকের ঘরে 'রাত্রির ভূত' যাতায়াত সুরু করিয়াছে। এই ভূতের হাতের 'অভদ্র ছোঁয়ায়' তিনবার তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যাইবার পর তিনি পুলিশ ডাকিয়া আনেন। পুলিশ আসিয়া যাজকের জানালার নীচে একটা টুপী পড়িয়া আছে দেখিতে পায়। টুপীটিকে 'ভূত' ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

"যে মেয়েদের চুল বব করা তাহাদের গীর্জায় প্রার্থনা করিতে দেওয়া হইবে কি? অনেক বিশপ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং ২৪শে মে ভ্যাটিকান এই প্রশ্নটি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। 'কলেজ অব কার্ডিনালস' এই প্রশ্নের সম্মতিসূচক জবাব দিয়াছেন। চুল ছোট করিয়া কাটাকে তাঁহারা খৃষ্টীয় রীতির বিরোধী বলিয়া মনে করেন না।"

গতবৎসর একজন সাংবাদিক সংবাদ দেন যে, পুলিশ-প্রদত্ত সংখ্যা হইতে জানা যায় প্রতি বৎসর ফ্রান্সে প্রায় চার হাজার মেয়ে নিখোঁজ হয়। সম্প্রতি কতকগুলি ফরাসী সহরে কয়েকজন শ্বেতাংগ নারীব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই দলটি সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার রিপাবলিকগুলির গণিকাপল্লীতে ২,৫০০ মেয়ে বিক্রয় করিয়াছে। পোলাণ্ডেও অনুরূপ একটি 'নারী-ব্যবসায়ী' সংগঠন কাজ করিত। এ লঁন্দ্রে নামক একজন ফরাসী সাংবাদিক দাস-ব্যবসায়ের এই শাখাটি লইয়া অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। 'পাপের কারবার' নামক তাঁহার বইটি 'ফেডারেশন পাবলিশিং হাউস' কর্তৃক আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়। বইখানি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; মেয়েদের কিভাবে ভুলাইয়া হরণকারীরা লইয়া যায় এবং আর্জেন্টিনার বেশ্যাপল্লীগুলিতে তাহাদের কি 'কাজ দেওয়া হয়'

তাহার বিশদ বর্ণনা এই বইটিতে আছে। কিন্তু বইটির সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, বইটিতে লেখক কোথায়ও এতটুকু রাগ বা উষ্মা প্রকাশ করেন নাই।

দশম পৃষ্ঠায় লঁদ্রে একজন শ্বেতাঙ্গ নারী-ব্যবসায়ীর সহিত আরমাঁদ সম্পর্কে লিখিতেছেন :

"আরমাঁদ একজন বেশ্যার কারবারী।...তাহার কি কারবার তাহা আমি জানি। আমি কে তাহাও তিনি জানেন। দুই ব্যবসায়ীর মত তিনিও আমাকে বিশ্বাস করেন, আমিও তাহাকে বিশ্বাস করি।"

ঠিক। দুই ব্যবসায়ীর মতই বটে। তাহার চেয়ে এতটুকু বেশী নয়। যদিও এই "ব্যবসায়" জঘন্যতম ও অমানুষিক।

কিন্তু লঁদ্রের মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে হইলে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের কথাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করা দরকার।

"যে লোকটিকে সে জেলে অথবা আদালতে লইয়া যাইতেছে সে নিরপরাধ কিনা, পুলিশম্যানের তাহা ভাবিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। এই একই ধরনের লোকদের আমি আনি সমাজের আদালতের সম্মুখে; আগে কি ঘটিয়াছে ও পরে কি ঘটিবে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাই না।"

কথাগুলি শুনিয়াছিলাম ১৯০৬ সালে নিউইয়র্কে যখন পূতচরিত্রের আমেরিকানরা একটা ছোটখাট কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করিয়াছিল। দুইটি হোটেল হইতে আমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। তখন আমি আমার মোট, বাক্স লইয়া রাস্তার উপর কায়েমী হইয়া বসিলাম এবং ঠিক করিলাম এখানে বসিয়াই দেখিব ব্যাপার কতদূর গড়ায়। আমাকে তখন জন পনের রিপোর্টার ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের নিজেদের মত, আমেরিকান হিসাবে, তাহারা লোক ভালো। আমার প্রতি তাহারা সহানুভূতি দেখাইল এবং এমন কি আমার মনে হইল এই কেলেঙ্কারীতে তাহারা বিব্রত। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল যাহাকে বিশেষ করিয়া ভাল লাগে। ভারী গড়নের লোক, মুখের উপর কোন স্পন্দন বা গতি নাই, কৌতুকময় ছোট নীল চোখ দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। সে বেশ নাম-করা লোক। জেল হইতে একটি জাতীয়তাবাদী মেয়ে বিপ্লবীর পলায়নের ব্যবস্থা করার জন্য তাহার কাগজ তাহাকে ফিলিপাইনসে ম্যানিলায় পাঠাইয়াছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা এই মেয়েটিকে জেলে পুরিয়া প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই সাংবাদিকটির মনে হইল, কেলেঙ্কারী কতদূর গড়ায় আমি তাহা দেখিতে চাই। সে তখন 'ওয়াকিং ডেলিগেট' উপন্যাসের লেখক লেরয় স্কট ও তাহার ফাইভ ক্লাবের বন্ধুদের এই ব্যাপারে 'একটা কিছু করিতে' রাজী করায়। পরে জানা যায়, তাহাদের কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু রাস্তা হইতে তাহারা আমাকে তাহাদের 'ক্লাবে' লইয়া গেল। ক্লাব বলিতে একখানা ঘর যেখানে সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত পাঁচজন একসঙ্গে থাকিত। স্কটের স্ত্রী ছিলেন এখানকার গৃহকর্ত্রী। ইনি ছিলেন রাশিয়ান ইহুদী। সন্ধ্যায় ক্লাবের বড় বারান্দাটার চুল্লীর সামনে এই তরুণ লেখকেরা সমবেত হইতেন। আমি তাঁহাদের কাছে সাহিত্য, রুশ বিপ্লব, মস্কোর সশস্ত্র

অভ্যুত্থানের গল্প বলিতাম। (বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এন. ই বুরেনিন, স্কটের স্ত্রী এবং এম, এফ, আঁদ্রিয়েভা আমার কথাগুলি ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া দিতেন।) সাংবাদিকেরা শুনিত, নোট নিত, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "কী দারুণ কৌতূহলকর ব্যাপার—কিন্তু আমাদের কাগজে কিছুই লেখা যাবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিতাম, নতুন যুগের ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে বহিবে তাহার একটা আভাস যখন এই ঘটনাগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তখন এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে সত্যকথা কেন তোমাদের কাগজগুলি বলিতে পারে না?

কিন্তু তাহারা নিজেদের মত সহজভাবে আমার প্রশ্নটি বুঝিত, মনে করিত ব্যাপারটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত। তাই জবাব দিত :

"আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। কিন্তু আমাদের করবার কিছুই নেই। এখানে বিপ্লব দিয়ে তুমি টাকা রোজগার করতে পারবে না। যখন কাগজে বেরুল রুজভেল্ট তোমার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, রুশ রাষ্ট্রদূত হস্তক্ষেপ করে তোমার কাজ পণ্ড করল। মনে রেখো, কাগজগুলো যে ফটো ছেপেছে তা' আঁদ্রিয়েভার ফটো নয় এবং আমরা জানি তোমার প্রথম স্ত্রী সন্তানেরা দারিদ্র্য ভোগ করছে না। কিন্তু এসব কথা খোলাখুলি লেখার ক্ষমতা আমাদের নেই। এখানে ওরা তোমাকে বিপ্লবের কাজ করতে দেবে না।"

"কিন্তু ব্রেশ্‌কোভ্‌স্কায়াকে দিয়েছিল কেন?"

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না তাহারা। তাহাদের ভুল হইয়াছিল: কাজ করিতে আমি পারিয়াছিলাম, যদিও যতটা আশা করিয়াছিলাম ততটা নয়। (কিন্তু এ প্রবন্ধের বিষয় তাহা নহে।)

নিউইয়র্কের সংবাদপত্রগুলির বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা সাংবাদিকরা আমাকে জানাইতে লাগিল। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিল তাহারা। কোন ধনী ও প্রভাবশালিনী মানবসেবাব্রতিনী মহিলার বিরুদ্ধে কোন সংবাদপত্র এই অভিযোগ আনে যে, তিনি কতকগুলি গণিকালয় চালাইয়া থাকেন। খবরটিতে ভয়ানক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুইদিন পরে ঐ কাগজেই পাঁচশজন পুলিশের ফটো ছাপা হয় ও বলা হয় পরমসম্ভ্রান্ত মহিলাটি নহেন, এই পুলিশেরাই গোপনে বেশ্যালয় চালাইতেছে।

"পুলিশদের কি হল?"

"উপযুক্ত খেসারত দিয়ে তাদের বরখাস্ত করা হয়। অন্য স্টেটে তারা কাজ পাবে।"

আরেকটি দৃষ্টান্ত। একটি সেনেটরকে বে-ইজ্জত করার প্রয়োজন হয়। সংবাদপত্রে বাহির হয় যে, দ্বিতীয় স্ত্রীর সহিত তাহার বনিবনা হইতেছে না এবং বিমাতার সহিত ছেলেমেয়েদের—উহাদের সকলেই ছাত্রছাত্রী—দারুণ ঝগড়াঝাটি চলিতেছে। বৃদ্ধ ও তাহার ছেলেমেয়েরা প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। সংবাদপত্র প্রতিবাদটি ছাপিল বটে, কিন্তু তাহা লইয়া ঠাট্টা করিল। তাহার বাসভবন ঘিরিয়া ফেলিল রিপোর্টারেরা।...... (১৯৩০)

১। পণ্ডিত মূর্খ

মূঢ়তাকে কি কখনও ‘প্রকৃতির দান’ বলা চলে?

চলে না যে সে কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। যে জীবতত্ত্ব বোধশক্তিহীনদের সৃষ্টি করে, তাহাও ‘পরিবেশের’ দ্বারা, সমাজতন্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কোন কোন পণ্ডিতমূর্খ বলেন, মূঢ়কে প্রকৃতি জন্ম হইতে মূঢ় করিয়াছেন এবং প্রকৃতি যেন সচেতন চেষ্টার দ্বারা মূঢ়কে চিরজীবনের মত যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবকল্পনার শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন।

অন্ধকার প্রাচীন অতীতে একদিন প্রকৃতির আদিম শক্তির ধ্বংসোন্মত্ত রূপ দেখিয়া আতঙ্কে অভিভূত আমাদের লোমশ পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্কে এই আজগুবী ধারণার জন্ম হইয়াছিল। ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, শীতাতপের বিবর্তনের মত অন্ধদানবের ধ্বংসলীলার বিচিত্র প্রকাশে মানুষের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই আতঙ্ককেই পণ্ডিতমূর্খেরা পরে দেবতায় পরিণত করিয়াছে।

মূঢ়তা বিচারশক্তির বিকৃতি। কৃত্রিম উপায়ে ইহার সৃষ্টি করা যায় ও সৃষ্টি করা হয়। মানুষের বিচারশক্তির উপর ধর্ম ও গীর্জার চাপে এই মূঢ়তার সৃষ্টি। শ্রমজীবী জনসাধারণকে বশীভূত রাখিবার যত অস্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে আছে, তার মধ্যে ধর্ম ও গীর্জা সবচেয়ে শক্তিশালী। একথা বলিতে আমার এতটুকু দুঃখ নাই যে, এই বিষয়ে ‘নূতন’ কিছু বলিবার ক্ষমতা পণ্ডিতমূর্খদের নাই।

মূঢ়দের বুর্জোয়াশ্রেণীর একান্ত প্রয়োজন। মূঢ়দের বাদ দিয়া ‘সুন্দর জীবন’ যাপন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, মূঢ়দের শারীরিক শক্তিকে ব্যবহার করা যায় সবচেয়ে সুবিধাজনকভাবে। শ্রমজীবী

জনসাধারণের মূঢ়তার উপরই বিশ্বের ভাবজগতের অন্ধ সংকীর্ণতা দাঁড়াইয়া আছে। জনসাধারণকে শিক্ষাদানের বুর্জোয়া ব্যবস্থা পাইকারী হারে নির্বোধ তৈয়ারীর ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নহে।

আমার বিশ্বাস এই অখণ্ডনীয় সত্যের সহিত শিক্ষিত সোবিয়েত জনসাধারণ ভালভাবেই পরিচিত। বুর্জোয়া রাষ্ট্র এই মূঢ়তাকে মানুষের মনে কিভাবে সঞ্চালিত করে, দৃঢ়মূল করে, চিরস্থায়ী করিয়া তোলে তাহা তাহাদের অজানা নয়। শ্রমিকশ্রেণীর পুরোধা ভি আই লেনিন ও বলশেভিকদের দুঃসাহসী উদ্যোগ, কমিউনিস্ট পার্টির কাজ এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর সরকারের প্রচেষ্টার ফলে সোবিয়েত ইউনিয়নে এই সুপ্রাচীন মূঢ়তা দ্রুত অবলুপ্ত হইতেছে। এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে ও শাসনের স্বাধিকার সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতেছে। জনসাধারণের সৃজনীশক্তি ক্রমেই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্যভাবে জগৎ সমক্ষে প্রমাণিত করিতেছে যে, সে এমন এক শক্তি, বনিয়াদ হইতে শুরু করিয়া জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে পুনর্গঠিত করিবার ক্ষমতা যাহার পূর্ণমাত্রায় আছে। ত্রিশবৎসরব্যাপী এই নির্ভীক ও সার্থক কর্ম-সাধনা গোষ্পদ জীবনের অন্ধ সন্তোষের প্রাচীন ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছে ও দিতেছে; শ্রমজীবী মানুষের ঘাম ও রক্ত দিয়া যে বনিয়াদ শক্ত ও পোক্ত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের নবজীবন নির্মাণের মহাশব্দের ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিতেছে সমগ্র শ্রমজীবী জগৎ হইতে এবং এই জগতের মুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রামকে এই প্রতিধ্বনিই ধীরে ধীরে সংগঠিত করিয়া তুলিতেছে।

পণ্ডিত-মূর্খদের মূঢ়তার আলোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

পণ্ডিত-মূর্খ সর্বোপরি বুদ্ধিজীবী। তাহার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের মত তাহারও "সংকল্পের নিজস্ব রংটি চিন্তার মলিন আবরণে বিবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে।" হ্যামলেটের মত সেও পিতৃহীন, তাহার মা ইতিহাস তাহার উপপিতা পুঁজিপতির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ এবং এই উপপিতা পাষণ্ড হইয়াও শিল্পকে উৎসাহ দেয়, বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করে ও নিজেকে সংস্কৃতিবান জীব বলিয়া জাহির করিতে চায়।

পণ্ডিতমূর্খ নিজেকে সংস্কৃতির অধিকর্তা 'আত্মিক শক্তির মূলাধার ও সমাজজীবনের ধারক ও বাহক' বলিয়া মনে করে। সে শুধু 'একজন মানুষ' মাত্র নহে—সে বিশ্বের জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক, বিশ্বের জ্ঞানের মর্মকেন্দ্র। 'জীবনে যখন ক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন দুঃসময়' আসে, যখন জীবনের কঠোর বাস্তবের আঘাতে তাহার মধ্যে কিছুটা বালকসুলভ আন্তরিকতা দেখা দেয়, তখন সে নিজেকে ইতিহাসের চাকার বাঁধা কয়েদী বলিয়া ঘোষণা করে। একজন প্রাক্তন স্পার্টাসিস্ট একবার এই কথাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর একজন প্রাক্তন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বলিয়াছিলেন, "বুর্জোয়ারা করে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, আর শ্রমিকেরা করে আমাদের, বুদ্ধি-জীবীদের উপর অত্যাচার।" সোবিয়েত ইউনিয়নের সকল লোকের মতই সোবিয়েত সাংবাদিকরা সাধারণত বর্বর; তাই তাঁহারা পণ্ডিতমূর্খদের মাঝে মাঝে বেশ্যার

দালাল বলিয়া থাকেন। এই বেশ্যার দালালের কাজ অতি নীচ কাজ; ধনী বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের অংকশয়নের জন্য তরুণী ও তরুণদের তাহারা যোগাড় করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পেশার সহিত ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর নেতাদবে কার্যকলাপের অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু......এখানে হয়ত পণ্ডিতমূর্খেরা একটা কিন্তু আবিষ্কার করিবেন। এই কিন্তু খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি আমার নাই। 'হাঁ' ও 'না'র কঠোর যুক্তিবাদিতার উপর এই বাস্তবসর্বস্ব জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে 'কিন্তু' কথাটি 'বর্জিত মধ্যম'।

পণ্ডিতমূর্খের দৃঢ়বিশ্বাস, যে চেয়ারে সে বসিতে অভ্যস্ত সেই চেয়ারই শ্রেষ্ঠ চেয়ার. এবং যে আকৃতির চেয়ার সে পছন্দ করে সকলেই সেই আকৃতির চেয়ারে বসিবে সে এই দাবীই করে। নিজের নিতম্বদেশের আরামের মাপকাঠিতেই সে দুনিয়ার সমস্ত ঘটনার বিচার করিয়া থাকে, তাই যে পুরাতন আসবাবটির উপর তাহার যোগ্য পশ্চাদ্দেশ সমাসীন থাকে সেটি কেহ উল্টাইয়া দিবে পণ্ডিতমূর্খ তাহা সহ্য করিতে পারিবে না।

দৃষ্টান্ত দিই। ভূমিদাসত্বের আমলে রাশিয়ার জমিদারেরা ভল্‌তেয়ারীয় আরাম-কেদারায় বসিতে ভালবাসিতেন। তারপর অভিজাতশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা ভাববাদী শেলিং-এর নরম কুর্নিশের পক্ষপাতী হইয়া ওঠেন। ফুরিয়ার, মোলেশট ভগ্‌তের উপরও তাঁহারা বসিতেন। তারপর আসন পাল্টাইয়া বসিতে শুরু করেন শূন্যতাবাদের উপর। তারপর স্পেন্সার তাঁহাদের প্রিয় হইয়া ওঠেন। কারণ তিনি অনেক কথার মধ্যে একটি কথা বলিয়াছিলেন : সীসার প্রবৃত্তি হইতে কখনও সোনার আচরণ আসিতে পারে না। এই মনোরম প্রবচনটির মধ্যে সামাজিক অকর্মণ্যতা, দুর্বৃত্ততা ও মর্মান্তিক সংঘটনার প্রতি উদাসীনতার একটা সমর্থন মেলে। কিন্তু ক্রমে স্পেন্সারও অসহ্য হইয়া উঠিল এবং ঘনঘন ঘটিতে লাগিল নিতম্বস্থাপনের পাত্র পরিবর্তন। তাহারা বসিল মার্কসের উপর—বড় শক্ত। মার্কসের উপর বার্নস্টাইনের প্যাড পাতিয়া বসিল—সুবিধা হইল না। নীৎসের উপর বসিল, বসিল বের্গস'র উপর। তাহারা যে কত কুর্সীর উপর বসিল তাহার নামোল্লেখ এখানে করিব না। আজ পণ্ডিতমূর্খেরা কিসের উপর বসিয়া কে জানে? তাহাদের অনেকেই এখন নির্বাসনে। ক্রমবর্ধমান দ্রুততার সহিত এই আসন পরিবর্তনের ধারাটিকেই বলে, "রুশ বুদ্ধিজীবীর মানস জীবনের ইতিহাস।"

নির্বাসনে বসিয়া এই পণ্ডিতমূর্খের দল রচনা করে 'বৈজ্ঞানিক-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিগ্‌দর্শন', 'ঐশ্বরিক বিচারের বাণী', 'সাধুসন্তদের জীবনীমালা', 'রক্ষণশীল চার্চ কর্তৃক ব্যাপটিস্ট-জন পূজা' সংক্রান্ত গবেষণাপুস্তক এবং সাধারণভাবে গভীর অধ্যবসায়ের সহিত তাহারা দার্শনিক মিস্ত্রীগিরির কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং চেষ্টা করে এমন কুর্শী তৈয়ারী করিবার যাহাতে আরামে বসা যায়।

প্রবাসীদের সংবাদপত্রে এই ধরনের সব গবেষণালব্ধ তথ্যবর্ণনা পাওয়া যায় :

"আবিসিনিয়ার নৈষ্ঠিক পুরোহিতেরা পূজার সময় নৃত্য করে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যে ইথিয়োপিয়ানদের 'ইথিওপিয়ার সুযোগ্য অধিবাসী' বলিয়া হোমর

বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন সেই ইথিওপিয়ানদের আত্মার মধ্যে নৈষ্ঠিক ধর্ম আপনার যে রূপটি দেখিতে পায়, রুশ আত্মার মধ্যে প্রতিবিম্বিত রূপ হইতে তাহা স্বতন্ত্র।

"ফরাসী ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে মানুষ হইয়াছে এমন একটি রুশ বালিকাকে আমরা জানি যে সেদিন তাহার মার নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে,

"'সেখানে স্নান করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সেখানে সেমিজ পরিয়া স্নান করিতে হয়।'

"'কেন?'

"'আমিও ত বলি, কেন? স্নানের ঘরে ত আমি একা ও দরজাও বন্ধ। কিন্তু ওরা বলে, 'একা কি রকম? নিশ্চয়ই একা নও। তোমার অভিভাবক দেবদূত? তিনি কি সব সময় তোমার সঙ্গে নেই?'

"ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীমঠের এই মধুর শিশুসুলভ সরলতায় সত্যই আমি মুগ্ধ। কিন্তু আমাদের অভিভাবক-দেবদূতের ধারণার সহিত এ ধারণা মেলে কি?"

কথাগুলি লিখিয়াছেন একজন প্রাক্তন ঔপন্যাসিক। ১৯০৫ সালে ইনিই 'সোশ্যাল রিভলিউশনারী' সংবাদপত্রের একজন নামকরা লোক ছিলেন। হায়! পশ্চাদ্দেশ ভারী হইবার কী মর্মান্তিক পরিণতি!

এইসব হাসির ব্যাপার এখন থাক। যদিও এগুলি ছাড়িয়া ওঠা কঠিন। কমরেড এস, বি, উরীৎস্কির লেখা 'সর্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক অভিযান' নামক চমৎকার বইখানি আমি সম্প্রতি পড়িয়াছি। বইখানি পড়িবার পর মনটা বেশ প্রফুল্ল আছে।

আগেকার আমলে এক ধরনের সরকারী কেরানী ছিল। তাহাদের বলিত 'চ্যান্‌সেলারিস্ট'। কথাটি আসিয়াছে 'কেন সে'ল আরিয়া' কথাগুলি হইতে; মানে খোলা জায়গার কুকুর অর্থাৎ দুয়ারে অথবা সিংদরজায় কুকুর। এই চ্যান্‌সেলারিস্টদের বলিত 'কালিমাখা আত্মা'। পণ্ডিতমূর্খ অবশ্য ঠিক 'চ্যান্সে-লারিস্টের' মত নয়; তাহার আত্মা কেতাবী আত্মা। কিন্তু সেও বাস্তবের সিংদরজার বাইরে বাস্ করে এবং সিংদরজার নীচু দিয়া বাহিরের জগতের দিকে তাকাইয়া দেখে।

পণ্ডিতমূর্খ বিভিন্ন বিষয়ে হয়ত ষোলো হাজার বই পড়িয়াছে। পরের চিন্তা আত্মসাৎ করিবার এই আধাযান্ত্রিক মেহনতের ফলে নিজের মগজের পরিধি ও শক্তি সম্পর্কে তাহার মনে একটা ভীষণ বড় ধারণা জন্মিয়াছে। অবশ্য, ভর্তি-শস্যের পরিমাণ লইয়া গর্ব করিবার অধিকার নিশ্চয়ই শস্যভর্তি থলির আছে। কিন্তু দেখা যায়, পণ্ডিতমূর্খের জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ে, তাহার মতপরিবর্তনের ক্ষেত্রও তত বিস্তৃত হইতে থাকে।

এমন অনেক ঘটনাই আপনারা জানেন যখন কোন পণ্ডিতমূর্খ আরামপ্রদ বসিবার আসন খুঁজিতে গিয়া মার্কসবাদ হইতে শুরু করে ও পরে নৈষ্ঠিক দুর্বোধ্যতাবাদী হইয়া ওঠে; শুরু করে বলশেভিক হইয়া, শেষ হয় গীর্জা-প্রধানরূপে।

কোন কোন পণ্ডিতমূর্খ বলেন, এই ঘন ঘন মত পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই

চিন্তার স্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পরিশেষে, বই পণ্ডিতমূর্খকে জ্ঞানদান না করিয়া অন্ধ করে এবং তাহার আত্মার নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও সংগতির সুর হারাইয়া যায়।

বইগুলি তাহার কাছে স্ববিরোধিতার উৎস। সামাজিক বাস্তবতার ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণী অপেক্ষা এই স্ববিরোধিতাই তাহাকে উদ্বিগ্ন ও পীড়িত করে অনেক বেশী। বাস্তবতা চায় যে, বইয়ের পাতায় পাতায় তাহার বিকাশ ও গতি প্রতিবিম্বিত হোক। নূতন শ্রেণীর কর্মশক্তি ও সৃজনীশক্তিতে এই বাস্তবতা আজ যতই বেশী ভরিয়া উঠিতেছে, যতই দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে, ততই পুরাতন বাস্তবতার পুঁথির প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে। কিন্তু পণ্ডিতমূর্খেরা চায়, পুঁথি বাস্তবকে নহে, বাস্তবই পুঁথিকে অনুসরণ করুক। ইহাদের একজন সম্প্রতি আমাকে লেনিনগ্রাদ হইতে গুরুগম্ভীরভাবে লিখিয়াছেনঃ

"একটি জিনিস লইয়াই আজ আমরা বাঁচিয়া আছি : রাজনীতি। কিন্তু রাজনীতি তো সরকারী শাসন পরিচালনা ও সরকারী কার্যকলাপের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই জন্যই জারের মন্ত্রীদের ও বড় বড় পদাধিকারীদের বিপ্লবের দরবারে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। তাহা হইলে আমাদের কিসের অভাব? অভাব আমাদের 'অস্তিত্বের'। কেন? কারণ এই 'অস্তিত্ব' বিশ্ব-সৃষ্টির অনুষঙ্গ এবং আমাদের কোন বিশ্বসৃষ্টিই নাই।

এই চিন্তার 'মৌলিকত্বের' মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সিংদরজার তলা হইতে জীবনের যে রূপটি দেখা যায়, ইহা তাহারই খুবই স্বাভাবিক 'অভিব্যক্তি'। পণ্ডিতমূর্খ পুঁথির কদর করে, পুঁথিতে সে বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন তাহাকে বলা হয়, সোবিয়েত ইউনিয়নে বই-এর চাহিদা হু-হু করিয়া বাড়িতেছে, ১৯২৭ সালে ছাপা হইয়াছিল ৪৬২,০০০,০০০ স্বাক্ষর এবং ১৯৩০ সালে ১,৩৬৫, ০০০,০০০, তখন পণ্ডিতমূর্খ খুশী হয় না। সে বলিবে, "ঠিক ধরনের বই ছাপা হইতেছে না, বইগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সত্যনিষ্ঠ নহে, বইগুলি লিখিতেছে বিধর্মীরা কারণ বস্তুবাদ বিধর্মী সংস্কৃতিবিরোধী তত্ত্ব।"

পণ্ডিতমূর্খের দৃঢ় বিশ্বাস, সে যদি তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য লইয়া জাগতিক ব্যাপারে যোগ না দেয়, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে তাহার একমাত্র অবদান হইতে পারে বাচালতা। সে যে সব কিছুই জানে ও কোন কিছুই যে তার বুঝিতে বাকী নাই এ বিষয়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা জীবননির্মাণকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং এই কাজকে মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়া গ্রহণ করে তাহাদের চরিত্রে বিনয় ও কোন কিছু বিচারে সতর্কতা দেখা দেয়। কেতাবীপনার জন্য এই বিনয় ও সতর্কতার কোন চিহ্নই নাই পণ্ডিতমূর্খদের মধ্যে। কোন এক স্থান হইতে, ধরুন প্রাগ হইতে, একজন পণ্ডিতমূর্খ লিখিতেছেনঃ

"আমি জানি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব শোচনীয়।" প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই জানেন না। শ্রমিকশ্রেণী ও অগ্রণী কৃষকশ্রেণীর কার্যের ফলে

সোবিয়েত ইউনিয়ন আজ উন্নতির কোন্ শিখরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তিনি একদম জানেন না। একটি ছোট পাড়াগাঁয়ের অধিবাসীদের অবস্থা যেভাবে বিচার করা হয়, ঠিক সেইভাবে তিনি ১৬ কোটি লোকের অবস্থা বিচার করিতেছেন।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়াছেন, "পাঁচশালা পরিকল্পনা চলিতে পারে না।" কিন্তু তাঁহার জানা উচিত শ্রমিকদের উদ্যোগের ফলে পাঁচ বৎসরকে কমাইয়া চারি বৎসর করা হইয়াছে। সাধারণভাবে একথা ইনি মানিতে চান না, যে শক্তির অস্তিত্ব তাঁহার একেবারেই অজানা ও যে শক্তির পরিচয় তিনি কখনও কোথাও পান নাই সেই শক্তিই আজ সোবিয়েত ইউনিয়নে কাজ করিতেছে। এ শক্তি শ্রমিক ও কৃষকদের বন্ধনমুক্ত শক্তি এবং তাহারা ক্রমেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছে যে, তাহারাই তাহাদের দেশের আইনসম্মত প্রভু, তাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের নিজেদের জন্য এবং সেইজন্য নিঃস্বার্থভাবে বীরের মত সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কাজ করিতে হইবে।

এই চেতনা ছাড়া এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটিকে তুমি কি করিয়া ব্যাখ্যা করিবে যে, তৈল ও পীট শিল্পে ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে যে উৎপাদনের কথা ছিল, ইতিমধ্যেই ঐ দুইশিল্পে যথাক্রমে শতকরা ৮৩ ও ৯৬ ভাগ উৎপাদন হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ, এই দুই শিল্পের শ্রমিকেরা পাঁচসালা পরিকল্পনাকে আড়াই বছরে পূর্ণ করিতেছে। যন্ত্রনির্মাণশিল্প ইতিমধ্যেই তাহার পাঁচ বছরের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগে পেঁছাইয়া দিয়াছে। ইহার অর্থ, যন্ত্রনির্মাণ শিল্প, পাঁচবছরে নয়, তিনবছরেই তাহার পরিকল্পনা পূর্ণ করিবে। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা।

ইহার দ্বারা কি বুঝা যায়? বুঝা যায় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কী প্রচণ্ড শক্তির ভাণ্ডারই না ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বুঝা যাইতেছে, চাষী যে আর প্রকৃতির মর্জির উপর নির্ভর করিয়া জমির ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে চাহে না, তাহার প্রমাণ, আমাদের দেশের শতকরা ২২ জন চাষীই সমবায়ী খামারে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া যাহারা জমির ক্রীতদাস হইয়া আসিতেছে তাহারা আজ যে বুঝিয়াছে প্রকৃতির সহিত যুঝিতে হইলে চাই যন্ত্র, চাই সার, চাই সর্বাধুনিক সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

যৌথ খামারের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে, এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঘটনার সহিত ঘটনার কি করিয়া তুলনা করিতে হয়, কি করিয়া এই তুলনা হইতে সিদ্ধান্তে আসিতে হয়, চাষীরা তাহা জানে। ঘটনা ঘটিতেছে এই-রূপ : ক্রাস্‌নি পার্টিসান যৌথখামার হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, যখন ফসল ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে তখন প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক ন্যূনপক্ষে ৭০০ রুবল্‌ করিয়া পাইবে। এই আয় একজন সমবায় বহির্ভূত কৃষকের স্বপ্নের অতীত।"

শ্রমিক ও কৃষকের শক্তি বিস্ময়কর গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। পুঁজিপতিদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ নহে তাহারা ইহা স্বীকার করিতেছে যদিও এই শক্তিবৃদ্ধিতে তাহারা কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছে। কিন্তু পণ্ডিতমূর্খ কিছুতেই তাহার

খুঁটি ছাড়িবে না। কারণ সে ব্যথা পাইয়াছে, প্রাতরাশের সহিত যথেষ্ট ডিম ও মাখন পাইতেছে না বলিয়া আরাম পাইতেছে না। "অর্ধশিক্ষিত, মাতাল ও অলস মজুর এবং অশিক্ষিত অধঃপতিত চাষী কি করিয়া পুঁজিপতির সহিত প্রতিযোগিতায় জিতিতেছে, তাহা আমার কল্পনায় আসে না। আমরা আমাদের দেশকে জানি, দেশের জনশক্তির প্রকৃতিও জানি এবং ইহাও জানি যে যখন পি, বি, স্ট্রুব বলেন সৃজনীশক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই থাকিতে পারে, তখন তিনি সত্য কথাই বলেন।"

কি গগনচুম্বী জ্ঞান! কি বিজ্ঞতা! জানি না স্ট্রুব কবে, কোথায় শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে এত চমৎকার কথা লিখিয়াছেন; মোটে লিখিয়াছেন কি না তাহাও জানি না। 'সৎ রাশিয়ান' স্বাক্ষরে যাঁহারা আমার কাছে চিঠি লিখিয়াছেন তাঁহারা স্ট্রুবের উক্তির ভুল উদ্ধৃতি দিয়াছেন কি না তাহাও আমার জানা নাই।

এই 'সৎ রাশিয়ান' পণ্ডিতমূর্খেরা ঘটনাবলী সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বিজ্ঞতার মতই গভীর। এই জ্ঞানের বহর হইতে আমি যেন মানসিক ব্যাধির আভাস পাইতেছি। ভাবিয়া আশ্চর্য হই, যখন এই পণ্ডিতমূর্খেরা 'জনশক্তির' কথা বলে, শ্রমিক ও কৃষকের কথা বলে তখন 'নারীদের' কথা তাহারা ভুলিয়া যায়। 'জনশক্তি' হিসাবে নারীরাও আজ জাগিয়া উঠিয়াছে ও কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিতমূর্খদের মানসিক বিভ্রান্তি বিভিন্ন, বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত দিই। একটি পণ্ডিতমূর্খকে যখন বলা হইল, জর্জিয়া ও আবখাজিয়া রিপাবলিক দুইটিতে গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিদের চাষ ভালভাবেই চলিয়াছে এবং বিপ্লবের আগে কৃষ্ণসাগর উপকূলে যেখানে ২৫০ দেসিয়াতিন চায়ের চাষ হইত আজ ১৯৩০ সালে সেখানে ২০,০০০ হেক্তারের চায়ের চাষ হইতেছে, পণ্ডিতমূর্খটি তখন বিদ্রূপের স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করিল, "নিশ্চয়ই তোমরা চীনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চাও না।" আর কিছুই সে বলিল না। অথচ ইনি একজন শিক্ষিত লোক, বৈজ্ঞানিক, উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ।

'জনসাধারণের' জন্য তাহাদের ভাবনা ও ভালবাসার কথা পণ্ডিতমূর্খেরা প্রায় গর্বভরে ঘোষণা করিয়া থাকে। জমিদার ও পুঁজিপতিদের নৃশংস অব্যবস্থাপূর্ণ শাসনকালে 'জনসাধারণের' সহিত তাঁহারাও কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন একথা প্রায়ই তাঁহারা স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু, এখন যখন শ্রমিক ও কৃষকেরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের শাসনের উচ্ছেদ করিয়া নিজেরাই নিজেদের দেশের প্রভু হইয়াছে, নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছে, এবং সারা জগতের শ্রমিকদের শিখাইতেছে কিভাবে সমাজতন্ত্র গড়িতে হয়, তখন আশা করা গিয়াছিল 'জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশায় বিগলিতপ্রাণ' এইসব ব্যক্তি কাঁদুনীর কারবার ছাড়িয়া দিয়া শান্তভাবে বসিয়া শ্রমজীবী জনসাধারণের বিশাল আত্মোদ্যোগের এবং দেহ ও মস্তিষ্কের কর্ম-সাধনার সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের সৃজনী শ্রমশক্তির প্রশংসা করিবেন। ভাবা গিয়াছিল পণ্ডিতমূর্খেরা এখন কোরাসে গাহিবেন: "প্রভু, তোমার ভৃত্যকে এখন

শান্তিতে যাইতে দাও," এবং আত্মার সর্বশেষ বিশ্রান্তির জন্য তাহারা এইবার চিন্তাধারাকে কবরের দিকে ফিরাইবে। ফিরাইবার এইত সময়।

নিজেদের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক কীর্তি ও অগ্রগতি তাহাদের চোখে পড়ে না। তাঁহাদের প্রতিটি ত্রুটি তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখেন। শ্রমিক-কৃষকদের 'আত্মসমালোচনা'গুলি 'কুশাসনের ট্রাজেডি' নহে; এই আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়াই জনসাধারণের শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, আত্মোদ্যমে জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া ওঠে, শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে এই চেতনা সঞ্চারিত হয় যে, তাহাদের ভুল, ত্রুটি, অপরাধ, অসাবধানতা, অব্যবস্থার জন্য তাহারা রাষ্ট্রের নিকট দায়ী। অথচ এই 'আত্মসমালোচনা' হইতেই পণ্ডিতমূর্খেরা শ্রমিক-কৃষকের শাসনব্যবস্থার একটা পতনের ছবি আঁকেন। কারণ, আত্মসমালোচনার তাৎপর্য পণ্ডিতমূর্খদের মাথায় ঢোকে না, কারণ তাহারা অন্য জিনিষ লইয়া ব্যস্ত।

তাঁহারা লিখিতেছেন: "ইভান ইভানোভিচ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইনি অভিজাতদের মধ্যমণি। তাঁহাকে জানিতাম........."

শ্রমিক ও কৃষকের সরকার ও ইচ্ছাশক্তি যে নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছে, সিংদরজার ছিদ্র ও ফাটল দিয়া তাহা দেখিয়া পণ্ডিতমূর্খেরা মনে করিতেছে তাহারা সব কিছুই দেখিয়াছে, জানিয়াছে। একটি মাত্র জিনিষ তাহারা অবশ্য ভাল জানে—তাহারা জানে তাহাদের জ্ঞাতিভাই পণ্ডিতমূর্খেরা তাহাদের ক্ষীণ শক্তি দিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে রাশিয়ায় আবার নির্বোধতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে, আবার বুর্জোয়া ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে। হয়ত তাহারা বুঝিতেছে, শ্রমিক-কৃষকের সরকার যত দৃঢ় পদে সমাজতান্ত্রিক অভিযানে অগ্রসর হইবে, ততই বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহার প্রতি অনিবার্য ধ্বংসের পরোয়ানাপ্রাপ্ত এই আবিলদৃষ্টি নির্বোধদের বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ নিজের আবহাওয়া নিজেই সৃষ্টি করে। স্বভাবতই পণ্ডিতমূর্খদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিষে বিষাক্ত হইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে তাহাদের আভিজাত্যকে উপেক্ষা করিয়া বাক্য ও কাব্যের স্বাধীনতার সুযোগ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিতে হইবে।

একজন পণ্ডিতমূর্খের প্রতিটি কথা আমার মনে আছে, এই কথাগুলির আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ উঠিতে পারে না। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কেন তিনি নিজেকে 'অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে দিলেন', তিনি বলিয়াছিলেন :

"পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমরা ছিলাম পুঁজির সেবায় নিয়োজিত—যদি এই-ভাবে বলা যায়—কিছুটা উচ্চপদস্থ অফিসার। আমাদের সাহায্যেই পুঁজিবাদ শ্রমিকশোষণ চালাইত। পুঁজিবাদের মধ্যেই এই শোষণ নিহিত এবং পুঁজিবাদের আমলে এই শোষণ অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে একটা বিশেষ ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়। এই ভাবাদর্শই আমাদের শ্রমিকশ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করাইয়াছে।"

পণ্ডিতমূর্খদের 'আত্মিক' সহকর্মী এই ব্যক্তির এই উক্তিটি দিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। (১৯৩০)

॥ বৃদ্ধ ॥

'জা রুবেজোম' (বিদেশ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যে প্রশ্নমালা প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্পাদকগণ তাহার অনেকগুলি গুরুগম্ভীর ও শিক্ষাপ্রদ উত্তর পাইয়াছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন আছেন 'অফিস কর্মচারী অদলীয় সোশ্যালিস্ট, বয়স সাড়ে ষাট।'

প্রশ্নগুলির জবাব তিনি দেন নাই, বলা যায় প্রশ্নগুলিকে তিনি ডিঙাইয়া গিয়াছেন। সর্বপ্রথমে তিনি বলিতেছেন, "স্বদেশের ও বিদেশের জীবনযাত্রার সত্য বিবরণ দেওয়া হইবে বলিয়া পত্রিকাখানির প্রত্যাশাপত্রে (প্রস্পেক্টাস) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।" এইখানেই তিনি ভুল করিয়াছেন। স্বদেশের জীবনযাত্রার বিবরণ থাকিবে, এমন কোন কথাই প্রত্যাশাপত্রে নাই। বরঞ্চ উহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, নামের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া পত্রিকাতে শুধু বিদেশের জীবনযাত্রার কথাই থাকিবে। এই ভুলের জন্য বোধ হয় বৃদ্ধের 'অদলীয়' দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাই দায়ী। অবশ্য এ বয়সে এ রোগ সারিবার নহে।

কিন্তু শেষে দেখা যাইতেছে এই ভুলের মধ্যেই বৃদ্ধের 'ভিতরটি' প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে এই বৃদ্ধ একজন মানবপ্রেমিক। 'পার্টি হইতে বিতাড়ন' সম্পর্কে আমাদের পত্রিকায় আমরা কিছু লিখি নাই বলিয়া তিনি আমাদের তিরস্কার করিয়াছেন। এই বিতাড়নকে তিনি 'অহেতুক উৎপীড়ন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অহেতুক, কেননা, তাঁহার মতে "এমন কোন মানুষ পাওয়া যায় না যাহার কোনই নৈতিক দুর্বলতা নাই।"

এখানে বলা উচিত যে, রাজনীতিগতভাবে, মানুষের ত্রুটি-দুর্বলতা সম্পর্কে এই 'মানবপ্রেমিক' দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণাম আমাদের বর্তমান অবস্থায় ব্যবহারিক

ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। 'দুর্বলতাদুষ্ট', 'নৈতিক দৃঢ়তাহীন', 'আনুগত্য-হীন', 'সোবিয়েত-বিরোধী মনোবৃত্তিসম্পন্ন' ব্যক্তিবিশেষেরা এবং সাধারণভাবে অপদার্থরা রাষ্ট্রবিরোধী অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে কতখানি কাজে লাগে, তাহা 'ধ্বংসকারীগণ' তাহাদের খোলাখুলি সাক্ষ্যদানে বার বার এমনভাবে স্বীকার করিয়া থাকে যে উহা অবিশ্বাস করা যায় না। 'পার্টি পরিষ্কার' অভিযানে ইহাদেরই পার্টি হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হয়। এই কথাকে বুদ্ধ শুধু 'উৎপীড়ন' বলিতেছেন না, বলিতেছেন 'অহেতুক উৎপীড়ন'। 'অহেতুক উৎপীড়ন' কথাটি তিনি যখন উচ্চারণ করিতেছেন তখন ধরিয়া লওয়া চলে যে, হেতুসংগত উৎপীড়ন বলিয়া পদার্থ আছে।

এই মানবপ্রেমিক বুদ্ধ লিখিয়াছেন,—ঠিকই লিখিয়াছেন যদিও ভাষার ভুল ন—"ধনী কৃষক উচ্ছেদ য়েত ইউনিয়নে যে সর্বহারা-হীনতার অবস্থা (ডি-প্রোলেটারিয়ানাইজেশন) সৃষ্টি এই পার্থিব জগতে তাহা অন্য কোথাও দেখা যায় না।"

সত্যই ত। আমাদের দেশ সোবিয়েত ইউনিয়নে যে প্রয়োজনীয় কাজ আজ এতখানি সাফল্যের সাথে শুরু হইয়াছে, এই পার্থিব জগতের অন্য কোথাও শ্রমিক-শ্রেণী এখনও তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। **যদিও সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণ যে অনিবার্যভাবেই আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় বা সন্দেহ নাই।** এবং এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট : প্রকৃতির আদিম শক্তির নিরীহ ক্রীতদাস যে কৃষকশ্রেণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শোষিত হইতেছে এবং সঙ্গে সংগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের মধ্যেই নৃশংস শোষণকারীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদিগকে জমির ক্রীতদাস থাকিবার পরিবর্তে জমির মালিক হইবার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ, যে পরিবেশ হইতে পুঁজিবাদের দুঃসহ ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে। জার্মান ক্যাথলিক 'নুয়ে ভোক' পত্রিকায় সম্প্রতি হামেলরাট নামক একজন লেখক লিখিয়াছেন : "**এই সংহত শক্তিই পুরাতন জগতকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া নূতন জগতের সৃষ্টি করিতেছে।** সত্তর লক্ষ চাষী পরিবার, গ্রামাঞ্চলের দুই কোটি মানুষ যৌথ কৃষিতে যোগ দিয়াছে। যৌথ কৃষি আন্দোলনের মূল শক্তি গরীব চাষী। এখানে এই যৌথকৃষি আন্দোলনে পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য বহু আগেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। ....যতখানি করা হইয়াছে সোবিয়েত সংবাদপত্র তাহার বর্ণনায় মুখর হইয়া থাকে না, আরও অগ্রসর হইবার জন্য অবিশ্রাম সম্মুখে ঠেলিতে থাকে। সোবিয়েত সংবাদপত্রে যখন বিপদ ও ব্যর্থতার কথা বলা হয় তখন তাহাতে উল্লসিত না হইয়া বিস্মিত হওয়াই উচিত, কারণ, যে অদম্য কর্মশক্তি ইহাদের অবিশ্রাম সম্মুখে চালিত করিতেছে ইহা তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। '**এই যৌবনোচিত অদম্য কর্মশক্তিই সব কিছু নির্ধারণ করিবে।** বহির্জগতের উপর নির্ভরশীলতা রাশিয়ার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য তাহার বড় রকমের ত্যাগের প্রয়োজন হইতেছে এবং সে ত্যাগ সে করিতেছে। আগামী

কয়েক দশকের বিশ্বরাজনীতির গতি ও প্রকৃতি পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করিতেছে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।"

কথাগুলি এমন একব্যক্তির যিনি আমাদের বন্ধু নহেন এবং তার উপর তিনি একজন ক্যাথলিক, এমন এক ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্য যাহার প্রধান আমাদের 'অদলীয় সোশ্যালিস্টের' দেশের ও জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু নিজের জাতির এই নবজাগরণ সম্পর্কে অথবা নিজের মাতৃভূমির শ্রমিকশ্রেণীর 'সংহত কর্ম-শক্তির' দ্বারা সাধিত বিপুল নির্মাণকার্য সম্পর্কে এই মানবপ্রেমিক বন্ধুর কোন কৌতূহল অথবা আগ্রহ নাই। তিনি আমাদের জানাইতেছেন যে, "তিনজন করিয়া কুলাককে একসঙ্গে মাদুরে জড়াইয়া বাহিরে পাঠানো হইতেছে"—সম্ভবত হাসপাতালে।

কি করিয়া মাদুর তৈয়ারী হয় তাহার কিছুটা ধারণা বর্তমান লেখকের আছে। তিনটি মানুষকে একসঙ্গে বাঁধা যায়, এমন আয়তনের মাদুর আছে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। এই মাদুরের ব্যাপারটা তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু 'অদলীয়' নিন্দুক ও সত্যনিষ্ঠদের বেলায় এই ধরনের তুচ্ছ জিনিষগুলিই সব সময়েই অত্যন্ত বৈশিষ্টপূর্ণ হইয়া থাকে। এই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন তাঁহার সত্যকে জোরের সহিত ঘোষণা করেন, তখন মিথ্যা কথা বলিতে তাঁহার দ্বিধা হয় না। 'জীবনের সত্য ও নিরপেক্ষ বিবরণ দিবার প্রতিশ্রুতিমত কার্য করিবার' আবেদন জানাইয়া মানবপ্রেমিক বন্ধুটি তাঁহার পত্র শেষ করিয়াছেন। সম্পাদকেরা পূর্বে যাহা বলিয়াছেন সেই কথাই শুধু আবার বলিতে পারেন অর্থাৎ জা রুবেজোম-এর বা বিদেশের জীবনযাত্রার বিবরণই তাঁহারা দিবেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও সাধারণভাবে বৈদেশিক জগতের মানুষেরা যে মোটেই স্বর্গীয় সুখে দিন যাপন করিতেছে না; সেখানকার মালিক ও মজুর, জমিদার ও চাষী, প্রভু ও কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেমের বন্যা বহিতেছে না, এক কথায় সেখানে যে মানুষ শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে চির-আনন্দে হাবুডুবু খাইতেছে না; ইহা দেখানই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। বিদেশের বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান ও শিল্প-ক্ষেত্রের সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাকেই সম্পাদকেরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহাদের কাজ যে তাঁহারা এখন পর্যন্ত পূর্ণভাবে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারেন নাই, সে বিষয়ে সম্পাদকেরা সম্পূর্ণ সচেতন।

কিন্তু, বিদেশের জীবন্ত ও রাজনৈতিক অবস্থার নিরপেক্ষ বিবরণ দানের প্রতিশ্রুতি এই মানবপ্রেমিক বন্ধুকে সম্পাদকরা দিতে পারেন না। নিরপেক্ষতার অর্থই আবেগহীনতা। আমরা আবেগবান মানুষ; আমরা আবেগের সহিত ঘৃণা করি। আমরা পক্ষপাতী হইব। পছন্দ না হয়, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর। আঠারো হইতে সত্তর ও তদূর্ধ্বের অদলীয় বা দলীয় বন্ধুরা আমাদের দৈনন্দিন সংবাদপত্র পড়িয়া তাহাদের সত্যের পিপাসা পূর্ণভাবেই মিটাইতে পারেন, যেখানে সোবিয়েত বাস্তবতার সত্য বিবরণ আবেগ ও নির্মমতার সহিত পরিবেশন করা হয়। যে আবেগ ও নির্মমতার সহিত অলস, অপদার্থ, গুপ্ত অন্তর্ঘাতক, প্রবঞ্চক, চোর, নির্বোধ ও অশ্লীল রুচিবিলাসীদের ধিক্কার জানান হয় তাহাতে সমস্ত বয়সের

বৃদ্ধদের বুকেই যৌবনের বান ডাকে। তাহারা যখন আমাদের ভুল, অব্যবস্থা, নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বৃত্ততার কথা পড়ে, আমরা জানি তখন তাহারা তাহাদের কবরের কিনারে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, আমাদের ত্রুটি অপেক্ষা আমাদের কীর্তির পরিমাণ অনেক বেশী এবং আমাদের সবচেয়ে মৌলিক কীর্তি সেই 'সংহত কর্মশক্তি' যাহা অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে পারে।

এই বৃদ্ধ তাহার বয়স অনেক কম বলিয়াছেন। তাহার বয়স সাড়ে একষট্টি নয়, তার অনেক বেশী; বয়স তাহার অসংগতরূপ বেশী। তিনি তাহার দলের একজন নহেন, তিনি সেই বৃদ্ধ জাতের প্রতীক যাহাদের সম্পর্কে নিয়াপোলিটান গিওর্দানো ব্রুনো ১৫৮৩ সালে লিখিয়াছিলেন :

"দুর্ভাগা জাতিগুলিকে ইহারা যে শান্তি ও সুসংগতি দিতে চায় তাহার স্বরূপ কি? ইহাই কি তাহাদের কামনা ও স্বপ্ন নহে যে, সারা জগত তাহাদের হিংস্র উদ্ধত অজ্ঞতা মানিয়া লইবে ও তোষণ করিবে তাহাদের শয়তানী প্রবৃত্তিকে, কিন্তু তাহারা নিজেরা ন্যায়ের নীতির ধার ধারিবে না?"

তাহার 'এক্সক্রুশন অব দি ট্রায়াম্ফান্ট বিস্ট্' ও 'দি হীরোয়িক এনথুসিয়াজম্' নামক বই দুখানিতে তিনি এই ধরণের অনেক কথাই লিখিয়াছিলেন বলিয়া বৃদ্ধের দল গিওর্দানো ব্রুনোকে সাত বছর জেলে আটকাইয়া রাখিয়া শেষে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিয়াছিল। কার্ডিনাল গাসপার সোপে নামক বৃদ্ধদের একজন ব্রুনোর চিতাভস্মের পাশে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়াছিল :

"অগ্নিশিখা তাহাকে জঠরস্থ করিয়াছে, অগৌরবের মৃত্যু মরিয়াছেন তিনি। আমার মনে হয়, নিজের কল্পনাবলে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখানেই গিয়াছেন তিনি, রোমকরা কিভাবে পাপীর সহিত ব্যবহার করে সেখানকার অধিবাসীদের তাহাই জানাইয়া দিতে।"

দেখা যাইতেছে, চারিশত বছর আগে বৃদ্ধরা যতখানি শয়তান ও দুর্বৃত্ত ছিল, এখনও ততখানিই আছে। গিওর্দানো ব্রুনোকে হত্যা করিয়া কার্ডিনাল শোপে যেমন উল্লাস করিয়াছিলেন, আমাদের আধুনিক যুগের বৃদ্ধেরাও ঠিক তেমনই জরেস, লাইবনেকট্, রোজা লুক্সেমবুর্গ, সাক্কো-ভানজেত্তি ও আরও অনেক বীর-বীরাংগনার হত্যায় উল্লাস করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধদের আয়ুষ্কালের এই দানবীয় দীর্ঘতা শুধু দুঃখের নহে, অসহ্যও বটে। যে জীবন এই 'বৃদ্ধদের' সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যে কত স্রোতহীন ও অসাড়, 'ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের' পরিবর্তন যে কত ধীরে ধীরে ঘটে ইহাই তাহার প্রমাণ। সংগে-সংগে আবার ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্যক্তি ক্রমেই তুচ্ছ হইয়া আসিতেছে, এবং 'ইতিহাসের গতির উপর' ব্যক্তির প্রভাব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ব্যক্তির এই ক্ষয় ও হ্রাস ইউরোপীয় সাহিত্যে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তঃশক্তির বৃদ্ধি, বিকাশ ও পরিশেষে বিলোপের ইতিহাসের জীবন্ত টীকা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই সাহিত্যে।

ভণ্ড, প্রতারক, ধর্মান্ধ, 'মুনাফাবাজ শয়তান' প্রভৃতি বুর্জোয়া জগতের

স্তম্ভপ্রতিম কতকগুলির চরিত্রের স্মরণীয় ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন সাহিত্যরথীরা। আমাদের কালে এই সব স্তম্ভগুলি চুপসাইয়া গিয়া ব্রিয়াণ্ড-চেম্বারলেন প্রমুখ এমন সব মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে যাহারা বুর্জোয়া-রাষ্ট্র নামধারী মুগীর খাঁচাটিকে তালি দিয়া কোনমতে ঠিক রাখিতেছে। আমাদের সাহিত্য-পণ্ডিতেরা যদি এই মূল সাহিত্য-চরিত্রগুলির জীবনকথা লিখিতে পারেন, তবে আমাদের তরুণদের শিক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজ করা হয়। এইগুলি হইবে ব্যক্তির অধঃপতনের কৌতূহলোদ্দীপক ছোট ছোট ইতিহাস। যেমন, সুবিধান জন্য অলিভার ক্রমওয়েল চরিত্র লওয়া যায় এবং তাহার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত কতকগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়া দেখান যায় কেমন করিয়া এই চরিত্রটি আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কির বামনমূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতীতের 'মহাপুরুষেরা' যে বর্তমান বৃদ্ধদের রক্ত সম্পর্কিত পূর্বপুরুষ তাহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের বৃদ্ধদের আয়তন বা গুরুত্ব তাহাতে একচুলও বাড়ে না। মহাপুরুষেরা চুপসাইয়া কতটুকু হইয়া গিয়াছেন, শুধু তাহাই চোখে পড়ে।

আমাদের বৃদ্ধটি একজন যোগ্য ব্যক্তি বটে, কিন্তু তিনি প্রতীক ও প্রতিনিধি। নিজের প্রতি ভালবাসা, বিভিন্ন ভগবদ্বাণী হইতে সংকলিত 'চিরন্তন সত্যের' প্রতি ভালবাসা, কথার দ্বারা যে 'জটিল সমস্যাবলীর' সমাধান হয় না সেইগুলির প্রতি ভালবাসা তাহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ছাব্বিশ বছরের এক বৃদ্ধ লিখিতেছেন, "কে এই আমি যে এখানে বসিয়া আছি ও সমস্ত জীবিত-বস্তুর মতই মৃত্যু যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।"

একলেসিয়াস্টেসের (বাইবেলের) চমৎকার বাণীটির আজ এ কি পরিণতি! অলস, অকর্মণ্য, নির্বোধের দল এইভাবে সুন্দর সবকিছুকেই বিকৃত করিতেছে। তাহাদের কাছে নিজেদের পায়ের কড়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জগতে আর কিছুই নাই। কথার কথা নহে। সত্যই একজন লিখিতেছেন, "আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ তৈয়ারী করিতেছি, কিন্তু পায়ের একটি সামান্য কড়া সারাইতে আজও শিখিলাম না।" ঐশ্বরিক রাজকীয় ভঙ্গীতে আর একজন বলিতেছেন, "বাস্তবতা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, আমাকে সে বুঝিতে পারে নাই।" এই খেয়ালী বাস্তবতার নিষ্ঠুরতার কথাটি একবার ভাবিয়া দেখুন! **এই সংকীর্ণচিত্ত ক্ষীণদৃষ্টি নির্বোধ মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা অধঃপতনের পথে চলিয়াছে; কদর্য জীবনযাত্রার বিষে বিষাক্ত হইয়া তাহার চিন্তা পচিতেছে আবর্জনাস্তূপে।** ধূর্ত ডাকাত, সুদখোর, টাকার ক্রীতদাস অতীতে একদিন রাষ্ট্রের লোহার খাঁচা তৈয়ারী করিয়াছিল। আজ সে এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বামনমূর্তিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র সে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত, বদ্ধজলা ও পচা মড়ার ধোঁয়ার মতই সে বিষাক্ত। যে বাতাস আমরা টানি তাহাতে বিষের ভাগ কম নহে। এ বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, ইহার বিরুদ্ধে চালাইতে হইবে অবিশ্রাম সংগ্রাম। স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানুষের ক্ষয়ের ও নূতন ব্যক্তিমানুষের অভ্যুদয়ের ইতিহাসরূপে

একখানি ইতিহাস লিখিলে ভাল হয়। ইহাতে থাকিবে পুরাতন ব্যক্তিমানুষের মৃত্যুপথযাত্রার বর্ণনা ও নূতন জগৎস্রষ্টাদের 'সংহত শক্তির' আগুনে নূতন ব্যক্তি-মানুষের রূপ পরিগ্রহণের ইতিহাস।

॥ মানব বিদ্বেষ ॥

< পত্রদাতার জবাব >

আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন : "বর্তমান জীবনযাত্রার মানববিদ্বেষী রূপ কি আপনাকে ক্ষুব্ধ করে না, ম্যাক্সিম গর্কি? এই ভীষণ বাস্তবতা হইতে বাহিরে যাইবার পথ যাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না তাহাদের নৈরাশ্যে কি আপনি সত্যই উল্লসিত? জীবনের অন্তহীন মর্মান্তিকতার আঘাতে আপনার দার্শনিক প্রশান্তিতে কি এতটুকু চঞ্চলতা জাগে না?"

একটা কথা আপনি জানিয়া রাখুন। আমি আর যাহা হই-না কেন, দার্শনিক নই এবং 'প্রশান্তি' একেবারেই আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নহে। আমি যদি একজন প্রশান্ত ব্যক্তি হইতাম, তবে আপনার জাতের লোকেরা, যাহারা আপনার মত চিন্তা করে তাহারা আমার প্রতি এতখানি মনোযোগ দিত না। এই মনোযোগের মধ্যে ঘৃণার সঙ্গে কি করুণভাবেই না মিশিয়া আছে প্রকাশভঙ্গীর অতিস্পষ্ট অক্ষমতা ও এমন একধরণের নিরক্ষরতা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব সত্যই বিস্ময়কর। শুধু অতীতের বিস্মৃতির দ্বারাই আমার পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

মানববিদ্বেষের আলোচনায় আসা যাক। ১৯০৮ সালে 'সাহিত্যে ক্ষয়িষ্ণুতা' নামক আলোচনা সংকলনে 'মানববিদ্বেষ' নামে আমার একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শুরু এইভাবে :

"বিশ্বের জীবনযাত্রার গতিবেগ ক্রমেই বাড়িতেছে কারণ এক বসন্ত-জাগরণের বিপুল আলোড়ন নিভৃততম কন্দরের গভীর হইতে গভীরে প্রবেশ করিতেছে। নিহিত ও নিদ্রিত শক্তি সৃষ্টিশক্তিতে জাগিয়া উঠিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাই সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের কম্পন স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যায়। ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে জাগিয়া উঠিতেছে জনসাধারণের চেতনা, সামাজিক

সুবিচারের সূর্যের উজ্জ্বলতা ক্রমেই বাড়িতেছে: আসন্ন বসন্তের নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় কপটতা ও কুসংস্কারের হিমতুষারস্তূপ গলিয়া পড়িতেছে চোখের উপর: মানবাত্মার কারাগার বর্তমানে সমাজের কদর্য কংকালখানি নির্লজ্জ নগ্নতায় প্রকট হইয়া পড়িতেছে।

কোটি কোটি চোখে জ্বলিতেছে আনন্দের অগ্নিশিখা: যুগ যুগ ধরিয়া মূঢ়তা, ভ্রান্তি, মিথ্যা ও কুসংস্কারের যে মেঘ জমা হইয়াছে, ক্রোধের বিদ্যুৎবহ্নিতে তাহা রুখিয়া উঠিতেছে। গণমানবের এক সর্বজনীন নবজন্মের মহোৎসবের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি আমরা।*

*   *   *

*   *   *

*   *   *

জনসাধারণ কর্মশক্তির অফুরন্ত উৎস এবং শুধু এই শক্তিই পারে সম্ভবকে অনিবার্য করিতে, স্বপ্নকে বাস্তব করিতে। এই কথা যাহারা জানে, তাহারা সুখী। কারণ, জনসাধারণের সহিত জৈবিক বন্ধনের একটা জীবন্ত সৃজনী চেতনা তাহাদের চিরদিনই রহিয়াছে এবং আজ এই চেতনা ক্রমেই বাড়িবে, তাহাদের মন ভরিয়া উঠিবে গভীর আনন্দে ও নূতন সংস্কৃতির নব নব রূপসৃষ্টির তীব্র পিপাসায়। মানব সমাজের নবজাগরণের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু 'সংস্কৃতিবান সমাজের সভ্যদের' চোখে তো তাহা পড়িতেছে না। চোখে পড়িতেছে না বটে, কিন্তু এক বিশ্বব্যাপী দাবানল যে ক্রমেই অনিবার্যভাবে আগাইয়া আসিতেছে, তাহা তো তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছে।

"ধনসঞ্চয়ের নির্বোধ যন্ত্র* .... তাহাদের আজ নিজেদের করুণ অবস্থার স্বপক্ষে সওয়াল করিতে হইতেছে এবং তাহাদের 'সংস্কৃতির' সংকীর্ণ পিঞ্জরে আত্মগোপন করিতে হইতেছে। এই 'সংস্কৃতি' কি? পুঁজির শক্তি চির-কালের মত বিধিসম্মত ও চিরদিনের মত অটল, অটুট—এই ধারণাই তাহাদের 'সংস্কৃতি।' এই ধারণাই তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে, এই ধারণাই তাহাদের আত্মাকে অসাড় করিয়া দিতেছে। আজ তাহারা আর তাহাদের প্রভুর ক্রীতদাসও নহে, আজ তাহারা তাহার গৃহপালিত জানোয়ার।

"ক্রীতদাসেরা মানুষরূপে নবজন্ম লাভ করিতেছে। ইহাই জীবনের নূতন তাৎপর্য...।"

এই কথাগুলি আমি লিখিয়াছিলাম বাইশ বছর আগে। আমার মনে হয়, তখনকার দিনে প্রবন্ধটি খারাপ ছিল না। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, আনাতোল ফ্রাঁস আমার নিকট লেখা একটি চিঠিতে প্রবন্ধটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি সচরাচর করিতেন না। ইচ্ছা হয় পুরা প্রবন্ধটিই উদ্ধৃত করি কারণ হয়ত

---

* এই ফুটকিগুলি জারের সেন্সরের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন।—ম্যাক্সিম গর্কি

* এখানে আবার সেন্সরের খুরের দাগ—ম্যাক্সিম গর্কি।

পুরো প্রবন্ধটি পড়িলে আপনার বিশ্বাস হইত যে, আপনার জাতের মানুষের প্রতি আমার মনোভাব এই বাইশ বছরে বিশেষ বদলায় নাই এবং 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ আচরণবিধির প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি", একথা কিছুতেই বলা চলে না। বিশ্বাস হইত যে, এই বাইশ বছরে আমিও 'বাড়িয়াছি' এই বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে নহে। 'নিজেদের মত করিয়া' অর্থাৎ পুঁজির পালিত কুকুরের মত করিয়া আমাকে পালন করিবার জন্য এই বুদ্ধিজীবীরা যে চেষ্টা করিয়াছিল সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই আমি বাড়িয়া উঠিয়াছি। সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় এই ভূমিকায় আমি অক্ষম প্রতিপন্ন হইয়াছি।

'মানববিদ্বেষ' প্রবন্ধটি আমি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি খুবই দুঃখিত। প্রবন্ধটির খসড়াটি আমার কাছে নাই এবং ১৯১৬ সালে 'পারুস' কর্তৃক প্রকাশিত রুশভাষায় লিখিত আমার 'প্রবন্ধাবলী' বইখানির মধ্য দিয়া সেন্সর হাটিয়া বেড়াইয়াছে রান্নাঘরের বাগানের মধ্য দিয়া ক্ষুধিত শূকর-শাবকের মত। কিন্তু এইখানে এই এক টুকরা সেন্সর গিলিয়া খায় নাই...

"স্বাধীনতার মুখোশেও, পূর্ণ স্বাধীনতার সন্ধানের মুখোশেও, মানববিদ্বেষ আত্মগোপন করিয়া থাকে। এই মুখোশই সবচেয়ে ঘৃণিত মুখোশ।

"সবচেয়ে প্রতিভাবান সাহিত্যসেবীরা যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন সেই সাহিত্য এই সাক্ষ্যই দেয় যে, পূর্ণ স্বাধীনতার সন্ধানে 'ফিলিস্টিন' যখন তাহার অহমিকাকে নগ্ন করিয়া ধরে তখন তাহার 'আমিত্বের' জানোয়াররূপটি আধুনিক সমাজের চোখে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

"মনে হয় ইহা অবশ্যম্ভাবী ও গ্রন্থকারের ইচ্ছার অপেক্ষা রাখে না। তাহাদের প্রচেষ্টা ভাল ও স্পষ্ট। তাহারা এমন একটি মানুষের মূর্তি সৃষ্টি করিতে চান, যে কুসংস্কার ও ঐতিহ্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ কুসংস্কার ও ঐতিহ্য 'ফিলিস্টিনদের' সমাজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে ও তাহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশে বাধা দেয়। তাহারা এমন একটি 'ভাল টাইপের' নায়ক সৃষ্টি করিতে চান যে জীবন হইতে সব কিছুই নেয় কিন্তু প্রতিদানে কিছুই দেয় না।

"উপন্যাসের পাতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া নায়ক যাহা সে আছে তাহা হইবার অধিকারকে ফলাও করিয়া দেখায়। সামাজিক ভাবাবেগও চিন্তার শৃঙ্খল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য কতকগুলি খেলা দেখায় এবং যদি তাহার চারিপাশের মানুষেরা তাহাকে সময়মত গলা টিপিয়া মারিয়া না ফেলে অথবা সে নিজে নিজেকে হত্যা না করে তবে বইয়ের শেষে 'ফিলিস্টিন' পাঠকের চোখে সে দেখা দিবে বড় জোর একটি সদ্যজাত শূকরশাবকরূপে।

"পাঠক ভ্রূকুটি করে, পাঠক বিরক্ত হয়। যখন 'আমার' কথাটি রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ স্বাধীন 'আমি'ও রহিয়াছি। কিন্তু পাঠক দেখিতে পায়, একটি 'আমি'র পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ অন্য সমস্ত ব্যক্তিবাচক সাধারণের ক্রীতদাসত্ব; দেখিতে পায় সেই পুরাতন সত্যটিকে যাহা ভুলিবার জন্য সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করে। 'ফিলিস্টিন' বার বার এ সবকিছুই দেখে; কারণ ব্যবহারিক জীবনে,

সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচিয়া থাকিবার দৈনন্দিন হিংস্র সংগ্রামে মানুষ ক্রমেই নিষ্ঠুর ও ভীষণ হইয়া ওঠে, ক্রমেই তাহার মানুষরূপ ক্ষয় পাইতে থাকে। আবার এদিকে পবিত্র সম্পত্তি রক্ষার জন্য এই ধরণের জানোয়ারের প্রয়োজন।

"ফিলিস্টিন" জনসাধারণকে বীর ও ইতর জনতা এই দুই ভাগে ভাগ করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই ইতর জনতা আজ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে সোশ্যালিস্ট পার্টিতে, ক্ষুদ্র ফিলিস্টিন 'আমি'কে পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া দিতে চাহিতেছে। 'ফিলিটিন' একজন নায়ককে ডাকে সাহায্যের জন্য—সঙ্গে সঙ্গে চুপিসারে আগাইয়া আসে বুনোশুয়োর অথবা রুশ আমলার মনোভাবসম্পন্ন একটি ভোজনসর্বস্ব জীব।

"ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্র অধিকার রক্ষার জন্য আহূত এই দানবের কাছে অবশ্য মানুষের পবিত্র ব্যক্তিগত অধিকার বলিয়া কিছু নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই ত সে বিজয়ীর চোখে দেখে। একদিকে এই রক্তবর্ণ সহস্রফণা সাপ; অন্যদিকে চির-ক্ষুধিত ভীষণ দানবের হিংস্র মুখব্যাদান—মধ্যে বিহ্বল দিশাহারার মত দুলিতেছে ক্ষুদ্র বামন তাহার ভিখারীর সম্পত্তি লইয়া।

"যদিও তাহার ভাগ্যে জুটিতেছে কয়েদীর শৃংখল ও ক্রীতদাসের জীবন তবু ইহাকেই সে ভালবাসে, তবু ইহাকেই সে সেবা করে বিশ্বস্তভাবে এবং সাধ্যমত মিথ্যা ও চাতুরীর সাহায্যে ইহার শক্তি ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করিতে চিরকালই প্রস্তুত থাকে। ঈশ্বর ও দর্শন হইতে শুরু করিয়া জেল ও সংগীত পর্যন্ত সব কিছু দিয়া সামজব্যবস্থাকে সমর্থন করিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত।"

ইহা হইতে আমার মনে হয় একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই আসা যায়। আমি চির-দিন যাহা বলিয়া আসিয়াছি এবং আজ যাহা বলিতেছি, এ সিদ্ধান্ত তাহাই।

আমার বন্ধু, এবং পরে আমার 'শত্রু' লিওনিদ আঁদ্রেইয়েভ ১৯১৩ সালে এ ভি আম্ফিতিয়ত্রভের নিকট লিখিত এক চিঠিতে আমাকে 'শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষাকারী বীর' আখ্যা দিয়াছিলেন। কথাটি অবশ্য বড় বেশী অলংকার-বহুল ও প্রশংসা-সূচক। কিন্তু কথাটি বলিয়াছিলেন তিনি এই কথাগুলি বলিবার জন্য :

"ইনি বাস্তবতার পাথর ঠেলিয়া উপরে তুলিতেছেন, আবার সে পাথর গড়াইয়া নামিতেছে। পাটীগণিতের চারিটি সূত্রের উপর তিনি তাহার অলৌকিক, দৈববাণীলব্ধ শ্রমিকস্বপ্নকে স্থাপনা করিয়াছেন। কিন্তু, সেই একমাত্র বাস্তব সাহা আমি চাই না; যাহা আমি চাই ও পছন্দ করি তাহা কখনই বাস্তব নহে।"

ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত তাহার 'রিকোয়ায়েম' পুস্তকে তিনি এই কথাগুলি লিখিয়াছেন। বড় দুঃখের ভুল করিয়াছেন আঁদ্রেইয়েভ। পাটীগণিতের চারিটি সূত্রকে তুচ্ছ করা তাহার উচিত হয় নাই—এই চারিটি সূত্রকে তুচ্ছ করা কাহারও উচিত নয়। কারণ এই সূত্র চারিটিই বিজ্ঞানের ভিত্তি। বন্ধনমুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর 'অলৌকিক স্বপ্ন' ও তাহার সৃজনী ইচ্ছার শক্তি সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে এই "স্বপ্ন" প্রচণ্ড বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

আপনি লিখিয়াছেন : "আমাদের কাল ক্রমেই মানববিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে।"

খুব সত্য কথা। আমি নিজেকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া দাবি করি না। কিন্তু নিজেকে খুব খারাপ পর্যদর্শক মনে করি না। বুর্জোয়া ব্যবস্থার মানববিদ্বেষ সম্পর্কে লিখিবার পর বাইশ বছর কাটিয়া গিয়াছে, আজ বুর্জোয়া জীবদেহে এই মানববিদ্বেষ কুষ্ঠব্যাধির মত দেখা দিয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি আপনারা বড় দেরীতে দেখিতে পাইয়াছেন; এবং এই দেখিতে পাওয়ায় বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হোক, আমাকে নম্রতার নীতি শিখাইবার চেষ্টার পরিবর্তে আপনি যদি আপনার চারি-পাশের জগৎটিকে একটু মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে হয়ত আপনার কিছুটা উপকার হইবে। দেখুন :

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বিশাল ইমারত সম্পূর্ণরূপে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে: ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পাষাণকারার অভ্যন্তরে যে কি কাণ্ড চলিয়াছে যাহার চোখ আছে সেই দেখিতে পাইবে। লুণ্ঠনকারীদের বিকৃত অর্থলালসার পরিণামে অর্থনৈতিক সংকট মাথা চাড়া দিয়াছে। ব্যাংকের পর ব্যাংক ফেল হইতেছে; পুঁজির বশম্বদ ভৃত্য, সরকার ও আইনসভার সদস্যদের সামান্য সাহায্যে ব্যাংকাররা লুণ্ঠনকার্য আরও তীব্রভাবে চালাইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বুর্জোয়া জীবনের বিলাসিতা ক্রমেই বেশী করিয়া আড়ম্বরপূর্ণ, অর্থহীন ও স্থূল হইতেছে; বুর্জোয়া শ্রেণীর আমোদ-প্রমোদের প্রাণহীনতা ক্রমেই বাড়িতেছে; ক্রমেই বেশী করিয়া উহা একান্তভাবে যৌনবিকৃতি ও যৌন অধঃপতনের রূপ গ্রহণ করিতেছে। কোন সংবাদপত্রের সুধীব্যক্তি সম্প্রতি বলিয়াছেন, "শিল্পপ্রগতি শ্রমিকদের জনক।" ইহার সহিত তিনি এই কয়টি কথা যোগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর হিংস্র, মূঢ়, লম্পট বিমাতা। স্ত্রী-সন্তানসহ যখন কোটি কোটি শ্রমিক উপবাস করিতেছে, ঠিক তখনই কোটি কোটি টন গমের বাজার নাই, কারখানার চুল্লীর জ্বালানী হিসাবে উহা ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে ওখানে মজুরী কাটিয়া পুঁজিপতিরা টাকা বাঁচাইতেছে আর বলিতেছে শ্রমিকদের সরকারী সাহায্যদান বন্ধ করিতেই হইবে; কারণ এই সাহায্যের ফলে ক্ষুধিতদের চরিত্র-বিকার ঘটিতেছে, তাহারা অলস অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।

ইউরোপের ক্ষুধিত শ্রমিকেরা এখনও নিজেদের সহিষ্ণু রাখিয়া শক্তির নিষ্ফল অপচয় ঘটাইতেছে। এই সহিষ্ণুতার মধ্যে যে সাহসের পরিচয় তাহারা দিতেছে তাহার আরও বেশী সক্রিয় প্রয়োগ হওয়া উচিত। তাহাদের মধ্যে অপরাধ ও আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িতেছে; উপবাসের যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত পরিবার কার্বনিক এসিড গ্যাসের বিষে নিজেদের শেষ করিয়া দিয়াছে, এমন সংবাদ প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এমন সংবাদও বিরল নয়, যেখানে পিতামাতা

নিজেদের শেষ করিবার আগে গলা কাটিয়া সন্তানদের হত্যা করিতে যাহাতে বুর্জোয়া জগতে অনাথ ও ভিখারী হইয়া তাহাদের না বাঁচিতে হয়।

এই ধরনের ঘটনা যে অসংখ্য ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার সাহস কি আপনার আছে?

শ্রমিক কল্যাণের পেশাদার পাণ্ডা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির নেতারা. রক্তহীনতা ও মূঢ়তায় মৃত্যুমুখী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সভ্যেরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রাচীন শত্রুকে তাহার বৃদ্ধ বয়সে ভুলিয়া গিয়া নিরীহ মেষপালকে বলিতে চাহিতেছেন—যদিও এখনও খোলাখুলি বলিতে দ্বিধা করিতেছেন—"যথাসম্ভব কম খাও। একেবারে না খাইয়া পার ত আরও ভাল। কারণ, আমাদের পুঁজিবাদী পিতৃভূমি আজ বিপন্ন; অন্যান্য জাতির শ্রমিকদের পুঁজিবাদী পিতৃভূমি আমাদের পুঁজিবাদী পিতৃভূমির উদ্দেশ্যে ছুরিতে শান দিতেছে।"

সোবিয়েত ইউনিয়নে আজ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে গড়িয়া উঠিতেছে। ইউরোপের শ্রমিকদের মনে তাই সোবিয়েত সম্পর্কে স্বভাবতই তীব্র আগ্রহ জাগিয়াছে। এই আগ্রহকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য অকর্মণ্য বৃদ্ধ কার্ল কাউটস্কির মত সোশ্যাল নেতারা শ্রমিকশ্রেণীর মগজে নিষ্প্রাণ নীরস জ্ঞানের বালি ঢালিয়া দিতেছেন এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে হৃদয়হীন নির্বোধের হিংস্রতা লইয়া কুৎসা রটনা করিয়া চলিয়াছেন। এই কুৎসার রসদ তাহারা যোগাড় করিতেছে বুর্জোয়া সংবাদপত্র হইতে, এ ব্যাপারে নির্বাসিত রুশ প্রবাসীদের পত্রিকাগুলিকেও তাহারা বাদ দিতেছে না। অথচ তাহারা জানে, এই মাল কত পচা ও ঝুটা।

ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা ও কুৎসা উৎপাদনের কারবারের মধ্যে দেখিতেছি এক চমৎকার অস্বাভাবিক মিশ্রণ। ইহার মধ্যে রহিয়াছেন শ্রমিকদের হাতের মার-খাওয়া রুশ সেনাপতিরা, ধর্মতাত্ত্বিকেরা, ধর্মযাজকেরা, সোবিয়েত হইতে বিতাড়িত ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড পত্রিকাগুলির লোকেরা, প্রাক্তন ব্যাঙ্কার ও মিল-মালিকেরা, জারশাসিত রাশিয়ার প্রাক্তন র‍্যাডিকাল লেখকেরা —এক কথায়, মহান শ্রমিক বিপ্লবের ঝড়ে আমাদের দেশ হইতে যে আবর্জনা উড়িয়া বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে তাহার সবাই আছেন এই দলে।

সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের এই রুশ ও ইউরোপীয় দলটিকে পরিচালনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন 'ভ্যাটিকান সহরের' প্রভু। দেখিলেই মনে হয়, ইনি একজন অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার বিশ্বাস তিনি খৃস্টের ডেপুটী, পৃথিবীতে 'প্রেম ও বিনয়ের দেবতার' প্রতিনিধি। 'রাশিয়ার দুর্গত জনসাধারণের' জন্য প্রার্থনা করিবার জন্য তিনি যাজকদের নির্দেশ দিয়াছেন। মজার ব্যাপার, এই দুর্গতদের জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁহার কোন ধারণা নাই। তিনশত উদ্যোগী শ্রমিক লইয়া গঠিত এই জনসাধারণেরই একটি প্রতিনিধিদল—ইহাদের অধিকাংশই অদলীয়—নেপলস্ সহর দেখিয়া ব্যথিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিয়াছিলেন :

"কী দারুণ দারিদ্র্য এখানে, শিশুরা কী রুগ্ন, শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা কী ভয়াবহ!"

ইউরোপের বড় ও ছোটদের, তাহার বুদ্ধিজীবীদের, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতার কথা আমি যখন বলি, তখন আমি এতটুকু অতিরঞ্জন করি না। ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী 'ইল্ মাত্তিনো' নামক সংবাদপত্র ভিয়েনা হইতে প্রাপ্ত এই সংবাদটি ছাপে :

"দাড়ি রাখা রাশিয়ায় ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইল।"

"যে বংশপতিসুলভ দাড়ি দেখিয়া পিটার দি গ্রেট এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার সভাসদদের সকলকেই দাড়ি কামাইয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছিলেন, সেই দাড়িই আবার বর্তমান রাশিয়ায় ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন সৌন্দর্যবোধ হইতে এই ফ্যাশানের সৃষ্টি হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, লম্বা দাড়ির অনেকগুলি সুবিধা আছে। ইহা নেকটাই-এর খরচ বাঁচায়, বুকে ঠান্ডা লাগিতে দেয় না; এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখের দাড়িগোঁফহীন বুর্জোয়া ভাবটিও মুছিয়া দেয়। প্রকৃতি যাহাদের লাল চুল দিয়াছেন কেবলমাত্র তাহারাই এই দাড়ি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে; কারণ বলশেভিক মনোভাব সত্ত্বেও রাশিয়ার জনসাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে এবং তাহারা বিশ্বাস করে লালচুলওয়ালা মানুষ দুর্ভাগ্যের কারণ।"

এই ধরনের নির্বোধ কাহিনী প্রায় রোজ ইউরোপের সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হয়। নামকরা লারুস অভিধানেও এইসব আছে। অন্যান্য আজগুবী জিনিষের সহিত এমন জিনিষও আপনি দেখিতে পাইবেন :

সামোভার হইল একাধিক নলযুক্ত জল গরম করিবার পাত্র।

রাসকোলনিক্‌রা হইতেছেন রুশ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ। ইহারা তিন ধরনের : রাসকোলনিক্‌স্, রাকোলনিক্‌স্ ও রাসকোলনিস্ট্‌স্।

তৃতীয় আইভানকে বলা হইত 'দি গুড'।

চতুর্থ আইভানের ডাকনাম ছিল 'ভীষণ' (টেরিব্‌ল্) কারণ নিজের স্ত্রীদের তিনি চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জেনারেল দেনিকিন একজন নামকরা সেনাপতি। কেরেন্‌স্কির হুকুমে ইনি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন।

একখানি ইতালীয় সংবাদপত্র নিপ্রোস্ট্রয়ের একটি ফটো ছাপিয়া তাহার সহিত এই আজগুবী কাহিনীটি জুড়িয়া দিয়াছেন : "সাইবেরিয়ার নূতন জীবন। ওব নদীর তীরে অবস্থিত নিপ্রোস্ট্রয়ের দৃশ্য। এখান হইতে ওম্‌স্ক সহরে বিদ্যুৎশক্তি ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ করা হইবে।"

এ সকল অবশ্য তুচ্ছ জিনিষ কিন্তু এই ধরনের আবর্জনা দিয়াই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ইউরোপীয় শ্রমিকদের মগজ ভর্তি করা হইতেছে। এবং যাহারা 'জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব', 'জাতিসমূহের ঐক্য', 'সংস্কৃতির সংকট' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, মনে হয় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়

দুর্ভাগ্যগুলির একটি হইল অজ্ঞতা। তাই, এই অজ্ঞতা প্রচারের বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিবাদও করেন না, সেদিকে মনোযোগও দেন না।

এই মিথ্যা ও কুৎসা প্রচারের প্রতি ঔদাসীন্য ত আছেই। তাহা ছাড়াও, বুর্জোয়া জগতের শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে নিত্য যে অসংখ্য দুর্বৃত্ত পাপ আক্রমণ চালিয়াছে, ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা তাহার বিরুদ্ধেও কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য করেন না। শিশুসুলভ সরলতার সহিত তাহারা নিজেদের মনে করিয়া চলে আপনারা যাহাকে বলেন 'সেই শক্তি যাহা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করে ও রক্ষা করে, যাহার ভিত্তি খৃস্টীয় মানবতা, যাহা অগ্রসরমান এবং প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সত্য-সন্ধানে যে শক্তি নিজেকে নিয়োগ করিয়াছে।"

এই বাক্যটি হইতে বুঝা গেল, আপনারা দান্তের সেই নরকের পাপীদের কথা বলিতেছেন, যাহারা মুখ পিছু করিয়া আগাইয়া আসে।

ভার্সায়ে যে জাতিবিদ্বেষের অগ্নিশিখা জ্বালানো হইয়াছে আজ যখন সেই শিখা ক্রমেই ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, যখন ইউরোপের পুঁজিপতিরা নূতন বিশ্বযুদ্ধের জন্য পাগলের মত অস্ত্রসজ্জিত হইতেছে, যখন এমন একটি দিন যায় না যেদিন শুধু খাইতে চাহিবার অপরাধে 'বিশ্বের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির' রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকদের গুলী করিয়া মারা হয় না, তখন প্রগলভের মত 'প্রেমের সার্বজনীন সত্যের' কথা বলিতে আমার লজ্জা করে। সম্পূর্ণ পশুতে পরিণত জেনারেল লুডেনডর্ফও এইসব বাকসর্বস্বদের অপেক্ষা অনেক বেশী সৎ। এই জেনারেল সম্প্রতি ইহুদীদের প্রতি তাঁহার ঘৃণার কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং এখন সারব্রুকেনের সংবাদপত্রের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে বলিতেছেন যে "প্রকৃত জার্মানরা ক্রীশ্চান হইতে পারে না।"

তাঁহার কথায় অন্তত স্ববিরোধিতা নাই। কামানবাহিনী, অশ্বারোহীবাহিনী, রাজনীতি, ধর্ম এমন কি বিজ্ঞানেরও অধিনায়ক বর্তমান ইউরোপের এই সব জেনারেলরা যে আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞতে পরিণত হইয়াছেন, এই একটিমাত্র ঘটনাই তাহার প্রমাণ নহে।

যখন বিনা বাধায় বিনা লজ্জায় সর্বসমক্ষেই শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে একটি রক্তাক্ত চক্রান্ত চলিতেছে, যে চক্রান্তের আবর্তে যেভাবেই হউক 'গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণী' অনিবার্যরূপেই জড়িত হইয়া পড়িবে, তখন 'সার্বজনীন সত্যের' কথা বলা লজ্জাহীন ও বুদ্ধিহীনের কাজ। পুঁজিপতিরা ও তাহাদের শিকল-বাঁধা পোষা কুকুর 'ফিলিস্টিনেরা' আজ যে বাস্তবতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মানব-বিদ্বেষী রূপ দেখিয়া মনে হয় যে, অর্থনৈতিক সংকট শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের বিরাট ষড়যন্ত্রের একটি অংশ এবং সেনাবাহিনী সৃষ্টির জন্য বেকার-বাহিনীর সৃষ্টির প্রয়োজনেই এই সংকটকে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আপনি বলিবেন, আজগুবী। হয়ত তাই। কিন্তু, আমাদের চোখের সম্মুখেই কোটিপতিদের চক্রান্তসৃষ্ট বিশ্বব্যাপী আর একটি ভিক্ষুকহত্যা যজ্ঞ ঘটিতে চলিয়াছে, তাহা ত আর সম্ভাবনার কোঠায় নাই। এই চিন্তাধারা আমার একার নহে।

গত ডিসেম্বর মাসে ক্লেভল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নৃতত্ত্ব কংগ্রেসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক লোলী হোয়াইট ঘোষণা করেন যে, যখন সংকট সমাধানের জন্য পুঁজিবাদ আর একটি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, যুদ্ধ তখন অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাপক হোয়াইট বলেন, যুদ্ধের মধ্য দিয়া আত্মহত্যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

* * *

আপনি বলিতেছেন আমি সত্যকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি দেখিতেছি দুই সত্য।

এক সত্য আপনার সত্য—স্থবির, অকর্মণ্য, বাঁ-চোখ অন্ধ, দন্তহীন, নিজের বিষ্ঠা নিজে খাইতেছে। অপর সত্য তরুণ, দুঃসাহসী, অফুরন্ততার প্রাণশক্তি। কখনও পিছু না তাকাইয়া অবিশ্রাম সে সম্মুখপানে চলিয়াছে মহান লক্ষ্যের দিকে। ঈর্ষায় হিংসায় অন্ধ হইয়া পুরাতন সত্যের ক্রীতদাসেরা তাহার দুর্গম পথের মাঝে মাঝে যে খাদ কাটিয়া রাখিয়াছে কখনও কখনও তাহার মধ্যে সে পড়িয়াও যাইতেছে।

এক সত্য বলে, সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনসাধারণ বলশেভিক পার্টি ও শ্রমিক-কৃষক সরকারের পরিচালনায় দুরূহ কঠোর অবস্থার মধ্যে সাফল্যের সহিত, একটি নূতন রাষ্ট্র, তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র, সমানদের রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছে এবং এই মহিমাময় দুঃসাহসী কর্মকান্ডের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর নবজন্মের ও বিশ্বব্যাপী এক নবজাগৃতির সূচনা দেখা যাইতেছে।

অপর সত্যটি সোবিয়েত ইউনিয়নের ভিতরের ও বাহিরের ক্ষয়পন্থীদের অতিপ্রিয় মূঢ়, ক্ষুদ্র, হিংস্র সত্য। প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া এই সত্য শুধু এই কথাই বলে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের ১৬ কোটি ২০ লক্ষ লোকের রেশম ও মখমলের পোষাক নাই এবং শ্রমিকশ্রেণীর ত্রিশ বছরের একনায়কত্ব এখনও দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ স্বতন্ত্রবাদী ছোট সম্পত্তি-মালিকদের সমাজতন্ত্রীতে পরিণত করিতে পারে নাই। হীন ছিদ্রান্বেষণের নীতির ফলে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে হইবে এই পুরাতন যোদ্ধাদের। এ সত্য অবশ্য আজও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু এ সত্যের দিন দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে।

অতএব আপনি দেখিতেছেন মিঃ পি. এন., সত্য আমি জানি।

(১৯৩১)

॥ ইতিহাসের গতি ॥

সেদিন প্রবাসী শ্বেত রুশদের পত্রিকায় নীচের সংবাদটি ছাপা হইয়াছে :

"নিউইয়র্ক, ৪ঠা জুলাই। পদাধিকারের চরম অপব্যবহার করিয়া ঘুষ লইবার অপরাধে নিউইয়র্কের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। এর আগে এই অপরাধেই নিউইয়র্কের আরও তেরোজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। গত আঠারো মাসে নিউইয়র্কের পঁচিশজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ধেকেরও বেশী অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।"

তিনমাস পূর্বে এই পত্রিকাখানিই সংবাদ দিয়াছে যে, মার্কিন রাষ্ট্রের কোন একজন বিচারপতিকে পদাধিকারের সুযোগ লইয়া অপরাধ করিবার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বিচারকালে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সময় তিনি অপরাধ-নিবারণকার্যে বহাল ছিলেন সেই সময়ের মধ্যেই অপরাধী বন্ধু ও আত্মীয়দের নিকট ঘুষ লইয়া তিনি অন্তত এক হাজারটি মামলার অন্যায় রায় দিয়াছেন।

একজন বিচারপতির পক্ষে অপরাধের এক হাজার অঙ্কটি অবশ্য খুবই বেশী, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আমেরিকানরা সব কিছুই একটা বিরাট আকারে করিতে চায়। এবং এক্ষেত্রে প্রবাসী শ্বেতরুশদের সংবাদপত্রগুলিকে বিশ্বাস করা চলে' এই সংবাদপত্রগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎসাহী, এমন কি হিংস্র সমর্থক, অতএব যে ব্যবস্থার প্রশংসায় তাহারা পঞ্চমুখ তাহাকে হেয় করিতে পারে এমন কোন ঘটনাকে না যাচাই করিয়া প্রকাশ করা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই এই সংবাদগুলি ছাপা তাহাদের ভুল হইতে পারে, বোকামি হইতে পারে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, কাগজের কাটতি যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে কি ছাপা হইতেছে, না হইতেছে তাহাতে তাহাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না।

এই পত্রিকাগুলিতে কৌতুকছলে নীচের সংবাদটি ছাপা হইয়াছে :

"চুরির অপরাধে ধৃত একজন ভবঘুরেকে লাইয়ন্সের শোধন আদালতে উপস্থিত করার কথা ছিল। কিন্তু আসামীকে আদালতে উপস্থিত করাইতে পুলিশরা অনেকক্ষণ ইতস্তত করে। শেষে বিচারপতি বার বার হুকুম দেওয়ায় তাহারা আসামী হাজির করিতে বাধ্য হয়। ভবঘুরেটি যখন আদালতে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখা গেল তাহার পরনে কোন ট্রাউজার নাই। সে বলিল যে, অন্যায় অভিযোগের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য সে তাহার পরনের ট্রাউজারটি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং 'আর বেশী অত্যাচার করিলে সে আরও কতটা যাইতে পারে' তাহা দেখাইবার জন্য ট্রাউজারটির এক বড় অংশ গিলিয়া খাইয়াছে। যতক্ষণ আরেক জোড়া ট্রাউজার তাহাকে না দেওয়া হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে জেলে রাখিবার হুকুম দিলেন জজসাহেব।"

অত্যন্ত কৌতুকের সহিত কাহিনীটি বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সন্দেহ হয় ভবঘুরেটি নূতন উদ্ভূতদেরই একজন—বেকারীর অবদান।

আমেরিকার কথায় ফিরিয়া আসা যাক। গণ্ডায় গণ্ডায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হইতেছে যে-বিচারপতিদের তাহাদের কথাই আলোচনা করা যাক। সকলকেই যে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইতেছে তাহা অবশ্য নয়। যতদূর মনে হইতেছে, সাকুকো ভানজেত্তির হত্যাকারী স্টেট গভর্ণর ফুলার এখনও শাসন চালাইয়া যাইতেছেন। একজন বিচারপতি একটি রেস্তোঁরায় প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এক মিনিটের মধ্যেই তিনটি লোক বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিবে। তাহারা অপরাধী কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কিন্তু অন্যদের পক্ষে দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহারা পুড়িয়া মরুক।" এই বিচারপতিটি এখনও কাঠগড়ায় ওঠেন নাই।

রেস্তোরাঁয় যাহারা ছিল তাহারা বোধ হয় তাঁহাকে বাহবা দিয়াছিল। আমরা জানি, ঠিক এই মুহূর্তে আটজন অল্পবয়স্ক নিগ্রো—একেবারেই বালক—মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল নৈরাজ্যবাদের অভিযোগ, যদিও সে অভিযোগের কোন প্রমাণই ছিল না, এখনও নাই। নিঃসন্দেহে তাহাদেরও হত্যা করা হইবে 'অন্যদের প্রতি দৃষ্টান্ত হিসাবে'।

ইতালীয়ান সাক্কো ও ভানজেত্তিকে প্রকৃতপক্ষে এই 'দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই' হত্যা করা হইয়াছে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর এই শহীদদের সাত বছর জেলে রাখা হয়। জারশাসিত রাশিয়াতেও এমন ব্যাপার ঘটে নাই। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী, প্রতিবাদ জানাইয়াছে বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। কোন ফল হয় নাই। সাক্কো ও ভানজেত্তিকে হত্যা করা হইয়াছে। ইউরোপ ও সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে এই আটটি নিগ্রো বালককেও হত্যা করা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুঁজিবাদীদের মানববিদ্বেষী নৃশংসতার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, কারণ এই প্রতিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংহতি ও শ্রেণী-চেতনা সংগঠিত করিতে সাহায্য করে।

কিন্তু, এই প্রতিবাদের প্রভাব পুঁজিবাদী বিচারপতিদের উপর পড়িতে

পারে, একথা মনে করা মূঢ়তা। একে তো ক্ষমতার মদে মাতাল হইয়া আছে এই বিচারপতিরা, তাহার উপর সামাজিক বিপর্যয়ের একটা পশুসুলভ আতঙ্ক তাহাদের একেবারেই উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, যে-পৃথিবীকে তাহারা কলুষিত করিতেছে সেই পৃথিবীর বুক হইতে বিপ্লবের বন্যা তাহাদের ধুইয়া মুছিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবেই। এ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য। তাই শত্রু চূড়ান্ত শেষ সংগ্রামের জন্য যথেষ্ট সংগঠিত হইবার পূর্বেই এই শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রমেই বেশীমাত্রায় নৃশংস হইয়া ওঠা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু শত্রুও সংগঠিত হইতেছে। তাইত প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্রসচিব সেভারিং পুলিশকে কার্তুজ না বাঁচাইবার উপদেশ দিয়াছেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গের শাসনকর্তা ট্রেপভও ১৯০৫ সালে এই একই উপদেশ দিয়াছিলেন।

৪ঠা জুলাই সেভারিং সমস্ত পুলিশ অফিসারের কাছে একটি হুকুমনামা পাঠাইয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে :

"আগেকার হুকুমনামায় শূন্যে গুলী করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইতে ইহা বোঝা যায় না যে, শুধুমাত্র খালি কার্তুজের ফাঁকা আওয়াজের হুকুম দেওয়া হইয়াছে এবং ভরা কার্তুজের গুলী ছাড়া নিষিদ্ধ। এই হুকুমনামার উপর নির্ভর করিয়া যে কেহ গুলী ছুঁড়িবে তাহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিব না।"

লেখাপড়া জানা যে-কোন বিপ্লবীর নিকটই এই ঘোষণার অর্থ পরিষ্কার। আট নহে, আটশ, আট হাজার এবং পারিলে আশি হাজার শ্রমিককে হত্যা করিতে মন্ত্রীমহোদয় প্রস্তুত। তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করিতেছেন। এইভাবেই তিনি জার্মান শ্রমিকদের সংগঠিত হইবার শিক্ষা দিতেছেন। তাহারাও সংগঠিত হইতেছে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়িয়া তাহারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতেছে।

যেমন চলা উচিত, সব কিছুই চলিয়াছে তেমনই। ক্রমেই নিকটে আসিতেছে চরম সংগ্রামের পরম মুহূর্তটি। এই সংগ্রামেই পরাশ্রয়ী শোষিতদের শেষ করিবে শ্রমিকশ্রেণী। বিচারপতির আসন হইতে সাম্যবাদ বাকী পৃথিবীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছে। শ্রমজীবী-জনতার নেতা হিসাবে এবং তাহাদের হাত দিয়াই এই মৃত্যুদণ্ড সে কার্যকরী করিবে। শ্রমশক্তির সংগঠকরূপে সে নূতন জগৎ গড়িয়া তুলিবে।

ইহা উন্মাদের ভবিষ্যদ্বাণী বা দুর্বলচিত্তের আত্মসান্ত্বনা নহে। ঘটনাস্রোত ও ইতিহাসের ইহাই অনিবার্য, অলঙ্ঘনীয় পরিণতি।

(১৯৩১)

॥ 'ভ্যু' পত্রিকার প্রশ্নাবলীর জবাব ॥

(১) 'আর একটি যুদ্ধের' আশংকা আছে কি?

ইউরোপের গভর্ণমেণ্টগুলি অস্ত্রসজ্জায় জনসাধারণের অর্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করিতেছে। আমরা তো জানি বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য কেহ একটি রিভলবারও রাখে না, রাখে হত্যা অথবা জন্য। অতএব অস্ত্রসজ্জিত ব্রুজার, সাবমেরিন, ট্যাংক ইত্যাদি জিনিস শা পর্যটনের জন্য তৈয়ারী করা হইতেছে না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(২) কি কি কারণে আবার যুদ্ধ বাঁধিতে পারে?

পুঁজিবাদের অস্তিত্ব মূল কারণ। ইহারা এমন এক জাতের লোক ঐশ্বর্যের লালসা যাহাদের ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, কি করিয়া মুষ্টিমেয় একদল উন্মাদ পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য কুক্ষিগত করিয়া শ্রমজীবী জনসাধারণের লইয়া চরম অবহেলাভরে ছিনিমিনি খেলিতেছে। এ ব্যাপার এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, কোন ঘটনার দ্বারা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 'ক্রীশ্চান সিসারো' নামে খ্যাত 'খৃস্টীয় ধর্মজগতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা' লাক্টান্টিয়াস দেড় হাজার বছর আগে এই লোকগুলিরই পাপ কার্যকলাপের এক নির্ভুল বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'ন্যায় সম্পর্কে' নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি ঠিক এই কথাগুলিই বলিতেছেন :

যাহা পূর্বে সকলে মিলিয়া সমবেতভাবে ভোগ করিত, এখন তাহা মাত্র কয়েকটি পরিবারের হাতে জমা হইতে লাগিল; অপরকে ক্রীতদাসে পরিণত

করার জন্য কেহ কেহ জীবনধারণের মূল প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি নিজেদের হস্তগত ও সযত্নে মজুদ করিতে শুরু করিল। শুধুমাত্র নিজেদের লোভ ও লালসা চরিতার্থ করিতে পৃথিবীর বিধিদত্ত ধন নিজেদের সম্পত্তিতে পরিণত করিল। তারপর ন্যায় বিচারের মিথ্যা অছিলায় তাহারা অন্যায় আইন তৈয়ারী করিল, জনসাধারণের হাত হইতে নিজেদের লোভ ও লুণ্ঠনকে নিরাপদ করিবার জন্য। এই কাজে কখনও তাহারা লইল হিংসার আশ্রয়, কখনও লইল অর্থের সাহায্য, কখনও প্রয়োগ করিল বিদ্বেষকে। এইভাবে ন্যায়ের পক্ষ হইতে একেবারেই দূরে সরিয়া গিয়া তাহারা মানবসমাজে সৃষ্টি করিল এক দাম্ভিক, উদ্ধত বৈষম্য: নির্লজ্জের মত নিজেদের বসাইল অন্য সকলের মাথার উপর এবং পোষাকে ও অস্ত্রে জনতা হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করিল।

শুধু ল্যাক্টান্টিয়াস নহে, সৎ চিন্তার সু-অভ্যাসের প্রতি যাহারা বীতরাগ নহেন, তাঁহাদের সকলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাপ প্রকৃতিটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

যেমন অর্থনীতিবিদ সিসমণ্ডি। ইনি কখনও সমাজতন্ত্রের কাছাকাছিও আসেন নাই। ঊনিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, "...... "সমাজশাসনব্যয়ের একটা বড় অংশ গরীবের হাত হইতে ধনীকে রক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট থাকে।" এইসব সংমানুষগুলির বক্তব্যই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত করেন কার্ল মার্কস্ এবং মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত ইতিহাসের দর্শনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এবং এই ভিত্তিকেই তাহার যুক্তিগত পর্যায়ে উন্নীত করিয়া ভ্লাদিমির লেনিন রুশ শ্রমিকদের শিক্ষা দেন উন্মাদ ও অক্ষমদের নৃশংস কারাগার হইতে মুক্তিলাভের সোজা ও বাস্তব উপায়।

ধনীরা যুদ্ধ বাধায় শুধুমাত্র গরীবদের উপর শক্তিবৃদ্ধির জন্য নহে, পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্যও বটে এবং একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, এই যুদ্ধ সে চালায় গরীবের হাত ও বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কের সাহায্যে। পুঁজি-বাদীদের অমানুষিক উদ্দেশ্যাসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ আত্মনিয়োগ করে তাহাদের সাহায্যেই যুদ্ধ চালায় পুঁজিবাদীরা। এমন জঘন্য দৃশ্য পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে চার্চিল নামক একজন ইংরাজ লণ্ডনে ইংরাজ শিল্পপতিদের এক সভায় বলেন :

"ভারতের জীবনযাত্রা ও বিকাশের নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ইংরাজ জাতির নাই। ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন এক্তিয়ার গোলটেবিল বৈঠকের নাই। এই বৈঠকে গৃহীত কোন চুক্তি মানিবার বাধ্যবাধকতা বৃটিশ পার্লামেন্টের থাকিবে না।

"ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা ও তাহাদের খপ্পরে-পড়া লোক—সর্বসমেত চব্বিশ হাজার মানুষ আজ জেলে। দৃঢ়ভাবে দ্রুতভাবে বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভ দমন করা হইতেছে। বৃটিশ জাতি ভারতে তাহার অভীষ্ট সাধন হইতে বিরত

থাকিবে না। বৃটিশ রাজমুকুটের শ্রেষ্ঠতম মণিটিকে আমরা হারাইতে চাই না। ভারত হাতছাড়া হইয়া যাওয়া মানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান।"

* * *

এই বক্তৃতার মানববিদ্বেষে ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপের খৃস্টীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। আর্কবিশপও একজন ইংরাজ, তিনি একজন মানববিদ্বেষীও বটে। শুধুমাত্র প্রভুদের স্বার্থের প্রয়োজনেই তিনি তাঁহার সরকারী 'মানবপ্রেম' প্রদর্শন করেন, যেমন করিয়াছেন সোবিয়েত ইউনিয়নের বেলায়।

যে পাগলগুলি জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে ধীর, শান্ত হইতেছে স্পেনের রাজা। সে তার দেশের লোকগুলিকে নিঃশব্দে মারিয়া ফেলিতেছে। এদিকে পিলসুদ্‌স্কির মত লোক সাংবাদিকদের সহিত কথাচ্ছলে গেরেম্ভারী চালে তাঁহার হত্যা করিবার 'ঈশ্বরদত্ত অধিকার' ঘোষণা করেন। তিনি বলেন :

"আমি একজন অতিমাত্রায় শক্ত মানুষ। যেসব মানুষ অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ও অসম্ভব কঠোর সংকল্পের অধিকারী, আমি তাহাদেরই একজন।"

ইহা শূন্য দম্ভ নহে। পোলিশ সেনেটরদের তিনি জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেন—ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের 'সম্মান' অথবা স্বাস্থ্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যদি সেনেটরদের তিরস্কার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে উন্মাদ বলা ঠিক হইত না। কিন্তু কাজকর্মে তিনি স্পষ্টতই রাশিয়ার জারদের অনুকরণ করিতেছেন।

যেসব লোক এক এক জাতির ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিয়া আছে তাহারা যে একদম উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, এই মূল ভয়াবহ ঘটনাটি প্রমাণের জন্য দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বুঝিতে কষ্ট হয় না, যতদিন জাতির জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এইসব লোকের হাতে থাকিবে ততদিন যুদ্ধ এবং 'সর্বপ্রকারের শান্তিপূর্ণ লুণ্ঠন' এবং সাধারণভাবে সামাজিক বিপর্যয় রোধ করা যাইবে না।

(৩) যুদ্ধ কি রূপ গ্রহণ করিবে?

ফ্রান্সের অন্যতম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মঃ কাইঅ ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে তাহার একটা উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়াছেন :

"কোন মোহ যেন না থাকে। গত যুদ্ধে ছিল ভারী কামান, মেসিনগান ও সাবমেরিনের যুদ্ধ। যদি মানুষ আর একটি যুদ্ধ বাধাইবার মত উন্মাদ হইয়া ওঠে, তবে সে যুদ্ধ হইবে রাসায়নিক ও গ্যাসযুদ্ধ। ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধরত সৈন্যেরা মরিয়াছিল লাখে-লাখে। 'অমুক' বৎসরে—আশা করি এই বছরটি কোনদিন পাঁজিতে লেখা হইবে না—বেসামরিক জনতা একদম নির্মূল হইবে; বেসামরিক অধিবাসীদের রক্ষা করিবার কোন উপায় থাকিবে না। এমন একটি গ্যাস আছে যাহা চামড়ার নীচে ঢুকিয়া যায়,—ফোস্কাও পড়ে না, লোক বুঝিতেও

পারে না। কিন্তু কিছুকাল পরে ভীষণ তড়কা আরম্ভ হয়, এবং লোক চির-দিনের মত পাগল হইয়া যায়।...

"এই নিপীড়ন শুধু যুদ্ধরতদের জন্য পরিকল্পিত হয় নাই, হইয়াছে প্রধানত বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য।"

মঃ কাইঅ-এর কথাগুলির সত্যতা ঐ আগস্ট মাসেই একজন অগ্রণী সামরিক বিজ্ঞানী জেনারেল বার্থহোল ডিমলিং কর্তৃক দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়। ঐ গ্রীষ্মে ইতালী, ফ্রান্স ও বৃটেনে যে বিমান মহড়া হয় তাহা বিশদভাবে অনুশীলন করিয়া তিনি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

" 'লাইয়ন্সে'র উপর 'শত্রু' আক্রমণের আগে জনসাধারণের মধ্যে গ্যাসমুখোশ বিতরণ করা হয় এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকে। একটি বিশেষ বিমান স্কোয়াড্রন, বৈদ্যুতিক সার্চলাইট ও বিমানবিধ্বংসী কামান বসাইয়া শহরটিকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়। তথাপি, আক্রমণকারী বিমানগুলি শহরের মধ্যে ঢুকিয়া বোমা ফেলিয়া যায়। সাম্প্রতিক মহড়াগুলি হইতে দেখা যায়, বিমানধ্বংসী কামান বিশেষ কাজে আসে না, কারণ বিমানগুলি সব সময়ই শ্রাপ্‌নেলের আওতার উপরে উঠিতে ও নীচে নামিতে পারে। ইংলণ্ডের মহড়া হইতে দেখা গেল, শ্রাপ্‌নেলের কুঁচিতে শত্রুর চেয়ে বেসামরিক অধিবাসীদেরই ক্ষতি হয় বেশী।"

(৪) ১৯১৪-১৮'র যুদ্ধে ফ্রান্সের জনসাধারণের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে এবং যুদ্ধ না হইলে তাহাদের কী লাভ হইত?

'ভ্যু' পত্রিকায় প্রদত্ত হিসাব হইতেই ইহার বেশ ভাল জবাব পাওয়া যায়। যুদ্ধে ফ্রান্সের খরচ হইয়াছে ৮,৮৭০,০০০ লক্ষ ফ্রাঁ—ইহার সবটাই শ্রমজীবী মানুষের টাকা, কারণ দুনিয়ায় অন্য কোন টাকা নাই। আর কতকগুলি স্বাস্থ্যবান, সমাজের পক্ষে মূল্যবান মানুষ ধ্বংস হইয়া গেল!

আমি যতদূর জানি, অপরাধের নিরোধ ও শাস্তির জন্য প্রত্যেক দেশেই আইন আছে।

যুদ্ধের এই সব হুমকি দেখিয়া এই সহজ কথাটিই মনে আসে যে, নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহারা ব্যাপক নরহত্যার পরিকল্পনা করিতেছে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা উচিত।

সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক এই মানুষগুলিকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়া রাখিবার কতকগুলি অত্যন্ত মানবিক উপায় আছে; যেমন, তাহাদের সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ কিম্বা নরভুক উপজাতিদের বাসস্থান ঐরূপ কোন স্থানে নির্বাসিত করা। আমি নিশ্চয় জানি, এই প্রস্তাবকে কেহ নিষ্ঠুর মনে করিবেন না, বিশেষত ইহা যদি চার্চিল, চেম্বারলেন, ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপ, পঁয়কারে ও তাহাদের স্বগোত্রদের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপ অবশ্য তাঁহার 'সাধু জেরোম' পড়িয়াছেন, তাঁহার মনে আছে এই সাধুটি যৌবনে গল দেশে দেখিয়াছেন, "আটিকট নামে একটি বৃটিশ উপজাতি মানুষের মাংস খাইয়া বাঁচিয়া

থাকে।" 'ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাগণকে' যদি এই নরভুকদের সহিত বাস করিতে পাঠানো হয়, তবে তাহাদের জিহ্বায় পুরাতন স্বাদ ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু, অপরাধের নিরোধ ও শাস্তিদানের আইন অনুসারে অপরাধীদের পৃথক করিবার কোন প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া মঃ কাইঅ এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে আসিয়া পোঁছিয়াছেন; তাঁহার মতে, মানবসমাজকে বাঁচাইতে হইলে আমাদের প্রমেথিউসের পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ করা উচিত ঃ "মানুষকে বাঁচিতে হইলে নূতন প্রমেথিউসকে—অর্থাৎ বিজ্ঞানকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।"

পুঁজিপতিরা দুনিয়াকে এই নির্জলা বর্বরতার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। অথচ ইহাদের বুদ্ধিজীবী সমর্থকেরা ইহাদেরই সংস্কৃতির স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা বলিয়া থাকে। পুঁজিপতিরা দেখিতেছে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার যুদ্ধের উপযোগী উপায় বিজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণেই তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তবে, আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে বিজ্ঞানের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ইউরোপেও যদি শীঘ্রই তাহার নিজস্ব 'নীচুকপালে' ব্রায়ান্স দেখা দেয় এবং সেখানে যদি বিশপদের ফরিয়াদী করিয়া 'বানরের বিচার' আরম্ভ হইতে দেখি তবে আশ্চর্য হইব না।

স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য পুঁজিপতিরা যে আবার সেই মধ্য-যুগীয় বিশেষ আদালতের প্রতিষ্ঠা করিবে না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না।

পুঁজিবাদ যে সংস্কৃতি ধ্বংস করিতেছে, ইউরোপের সাংস্কৃতিক দৈন্যই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

(৫) যুদ্ধ এড়াইবার জন্য কি করা যাইতে পারে?

ঠিক যাহা করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নে। এই পচা ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য কোন একটা স্থান হইতে তোমাকে শুরু করিতে হইবে। শ্রমিক-শ্রেণী কাজ শুরু করিয়াছিল সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে—দেশে তাহাদের নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া। তাহাদের ত্রিশ বছরের কর্মকাণ্ডের ফল দুনিয়ার প্রতিটি পাপিষ্ঠের মনে ঘৃণার গরল উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাগাইয়া তুলিতেছে ও তুলিবে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী জনসাধারণের মনে ও সারা পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীর মনে এক বলিষ্ঠ সক্রিয় সহানুভূতি।

(১৯৩১)

॥ স্মলেনস্কে প্রাপ্তবয়স্কদের স্কুল ॥

কমরেডস, আপনাদের চিঠি পাইয়াছি।

চিঠিখানির সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে জোরালো জায়গাটি এই :

"সোশ্যালিস্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন ও তড়িৎগতি কাজের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশে মেহনতের প্রতি মানুষের নূতন মনোভাব বাস্তবক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই কাজই নির্মাণকাণ্ডের গতিবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া এমন এক নূতন ধরনের শ্রমিক সৃষ্টি করিতেছে, যে কোন প্রভুর জন্য কাজ করে না, করে নিজের জন্য ও সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর জন্য।"

ঠিক, কমরেডস্ ঠিক। পনের কোটি জীবকোষ লইয়া গঠিত এক বিশাল জীবদেহ আমাদের এই সোবিয়েত ইউনিয়ন। অবিশ্রাম নিজেদের বিস্তৃত করিয়া, বিলাইয়া দিয়া, ইচ্ছা ও যুক্তির প্রচণ্ড বিপ্লবী কর্মশক্তিকে জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া এই পনের কোটি জীবকোষ রাষ্ট্রের নূতন নূতন রূপ সৃষ্টি করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে এক নূতন সংস্কৃতি। আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন কমরেডস্; শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর সেই অংশ যাহারা সচেতন দৃঢ়প্রত্যয় লইয়া লেনিন-বাদী শ্রমিকদের পার্টির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আগাইয়া চলিয়াছে তাহারাই আজ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিতেছে, এবং আপনারা যাহাকে বলিয়াছেন 'সংস্কৃতির প্রতি নূতন মনোভাব' সেই নূতন মনোভাবই এই সংস্কৃতির মূল ও প্রধান প্রয়োজন।

এই নূতন মনোভাব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে?

আত্মপ্রকাশ করিবে এই স্পষ্ট উপলব্ধির মধ্যে যে, আমাদের দেশ সোবিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারেই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক, সংবাদপত্র-সাময়িক

পত্রিকাতেই হোক, কলে-কারখানায় হোক, মাঠের বুকে কি মাটির গহ্বরে হোক, এমন কোন কাজ নাই যাহা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে,—এখানে সর্বপ্রকারের কাজই সমান মনোযোগ ও সমান সম্মান লাভ করে, সমান শক্তি দিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

এই নূতন মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিবে নূতন নির্মাণকার্যের মালমশলা ব্যবহারে মিতব্যয়িতার প্রয়োজনবোধের মধ্যে, আত্মপ্রকাশ করিবে এই সহজ সত্যটি উপলব্ধির মধ্যে যে যত ভালভাবে, যত শক্তভাবে, যত সম্পূর্ণভাবে কোন জিনিস তৈয়ারী করা হইবে, সে জিনিস টিকিবে তত বেশী, তত শীঘ্র মিটিবে দেশের মূল প্রয়োজনগুলির চাহিদা। আমাদের বিরাট দেশের জনসংখ্যার সে চাহিদা মিটাইবার মত অবস্থা এখনও আমাদের আসে নাই।

বুঝিতে হইবে, কোন জিনিস যদি ভালভাবে ও শক্তভাবে তৈয়ারী করা যায়, তবে সে জিনিস বেশীদিন ধরিয়া লোকের কাজে আসিবে, ফলে ব্যয় কমিবে জাতীয় শ্রমের ও শ্রমশক্তির।

অতএব, 'মেহনতের প্রতি নূতন মনোভাবের বাস্তব বহিঃপ্রকাশের' জন্য প্রয়োজন মালমশলা, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রতি মিতব্যয়ীর মমতা ও যাহাতে খারাপ মাল তৈয়ারী হইতে না পারে তাহার জন্য নির্মম লড়াই। এ সবই অবশ্য আপনারা জানেন। আপনারা ইহাও জানেন :

"পাঁচসালা পরিকল্পনার বিরাট কর্মকান্ড ও তাহার গতিবেগের জন্য সংস্কৃতির সাধারণ স্তরের উন্নয়নের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নিজেদের মধ্য হইতে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তোলা, যাহাদের উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি এবং শ্রমিকশ্রেণীর কাজ যাহাদের নিজেদের কাজ।"

খুব ঠিক আপনাদের কথা, বলিয়াছেনও খুব জোরের সাথে। কমরেডস, 'আমাদের সংস্কৃতির সাধারণ স্তর' উন্নয়নের কাজ যে বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আপনাদের গর্ববোধ করিবার যুক্তিসংগত কারণ আছে: তেরো বছর আগে জারশাসিত রাশিয়ার মেহনতী মানুষের পনের আনাই ছিল শুধু মূক নয়, মূকবধির। স্বৈরতন্ত্র, ধনতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, পুরোহিত ও পুলিশ, জারের ফৌজের পদদলিত ও পশুতে-পরিণত সৈন্যদের সঙ্গীনের সাহায্যে এক বর্বর অত্যাচার কায়েম করিয়া মেহনতী জনসাধারণকে যে অবস্থায় রাখিয়াছিল, তাহাতে যন্ত্রণার মৃদু গোঙানি ও জীবনের দুঃসহ দুর্দশা লইয়া শঙ্কিত নীচুগলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা ছাড়া তাহাদের কোন উপায় ছিল না। বিপ্লবীদের, বিশেষত দৃঢ়তম বিপ্লবীদের অর্থাৎ বলশেভিকদের কণ্ঠস্বর এইসব শৃঙ্খলিতদের কানে, মনে, হৃদয়ে প্রবেশ করিত অতি ধীরে, অতি কষ্টে। শ্রমিক ও কৃষক যদি কোনদিন মুখ খুলিত বা হাত তুলিত, তবে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষকে চাবুকে জর্জরিত করা হইত, গুলী করিয়া মারা হইত। ১৯০২ সালে উক্রেইনে, ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী সেন্ট পিতার্সবুর্গে, ১৯০৫-৬ সালের প্রথম বিপ্লবের পর, লেনার সোনার খনিতে—সর্বদা সর্বত্রই এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চারিটি বছরের রক্ত দুর্দশার অভিজ্ঞতার। এক কোটির বেশী শ্রমিক ও কৃষক এই যুদ্ধে নিহত ও পঙ্গু হয়। ভ্যাদিমির ইলিচ লেনিন ও তাঁহার শিষ্যদের শিক্ষার সত্যটি উপলব্ধির জন্য মেহনতী মানুষের প্রয়োজন ছিল রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার। এই দুর্জয় সত্যই বলশেভিক পার্টিচালিত শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণকে যোগাইয়াছিল সেই প্রচণ্ড শক্তি, যাহার বলে মহাপণ্ডিত সেনাপতিদের অফিসারবাহিনীগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিল তাহারা, 'হস্তক্ষেপকারীদের' সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীগুলিকে সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে বিতাড়িত করিয়া প্রতিহত করিয়াছিল জারের রাশিয়ার বিতাড়িত পুঁজিপতিদের সাহায্যে আগত ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের আক্রমণকে। এ সব কথাই আপনারা ভালভাবেই জানেন, আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি শুধু এইটুকু বলিবার জন্য যে তাহার পর মাত্র দশটি বছর কাটিয়াছে।

এই দশ বছরে আমরা কি লাভ করিয়াছি?

প্রকাশিত বই ও সংবাদপত্রের সংখ্যাই জাতির সাংস্কৃতিক স্তরের নির্ভুল পরিমাপ। বিপ্লবের আগে আমাদের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, মূক ও বধির মেহনতী জনসাধারণের সংস্কৃতির স্তর ইতালী ও স্পেন ছাড়া যে কোন দেশের তুলনায় নীচু ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালে, আমার মনে হয়, প্রকাশিত বই ও সংবাদপত্রের দিক হইতে আমাদের দেশ প্রথমস্থানীয়দের মধ্যে। একথা বলার মত ক্ষমতা আমাদের হইয়াছে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র জনসাধারণ আজ পৃথিবীতে কি ঘটিতেছে তাহার সহিত সুপরিচিত এবং শীঘ্রই তাহারা নিজেদের বুদ্ধি ও যুক্তির সাথে প্রকাশ করিতে শিখিবে। দ্রুত বিলুপ্ত ।। শ্রমিক-কৃষকেরা প্রতি বৎসরই বেশী সংখ্যায় নিজেদের লোক শাসনকার্যে, সংবাদপত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে ও কারিগরীবিদ্যায় নিয়োগ করিতে পারিতেছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, তরুণ ও শিশু পত্র-লেখক ও লক্ষ লক্ষ 'নারী প্রতিনিধির' মুখ দিয়া দেশ কথা বলিতেছে। আমাদের লালফৌজ শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের দৈহিক রক্ষার জন্য সৃষ্ট সংগঠন মাত্র নহে, আমাদের লালফৌজ একটি সাংস্কৃতিক শক্তি। ইতিহাসে কোনদিন কোথাও এরূপ ফৌজ গঠিত হয় নাই। আমাদের লালফৌজ লইয়া গর্বিত হইবার অধিকার আমাদের আছে।

আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাফল্য ও দ্রুততার আরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, অবিসম্বাদী পরিমাপ রহিয়াছে। আমার সামনে সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংসদ হইতে প্রকাশিত প্রায় ত্রিশখানি পুস্তিকা পড়িয়া আছে এবং আমাদের 'নক্সা লেখকদের' লেখা স্তূপীকৃত বই। এই লেখকদের সংখ্যা দ্রুত-গতিতে বাড়িতেছে। এই বইগুলির অধিকাংশই ত্বরিত-কর্মা শ্রমিকদের লেখা। কলে-কারখানায়, যৌথখামারে, কৃষিসমবায়গুলিতে কিভাবে সোশ্যালিস্ট দৃষ্টান্ত স্থাপনের অভিযান শুরু হয়, কিভাবে 'ত্বরিত-কর্মাবাহিনী'র জন্ম হয়, কাজের মধ্য দিয়া কলে-কারখানায় তরুণ কমিউনিস্টরা কিভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে

তাহারই সহজ, সরল, জীবন্ত বিবরণ রহিয়াছে এই বইগুলিতে। জনসাধারণের দেশাত্মবোধ ও সৃষ্টিপ্রয়াসের দ্রুত বিস্তৃতির কাহিনী রহিয়াছে এই বইগুলিতে। এই বইগুলিই তো জনসাধারণের সৃজনী উদ্যোগের ফল। এই বইগুলির উপর আমি এত বেশী বাস্তব সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি কেন? কারণ, সবচেয়ে উৎসাহী ব্যক্তি ও দলের শ্রম-অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হইয়াছে এই বইগুলিতে। বইগুলি প্রকাশিত হইতেছে লাখো লাখো কপিতে, প্রবেশ করিতেছে আমাদের দেশের কল-কারখানাগুলিতে; ব্যক্তি ও দলের শিখিবার মত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনাইতেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষককে। ইহার ফলে সারা সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রমের উৎপাদনশক্তি বাড়িবেই। শিল্পশক্তিতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের 'সমকক্ষ হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার' প্রয়োজনবোধ যে কী দ্রুত-গতিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, এই আপাতসামান্য ব্যাপারটি তাহার অকাট্য প্রমাণ। শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে সমষ্টিগত, সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তির দ্রুতবিকাশেরও পরিচয় এখান হইতে পাওয়া যায়।

আমি পড়িয়া খুবই খুশী হইলাম আপনারা লিখিয়াছেন :

"আপনার নামে নাম দেওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের সান্ধ্য-বিদ্যালয়ে শ্রমিকদের সাধারণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক স্তর উন্নত করিবার কাজ খুব ভালোভাবেই চলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০০ জনকে ৫টি দলে ভাগ করিয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইবার জন্য প্রস্তুতি হইতেছে।"

চমৎকার, কমরেডস্, চমৎকার। জীবনযাত্রা এখনও কঠোর, এখনও আমাদের অনেক জিনিসই নাই। কিন্তু, আমরা বুঝিতেছি এমন কিছু নাই যাহা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে, এমন কোন বাধা নাই যাহা আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। সারা দেশ ব্যাপিয়া শিল্পের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য যোদ্ধাদের শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে। আত্মিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েত ইউনিয়নের দৈহিক শক্তিও বাড়িতেছে; সাংস্কৃতিক শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ চলিয়াছে দ্রুতগতিতে।

আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, সোবিয়েত ইউনিয়নের বাহিরে আমাদের শত্রুদের দিন কেমন কাটিতেছে। তাহারা কিভাবে আছে তাহা যদি আমি নিজে বলি তবে লোকে বলিতে পারে আমি 'বানাইয়া বলিতেছি'। অতএব তাহাদের নিজেদের কথা তাহারা নিজেরাই বলুক। যেমন, রাজতন্ত্রী সংবাদপত্র 'ভোরোজদেনিয়ে' লিখিতেছে :

"নির্বাসিত রুশেরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় বল নাচ ও কনসার্টের আয়োজন করিতেছে। তাহাদের দুর্দশার ইহা অপেক্ষা বড় পরিচয় আর কিছুই নাই।"

সম্ভবত করুণ বিদ্রূপের সুরেই ইহা লেখা হইয়াছিল; কারণ এই সংবাদ-পত্রটিতেই কবি লোজোর এই বিষণ্ণ কবিতাটি ছাপা হইয়াছে :

নির্বাসিত জীবনের 'প্রত্যুষে' সংগ্রামে আহ্বান
জানিয়েছিলাম ভাগ্যকে, বিদ্রূপ করেছিলাম তার বিপদ
কী ঘটতে পারে, ভ্রূক্ষেপ করিনি সেদিকে
নিয়তির ভীষণ পরিহাসের সামনে এতটুকু ভয় পাই
প্রতিহিংসার নির্মম নিয়তি
নির্মূল ক'রে দিল আমাদের সমস্ত মধুর আশা।
স্বপ্নের সান্ত্বনায় আর মন ভরে না।
মরিয়া হ'য়ে দুর্দশার মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'ল জী
বিষণ্ণ ধ্যানের অন্ধকারে কেটে যেতে লাগল দিনগুলো।

এমনভাবে পার হয়ে গেল বছরের পর বছর
তিক্ত অধৈর্যে কুশ্রী ভাষায় তিরস্কার করলুম দুঃখকে,
ক্ষয়ের অবসাদ আচ্ছন্ন করল শরীর ও মন,
হৃদয়ের পিছু পিছু চোরের মত নিঃশব্দচরণে
ফিরতে লাগল আতঙ্ক,
তীব্র যন্ত্রণা ও তিক্ত মর্মবেদনায়
বিদীর্ণ হতে লাগল সে হৃদয়।

মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে
দিন কেটে যায় অভাবে-অনটনে,
উৎসবের গানে আনে না কোন সান্ত্বনা।
যে জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত আমরা,
তার কোলে ফিরে যেতে মন কেঁদে উঠছে আজ।

সেই জন্মভূমিকে ঘিরে আজও আমাদের
চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন ও সাধ।
তবু, কারাগারে ব'সে আজও আমরা
আকাশকুসুম রচনা করে চলেছি,
কী চাই আমরা, কিসের পিপাসায় পিপাসিত আমরা
নিজেরাই তা' ভালভাবে জানি না।
যে আশায় বুক বেঁধেছি
যুক্তির আলোকে দেখলে সে শুধু দুরাশা।

অভ্যাসের ক্রীতদাস আমরা
অপরিচিতের নিষ্প্রাণ আনন্দোৎসবের মধ্যে
বছরের পর বছর শুধু বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবি আর ভাবি।
মানুষ নই, মানুষের প্রেত আমরা
নাচ্ছি নিজেদের কবরের উপর।

ব্যথায় যখন বুক ভেঙে যাচ্ছে
মুখে তখন আমাদের খুশীর হাসি।

এই ধরনের কবিতা বিরল নহে। নির্বাসিতদের জীবন বিবর্ণ, নিষ্প্রভ, উৎসাহহীন। প্রসঙ্গত, তাহারা প্রায়ই তিক্ত বিদ্বেষে আমাদের তরুণ লেখকদের ব্যাকরণের ভুল ধরিয়া থাকে। কিন্তু নিজেরা তাহারা রুশ ভাষা ভুলিযা যাইতেছে এবং এইরকম লিখিতেছে :

"ফ্লোরেন্সের দুর্বৃত্ত সম্পর্কে দান্তের 'নরক' হইতে লওয়া সেই সুপরিচিত গল্পটি, যে দুর্বৃত্তটি কোনমতে মৃত ধনীর ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়স্বজনের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া নিজেই তাহার সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হইয়া বসে।"

ইহা 'রুল' পত্রিকা হইতে লওয়া। সেখানে আমরা এও দেখি, "একটি চাকর ডাকাতের উপর একটি গরম জলভরা পাত্র ঢালিয়া দেয়।" মিলুকভের 'পোস্লেদনিয়ে নোভোস্তি'তে এই ধরনের বাক্য হামেশা চোখে পড়িবে, "তাহারা সকলেই ছড়াইয়া পড়িল, নেকড়ে নিজে তাহাদের মধ্যে", এবং "সে তার কন্যার পিছু পিছু ছুটিল।"

রুশ ভাষাকে জবাই করা অবশ্য নির্বাসিতদের প্রধান কাজ নহে। উৎসাহের সহিত সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসা রচনাই তাহাদের আসল কাজ। তাহারা পরস্পরকে আশ্বাস দেয়, "পাঁচসালা পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে", "রাশিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে", যদিও ইউরোপের পুঁজিপতি ও অর্থনীতিবিদেরা ক্রমেই স্পষ্টভাবে ও শঙ্কিতভাবে ঘোষণা করিতেছেন "পাঁচসালা পরিকল্পনা সাফল্যের পথে চলিয়াছে এবং শীঘ্রই সোবিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপীয় রক্তশোষকদের সম্পূর্ণ নির্ভরমুক্ত হইবে।"

সাধারণত নির্বাসিতেরা এখন আর কাহারও কৌতূহল জাগ্রত করে না, তাহারা কিভাবে আছে কাহারও তাহা জানার আগ্রহও নাই। ইউরোপের পুঁজিপতিরা ও পার্লামেণ্টারী রাজনীতিবিদেরা সক্রিয়ভাবেই অস্ত্রসজ্জা শুরু করিয়াছে এবং মনে হয় আরও সক্রিয়ভাবে চুরির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

৭ই জানুয়ারী 'রুল' পত্রিকায় এই কাহিনীটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

"ফ্রান্সে আর একটি বিরাট বাটপাড়ি"

"প্যারিস, ৭-১-৩১॥ উস্ত্রিক ব্যাঙ্কের ঘটনাটি একটি বিরাট রাজনৈতিক কেলেঙ্কারীর রূপ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। এই ব্যাপারের সহিত জড়িত প্রতিনিধি পরিষদের এগারজন সদস্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মঃ রেনো। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী বর্তমান অর্থমন্ত্রী জেরমেঁ মার্ত্যাঁর তালিকায় আছে ৪৫ জনের নাম। এই তালিকায় আছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তার্দু, বর্তমানে যে কমিটি উস্ত্রিক ঘটনার তদন্ত করিতেছে তাহার সভাপতি মার্ত্যাঁ, পরিষদের অন্যতম দক্ষিণপন্থী নেতা ও প্যারিসের প্রতিনিধি, দেশপ্রেমিক

যুব সংঘের নেতা তাইতিংগার, প্রতিনিধি পরিষদের ফিনান্স কমিটির সভাপতি মালভি প্রমুখ ব্যক্তিরা। উস্ত্রিক ব্যাংকের খাতায় পাওয়া গিয়াছে : তার্দুর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিলরকে ব্যাংক মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ করিয়া দিয়াছে। সর্বসমেত সে লইয়াছে এক লক্ষ বিশ হাজার ফ্রাঁ। ভলোঁতে সংবাদপত্রের দুই লক্ষ ষাট হাজার ফ্রাঁ'র একটি রসিদও পাওয়া গিয়াছে। এককালে স্বরাষ্ট্রসচিব র‍্যাডিক্যাল পার্টির দুর্রাদের মুখপত্র মফঃস্বলের সংবাদপত্র 'একো দ্যু সোল'কে আশি হাজার ফ্রাঁ দিবার একটা নির্দেশপত্রও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন কাগজ লিখিতেছে, জেরমেঁ মার্ত্যাঁর তালিকা পূর্ণ হইতে এখনও অনেক বাকী এবং বর্তমান কৃষিমন্ত্রী ভিক্টর বোরেতের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আদালতের তদন্তকারী প্রমাণ করিয়াছেন, উস্ত্রিক পুলিশ কমিশনার বেনোয়াকে দিয়াছে সতের হাজার ফ্রাঁ। এই বেনোয়া লোকটি কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার। এই লোকই জুতাপ্রস্তুতকারক আলমাজভকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছিল। সোশ্যালিস্ট-দের মুখপত্র 'লে পপুলেয়র' বলিতেছে, পার্লামেন্টের সদস্যেরা ঘুষ খাইয়া ব্যাংকের উপর চাপ দিয়া সন্দেহজনক বিদেশী ঋণপত্রধারী ফরাসীদের টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের প্রায় দুই লক্ষ ফ্রাঁ ক্ষতি হইয়াছে। উপনিবেশ মন্ত্রী-দপ্তরের দাবিতে সিরাদোঁ ও বুসিয়ের নামক দুইজন ইঞ্জিনিয়ারকে প্যারিসে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং মার্তিনিকের প্রতিনিধি প্রাক্তন সোশ্যালিস্ট ডেপুটি মঃ লাগ্রো-সিলিয়ারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তাহাদেব সকলের বিরুদ্ধেই সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিবার অভিযোগ আনা হইয়াছে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্মাণকার্যের জন্য মার্তিনিক উপনিবেশকে বিশ কোটি ফ্রাঁর একটি ঋণ দেওয়া হয়। আসামী পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ মূলধনের একটি নির্মাণ-কোম্পানী খুলিয়া বসেন। এই কোম্পানীকে টাকা দেয় উস্ত্রিক ব্যাংক এবং প্রচুর ঘুষের সাহায্যে কন্ট্রাক্ট সংগ্রহ করে। দ্রাগুইঞাঁত্রের ইনার ব্যাংক এক কোটি দশ লক্ষ ফ্রাঁ ঘাটতি ঘোষণা করিয়া ফেল হইয়াছে। ব্যাংকের মালিক আত্মহত্যা করিয়াছে।"

'ইল মাত্তেনো' পত্রিকার এই খবরটি আরও বেশী মজার :

"আমেরিকায় চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারী"

"লন্ডন, ১৯-১-৩১। শিকাগো পুলিশ কর্তৃক রেক্স হোটেল তল্লাসীতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমেরিকায় বেশ বড় রকমের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হোটেলটির মালিক ব্যান্ডিট* (ডাকাত) আল কাপন এবং শহরের ডাকাত-গুন্ডা-বদমাইসের গোপন আড্ডা। সম্প্রতি দুই গুন্ডার দলে ঝগড়ার

* ভাবিবেন না 'ব্যাংকার' কথাটি ছাপার ভুলে 'ব্যান্ডিট' হইয়া গিয়াছে। গত কয়েক বছর ধরিয়া শিকাগো শহরটি দুইটি গুন্ডার দলের হাতে। এক দলের নেতা আল কাপন, অপর দলের সর্দার ডায়মন্ড। দুইটি দলই ব্যাপক রাহাজানি করিয়া থাকে। দুই দলই অনেক খুন করিয়াছে, দুই দলই পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, ইত্যাদি।—ম্যাক্সিম গর্কি।

ফলে হোটেলটির একমাত্র মুরুব্বি আল কাপনের দলের লোকেরাই শুধু সেখানে নিজেদের কাজকর্মের হিসাবনিকাশ দিতে আসিয়াছিল।

"এই সর্বপ্রথম পুলিশ কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা ঠিক করে। প্রথমে তল্লাসীতে কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু শেষে একটি ঘরের দেয়ালে দুইটি গোপন সিন্দুক পাওয়া যায়। খুলিয়া দেখা গেল তাহার মধ্যে কতকগুলি মোড়ক ও চেক ও প্রমিসারী নোটের কতকগুলি বান্ডিল।

"আল কাপনের সঙ্গীদের ও অস্ত্রশস্ত্রের সংবাদ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া মোড়ক-গুলি পরীক্ষা করা হয়। এ ধরনের কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু চেক ও প্রমিসারী নোট পরীক্ষা করিয়া অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। চেকগুলিতে সুপরিচিত উচ্চপদস্থ মার্কিন রাজনীতিবিদের স্বাক্ষর রহিয়াছে এবং দেখা গেল মার্কিন সরকারের ও শাসন বিভাগের সমস্ত শাখার কর্মচারীরাই শুধু নহেন, ওয়াশিংটনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পর্যন্ত আল কাপনের দলের কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট।

"প্রকাশ পায়, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের এবং শাসন বিভাগের বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত আল কাপনের দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন উচ্চ পদের ব্যক্তিও কিছু আছেন যে, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যায় না।

"এই সংবাদে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ও আল কাপনের অনুচরদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

[পুলিশ রিপোর্টটি যখন প্রকাশিত হয় এবং সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতি কতদূর গিয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন এমন বহু ভাঁটিখানা বন্ধ হইতে শুরু করে যে সকল জায়গায় পুলিশের মৌন সম্মতিতে ঝুটা দামী মদ-চোলাই কারখানার দুষ্পাচ্য মাল বিক্রয় হয়।]"

বন্ধনীর মধ্যস্থিত এই কথাগুলি 'ইল মাত্তিনো'র সংবাদের মধ্যেই ছিল।

"সিন্দুকগুলির মধ্যে কি কি ছিল তাহার পূর্ণ বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে কিন্তু কেলেঙ্কারীটি যাহাতে বেশীদূর ছড়াইতে না পারে এবং সমাজের উঁচুতলার যেসব ব্যক্তি ইহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত তাহারা যাহাতে বিপদে না পড়েন সেজন্য যে সংবাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বসিবে, তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যায়।" (ইল মাত্তিনো, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩১)।*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোকে সকালে উঠিয়া এই ধরনের সংবাদ পড়িয়া কৌতুক লাভ করে :

"মিসৌরীর একজন নিগ্রোকে জনতা 'লিঞ্চ' করিয়া মারিয়াছে। জেল হইতে টানিয়া তাহাকে পুরানো স্কুল বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। ছাদের উপর তোলা

* সিন্দুকগুলির মধ্যে কি ছিল তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এই তল্লাসীর বৎসরাধিক পরে আল কাপনকে গ্রেপ্তার করা হয়।—ম্যাক্সিম গর্কি

হয় এবং তারপর ডানামেলা ঈগলের মতো দুইটি হাত ছাদের কাঠে বাঁধা হয়। তারপর সারা বাড়ীটাতে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। নিগ্রোটি জীবন্ত দগ্ধ হয় এবং আগুনে বাড়ীটিও ভস্মীভূত হয়।"

আমেরিকানরা মাঝে মাঝে এইভাবে স্কুলগুলিকে ব্যবহার করে।

বিদেশী সংবাদপত্র হইতে এই সকল উদ্ধৃতির শেষে আমরা 'ভোরোজদেনিয়ে' পত্রিকা হইতে এই ছোট সংবাদটি তুলিয়া 'মধুরেন সমাপয়েৎ' করি :

"এখনকার বার্লিন দুই চরম বিপরীতের সমন্বয়।—বাহিরের আড়ম্বর এবং ভিতরের অস্বাভাবিক তীব্র সংকট।

"বার্লিনে একজন বিজ্ঞাপনের এমন এক চমকপ্রদ কায়দা বাহির করিয়াছে যাহার তুলনা বোধ হয় আমেরিকাতেও মিলে না। একটি দোকানে কয়েকজন 'জিনিষ-চোর' রাখা হয়। সাধারণত একজন মধ্যবয়সী মহিলাকে এই কাজে রাখা হয়। তিনি সারাদিন দোকানে কাটান। তাহার কাজ হইতেছে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়া। অমুক দিনে তাহাকে কি চুরি করিতে হইবে,—ছাতা না রেডিও সেট—তাহা আগেই তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়। চোর ধরিয়া একজন দোকান-দার প্রকাশ্যে তাহার 'চুরি' ঘোষণা করে। সংগে সংগে ভীড় জমিয়া যায়। মধ্য-শ্রেণীর ক্রুদ্ধা মহিলারা দুর্বৃত্তাকে ঘিরিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছেন সাধারণত ঠিক সেই মুহূর্তে দোকানের ম্যানেজার আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন :

"মাদাম আপনি এই জিনিস চুরি করেছেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসটি আপনি পছন্দ করেন। বেশ, জিনিসটি নিয়ে আপনি নিরাপদে বাড়ী চলে যান। আমরা আমাদের মাল এত সস্তায় বিক্রী করি যে, দাম নেওয়া না-নেওয়া আমাদের কাছে সমান।"

"বার্লিনের জীবনের এই এক দিক। অন্য দিকটি এই.........

"ট্যাক্সের বোঝা মাথায় করিয়া এই বড় বড় দোকানগুলি কোনমতে কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে। বিখ্যাত অ্যাডমিরাল-পালাস্ট মিউজিক হলটি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে ও জলের দামে বিকাইয়া যাইতেছে। সমগ্র জার্মান অর্থনৈতিক জগতে সুপরিচিত এবং বার্লিনের বৃহত্তম ব্যাংকগুলির একটির মালিক গোল্ডস্মিড্ সেদিন বিছানায় শুইয়া বুকে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার টেবিলের উপর একটি চিরকুটে লেখা ছিল, "আমার সব টাকা গিয়াছে......"

লক্ষ্য করুন, দোকানের জিনিস-চোরের কাজটিকে—কাজটি চমৎকার নয় কি? —একটু কৌতুকের সাথে 'চমৎকার কৌশল' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মিউজিক হলের ফেলপড়া ও ব্যাংকারের আত্মহত্যার কথা বলিতে গিয়া স্পষ্টই দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে।

যথেষ্ট হইয়াছে, আজ তবে থাক কমরেডস। এই ধরনের নোংরা আবর্জনার শেষ নাই। বলিতে গেলে গা ঘিন ঘিন করে। আমাদের অন্তরের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। (১৯৩১)

॥ "দাসত্বের" অলীক কাহিনী

"অর্থনৈতিক সংকট দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে।" "বেকারী এক বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে।" "অনশনের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আত্মহত্যা মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে এবং রাহাজানি, বেশ্যাবৃত্তি, এমন কি শিশু-বেশ্যাবৃত্তি পর্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।" "প্রতিদিন যত মার্কিন শ্রমিক অনাহারে মরিতেছে তাহাদের সংখ্যা এক হাজারের কম হইবে না।"

এগুলি আমার কথা নহে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র হইতে এগুলি আমি সংগ্রহ করিয়াছি।

পুঁজিবাদীরা বলিতেছে—এ ব্যাপারে ক্রমেই তাহাদের মতৈক্য বাড়িতেছে—শ্রমিকদের খাওয়াইবার মত উপায় তাহাদের নাই এবং রাষ্ট্র হইতে বেকারদের সাহায্য দিবার কথা চিন্তা করা যায় না। বেকারদের সাহায্যার্থ কিছু পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছিল রেড ক্রশ। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেণ্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। কারণ তাঁহার মতে, এই কার্যটি হইবে একটি 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থামূলক কাজ'। পেরিমাইশুল্-এর লেবর এক্সচেঞ্জের ম্যানেজার বেকারদের একটি প্রতিনিধিদলকে বলেন : "আমাদের কোন তহবিল নাই। গলায় দিয়া মরিবার মত দড়ি কিনিবার জন্য কিছু টাকা বড় জোর আমরা তোমাদের দিতে পারি।"

কোন প্রখ্যাত জার্মান রাজনৈতিক নেতা মনের মানববিদ্বেষকে বিন্দুমাত্র গোপন না করিয়া অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এই কথাটি ঘোষণা করিয়াছেন : "দুই কোটি জার্মানকে মরিতে হইবে, কারণ রাষ্ট্র তাহাদের খাওয়াইতে পারে না।" পুঁজিবাদের পদলেহীদের হতাশার এই জানোয়ারসুলভ গর্জন সম্পর্কে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে কোন 'মন্তব্য' প্রকাশিত হয় নাই, অথচ মিথ্যা ও কুৎসার

বিশেষজ্ঞেরা বড়াই করিয়া বলিয়া থাকে যে এই পত্রিকাগুলির 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' রহিয়াছে। এই জানোয়ারী গর্জনে 'মানবপ্রেমিক' বুদ্ধিজীবীদের উদার হৃদয়েও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। লর্ড, বিশপ প্রভৃতি যেসব ভাগ্যান্বেষী দায়িত্ববোধ ও নীতিবোধের বালাই না রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়া ও আফ্রিকার শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তাহাদের শূন্য হৃদয়েও এই গর্জনের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। দুনিয়ার শ্রমিকেরা আর একবার তাহাদের এই বিশ্বাসকেই দৃঢ়মূল করিবার সুযোগ পাইল যে, পুঁজিবাদী, বুর্জোয়াশ্রেণী ও মানবপ্রেমিক 'মত প্রকাশের স্বাধীনতার' নিকট হইতে সাহায্য আশা করা বলদের নিকট হইতে দুধের আশা করার সামিল। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, "শ্রমিকদের কোন দেশ নাই"; এই কথাগুলির মধ্যে একটা কঠোর অবিসম্বাদী শ্রমিক-সত্য নিহিত রহিয়াছে। এই সত্যকে কার্ল মার্কস তাঁহার যুগে ঘোষণা করেন; বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এই সত্যের উপরই বারম্বার জোর দিয়া গিয়াছেন। পুঁজিবাদীদের শক্তি ও শ্রমজীবী জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাসত্বের সমর্থক, বুর্জোয়া 'চিন্তানায়কেরা' এই সত্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ এমন এক সময় আসিয়াছে যখন পুঁজিবাদীরা নিজেরাই, কথায় নয় কাজে, জাহির করিতেছেন যে শ্রমজীবীরা স্বদেশেই পরদেশীয়; নিজের অর্থহীন অন্ধ মুনাফা-লালসায় বুর্জোয়া ব্যবস্থা যে কোটি কোটি মানুষকে বেকার করিয়া দিতেছে তাহাদের জন্য কিছুই করিবার ক্ষমতা তাহার নাই এবং এই দুই কোটি মানুষকে 'নির্মূল করিতেই হইবে'।

এই 'নির্ভীক' উক্তিটি ফাটিয়া পড়িয়াছে একজন জার্মান মানববিদ্বেষীর কণ্ঠ হইতে; কিন্তু বলা বাহুল্য ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত মানববিদ্বেষীরাই, শ্রমিকদের সমস্ত 'প্রভুরাই' এই উক্তিটিকে বাহবা দিয়াছেন। 'অর্থনৈতিক সংকট' কথাটির অর্থ কি সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর তাহা আজ বুঝিবার সময় আসিয়াছে। অর্থ সহজ ও স্পষ্ট। পুঁজিবাদী লালসা, উৎপাদনের বিশৃংখলা এবং শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রভুশ্রেণীর চরম ঔদাসীন্যই এই অর্থনৈতিক সংকটের জন্ম দিয়াছে। সত্যকে বিকৃত করিবার যত কৌশলই তাহার জানা থাক, আজ এমন কোন বুর্জোয়া চিন্তানায়ক নাই যিনি এই সত্যকে খণ্ডন করিতে পারেন অথবা এই সত্যের মর্মান্তিক তাৎপর্য ঢাকিয়া রাখিতে পারেন।

ঘটনা ঘটনাই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে-অবস্থার মধ্যে কোটি কোটি মানুষকে কাজ হারাইয়া অনাহারে 'নির্মূল হইতে হইবে'। এই অনাহারের সংগঠকেরা যখন নিজেরাই এই সত্যের সত্যতা স্বীকার করিতেছে তখন এ সত্য আরও অকাট্য, অবিসম্বাদী হইয়া উঠিয়াছে।

অনাহারের সংগঠকেরা উপবাসী শ্রমিকদের সাহায্য দিতে অস্বীকার করিতেছে। তাহারা এমন কিছু লইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে যাহার গুরুত্ব তাহাদের কাছে বেকারদের অনাহার-মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশী। যে শস্য তাহারা জমা করিয়াছে, বিনা লোকসানে, কি ভাবে কাহার কাছে তাহা বিক্রয় করা যায়

তাহাই তাহাদের সমস্যা। সোবিয়েত শস্য যাহাতে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে না আসিতে পারে, তাহার জন্য তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে।

শ্রমিকদের জন্য তাহারা যথেষ্ট রুটির ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু তাহাতে সংকটের সমাধান হইবে না, উপরন্তু তাহা তাহাদের লক্ষ্যও নহে। তাহাদের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ অন্য দিকে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে বেকার নাই, উপরন্তু প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পথে রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের সেখানে অভাব রহিয়াছে—ইহা বাস্তব ঘটনা। শ্রমশক্তির এই অভাব পূরণের জন্য খুব সম্ভব নিকট ভবিষ্যতেই সোবিয়েত ইউনিয়নকে বাহির হইতে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ ইতিমধ্যেই কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।

সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তিসম্মত রূপ ও প্রকৃতির অকাট্য প্রমাণ এই বাস্তব ঘটনা, এবং প্রমাণ অকাট্য বলিয়াই সোবিয়েত ইউনিয়নে 'দাস-শ্রমব্যবস্থার' ঘৃণ্য কুৎসা তাহাদের আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। পুঁজিবাদীর কথাকে ও তাহার এই ঘৃণিত রটনাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে যাওয়া অর্থহীন, কারণ পুঁজিবাদী সঠিক অর্থে মানুষ নয়, সে একটি 'ট্রাস্ট', অর্থাৎ লালসা ও ঈর্ষার দ্বারা যান্ত্রিকভাবে চালিত একটি প্রাণহীন যন্ত্রের অংশমাত্র। এই ট্রাস্টের কবলিত সংবাদপত্রগুলি, যাহারা তাহাদের দেহ-মন-প্রাণ, অস্থি-মজ্জা, রক্ত-মাংস বুর্জোয়াদের পায়ে বিকাইয়া দিয়াছে—তাহারা যাহাই বলুক না কেন, সোবিয়েত ইউনিয়নে 'দাস-শ্রমব্যবস্থা' ও 'জবরদস্তিমূলক খাটুনি'র কথা যতই উচ্চকণ্ঠে বাগাড়ম্বর করিয়া প্রচার করুক না কেন, এ বাস্তবকে তাহারা কিছুতেই ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না যে, পুঁজিবাদী লালসা ও ঈর্ষার ঠিক এই শক্তিই সংস্কৃতি ধ্বংস করিতেছে, জীবনকে শৃংখলাহীনতার আবর্তে টানিয়া আনিতেছে, এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের কায়িক শক্তির অর্থহীন অপচয়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইয়া চলিয়াছে।

পুঁজিবাদী 'ব্যবস্থাপনা' যে কতখানি অর্থহীন ও নীতিজ্ঞানশূন্য হইতে পারে তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, মূল্যের সৃষ্টিকর্তা শ্রমজীবীকে সে ক্রমেই বেশী করিয়া 'যুদ্ধশিল্পের' দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ঠেলিয়া দিতেছে নরহত্যার হাতিয়ার উৎপাদনের দিকে, ঠেলিয়া দিতেছে প্রকৃত শ্রমমূল্যের, সাংস্কৃতিক মূল্যের ধ্বংসের দিকে, যে-মূল্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মানুষের জীবনযাত্রাকে ও শ্রমের অবস্থাকে উন্নত করা। আজ ইউরোপের শ্রমিকদের একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে, শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের জন্য কাজ করিতেই পুঁজিবাদ তাহাদের বাধ্য করে। ইহা কোন 'স্ব-বিরোধী ব্যাপার' নহে। বাণিজ্যের স্বার্থের প্রচেষ্টাতেই যুদ্ধ বাধে; যত ধ্বংস, তত বিক্রয়। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে কোটিপতিদের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে 'জবরদস্তিমূলক খাটুনি'র যে অলীক কাহিনী পুঁজিপতিরা আবিষ্কার করিয়াছে, সে কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য সোবিয়েত ইউ-

নিয়নের উপর দস্যু-আক্রমণ—এই আক্রমণে যোগ দিতে পুঁজিপতিরা তাহাদের বেকার শ্রমিকদের ও দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বাধ্য করিবে।

সে ক্ষেত্রে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীকে তাহাদের নিজেদেরই সবচেয়ে অগ্রগামী অংশের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-কৃষকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। অস্ত্রধারণ করিতে হইবে তাহাদেরই বিরুদ্ধে যাহারা প্রচণ্ড কর্মোদ্যম, বিস্ময়কর উদ্দীপনার সাহায্যে সাফল্যের সহিত নির্ভীকভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছে এবং এই কাজের দ্বারা সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিতেছে; কারণ, ষোলো কোটি লোকের একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার অর্থ সারা দুনিয়ায় একদিন না একদিন পুঁজিবাদ ধ্বসিয়া পড়া।

ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকগণ, আপনাদের কি বলিয়া দিতে হইবে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পুঁজিবাদীরা যে ঘৃণা পোষণ করে তাহার উৎসমূলে আছে এই অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির আতঙ্ক—আর কিছুই নহে? আপনাদের কি বলিয়া দিতে হইবে যে, 'জবরদস্তিমূলক খাটুনি'র অলীক কাহিনী ও দুনিয়ার বাজারে লোকসান দিয়া সস্তায় মাল ছাড়িবার গালগল্পের উৎপত্তি এই আতঙ্ক ও ঘৃণা হইতেই হইয়াছে? ক্ষুধিতকে সস্তায় রুটি দিতে তাহারা চায় না এবং 'লোকসান সহিতে' চায় না বলিয়াই তাহারা 'অন্যের বাজার মারিবার জন্য দুনিয়ার বাজারে সস্তায় মাল ছাড়িবার' উদ্ভট গল্প রচনা করিয়াছে। অথচ শস্য এত প্রচুর রহিয়াছে যে, উহা পচিয়া যাইতেছে এবং রেল ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে উহা ব্যবহার করা হইতেছে। 'জবরদস্তিমূলক খাটুনি'র গল্প রচনা করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য, নিজেদের রাষ্ট্র গঠনে সোবিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে বাধা সৃষ্টির জন্য, পাঁচসালা পরিকল্পনা ও যৌথ-কৃষিব্যবস্থাকে বাস্তবে পরিণত হইতে না দিবার জন্য, সোবিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করিয়া তাহার জনসাধারণের বিরুদ্ধে আপনাদের লেলাইয়া দিবার জন্য, এবং সোবিয়েত দেশকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের উপনিবেশে পরিণত করিবার জন্য। ব্যাপারটি এত সহজ যে শিশুও বুঝিতে পারে। আপনিও নিশ্চয়ই বুঝিবেন। বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে এই যে খেলা শুরু হইয়াছে, ইহাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আপনাদেরই।

'জবরদস্তিমূলক খাটুনি'? সোবিয়েত ইউনিয়নে মেহনত বাধ্যতামূলক। কারণ, যথাযথভাবে বুঝিলে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি দাঁড়ায় এই: "যে কাজ করিবে না, সে খাইবেও না।" সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেককেই কাজ করিতে হইবে, সে ব্যবস্থায় লুণ্ঠনকারী অথবা পরশ্রমজীবীর স্থান নাই। এমন কোন অবস্থা সেখানে থাকিতে পারিবে না যাহা লুণ্ঠনকারী, পরাশ্রয়ী, অলস, স্বার্থান্বেষী, ভাগ্যান্বেষী প্রভৃতি ঘৃণ্য জীবের জন্ম দেয়। সোবিয়েত রাষ্ট্রে বন্দীশিবিরেও জবরদস্তিমূলক খাটুনির প্রচলন নাই; সেখানে নিরক্ষর অপরাধী-

দের লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করা হয়, এবং কৃষকদের বাড়ীতে যাইতে, জমিতে কাজ করিতে ও পরিবার-পরিজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নে মানুষকে যে কী উঁচু চোখে দেখা হয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধ হয় 'সমবায়ী কর্মব্যবস্থা'। ইহাদের সকল সভ্যই আগে 'সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক' ছিল।

সোবিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন বিচিত্র জাতীয় সত্তাসম্পন্ন শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের কাজ বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত অগ্রসর হইতেছে। এই কাজ এত দ্রুত ও এত সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে যে, মধ্য এশিয়ার স্তেপভূমির যাযাবর-উপজাতিরাও স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে এই মহামহিমাময় আন্দোলনে যোগদান করিতেছে। আগে ইহা কেহ বিশ্বাসই করিত না। সোবিয়েত ইউনিয়নে যাহারা কাজ করিতে চায় এবং সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েতে শ্রমের মহান লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে পারে, তাহাদের অতীত যাহাই হোক না কেন—গভীরতম দরদ ও যত্নসহকারে সোবিয়েত শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র তাহাদের ঘিরিয়া রাখে।

বুর্জোয়া সমাজে যে মানুষ ভুল করে তাহার পতন অনিবার্য, আইন তাহাকে শেষ করে, সমাজ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, মধ্যশ্রেণী তাহাকে পায়ের তলায় পিষিয়া মারে, অথবা সে পেশাদার অপরাধীদের দলে যোগ দেয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'পবিত্র প্রতিষ্ঠানের' বিরুদ্ধে পাপ অভিযানে লিপ্ত হয়। অবশ্য, সোবিয়েত ইউনিয়নেও এমন অপরাধী আছে, যাহারা কোনদিন শোধরাইবে না। উত্তর অঞ্চলের কোন বন্দীশিবির হইতে পলাইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছে যে তিনজন অপরাধী ইহাদের মধ্যে দুইজন খুনী এবং তৃতীয় জন নাবালিকাকে বলাৎকারের অপরাধে অপরাধী। ইহারাই লর্ড নিউটন ও কয়েকজন বিশপের কাছে বন্দীশিবিরে 'জবরদস্তিমূলক খাটুনি'র গল্প বলিয়াছে। আমরা জানি, লর্ডেরা ও বিশপেরা এই গল্পের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন নাই এবং বৃটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া খুনী ও নারীধর্ষণকারীর কথিত মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

লর্ড অথবা বিশপ পদের লোক হইলেই যে সে অস্বাভাবিক রকমের নির্বোধ হইবে না তাহার কোন অর্থ নাই। তাহাদের নির্বুদ্ধিতা স্পষ্টতই অস্বাভাবিক, কারণ সুবিধা হয় বলিয়াই তাহারা অতিমাত্রায় নির্বোধ হইবার ভান করে। প্রকৃতপক্ষে, তাহারা স্বাভাবিকভাবেই নির্বোধ, যেমন লর্ড ও বিশপেরা হইয়া থাকেন। তার উপর আবার তাহারা ইংরাজ, কপটতা যাহাদের নেশা।

যে দেশে শ্রমিক ও কৃষক প্রভু, যে দেশে তাহারা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে, যে দেশে মেহনতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলগতভাবে দৃষ্টান্তস্থাপন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, যেখানে 'ত্বরিতকর্ম' বলিয়া জিনিস সম্ভব হইয়াছে, যেখানে উৎপাদনের বেগ ও বিস্তৃতি বৃদ্ধির আগ্রহে শ্রমিকেরা নিজেরাই নিজেদের উৎপাদন ও খরচের পাল্টা পরিকল্পনায়

দ্বারা সরকারী পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করে, সে দেশে যে জবরদস্তিমূলক খাটুনি থাকিতেই পারে না, তাহা প্রমাণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ও অর্থহীন। সোবিয়েত ইউনিয়নের কুৎসা রটনায় যাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা অবশ্য যে-কোন প্রমাণে বিশ্বাস করিতে পারেন। সমাজতন্ত্র গড়িয়া ওঠা যে তাঁহাদের পক্ষে কি বিপদের কথা তাহা তাঁহারা ভালভাবেই জানেন; তাই তাহাদের জোরগলায় বলিতে হয় যে, জবরদস্তিমূলক খাটুনির সাহায্যে পাঁচসালা পরিকল্পনা সফল করা হইতেছে। যাহারা জানে যে, কাজ তাহারা নিজেদের স্বার্থেই করিতেছে এবং নিজেরাই নিজেদের প্রভু, সেই শ্রমিক ও কৃষকের সুশৃঙ্খল ইচ্ছাশক্তি ও শ্রেণী-চেতনাই যে পাঁচসালা পরিকল্পনাকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিয়াও স্বীকার করিতে চাহে না। এই ঘটনা বুঝিতে পারিয়াই, সোবিয়েত ইউনিয়নকে ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের হাতে বেচিয়া দিবার সুদূরবিস্তৃত 'অন্তর্ঘাতী' চক্রান্ত আবিষ্কৃত হইবার পর দলে দলে ত্বরিতকর্মী পার্টিতে যোগদান করিয়াছিল। পুঁজিবাদও একথা ভালভাবেই জানে। পুঁজিবাদীরা অনেকদিনই বুঝিয়াছেন যে, বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল কোনোক্রমেই 'মুষ্টিমেয়' কয়েকটি লোকের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নহে; রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক কোটি মানুষ এখানে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের মতাদর্শগত, ব্যবহারিক, ও সাংস্কৃতিক জীবন ও শ্রমজীবনের প্রভাব জনসাধারণের বাকী অংশের মধ্যে বিস্ময়কর দ্রুততায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। পুঁজিপতিদের ধারণা হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষই 'বলশেভিক' হইবে—তাহাদের শিরদাঁড়া আর ভাঙা যাইবে না এবং দুনিয়ার 'উপোসীরা' তাহাদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিবে। যে পুঁজিপতিদের শক্তি শুধু উপনিবেশ নহে, নিজেদের দেশেও দাস-শ্রমব্যবস্থার উপর দাঁড়াইয়া আছে, যাহারা প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় বেকার ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রহার করে ও গুলী করিয়া মারে, তাহারাই বলিতেছে জবরদস্তিমূলক খাটুনি খৃষ্টীয় নীতির পক্ষে অসহ্য! তাহারা অবশ্য মিথ্যা কথা বলিতেছে এবং এই মিথ্যার মিথ্যাত্ব তাহারা নিজেরাই প্রমাণ করিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমেরিকায় শুল্ক-আইনের ৬৬৪ ধারার ৩০৭ উপধারায় আমেরিকানরা একটি সংশোধন যোগ করিয়াছে। সংশোধনটি একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবার মত :

"ওয়াশিংটন, ১২ই ফেব্রুয়ারী। প্রতিনিধি পরিষদের শুল্ক ও ফিনান্স কমিটি কর্তৃক শুল্ক আইনের ৩০৭ ধারায় এই সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :

কয়েদী খাটুনি এবং/অথবা জবরদস্তিমূলক খাটুনি এবং/অথবা দণ্ডবিধি অনুযায়ী ফরমায়েসী খাটুনির দ্বারা সমগ্র বা আংশিকভাবে প্রস্তুত, উৎপন্ন অথবা উত্তোলিত কোনও বিদেশজাত মাল বা জিনিসপত্র বা পণ্যদ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহাদের আমদানী নিষিদ্ধ করা হইল এবং এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন

করিতে অর্থসচিবকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়া হইল। জবরদস্তিমূলক এবং/অথবা ফরমায়েসী খাটুনির দ্বারা প্রস্তুত, উত্তোলিত অথবা উৎপন্ন মাল, জিনিসপত্র ও পণ্য সম্পর্কিত এই ধারার ব্যবস্থাগুলি ১৯৩১এর ১লা এপ্রিল হইতে কার্যকরী হইবে; **কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণে যে-সকল মাল, জিনিস ও পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত, উৎপন্ন বা উত্তোলিত হয় না, পূর্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত, উত্তোলিত অথবা উৎপন্ন সেই সব মাল, জিনিস ও পণ্যের ক্ষেত্রে এই আইন কোনমতেই প্রযোজ্য হইবে না।"**

অতএব দেখিতেছেন, প্রশ্নটি নীতির নহে, লাভ-লোকসানের।

* * *

সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার আবহাওয়া সৃষ্টির ঘৃণিত কারবারে পুঁজিপতিরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 'সোশ্যালিস্টদের' সোৎসাহ সাহায্য লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী জার্মানরা। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। শ্রমিকদের অবশ্য 'শৃঙ্খল ছাড়া হারাইবার আর কিছুই নাই'। কিন্তু জার্মানরা শৃঙ্খলের চেয়ে অনেক আরামের জিনিস হারাইতে পারে। ঘটনা হইতেছে এই যে, মূলত এবং প্রধানত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা সরকারী মিউনিসিপালিটির ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মচারী। ইঁহাদের সংখ্যা অন্ততপক্ষে তিন লক্ষ। তাহারা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত এবং নিজেদের এই আসনেই বহাল রাখিতে চায়। তাহারা নিজেদের সোশ্যালিস্ট বলে। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে বিক্রীত হইতে দেখিয়াও তাহারা নিস্পৃহ থাকে—তাহাদের সোশ্যালিজমের চেহারা বুঝিবার জন্য এই একটিমাত্র ঘটনাই যথেষ্ট। আর শ্রমিকদের প্রতি এইসব সোশ্যালিস্টদের মনোভাব যে কী তাহা এই ঘটনাতেই বুঝা যাইবে। 'লাইজার চেন স্টোর্সের' কর্মচারীরা ধর্মঘট করিলেন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মুখপত্র 'ভরভার্টস্'-এ 'বে-আইনী ধর্মঘট' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। মালিক যে অন্যায় করে নাই তাহা প্রমাণের জন্য লাইজার তাঁহার দোকানে দোকানে প্রবন্ধটি টাঙাইয়া দিলেন। এই ধরনের সোশ্যালিস্টদের যে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতি প্রীতি থাকিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এবং তাহারা বিশেষভাবে ঘৃণা করে কমিউনিস্টদের। ফলে এই ধরনের ঘটনার উদ্ভব হয়। একজন কমিউনিস্ট হয়ত জেলা সমবায় সমিতিতে কাজ করেন। কমিউনিস্ট বলিয়া কালো খাতায় তাঁহার নাম উঠিয়াছে। তাঁহাকে বলা হইল, তিনি যদি চাকুরী না খোয়াইতে চান তবে তাঁহাকে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়িয়া সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দিতে হইবে। পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া তিনি হয়ত চাপে পড়িয়া রাজী হইলেন। 'সোশ্যালিস্ট পার্টির' একজন সভ্য বাড়িল এবং পার্টির তহবিলে আসিল কয়েকটি বেশী টাকা। এই তহবিল হইতে কিছু টাকা হয়ত 'সোৎশিয়ালিস্তিচেস্কি ভেস্তনিক' পত্রিকার সমর্থনে গেল। দান, আব্রামোভিচ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই কাগজখানি চালাইয়া থাকেন। সোবিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে কুৎসা

ও মিথ্যায় ইহা পরিপূর্ণ। মনে হয়, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কর্মীরা সোবিয়েত ইউনিয়ন ও তাহার শ্রমিক-কৃষক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসা প্রচারে সাহায্য করিতেছেন।

* * *

রুশ হোয়াইট গার্ড নির্বাসিতদের সংবাদপত্রগুলির সংবাদ সংগ্রহের প্রিয় স্থান হইল সোশ্যালিস্ট সংবাদপত্রগুলি, যদিও মিথ্যা ও কুৎসা সৃষ্টিতে তাহারা নিজেরা কম যায় না। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাদের তৈরী মাল ক্রমেই নোংরা হইয়া আসিতেছে। যেমন অধ্যাপক মিলুকভের পত্রিকা লিখিয়াছে, যে-সকল নির্বাসিত সোলোভ্‌কি-তে বাস করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা ছয় লক্ষেরও উপর।

কথাটি যদি নির্জলা মিথ্যা না হইত, তবে ব্যাপার ভীষণ হইত। সোলোভ্‌কি দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে যেটি বড় দ্বীপ সেটি ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৫ কিলোমিটার চওড়া। এই দ্বীপের সিকি ভাগ হ্রদ। বলশয় আনজারস্কির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ উহার এক-তৃতীয়াংশ। একটি দ্বীপ খেঁকশিয়াল প্রজননের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেখানে বড় জোর জন বারো লোক থাকে। অন্যান্য দ্বীপগুলি আরও ছোট ও মনুষ্যবাসহীন। স্বভাবতই, এই দ্বীপগুলিতে ছয় লক্ষ লোককে ধরানো যায় না। দ্বীপগুলিতে সম্ভবত বিশ হাজার লোকও ধরিবে না।

অত্যুৎসাহী হইলেও খুব বেশী বুদ্ধিমতী নন এমন একজন বৃদ্ধা এই পত্রিকাখানিতে হিসাব করিয়া দেখাইতেছেন যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে দেড় কোটি লোক বেকার। অথচ এই দেশেই কর্মপ্রার্থী কেহ নাই বলিয়া লেবর এক্সচেঞ্জগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং শ্রমিকের অভাবও ঘটিতেছে!

রাজতন্ত্রীদের পত্রিকায় একজন চিকিৎসক লিখিয়াছেন যে, "যৌথখামারে বাস করা বিদেশীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।" বিদেশীরা কাহারা? যৌথখামারে তাহারা ঢুকিল কি প্রকারে?

সোবিয়েত সংবাদপত্রগুলির প্রচারসংখ্যার বিবরণ দিতে গিয়া তাহারা তাহাকে আসল সংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যেমন এই ঘটনাগুলি তাহারা একদম চাপিয়া গিয়াছে :

'ক্রেস্তিয়ানস্কায়া গেজেতা' ছাপা হয় পঁচিশ লক্ষ কপি এবং ইহা ছাড়া কৃষকশ্রেণীর জন্য কমপক্ষে ত্রিশ লক্ষ অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা ছাপা হয় : শিশুদের পত্রিকা 'দ্রুজ্‌নিয়ে বেরিয়াতা'— সাড়ে সাত লক্ষ : যাহারা কেবল পড়িতে শিখিয়াছে তাহাদের কাগজ 'গেজেতা দলিয়া নাচিনায়ুশ্‌চিখ চিতাত' সাড়ে সাত লক্ষ। 'না স্ত্রাঝে'—সাড়ে চার লক্ষ। 'কৃস্তার ই আর্তেল'—দুই লক্ষ। সাময়িক' পত্রিকা ক্রেস্‌তিয়াঙ্কা (কৃষকরমণীদের জন্য)—আশি হাজার। কৃষক তরুণদের জন্য ক্রেস্‌তিয়ান্‌স্কায়া মোলোদিওজ—চল্লিশ হাজার। ইসবা চিতালনিয়া—চল্লিশ হাজার। দেরেভেন্‌স্কি তিয়াতর্‌—বিশ হাজার। সেলকর—বার হাজার। এইরূপ আরো লক্ষ লক্ষ প্রচারসংখ্যার সাময়িক পত্রিকা। কৃষকদের জন্য কৌতুক-পত্রিকা

লাপেৎ-এর প্রচারসংখ্যা দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার। সোবিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রগুলির কথা ধরা যাক। 'প্রাভদা'র প্রচার সংখ্যা পনের লক্ষ তিরিশ হাজার। 'ইজভেস্তিয়া'র প্রচার সংখ্যা এগার লক্ষ। কমজোমোলস্কায়া প্রাভদা—পাঁচ লক্ষ সাতষট্টি হাজার।

নির্বাসিতেরা জানে, এই সংখ্যাগুলি ঠিক। কিন্তু মিথ্যা তাহাদের বলিতেই হইবে। মিথ্যা ও কুৎসাই তাহাদের একমাত্র অস্ত্র। 'নিষ্কর্মা জীবন' যাহাদের পশুতে পরিণত করিয়াছে তাহাদের মুখনিঃসৃত এই ধরনের মিথ্যা কথা নির্বাসিত-দের যে-কোন পত্রিকাতেই পাওয়া যাইবে। এইভাবেই ইহারা ইউরোপের বুর্জোয়া ও 'সোশ্যালিস্ট' কাগজগুলিকে সংবাদ সরবরাহ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেরাই বুঝিতে পারে তাহাদের মিথ্যা আজগুবির পর্যায়ে উঠিতেছে এবং সেই উদ্ভট প্রচারই চলিতেছে। বার্লিনের 'রুল' একখানি অত্যন্ত তিক্ত, নির্বোধ ও আত্মম্ভরী কাগজ। কাগজখানি এই আত্মপ্রশংসার কথা লিখিয়াছে :

"মস্কোর হালের ঘটনাবলী যে বিচিত্র গুজবের সৃষ্টি করিয়াছে সে-সম্পর্কে প্রামাণ্য পত্রিকা কলনিশ্চে জাইতুং প্যারিসের 'ক্রোয়া' পত্রিকা হইতে উধৃত করিয়া প্রধানত রিগা ও রেভেল হইতে যে-সকল মিথ্যা খবর আসিতেছে সেইগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং কতকগুলি সংবাদপত্র বিশেষত বার্লিনের 'রুল' পত্রিকায় প্রকাশিত নির্ভুল সংবাদের সহিত পূর্বোক্ত সংবাদগুলির তুলনা করিয়াছে। রাশিয়া হইতে সংবাদ পাইবার সুযোগ-সুবিধা 'রুল'-এর আছে। পিটার্সবুর্গ হইতে যখন 'রেচ' প্রকাশিত হইত তখন হইতেই সাহিত্যিক অভিজ্ঞ-তার ফলে সে সংবাদের কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা বুঝিতে পারে।"

নির্বাসিতদের সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত 'রুল'-এর বিরুদ্ধে একাধিকবার মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের অভিযোগ আনিয়াছে। যেমন, মিলুকভের প্যারিসস্থ পত্রিকা প্রমাণ করে যে, 'রেড কমান্ডার-এর পত্রাবলী' 'রুলের' অফিসেই বসিয়া লেখা হয় এবং লেখা হয় আনাড়ির মত।

এগুলি নগণ্য ধূলিকণা, কিন্তু অনেক ধূলিকণা মিলিয়া ধূলার মেঘ সৃষ্টি হয় এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যাঁহারা সত্যই জানিতে চান, তাঁহাদের ধূলার আবরণের মধ্য দিয়া তাকাইয়া দেখিতে হয়। কিন্তু ইহাদের বেলায়ও খুব বেশী ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমজীবী জনসাধারণের বেলায়। শ্রমিকশ্রেণীকে অন্ধ করিবার জন্য এই মিথ্যা ও কুৎসার ধূলিমেঘ সৃষ্টি করা হয়। 'জবরদস্তিমূলক খাটুনির' অলীক কাহিনী শুধু যে সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির জন্য তৈয়ারী হইয়াছে তাহা নহে, সোবিয়েত শ্রমিক-কৃষকের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে শ্রমিকশ্রেণীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করাও ইহার উদ্দেশ্য। তাহাদের ক্রমে ক্রমে একটা নূতন সংহার-যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৯১৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা তাহাদের মৃত্যু-মশানে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ১৯১৮ সালে

বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় সোশ্যালিস্টরা শ্রমিকদের উপর গুলী চালাইয়াছিল। এই ঘটনা ভুলিলে চলিবে না।

আমি সম্প্রতি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিগ্রো গায়কদের একখানি গান শুনিয়াছি। গানটিতে এই কথাগুলি আছে :

আমরা আবার কোথাও যুদ্ধ করতে যাচ্ছি,
এবারও জানি না কেন?

ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকেরা যদি আবার লাখে লাখে মরিতে না চান, তবে তাঁহাদের জানা উচিত কোথায় তাঁহাদের লইয়া যাওয়া হইতেছে, এবং কেন? তাঁহাদের জানা উচিত কাহাদের অনুসরণ করিতে হইবে।
(১৯৩১)

॥ কোনো বুদ্ধিজীবীর প্রশ্নের জবাবে ॥

আপনি লিখিয়াছেন :

"ইউরোপের বহু বুদ্ধিজীবী আজ বুঝিতে শুরু করিয়াছেন যে তাঁহাদের কোন দেশ নাই, এবং রাশিয়ার জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। কিন্তু, সোবিয়েতে কি চলিতেছে তাহা আমাদের কাছে স্পষ্ট নহে।"

সোবিয়েত ইউনিয়নে চলিয়াছে প্রকৃতির আদিম শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনসাধারণের সংগঠিত ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত এক সংগ্রাম। মানুষের মধ্যে যে 'আদিম' শক্তিপুঞ্জ রহিয়াছে, যে শক্তিপুঞ্জ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শ্রেণী-রাষ্ট্রের চাপে গঠিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সহজাত উচ্ছৃংখলা ছাড়া আর কিছুই নহে, এ সংগ্রাম চলিয়াছে সেই শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধেও। এই সংগ্রামই সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান চলমান জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন রাশিয়ার বুকে আজ যে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলিয়াছে তাহার গভীর তাৎপর্য অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতে হইলে এই বিপুল কর্মপ্রবাহকে সংস্কৃতির ও সংস্কৃতি-সৃষ্টির সংগ্রামরূপেই দেখিতে হইবে।

পাশ্চাত্যের মানুষ আপনারা নিজেদের সমগ্র জগতের অবশ্য-গ্রহণীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলিয়া মনে করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সম্পর্কে যে-মনোভাব আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আপনাদের মোটেই শোভা পায় না বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, এ মনোভাব খরিদ্দারের প্রতি দোকানদারের মনোভাব, খাতকের প্রতি মহাজনের মনোভাব। আপনারা মনে রাখিয়াছেন, জারশাসিত রাশিয়া আপনাদের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছিল, কিন্তু আপনারা ভুলিয়া গিয়াছেন এই ধার দিয়া আপনাদের শিল্পপতি ও কারবারীরা মোটা সুদও

কামাইয়াছিল। আপনারা ভুলিয়া গিয়াছেন, উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে রুশ বিজ্ঞান ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাধারণ ধারাস্রোতে তাহার প্রচণ্ড জলধারা ঢালিয়া দিয়াছে। আপনারা ভুলিয়া যাইতেছেন, আপনাদের সৃজনী শিল্পের উৎস আজ যখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ও শোচনীয়ভাবে শুকাইয়া আসিতেছে, তখন রুশ শিল্পের শক্তি—তাহার ভাব ও ভাবচিত্র সম্পদের সাহায্যেই আপনারা বাঁচিয়া আছেন। একথা অস্বীকার করার সাহস আপনাদের হইবে না যে, রুশ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে রুশ সংগীত ও সাহিত্যও বহুকাল পূর্বেই সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতের সম্পদে পরিণত হইয়াছে। মানসক্ষেত্রের সৃজনীশক্তিকে যে স্তরে তুলিতে ইউরোপের বহু শতাব্দী লাগিয়াছে, মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে যে জাতি তাহার সৃষ্টিকে সেই স্তরে তুলিতে পারে, সেই জাতি যখন আজ স্বাধীন সৃজনী প্রচেষ্টার সুযোগ পাইয়াছে, তখন ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের নিকট হইতে নিশ্চয়ই সে আরও বেশি অনুশীলন ও মনোযোগ দাবি করিবার যোগ্যতা রাখে। ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী ও সোবিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ যে দুই পৃথক লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর হইতেছে, এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইবার সময় কি আপনাদের আসে নাই? ইতিমধ্যেই নিশ্চয় একথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইউরোপের রাজনৈতিক নেতারা 'সমগ্র জাতির' স্বার্থের সেবা করিতেছেন না, পরস্পরের মধ্যে বিবদমান কতকগুলি পুঁজিবাদী জোটের সেবা করিয়া চলিয়াছেন মাত্র। নিজেদের 'জাতির' প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন কয়েকজন ব্যবসায়ীর কলহ ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাধ্বংসের মতো মানব-বিরোধী পাপ অভিযানে পরিণত হইয়াছে। পারস্পরিক জাতি-বৈরিতার 'আদিম শক্তিকে' ইহা আরও তীব্র ও হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে, ইউরোপকে পরিণত করিয়াছে কতকগুলি সশস্ত্র শিবিরে, ব্যাপক নরহত্যার অস্ত্রোৎপাদনের জন্য জাতির বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি, স্বর্ণ ও লৌহসম্পদের উদ্ভ্রান্ত অপচয় ঘটাইতেছে। পুঁজিপতিদের এই পারস্পরিক কলহ বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকটকে তীব্র করিয়া তুলিতেছে, এবং এই সংকট 'জাতির' দৈহিক শক্তিকে শোষণ করিয়া তাহার মানসশক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। লুণ্ঠনকারী ও ব্যবসায়ীদের এই কলহ নূতন বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিতেছে। নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করুন, এ সমস্ত কেন? এবং সাধারণত যখন আপনি অন্তরের সহিত এই বেদনাদায়ক বিভ্রান্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চান এবং জীবন সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় মনোভাব পরিহার করিতে চান, তখন কতকগুলি অত্যন্ত প্রাথমিক সামাজিক প্রশ্ন নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন এবং কথার কারচুপীতে বিভ্রান্ত না হইয়া পুঁজিবাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য অথবা তাহার অস্তিত্বের পাপ-প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

আপনারা বুদ্ধিজীবীরা "সংস্কৃতির সম্পদকে রক্ষা করিতে চান, সারা মানবসমাজের পক্ষে যে-বস্তুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।" সংস্কৃতির সম্পদকে সত্যই কি আপনারা রক্ষা করিতেছেন? আপনারা তো নিজের চোখেই দেখিতেছেন, যে-সংস্কৃতি সম্পদকে আপনারা রক্ষা করিতে চান, সেই সংস্কৃতিকেই ইউরোপে পুঁজি-

বাদ প্রত্যহ অবিশ্রান্তভাবে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে এবং উপনিবেশগুলিতে এক অমানুষিক নরবিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করিয়া নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় সংস্কৃতির এক শত্রুবাহিনী গড়িয়া তুলিতেছে। কৃষ্ণ ও পীত মহাদেশে যখন এই লুণ্ঠন-কারীদের 'সংস্কৃতি' হাজার হাজার অনুরূপ লুণ্ঠনকারী গড়িয়া তুলিতেছে তখন একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই সকল মহাদেশেই এখনও কোটি কোটি মানুষ লুণ্ঠিত ও ভিখারীতে পরিণত হইতেছে। ভারতীয়, আনামী ও চীনারা কামানের সম্মুখে মাথা নত করিয়া আছে বটে, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে তাহারা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। আর তাহারা বুঝিতে শুরু করিয়াছে, রূপে ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি সংস্কৃতির সৃষ্টি হইতেছে সোবিয়েত ইউনিয়নে।

আপনারা বলেন, "প্রাচ্যের মানুষ পৌত্তলিক ও অসভ্য"। প্রাচ্যের বর্বরতার দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনারা সেখানকার নারীদের অবস্থার উল্লেখ করেন। এই অসভ্যদের প্রশ্নই আলোচনা করা যাক। ইউরোপের মিউজিক হলগুলির রঙ্গ-মঞ্চে হাজার হাজার নারীকে নগ্নদেহ দেখাইতে হয়। আপনাদের কি মনে হয় না, ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের জননী-ভগ্নী-পত্নীদের পক্ষ হইতে নগ্ন নারীদেহের এই প্রকাশ্য প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত? 'নৈতিক' দিক হইতে আমি এই মানববিদ্বেষী প্রদর্শনীর উল্লেখ করিতেছি না, করিতেছি জীবতত্ত্ব ও সামাজিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক হইতে। ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী যে বর্বরতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে, এই ঘৃণিত কুৎসিত প্রমোদ-প্রদর্শনী আমার কাছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ। পরিবার প্রতিপালনের দারুণ ব্যয়বৃদ্ধির মতো অর্থনৈতিক কারণেই অস্বাভাবিক যৌনপ্রক্রিয়া ও যৌনবিকৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকাশ্যে নারীসমাজের এই জঘন্য অপমানই যে তাহার কারণ সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবর্ধমান বর্বরতার লক্ষণ আজ এত বাড়িয়াছে যে, প্রাচ্যের অসভ্যদের বিদ্রূপ করা আপনাদের আর শোভা পায় না। এই প্রাচ্যের উপজাতিগুলির যে কৃষকেরা আজ সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত, তাহারা প্রকৃত সংস্কৃতির মূল্য ও জীবনে নারীর ভূমিকার গভীর তাৎপর্য নিবিড়ভাবে বুঝিতে শিখিতেছে। চীনের যে সকল প্রদেশে ইতিমধ্যেই সোবিয়েত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানকার শ্রমিক ও কৃষকেরা প্রকৃত সংস্কৃতির মূল্য উপলব্ধি করিতেছে। ভারতীয়েরাও একদিন ইহা উপলব্ধি করিতে শিখিবে। আমাদের এই গ্রহের সমগ্র জনসাধারণকেই স্বাধীনতার প্রকৃত পথ কোন্ দিকে তাহা জানিতে হইবে। এই স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলেই তাহারা সংগ্রাম চালাইতেছে।

পুঁজিবাদী জগতে তেলের জন্য, লোহার জন্য, আর একবার কোটি কোটি নরহত্যার জন্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বাঁধিয়া রাখিতে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারের জন্য লড়াই ক্রমেই হিংস্র হইতে হিংস্রতর হইয়া উঠিতেছে। উন্মাদ ধনসঞ্চয়ের লালসায় হিংস্র বর্বরে পরিণত মুষ্টিমেয় একদল

মানুষ এই নির্লজ্জ, নরদ্বেষী, পাপ সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে পৃথিবীর সবচেয়ে কপট ও বৈষম্যবিলাসী ধর্মসমাজ খৃস্টান চার্চের আশীর্বাদ রহিয়াছে তাহাদের উপর। যে 'মানবিকতার' জন্য ইউরোপের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এত মূল্য দিয়াছে এবং যাহার জন্য তাহারা এত গর্বিত, তাহাকে নির্মূল করিয়াছে এই সংগ্রাম। আজ, শাসকশ্রেণীর মানববিদ্বেষপ্রসূত অসংখ্য ট্র্যাজেডিতে পরিকীর্ণ এই বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধিজীবীরা যত স্পষ্টভাবে নিজেদের অসহায় অক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন এবং জীবন সম্পর্কে উদাসীনতার যে নির্লজ্জ প্রমাণ দিতেছেন, অতীতে তাহা আর দেখা যায় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে এই বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ভাব ও আবেগ পুঁজিবাদী দলগুলির ইচ্ছার অনুগত ক্রীড়নক ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যাহা কিছু কিনিবার ও বেচিবার মত সব কিছু লইয়া তাহারা কারবার করে এবং শেষ বিচারে দেখা যায়, জনগণের শ্রমশক্তি লইয়াও তাহারা কারবার করে। 'জনগণ' বলিতে এখানে আমি শুধু শ্রমিক ও কৃষককে বুঝাইতেছি না; ক্ষুদে অফিসার, পুঁজির 'চাকর'দের সেনাবাহিনী ও সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদেরও বুঝাইতেছি। বুর্জোয়া সমাজের নোংরা ছেঁড়া কাপড়ের উপর এই বুদ্ধিজীবীরা এখনও বেশ রঙীন তালির মত শোভা পাইতেছে।

* * *

'সর্বজনীন মানবিকের' মৌখিক সন্ধানে নিমগ্ন বিভিন্ন জাতি ও ভাষার বুদ্ধিজীবীরা নিজ নিজ জাতিগত ও শ্রেণীগত সংস্কার ও পূর্ব-ধারণার স্ফটিকের মধ্য দিয়া পরস্পরকে দেখিয়া থাকে। ফলে, প্রতিবেশীদের গুণাবলী অপেক্ষা ত্রুটিবিচ্যুতিতেই তাহারা আগ্রহান্বিত হইয়া ওঠে বেশি। তাহারা পরস্পরকে এত বেশী বেত্রাঘাত করিয়াছে যে, কাহার ভাগ্যে সবচেয়ে বেশী প্রহার জুটিয়াছে অতএব সবচেয়ে বেশী সম্মানের যোগ্য তাহা তাহারা জানে না। পুঁজিবাদ তাহাদের মনে পরস্পরের প্রতি একটা সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহাতে ইন্ধন যোগাইয়া চলিতেছে।

তাহারা অক্টোবর-বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝিতে পারে না এবং পুঁজিপতিদের ১৯১৮-২১ সালের দস্যুসুলভ রক্তাক্ত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার মত না ছিল তাহাদের ইচ্ছা, না ছিল নৈতিক শক্তি। যখন সোবিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ কোনো একজন অধ্যাপককে, কিংবা কোনো রাজতন্ত্রী অথবা [illegible] গ্রেপ্তার করে, তাহারা প্রতিবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু, যখন তাহাদেরই পুঁজিপতিরা ইন্দোচীন, ভারত অথবা আফ্রিকার মানুষকে অনুগত হইতে বাধ্য করে, তখন তাহারা উদাসীন থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নে যদি কয়েকজন বেহায়া বদমাইশকে গুলী করিয়া মারা হয়, তাহারা চীৎকার করিয়া ওঠে 'নৃশংসতা', কিন্তু যদি ভারতে অথবা আনামে কামান ও মেশিনগান দিয়া হাজার হাজার সম্পূর্ণ নিরপরাধ লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়, মানবপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরা তখন বিজ্ঞের মত নীরব থাকেন। সোবিয়েত ইউনিয়নের সক্রিয় শক্তির তেরো বছরের কাজের ফলাফল তাঁহারা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন

না। সংবাদপত্র ও পার্লামেন্ট মারফৎ রাজনীতিজ্ঞেরা বার বার তাঁহাদের মাথায় এই কথাটিই ঢুকাইতে চাহেন যে, সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত কার্যাবলীর একমাত্র পরিণাম 'পুরাতন জগতের' ধ্বংসসাধন এবং তাহারাও ইহা বিশ্বাস করে।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতেছে এই যে, সর্বজনীন সংস্কৃতির সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বসম্মত অমূল্য সম্পদকে সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবী জনসাধারণ দ্রুত আত্মস্থ করিতেছে এবং শুধু আত্মস্থই করিতেছে না, নব নব সৃষ্টি দ্বারা তাহা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। পুরাতন জগতকে অবশ্য ধ্বংস করা হইতেছে; কারণ শ্রেণীগত, জাতিগত, ধর্মগত ধারণা ও সংস্কারের বন্ধন হইতে এবং মানসিক বিকাশের পুরাতন জগতের নানা বাধানিষেধের হাত হইতে ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে হইবে। সোবিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র জগতের মানুষকে একটি অখণ্ড একতায় ঐক্যবদ্ধ করা। এই কাজের নির্দেশ দিতেছে মানবেতিহাসের সমগ্র ধারা। ইহা কোন জাতীয় নব জাগরণ নহে, এক বিশ্বব্যাপী নবজাগরণের সূচনা। ইহাই ছিল ব্যষ্টিমানুষের স্বপ্ন, ইহাই ছিল ক্যাম্পানেলা, টমাস মুর, সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ার প্রমুখের স্বপ্ন। তাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এমন এক সময় যখন সে স্বপ্ন সফল হইবার পূর্বশর্ত না ছিল শিল্পের ক্ষেত্রে, না ছিল যন্ত্রের ক্ষেত্রে। আজ এই শর্তগুলি পুরাপুরিই বিদ্যমান, এই শর্তগুলিই কল্পস্বর্গকামীদের স্বপ্নের বাস্তব ভিত্তি রচনা করিয়াছে এবং কোটি কোটি মানুষ আজ এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আর এক পুরুষ পরে, শুধু সোবিয়েত ইউনিয়নেই বিশ কোটি শ্রমিক এই কাজে আত্মনিয়োগ করিবে।

লোক যখন বুঝিতে চায় না অথবা পারে না, তখন তাহাদের বিশ্বাস ছাড়া গতি নাই।

শ্রেণীবুদ্ধি, ক্ষুদে মালিকের মনোবৃত্তি এবং শ্রেণীসমাজের অন্ধ সমর্থকদের দর্শনের প্রভাবে পড়িয়া বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিমানুষ দলিত ও নিষ্পিষ্ট হয় এবং মিশরের পিরামিডগুলি যেভাবে তৈয়ারী হইয়াছিল সেইভাবেই জবরদস্তিমূলক খাটুনির দ্বারা দেশের শিল্পোন্নয়নের কাজ চলিতেছে। ইহা শুধু মিথ্যা নহে, এত স্পষ্ট মিথ্যা যে, যাহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া পদার্থ নাই, যাহারা প্রাণশক্তিহীন, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি শুকাইয়া একদম শেষ হইয়া গিয়াছে শুধু তাহারাই ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। শিল্পে, বিজ্ঞানে, যন্ত্রবিদ্যায়—মানবপ্রচেষ্টার সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যক্তির নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবার অলীক কাহিনী এই বাস্তবের সম্মুখে একদম মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। যে-দেশে সংস্কৃতিসৃষ্টির কাজে সমগ্র জনসাধারণই নিযুক্ত, সে-দেশে এ ঘটনা ঘটিবেই।

যে আড়াই কোটি নিরক্ষর ও অর্ধনিরক্ষর 'ব্যক্তিগত মালিকানাভোগী' কৃষক রোমানভদের স্বেচ্ছাচারে ও ভূমিভোগী [illegible] উৎপীড়নে দলিত, হীন

জীবন যাপন করিত, তাহাদেরই এক কোটি বিশ লক্ষ ইতিমধ্যেই সমবায় কৃষির সুবিধা ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছে। এই নূতন কর্মপ্রণালী কৃষককে তাহার রক্ষণশীলতা ও উচ্ছৃংখলতা হইতে, ক্ষুদে মালিকের পশুজগতসুলভ মনোবৃত্তি হইতে মুক্তি দিতেছে। এইভাবে কাজের ফলে সে প্রচুর অবসর পায়, এবং এই অবসরকে সে নিজের শিক্ষার কাজে ব্যবহাব করে। এই বৎসর (১৯৩১) সোবিয়েত ইউনিয়নে পাঁচ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু শিক্ষালাভ করিতেছে এবং এই বৎসরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আশি কোটি বই ছাপা হইবে—তিনশ পঞ্চাশ কোটি ছাপা স্বাক্ষর। ছাপা স্বাক্ষরের চাহিদা ইতিমধ্যেই পাঁচশো কোটিতে উঠিয়াছে, কিন্তু কাগজের কলগুলি এই চাহিদা মিটাইবার মত কাগজ সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়িতেছে। এই তের বছরে সোবিয়েত ইউনিয়নে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু বিভাগবিশিষ্ট কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই তরুণ শিক্ষার্থীতে পরিপূর্ণ। শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে অবিরাম হাজার হাজার সংস্কৃতির বাহক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র মেহনতী জনসাধারণকে সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কি কোনোদিন কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্র অগ্রসর হইয়াছে? এই উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা কি কোনোদিন কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থাকিতে পারে? এই সহজ প্রশ্নের জবাবে ইতিহাস বলে, "না"। মেহনতী মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ঠিক ততটুকু বিকাশই পুঁজিবাদীরা ঘটিতে দিয়াছে যতটুকু তাহাদের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে প্রয়োজন ও সহায়ক। পুঁজিবাদের নিকট মানুষের প্রয়োজন উৎপাদনশক্তির কম-বেশি শস্তা আহরণ-স্থল ও বর্তমান ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবেই। সত্যকার সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে ধীশক্তির বিকাশ ও সঞ্চয়, তাহা পুঁজিবাদ বোঝে না, বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। এই শক্তি যাহাতে অবিরাম বিকশিত হইয়া উঠিয়া যথাসম্ভব দ্রুত প্রকৃতির শক্তি ও দানকে মানুষের করায়ত্ত করাইতে পারে, সেজন্য পুঁজিপতি, লুণ্ঠনকারী ও মেহনতী মানুষের কণ্ঠলগ্ন পরাশ্রয়ীদের স্বার্থে নিয়োজিত লক্ষ্যহীন ও অর্থহীন পণ্ডশ্রমের কবল হইতে যত বেশী পরিমাণ সম্ভব শারীরিক শক্তিকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যে মানসশক্তির বিপুল ভাণ্ডার রহিয়াছে, বুর্জোয়াদের তাহা ধারণার অতীত। সর্বপ্রকার কথার কৌশলে ও কারচুপি সত্ত্বেও সংখ্যাগুরুর উপর সংখ্যালঘুর প্রভুত্বের সমর্থনের ভাবাদর্শ মূলত পশুজগতেরই নীতি।

শ্রেণীরাষ্ট্র গড়া হইয়াছে পশুশালার আদর্শে। পশুশালায় পশুগুলিকে লোহার খাঁচায় আটকাইয়া রাখা হয়। শ্রেণীরাষ্ট্রে কম-বেশী কৌশলে তৈরী এই খাঁচাগুলি হইতেছে কতকগুলি ভাব। এই ভাবগুলি মানুষদের বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করিয়া রাখে, স্বার্থগত ঐক্যের চেতনার বিকাশ তাহাদের মধ্যে অসম্ভব করিয়া তোলে, অসম্ভব করিয়া তোলে একটি ঐক্যবদ্ধ সত্যকার সর্বজনীন মানবসংস্কৃতির আবির্ভাবকে।

একথা কি আমি অস্বীকার করিব যে সোবিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তির উপর বিধিনিষেধ রহিয়াছে? নিশ্চয়ই না। সোবিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ নূতন জীবন গঠনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া এমন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে যে লক্ষ্যলাভ একাকী এমন কি কোন অতিমানবীয় প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব নহে। কোন ব্যক্তিকে সেখানে এই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কিছু করিতে দেওয়া হয় না। নানা ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধা শীরের মত উপেক্ষা করিয়া সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক-কৃষকদের অগ্রগামী সৈন্যদল দৃঢ়পদে এই মহান লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

স্বাতন্ত্র্যবাদী তাহার কাল্পনিক স্বাধীনতার দাবী আঁকড়াইয়া থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী লোহার খাঁচার মধ্যে রাখিয়া যে শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে সে নিজেকে স্বাধীন মনে করে এবং এই অভ্যস্ত স্বাধীনতাকেই সে প্রাণপণে কামনা করে। লেখক, সাংবাদিক, দার্শনিক, আমলা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাযন্ত্রের অন্যান্য পালিশ-করা মসৃণ অংশকে যে-খাঁচাগুলির মধ্যে আটকাইয়া রাখা হয় সেগুলি অবশ্য কৃষকের খাঁচার চেয়ে বেশী আরামপ্রদ। ঝুলেভর্তি নোংরা কুটীর ও 'ব্যক্তিগত কাজ কারবার' লইয়া, প্রকৃতির আদিম শক্তির খেয়াল ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাহাকে অবিরাম আত্ম-রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তো তাহাকে শোষণ করিয়া অস্থিসার করিয়া রাখে। ভাষার পার্থক্য বাদ দিলে মনের দিক হইতে কালাব্রিয়া ও ব্যাভেরিয়ার, হাঙ্গেরী ও বৃটানির, আফ্রিকা ও আমেরিকার কৃষকদের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। দুনিয়ার সর্বত্রই কৃষকেরা প্রায় সমান অসহায় ও পশুজগতসুলভ স্বাতন্ত্র্যবাদে প্রায় সমানভাবেই আচ্ছন্ন। সোবিয়েত ইউনিয়নে কৃষকেরা যৌথমেহনতের পথ গ্রহণ করিতেছে এবং সম্পত্তিপ্রসূত নিঃস্বতার কারা-গারে চিরদিনের মত বন্দী জমির ক্রীতদাসের বিশেষ মনোবৃত্তি পরিহার করিতে শুরু করিয়াছে।

মানুষের উপর বাহিরের চাপে, শ্রেণীসমাজের চাপে স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম। স্বৈরাচার হইতে ব্যক্তির আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টাই স্বাতন্ত্র্যবাদ। কিন্তু আত্মরক্ষা যে আত্মসংকোচন ছাড়া কিছুই নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে মানসশক্তির বিকাশ হইতে পারে না। সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই এই অবস্থা সমান ক্ষতিকর। এক 'জাতি' প্রতিবেশী জাতিগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে; আর শ্রেণীসমাজের অত্যাচারের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তি তার অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করে। "জীবন কি সংগ্রাম?" হ্যাঁ, কিন্তু এ সংগ্রাম হইল প্রকৃতির আদিম শক্তির বিরুদ্ধে এবং সেই শক্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য মানুষ ও মানবসমাজের সংগ্রাম। এই মহান সংগ্রামকে শ্রেণী-রাষ্ট্র পরিণত করিয়াছে মানুষের শারীরিক শক্তিকে করতলগত করিবার, মানুষকে শৃঙ্খলিত করিবার এক ঘৃণিত সংগ্রামে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধি-জীবীর স্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত কৃষকের স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলত কোন প্রভেদ নাই,

প্রভেদ শুধু প্রকাশভঙ্গীর। বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্যবাদ পালিশ-করা বেশী, বেশী তাহাতে রঙের সমারোহ, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতার এ দুই স্বাতন্ত্র্যবাদ সমান পাশবিক, সমান অন্ধ। বুদ্ধিজীবীর মাথার উপর হাতুড়ি, পায়ের তলায় জনতার নেহাই। সাধারণভাবে তাহার জীবনযাত্রা কঠোর ও মর্মান্তিক, সাধারণত বাস্তব তাহার প্রতিকূল। তাই প্রায়ই দেখা যায়, বুদ্ধিজীবীর বন্দী মন তাহার নিজের জীবনের অসুবিধা ও দুর্দশাকে সারা জগতে পরিব্যাপ্তরূপে দেখে এবং তাহার জীবনের বহির্জাগতিক অভিজ্ঞতার ফল হয় দার্শনিক দুঃখবাদ, বাস্তব জীবনে সংশয়াচ্ছন্নতা ও অন্য নানা প্রকারের মানসিক বিকৃতি। আমরা জানি, প্রাচ্য, বিশেষত ভারতবর্ষই দুঃখবাদের জন্মভূমি কারণ এখানকার সমাজে জাতি-ভেদ প্রথাকে একটা অন্ধ, উন্মত্ত পর্যায়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

শ্রেণীরাষ্ট্রের বাস্তবতা ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে; ব্যক্তিত্ব তাই বাস্তবতার বাহিরেই মর্যাদা ও আশ্রয় খুঁজিয়া ফেরে। যেমন খোঁজে দেবতার মধ্যে। প্রকৃতির আদিম শক্তির শুভঙ্কর অথবা ভয়ংকর বিকাশের কারণ খুঁজিতে গিয়া মেহনতী মানুষ নিজের অপূর্ব সুন্দর পৌত্তলিক পদ্ধতিতে এমন সব দেবদেবীর রূপসৃষ্টি করিয়াছে যাহারা মানুষের মত বটে কিন্তু মানুষের চেয়েও শক্তিশালী। অলিম্পাস ও আসগার্ডের দেবতারা বর্ধিত আকারে মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাল্‌কান ও থর সাধারণ কর্মকারের মতোই কর্মকার, শুধু শক্তি ও নৈপুণ্য বেশী। শ্রমজীবী মানুষের ধর্মগত সৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে; তাহারা পরিপূর্ণভাবেই বাস্তব জীবন হইতে অবিচ্ছিন্ন। মেহনতের প্রভাব তাহাদের মধ্যে স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য মূলত মেহনতকেই উৎসাহ দেওয়া। সব কিছুর শেষে বাস্তবতা সৃষ্টি করে দেবতা নয়, মানুষের মেহনত—এ চেতনা জনসাধারণের কাব্যসৃষ্টির মধ্যে চোখে পড়ে। জন-সাধারণ মূর্তিপূজারী। খৃস্টধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হইবার দেড় হাজার বছর পরে আজও সেই প্রাচীন দেবতারাই কৃষকদের কল্পনার দেবতা। প্রাচীন গ্রীকদের ও স্ক্যান্ডি-নেভিয়ানদের দেবতাদের মতই আজও খৃস্ট, ম্যাডোনা ও সাধুরা এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং দৈনন্দিন কর্মজীবনে হস্তক্ষেপ করেন।

'ব্যক্তিগত কারবার' হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম। গোত্রের সহিত গোত্র মিশিয়া সৃষ্টি হয় সমবায়ের। যে-কোন কারণেই হোক, ব্যক্তি যখন সমবায় হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল, তখন সে অবিশ্রাম নব নব রূপান্তরিত প্রকৃত বাস্তব হইতে সৃষ্টি করিল বুদ্ধি ও যুক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থিত এমন এক একক অতীন্দ্রিয় দেবতার, যাহার উদ্দেশ্য হইল স্বাধীনতা ও ক্ষমতায় ব্যক্তিবিশেষের অধিকারকে ন্যাষ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা। প্রয়োজন হইল অতীন্দ্রিয়বাদের, কারণ ব্যক্তিবিশেষের সার্বভৌম ও স্বেচ্ছাচারী হইবার অধিকারকে যুক্তি দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাহার দেবতাকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও অনন্তবুদ্ধিমান বলিয়া প্রচার করে। অর্থাৎ নিজের দেবতাতে সে এমন সব গুণ আরোপ করে ব্যক্তিবিশেষ নিজে যে গুণগুলির অধিকারী হইতে চায়, অথচ যৌথ মেহনত-সৃষ্ট বাস্তবতা

ছাড়া যে গুণগুলির বিকাশ অসম্ভব। এই বাস্তবতা চিরদিনই মানুষের বুদ্ধির পিছনে পড়িয়া থাকে, কারণ যে বুদ্ধি ইহাকে সৃষ্টি করে সে চিরদিনই ধীরে ধীরে অবিশ্রান্তভাবে নিজেকে পূর্ণতার পথে লইয়া চলিয়াছে। যদি তাহা না হইত, তবে মানুষ বাস্তব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত এবং সন্তুষ্টি তো একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অপরিমেয় শক্তিই বাস্তবকে সৃষ্টি করে এবং এমন একটি মুহূর্তও নাই যখন এই বুদ্ধির বিকাশ থামিয়া থাকে। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অতীন্দ্রিয় দেবতা চিরদিনই গতিহীন, কর্মহীন, সৃষ্টিহীন, প্রাণহীন। ইহা বন্ধ্যাত্বের প্রতিফলন মাত্র। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ধর্মগত আধ্যাত্মবাদী চিন্তার নিষ্ফল দোদুল্যমানতার ইতিহাস তো শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। আজ বুদ্ধিজীবীদের অস্থিরতার বন্ধ্যাত্ব সন্দেহাতীতরূপেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের চরম অন্তঃসারশূন্যতা একেবারেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবাদী এখনও জীবনের 'রহস্যের' নিষ্ফল উত্তর খুঁজিয়া ফিরিতেছে। মানুষের শ্রমকান্ড জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বেগে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনের রহস্য সেখানে না খুঁজিয়া খুঁজিতেছে নিজের 'অহমিকার অন্ধকার গহ্বরে'। 'ব্যক্তিগত কারবারের' ভিক্ষুকজীবনকে অবিশ্রাম পাহারা দিয়া চলিয়াছে, এবং জীবনকে ফলবান করিয়া তুলিবার কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার নাই। সে জীবনধারণ করে, সে আত্মগোপন করে; তাহার 'মানসজীবনের কর্মকান্ড' দেখিয়া বাইবেলের ওনানের কাজকর্মের কথাই মনে পড়ে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আদেশ-উপদেশ বশম্বদ ভৃত্যের মত মানিয়া লইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবীর দল—লেখক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, একদা-সোশ্যালিস্ট ভাগ্যান্বেষী ও গান্ধীর মত কল্পনাবিলাসীর দল—জানিয়া অথবা না জানিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীব্যবস্থার বনিয়াদটিকে রক্ষা করিতেছে অথচ সর্বজনীন সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতিকে এই ব্যবস্থাই যে রুদ্ধ করিতেছে তাহা আজ একান্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বাস্তব সৃষ্টির জন্য শ্রমজীবী মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রভাবই এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মধ্যে ক্রমেই বেশী করিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। বুদ্ধিজীবীদের ধারণা তাহারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতেছে, যদিও নিজেদের পৌরুষহীন অক্ষমতার পরিচয় তাহারা অতীতেও দিয়াছে, আজও দিতেছে। তাহাদের ধারণা তাহারা 'ব্যক্তির স্বাধীনতা' রক্ষা করিতেছে, যদিও এই স্বাধীনতা এমন কতকগুলি ধারণার খাঁচায় আবদ্ধ যে-গুলি মানসিক বিকাশের পথে বাধা। তাহাদের ধারণা তাহারা 'বাক্যের স্বাধীনতা' রক্ষা করিতেছে, যদিও সংবাদপত্র আজ পুঁজিবাদীদের কুক্ষিগত এবং তাহাদেরই উচ্ছৃঙ্খল, অমানুষিক, পাপ স্বার্থের সেবা করা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন কাজ নাই। নিজের শত্রুকেই সেবা করিতেছে বুদ্ধিজীবী, কারণ আবহমানকাল ধরিয়া প্রভুরা শ্রমিকের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে এবং 'শ্রেণীসহযোগিতা'র কথাটি নেকড়ে ও মেষের বন্ধুত্বের মতই অর্থহীন মূঢ়তা মাত্র।

ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরা তাহাদের শত্রুদেরই স্বার্থসেবা করিতেছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণ যে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ সুরু করিয়াছেন তাহার প্রতি এই বুদ্ধিজীবীদের মনোভাবের মধ্যেই এই বাস্তব সত্যটি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর উন্মত্ত ঘৃণার আবহাওয়ায় এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাহাদের দস্যু-আক্রমণের হুমকির সম্মুখেই চলিয়াছে এই সাংস্কৃতিক অভিযান। যে সকল বিসদৃশ ঘটনাকে সোবিয়েত শ্রমিক-কৃষকের শত্রুরা এত বড় করিয়া দেখাইতেছে, সেগুলির কারণ এই ঘৃণা ও হুমকি।

সোবিয়েত জীবনের এই অবাঞ্ছিত বিসদৃশ ঘটনাগুলির বিবরণ প্রকাশে উৎসাহ ও উল্লাস দেখাইতেছেন বিশেষভাবে রাশিয়ার নির্বাসিত রাজনীতিকেরা। ইউরোপের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিকে সংবাদ যোগাইয়া থাকেন ইহারাই। ইহারা কাহারা? কাহারা এই নির্বাসিতেরা? ইহাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক জীবনে ব্যর্থ, উচ্চাভিলাষী, সামান্য ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু ইহাদের 'আশার অন্ত নাই'। ইহাদের কেহ কেহ মাসারিক, ব্রিয়ান্ড বা চার্চিল হইতে চাহেন, অনেকেই চাহেন ফোর্ড হইতে। কিন্তু ইহাদের সকলেই 'এতখানি কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে যাহা গেলা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে'। ইহাদের নৈতিক ও মানসিক দেউলিয়াপনার কথা আমি বহুকাল হইতেই জানি। ১৯০৫-০৭ সালে প্রথম বিপ্লবের পরই তাহারা ইহার পরিচয় দেয়। তখন তাহারা 'ডুমা'য় প্রতিদিনই নিজেদের অক্ষমতার পরিচয় দিত। এই অক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় দিল তাহারা ১৯১৪-১৭ সালে, যখন তাহারা 'স্বৈরতন্ত্রের' বিরুদ্ধে 'ধ্বজাধারণ' করিল বটে, করিল না সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। পেতি বুর্জোয়া ও বড় বুর্জোয়ার রাজনৈতিক চেতনার রূপদাতারূপে তখন তাহারা কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এক কথায় তাহারা ছিল ভাবাদর্শের প্রবক্তা। কথায় আছে, 'মাছ না থাকিলে, কাঁকড়ারাই চলিবে।' রুশজীবনে ইহাদের ছিল কাঁকড়ার পিছু-হটা ভঙ্গী। বিপ্লবের সময় অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর ইহাই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ইহাদের লজ্জাজনক ভূমিকা অবিরাম রাজনৈতিক 'সীমারেখা পরিবর্তন' ও 'হীনবলের প্রতিজ্ঞা' ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ১৯১৭ সালে ও তারপরে জারের অবশিষ্ট সেনাপতিদের সঙ্গে মিশিয়া তাহারাও তৈল সুতাকল ও কয়লার শিল্পপতিদের, বড় বড় মিলমালিক ও জমিদারদের স্বার্থসেবা করিয়াছে, যদিও এই সেনাপতিরা তাহাদের দলত্যাগী ও জারের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিত। রাশিয়ার ইতিহাস তাহাদের জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই স্মরণ করে। হে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহোদয়গণ, চার বছর ধরিয়া ইহারা নিজেদের জাতিকে তোমাদের পুঁজিপতিদের পায়ে বিক্রয় করিয়াছে। সারা ইউরোপের কলঙ্কস্বরূপ এক চারি বৎসরব্যাপী যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার জন্য দেনিকিন, কোলচাক, র‍্যাঙ্গেল, যুদেনিচ প্রমুখ পেশাদার জল্লাদদের তাহারা সাহায্য করিয়াছে পুরা চারিটি বছর ধরিয়া। এই

ঘৃণ্য জীবগুলির সহায়তায় জারের ও ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের সেনাপতিরা লক্ষ লক্ষ সোবিয়েত শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করিয়াছে, শত শত গ্রাম ও কৃষকদের কুটীর জ্বালাইয়া দিয়াছে, রেল লাইন ধ্বংস করিয়াছে, পুল উড়াইয়া দিয়াছে, যাহা পারিয়াছে সব কিছুই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে' নিজের দেশকে চরম দুর্বল করিয়া ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য। জিজ্ঞাসা করুন কেন তাহারা জনসাধারণকে হত্যা করিয়াছে, কেন তাহারা তাহাদের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে? জবাব পাইবেন, "জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য।" তবে, সেই জনসাধারণই কেন তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল,—একথার জবাব তাহারা চাপিয়া যাইবে। ১৯২৬ সাল হইতে শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রকে তাহারা সাহায্য করিয়াছে। এইসব পাপ কাজে তাহাদের যে হাত ছিল সেকথা অবশ্য তাহারা অস্বীকার করে, কিন্তু চক্রান্তকারীরা, তাহাদের বন্ধুরা, স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা 'ইচ্ছা করিয়াই সোবিয়েত কার্যকলাপের মিথ্যা বিবরণ' সংবাদপত্রে ছাপাইয়াছে এবং বলা বাহুল্য দেশদ্রোহীদের এই সংবাদপত্রের দ্বারাই এই ষড়যন্ত্রকারীরা চালিত হইয়াছে।

হে ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আটচল্লিশজন দুর্ভিক্ষস্রষ্টা নৃশংস ধর্ষণবিলাসীকে যে যোগ্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আপনাদের মানবপ্রেমিক হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। আশ্চর্য! কিন্তু আপনাদের নিজেদের শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ যে প্রায় প্রত্যহ একান্ত নিরপরাধ শ্রমিকদের হত্যা করিতেছে তাহাতে তো আপনাদের মনে ব্যথা লাগে না? কুর্তেন নামে ডুসেলডর্ফের যে নৃশংস পাপিষ্ঠের নয়বার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, এই আটচল্লিশজন নরপশু তাহার চেয়েও ঘৃণিত জীব। জানি না কি ভাবিয়া সোবিয়েত কর্তৃপক্ষ এই চক্রান্তকারীদের বিচারশালায় দাঁড় করান নাই। তবে অনুমান করিতে পারি। এমন অপরাধ আছে যাহার জঘন্য পাপিষ্ঠতা আমাদের শত্রুদের কাছে আকর্ষণীয় হইতে পারে এবং শত্রুকে এই পাপিষ্ঠতা শেখান নিশ্চয়ই শিশুসুলভ মূর্খতা। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, আমি যদি জার্মান নাগরিক হইতাম তবে কুর্তেনের প্রকাশ্য বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতাম, কারণ শ্রেণীসমাজ এত বেশী সংখ্যায় ধর্ষণবিলাসী পাপিষ্ঠের জন্ম দিয়াছে ও দিতেছে যে এই নৃশংসতার প্রকাশ্য প্রচারের এবং অপরাধীদের কারুবিদ্যার সম্পূর্ণতাসাধনের আর প্রয়োজন নাই। একথা জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না : অধ্যাপক এস, এফ, প্লাতানভের মত রাজতন্ত্রীর বেলায় ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা 'ব্যক্তির স্বাধীনতা'র লড়াইয়ে নামেন, অথচ ব্যক্তি যখন কমিউনিস্ট হয় তখন তাঁহারা উদাসীন থাকেন কেন?

রুশ নির্বাসিতেরা যে অধঃপতনের কোন্ অতলে নামিয়াছে যদি তাহার নির্ভুল পরিচয় পাইতে চান, তবে, রাজতন্ত্রী নির্বাসিতদের প্যারিসস্থ মুখপত্র 'ভোরোজদিয়েনীতে' প্রকাশিত সোবিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-তহবিলের আহ্বানটি পড়িয়া দেখুন।

এই ঘৃণিত অভিযানের শীর্ষদেশে রহিয়াছেন "রাশিয়ার বাহিরে রাশিয়ার অর্থডক্স চার্চের আর্কবিশপদের সিনড-এর সভাপতি ব্লেসেড মেট্রোপলিটান এন্টোনিয়াস।" শুনুন এই শয়তানের কথা তাহার নিজের ভাষায় :

"শয়তান কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র উত্তোলিত হইবে ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতাবলে আমি তাহাকে আশীর্বাদ জানাইতেছি; সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারীদের দলে থাকিয়া অথবা ব্যক্তিগতভাবে জনগণের প্রতিশোধকামীরূপে যাহারা রুশিয়া ও খৃস্টের জন্য জীবন বিসর্জন দিবে, তাহাদের সমস্ত পাপ আমি মার্জনা করিতেছি। এবং সর্বোপরি, আশীর্বাদ জানাইতেছি 'রুশ সত্যের জাতীয় ভ্রাতৃত্বের' সেই সেই অস্ত্র ও জঙ্গী অভিযানকে যাহা বহু বৎসর ধরিয়া ঈশ্বর ও রুশিয়ার নামে ও কার্যে ও বাক্যে লাল শয়তানের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইতেছে। এই ভ্রাতৃত্বের যাহারা দলপুষ্ট করিবে অথবা তাহাকে সাহায্য করিবে, সকলের উপরই যেন ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয়।"

—"মেট্রোপলিটান এন্টোনিয়াস।"

জনগণের ইচ্ছাকে পদদলিত করার কার্যে ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে খৃষ্টীয় ধর্মগুরু মেট্রোপলিটন যে তাঁহার সমর্থন ও আশীর্বাদ জানাইতেছেন, তাহা একেবারে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও কি আপনারা বুঝিতে পারেন না যে, যাহার হিংস্রতা মূর্খতার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এমন একজন খৃষ্টীয় ধর্মগুরুর এইসব আবেদন ও হত্যার মার্জনা-ঘোষণা কোনো 'সংস্কৃতিবান রাষ্ট্রের' রাজধানীতে শোভা পায় না? আপনাদের কি মনে হয় না যে, আপনাদের উচিত এই 'মহাগুরু'র মুখের উপর 'ক্ষান্ত হও' 'স্তব্ধ হও' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠা? আপনাদের কি মনে হয় না যে, একজন রুশ ধর্মগুরুর এই ধরনের অসভ্য চীৎকার শুধু রুশ নির্বাসিতদের পশুতে পরিণত হইবার চিহ্ন নহে, সামাজিক নীতি ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের চরম ও একান্ত লজ্জাকর উদাসীনতার পরিচয়ও বটে! তথাপি আপনারা "প্রাচ্যের বর্বরতার" কথা বলেন।

রুশ নির্বাসিতেরা যাহা বলে তাহাই আপনারা বিশ্বাস করেন। বেশ তো করুন। উহা আপনাদের 'ব্যক্তিগত ব্যাপার'। কিন্তু এ বিশ্বাসের অধিকার আপনাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ, অন্যপক্ষের অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকের সরকারের বক্তব্য শুনিবার স্পষ্টতই কোন আগ্রহ আপনাদের নাই। আমাদের বর্তমান জীবনের খারাপ দিকটা কখনও সোবিয়েত সংবাদপত্র গোপন করে না; কঠোর আত্মসমালোচনাই ইহার নীতি। প্রকাশ্যে নোংরা ন্যাকড়া ধুইতে সে ভয় পায় না। জনসাধারণের সহিত, কোটি কোটি মানুষের সহিত সে কাজ করিতেছে। এই মানুষেরা এখনও খুব শিক্ষিত হইয়া ওঠে নাই—এবং সেজন্য তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সততাসম্পন্ন মানুষকে মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা এখনও খুব বেশী শিক্ষা পায় নাই, তাহারা সহজেই ভুল করিতে পারে। এবং ইহাও জানা উচিত। [illegible] সংবাদপত্রগুলি যে সকল মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করিয়া থাকে, এবং

যে-গুলি তাহাদের সান্ত্বনা ও আশ্রয়স্থল, সেগুলির অধিকাংশই সোবিয়েত আত্ম-সমালোচনায় প্রকাশিত ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া রচিত।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের বিভিন্ন সভায় ও সংবাদপত্রে অতিরিক্ত আত্মসমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছি। আমি জানি, সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্বেষবিষাক্ত বিকারগ্রস্ত মনকে আশ্বাস যোগাইতে পারে এমন কণামাত্র কোথাও কিছু পাইলে, কী অন্ধ লোভে, কী উগ্র লালসায়ই না এই নির্বাসিতেরা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে! কিছুদিন সোবিয়েত সংবাদপত্রে আমি 'ব্রেখ'এর একটি সংস্করণ সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লিখি। প্রবীণ কিন্তু অসাবধানী ও খুব বেশী শিক্ষিত নন এমন একজন লেখক সম্পাদনা করায় সংস্করণটি একদম মাটি হইয়া গিয়াছে। নির্বাসিতদের পত্রিকা 'রুল'-এর অতি নির্বোধ ও উগ্রমস্তিষ্ক বৃদ্ধ সম্পাদক জোসিফ হেসেন হাস্যকর উল্লাসের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন : "এ্যাঁ, গর্কি পর্যন্ত সোবিয়েত শাসনকে সমালোচনা করিতেছেন!" তিনি জানেন যে, যাহার কাজে সাবধানতা, সততা ও সুষ্ঠুতার অভাব দেখি, তহাকে স্পষ্টভাবে কঠোর সত্যকথা বলিতে আমি দ্বিধা করি না। একথা জানা সত্ত্বেও, অন্য সমস্ত নির্বাসিত 'রাজনীতিজ্ঞের' মত তিনিও মিথ্যা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এমন এক বিশেষ ধরনের 'সত্য' আছে, যাহা হইতে শুধু মানববিদ্বেষীরা, অজ্ঞতাসম্বল সন্দেহবাদীরা ও উদাসীনতার সমর্থন খুঁজিয়া বেড়ান এমন উদাসীনেরাই মানসিক পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ সত্য পুরানো, পচা ও দুর্গন্ধময় সত্য—এ সত্য শূকরের খাবার। সোবিয়েত ইউনিয়নের নব সংস্কৃতির স্রষ্টাদের অগ্রণী কর্মীদলের হাতে এই সত্য আজ পরাজিত ও ধ্বংস হইতেছে। এ সত্য যে কিভাবে সততাসম্পন্ন মানুষের কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাহা আমি জানি ও চোখের উপর দেখিতেছি। কিন্তু, ইতিহাস যাহাদের ন্যায্যভাবেই অধঃপতনের অতলে নামাইয়া দিয়াছে তাহাদের আশ্বাস ও সাহস যোগাইবার জন্য এই সত্যকে ব্যবহৃত হইতে দিবার আমি বিরোধী।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"কোনো অসন্তুষ্ট শ্রমিক ও কৃষক আছে কিনা এবং তাহাদের অসন্তোষের কারণ কি?" অসন্তুষ্ট লোক অবশ্যই আছে; যদি মাত্র তের বছরের কাজের ফলে ষোলো কোটি মানুষ তাহাদের সমস্ত প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া ফেলিতে পারিত, তবে সেটা হইত এক অসাধারণ দৈব ঘটনা। সেখানে যে অসন্তোষ রহিয়াছে তাহার কারণ শ্রমজীবী জনসাধারণের দ্রুতবর্ধমান সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে মিটাইতে গেলে তেরটি বছর সরকারী যন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত কম সময়। এখনও বহু জিনিষ দুষ্প্রাপ্য, এখনও বহু লোক বিরক্তি প্রকাশ করে, অভিযোগ করে। সময়োচিত ও সুচিন্তিত নয় বলিয়া এ অভিযোগগুলি হয়ত হাস্যকর। কিন্তু আমি ইহাদের হাস্যকর বলিব না কারণ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে দেশের সমস্ত প্রয়োজনই মিটাইতে পারে অভিযোগগুলির মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাসই ফুটিয়া ওঠে। অবশ্য, সম্পন্ন কৃষকদের যে অংশ ভাবিয়া-

ছিল বিপ্লবের ফলে তাহারা বড় বড় জমির মালিক ও জমিদার হইয়া যাইবে এবং গরীব চাষীরা তাহাদের হাতের মুঠোয় আসিয়া পড়িবে তাহারা শুধু অসন্তুষ্ট নয়, সোবিয়েত সরকারের কাজে সক্রিয়ভাবেই বাধা দিতেছে। বলা বাহুল্য, কৃষক-শ্রেণীর এই অংশ যৌথকৃষির বিরোধী এবং ব্যক্তিগত চাষ, মজুরী-দাসত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদী জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনিবে তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু ইহাদের দিন শেষ হইয়াছে, এবং যৌথকৃষির বিরুদ্ধে ইহাদের প্রতিরোধের আর কোন ভবিষ্যতই নাই; এখন শুধু অভ্যাসবশেই তাহারা এই প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতেছে।

শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে সক্রিয় অংশ অভিযোগ করে না—কাজ করে। তাহারা ভালভাবেই জানে যে, তাহারাই সরকার এবং তাহাদের সমস্ত প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা মিটিবে তাহাদের নিজেদেরই প্রয়াসের ফলে। শক্তি ও সর্বশক্তিমত্তার এই চেতনা হইতেই সমাজতন্ত্রী দৃষ্টান্তস্থাপন, দ্রুতগতি কাজ এবং সৃজনী উদ্দীপনা ও শ্রমবীরত্বের অন্যান্য সন্দেহাতীত অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই চেতনার ফলেই বহু কারখানাতে পাঁচসালা পরিকল্পনার উৎপাদন বরাদ্দ আড়াই বছরেই শেষ করিতেছে।

ক্ষমতা যে তাহাদের নিজেদের হাতে—এই আসল কথাটি শ্রমিকেরা বোঝে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে আইন তৈরি হয় উপরতলায়, পার্লামেণ্ট এবং তৈরি হয় শাসকশ্রেণীর শক্তিকে সংহত করিবার জন্য। সোবিয়েত ইউনিয়নে আইন তৈয়ারির উদ্যোগ শুরু হয় নীচু তলায়, গ্রাম্য সোবিয়েতগুলিতে, কারখানা কমিটিগুলিতে এবং যে কোনো আইন প্রণয়নের ধারা লক্ষ্য করিলে সহজেই দেখা যাইবে যে, ইহার উদ্দেশ্য যে শুধু শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রয়োজন মিটানো তাহা নহে, এ-আইন তাহাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের স্পষ্ট অভিব্যক্তি।

সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে শুরু করিতেছে যে, তাহাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিপতিরা কৃত্রিম ও হিংস্রভাবে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই উপলব্ধির ফলে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা ও নিজেদের শক্তির চেতনা বহুগুণে বাড়িয়া যাইতেছে।

গল্পের পর গল্প না গিলিয়া দেশদ্রোহীদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরা যদি সোবিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাপ্রবাহ ঐতিহাসিক সততার সহিত গভীরভাবে অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, ষোলো কোটি মানুষ সর্বজনীন মানব-সংস্কৃতির অবিসম্বাদিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতেছেন এবং যুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত বাঁচিবার আগ্রহের দ্বারা অবিশ্বাস্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলা যায় ইহার বাস্তব প্রমাণ স্থাপন করিয়া শুধু নিজেদের জন্য নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

সর্বশেষ বিশ্লেষণে দাঁড়ায় এই : ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরা কি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ চান, যাহা তাঁহাদের সংখ্যা আরও কমাইবে ও তাঁহাদের আরও শক্তিহীন, আরও পশু করিয়া ফেলিবে? সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না; তাহারা এমন এক রাষ্ট্র গড়িতে চায় যেখানে সকলেই সমান। কিন্তু যদি তাহারা আক্রান্ত হয়, তবে তাহাদের প্রতিটি মানুষ একত্রে একটি মানুষের মত দাঁড়াইয়া লড়াই করিবে এবং জিতিবে তাহারা নিশ্চয়ই, কারণ ইতিহাস তাহাদের হইয়া কাজ করিতেছে।

(১৯৩১)

॥ আমেরিকায় নিগ্রো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী সন্ত্রাস ॥

পুঁজিপতি ও তাহাদের বশম্বদ ভৃত্যের দল—সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও ফাসিস্তরা, চার্চিল ও কাউট্স্কিরা, সামাজিক বিপর্যয়ের আতঙ্কে অর্ধোন্মাদ স্থবির ও উঁচুদরের পরাশ্রয়ী হইবার স্বপ্নে বিহ্বল চতুর তরুণের দল, 'কলম-চালানো গুণ্ডা আর সাংবাদিক বোম্বেটের দল', পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপ্রসূত সমস্ত দ্বিপদ জানোয়ার, পুঁজিবাদ যাহাদের না হইলে এক মুহূর্ত বাঁচিতে পারে না সেই সব মনুষ্যাকৃতি উকুনের দল—সোবিয়েত ইউনিয়নের 'বলশেভিকরা' সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে চাহে বলিয়া চীৎকার করিতেছে। প্রভুরা বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিকে স্লোগান বলিয়া দিয়াছেন : "বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই, সংস্কৃতির জন্য লড়াই।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, লড়াই করিবার মত কিছু পুঁজিপতিদের আছে। তাহাদের 'সংস্কৃতি' বলিতে বুঝায় এমন অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান যেগুলি শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর পরাশ্রয়ী সংখ্যালঘিষ্ঠের অসীম অবাধ ক্ষমতার সমর্থনের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করিয়া যায়। শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিতে বুঝায় শ্রমিক, কৃষক ও সেই পেটি-বুর্জোয়ারা যাহারা বড় বুর্জোয়াদের জন্য জঘন্য ছোট-খাট কাজ করিয়া জীবনধারণ করে। বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি বলিতে বুঝায় বিদ্যালয়, যেখানে মিথ্যা বোঝানো হয়; বুঝায় গীর্জা যেখানে মিথ্যা শেখানো হয়; বুঝায় পার্লামেন্ট যেখানে মিথ্যা বলা হয়, বুঝায় সংবাদপত্র যেখানে মিথ্যা ও কুৎসার ছড়াছড়ি। তাহাদের সংস্কৃতি পুলিশের সংস্কৃতি, যে পুলিশের শ্রমিকদের প্রহার ও হত্যা করিবার অধিকার রহিয়াছে। এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে ইহাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির কাজ

হইল প্রত্যহ অবিশ্রাম যুদ্ধ চালানো সেই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যাহারা লুণ্ঠিত হইতে চাহে না, যাহারা ভিখারী হইতে চাহে না, যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের অল্প বয়সে স্বাথ্য হারাইয়া কুড়িতেই বুড়ি দেখিতে চাহে না, যাহারা সন্তানদের উপবাস-মৃত্যু দেখিতে চাহে না, এক কণা রুটির জন্য কন্যাদের বেশ্যাবৃত্তি করিতে দেখিতে চাহে না, যাহারা চাহে না বেকারির তাড়নায় সৎ শ্রমিকসমাজের মধ্যে অপরাধের প্রসার।

প্রকৃতপক্ষে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক জীবন বলিতে আজ বুঝায় প্রধানত রাস্তায় রাস্তায় পুলিশে-শ্রমিকে লড়াই, অনাহারজনিত আত্মহত্যার সংখ্যাবৃদ্ধি, বেকারির জন্য ছোটখাট চুরির সংখ্যাবৃদ্ধি, বেশ্যাবৃত্তির প্রসার। এতটুকু বাড়াইয়া বলিতেছি না। সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্রের 'পুলিশ বিবরণী' এই ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকে। 'সংস্কৃতিবান' বুর্জোয়াজগত শ্রমিকশ্রেণীর সহিত অবিরাম লড়াইয়ের অবস্থায় বাস করে এবং প্রতিদিনই এ লড়াইয়ের রক্তাক্ত হিংস্রতা বাড়িয়া চলিয়াছে। সংখ্যাগুরুকে বিনা বাধায় লুণ্ঠনের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য সংখ্যালঘুর লড়াই—ইহাই হইতেছে সোবিয়েত ইউনিয়নের বাহিরের বর্তমান দুনিয়ার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের সার কথা। শ্রমিকশ্রেণী দুনিয়াব্যাপী যে চূড়ান্ত সংগ্রাম সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই চেষ্টাকে দুর্বল করিয়া দেওয়াই নিঃস্ব ও ক্ষুধিতের বিরুদ্ধে ধনী ও সুভুক্তের লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য। সবচেয়ে যারা সক্রিয়, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া, জেলে পাঠাইয়া অথবা হত্যা করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সাক্কো ভানজেত্তির মত নিরপরাধ মানুষগুলিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া বুর্জোয়ারা তাহাদের কাজ হাসিল করিতে চাহিতেছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই আমেরিকার স্কটস্ বোরো শহরে এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা সেই দুই ইতালীয়ানের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া পোড়াইয়া মারিবার আগে জেলে সাতটি বছর অপেক্ষা করানো হইয়াছিল। এই দুই নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যার বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের মানবতাবাদীরা ও শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। কিন্তু এই প্রতিবাদে মার্কিন পুঁজিপতিদের কঠোর মুখে সামান্যতম ভাঁজ পড়ে নাই। স্কটস্ বোরোতে আটজন তরুণ নিগ্রো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারাও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। পুলিশ ইঁহাদের এলোপাথাড়ি ধরিয়াছে এবং ইঁহাদের একজন অপরকে চেনেন না। কিন্তু তবু তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। নিগ্রোদের ভয় দেখানোর জন্যই ইহা করা হইয়াছে; এই হত্যা 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা'। নিগ্রোরা ক্রমেই বেশি করিয়া বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং শ্বেত শ্রমিকদের পাশে নিজেদের স্থান করিয়া চলিতেছে বলিয়াই এই হত্যার ব্যবস্থা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। তিন কোটি নিগ্রো শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব ছড়াইয়া পড়িবার আতঙ্কে, বুর্জোয়াশ্রেণী

নিগ্রো জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী শক্তিকে নিষ্পিষ্ট করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের অস্ত্র—শ্বেত সন্ত্রাস।

আলাবামার ক্যাম্প হিলের রক্তাক্ত ঘটনা হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। মার্কিন নিগ্রো শ্রমিকদের লিঞ্চ্ করার অর্থাৎ আদালতকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্যে হত্যা করার বিরুদ্ধে ও শ্রমিকদের সমর্থনে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যে অভিযান চালাইতেছেন, এই ঘটনাটি তাহাতে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে এবং এই অভিযানের তাৎপর্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিবার প্রয়োজনকে তুলিয়া ধরিয়াছে। এ বছর আলাবামার টালাপুসা কাউন্টির নিগ্রো ভাগচাষীরা তাহাদের নিজেদের সংগঠন গড়িয়াছিল। সংগঠনটি বেশ জঙ্গী এবং স্কটস্‌বোরো অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। এক পক্ষকাল আগে স্কটস্‌বোরো মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য একটি গীর্জায় সংগঠনের সদস্যদের এক সভা ডাকা হয়। জমিদাররা চারিশত পুলিশ ও সশস্ত্র ফাশিস্ত মোতায়েন করিয়াছিল। তাহারা গীর্জা আক্রমণ করে। সংঘর্ষকালে সংগঠনের নেতা রাল্‌ফ গ্রে গুরুতরভাবে আহত হন, তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যায়। ফাশিস্ত দুর্বৃত্তেরা যখন জানিতে পারিল যে, গ্রে তখনও বাঁচিয়া আছেন, তখন তাহারা তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং যে ডাক্তার তাঁহার ক্ষতস্থান চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহার সম্মুখেই বিছানাতে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। সংগঠনের কর্মকর্তাদের খোঁজে ফাশিস্তরা বহু নিগ্রো কুটীর বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। চারিজন নিগ্রোকে জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া 'লিঞ্চ্' করিয়া হত্যা করা হয়। 'নরহত্যা'র অপরাধে পঞ্চান্নজন নিগ্রোকে হত্যা করা হইয়াছে, সংগঠনের পাঁচজন নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'নরহত্যা প্রচেষ্টার' অভিযোগ আনা হইয়াছে। বীরেরা যখন আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করিতেছিলেন তখন ফাশিস্ত গুণ্ডাদলের দলপতি শেরিফ ইয়ং গুরুতরভাবে আহত হয়। কেন্টাকির হার্লান কাউন্টির জেলের কথাই ধরা যাক। ইস্ট কেন্টাকির খনিঅঞ্চলের ঠিক মর্মস্থলে ইহা অবস্থিত। দেশের কতকগুলি বৃহত্তম খনি-অঞ্চলের ঐশ্বর্যের উৎস এই খনি অঞ্চল; কিন্তু খনি-শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারদের ভাগ্যে জোটে শুধু ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও মৃত্যু। এই জেলের অন্ধকার কুঠুরিগুলিতে প্রায় একশ' খনিশ্রমিক পড়িয়া আছে। তাহাদের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ, কাহারও কাহারও মাথার উপর ঝুলিতেছে প্রাণদণ্ড। ইহাদের অনেকেই অসংগঠিত দলের অন্তর্ভুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত। অন্যেরা 'সিণ্ডিকালিজমের অপরাধে' অপরাধী, কারণ তাহারা সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিন মাস আগে নিজেদের দুরবস্থার উন্নতির জন্য খনিশ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছিল। গভর্ণর স্যাম্পসন্ ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কনস্টেবলবাহিনী নিয়োগ করেন এবং খনিমালিকেরা সশস্ত্র ফাশিস্ত গুণ্ডাদল, শেরিফ ও পুলিশ লেলাইয়া দেয় শ্রমিকদের উপর। পুলিশের উপর নির্দেশ থাকে ভারী কামান ও বোমা দিয়া ধর্মঘট ভাঙিবার। আঠারোজন খনিশ্রমিক ও তেরোজন সৈন্য ও ফাশিস্ত—এই একত্রিশজন নিহত হয়। [illegible] গুলী-

বারুদসহ ছয়টি কামান দখল করে, এবং একটা কোম্পানি স্টোরে হানা দিয়া নিজেদের উপবাসী পরিবারের জন্য খাবার লইয়া যায়।

আঠারোজন খনিশ্রমিককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, পঞ্চাশজনকে দেওয়া হয় দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। ষোলোজন খনিশ্রমিকের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। বাড়ীঘর হইতে খনিশ্রমিকদের পরিবারদের উচ্ছেদকার্য এখনও চলিতেছে।

পেনসিলভেনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও ওহিওতে চল্লিশ হাজার খনিশ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই নিগ্রো। ৬ই জুলাই তারিখে যে ছয় শত খনিশ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই নিগ্রো। গ্রেপ্তারের পর তাহাদের উপর প্রহার ও অত্যাচার করা হয়।

'আন্তর্জাতিক শ্রমিকরক্ষা প্রতিষ্ঠানের' মার্কিন বিভাগ সারা দুনিয়ায় স্কটস্‌বোরো মামলাটির কথা প্রচার করিতেছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর এই সর্বপ্রথম মার্কিন শাসকশ্রেণীকর্তৃক নিগ্রোদের নৃশংস শোষণ আন্তর্জাতিক প্রচার ও আন্তর্জাতিক ধিক্কারলাভ করিতেছে। দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করা নব্বই দিনের জন্য স্থগিত রাখা হোক বলিয়া 'আন্তর্জাতিক শ্রমিকরক্ষা প্রতিষ্ঠানের' মার্কিন বিভাগ যে দাবি জানাইয়াছেন তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সহিত সমর্থিত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও অন্যান্য বহু দেশ হইতে হাজার হাজার প্রস্তাব আসিয়াছে স্কটস্‌বোরোর আটজন নিগ্রো তরুণের মুক্তি দাবি করিয়া বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী হাজার হাজার শ্রমিক জার্মানী ও কিউবার মার্কিন কনসাল আফিস ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

স্কটস্‌বোরোর আটজন নিগ্রো তরুণ জেলে পড়িয়া আছে, তাহাদের চোখের সামনে রহিয়াছে বৈদ্যুতিক চেয়ার এবং রোজই কারারক্ষী তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে শীঘ্রই এই চেয়ারে তাহাদের পুড়াইয়া মারা হইবে।

"দুনিয়াব্যাপী অভিযানকে আরও তীব্র করিয়া তুলিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে শ্বেত-সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আবেদন না জানাইয়া যেন কোনো সভা বা বিক্ষোভপ্রদর্শন না হয়, কোনো পুস্তিকা বা আই-এল-ডি'র (আন্তর্জাতিক শ্রমিকরক্ষা প্রতিষ্ঠান) পত্রিকা প্রকাশিত না হয়।" (সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের নিকট আই-এল-ডি'র আবেদন।)

সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা যখন নিজেদের ভাইয়ের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তখন নিশ্চয়ই পুঁজিবাদীকে হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত করা যাইবে এই আশা লইয়া জানায় না। পুঁজিপতিরা কখনও 'মানবিক' হইতে পারে না। পশুপ্রবৃত্তি ছাড়া মানুষের সব কিছুই তাহার নিকট অপাংক্তেয়। শ্রমিকের পেশী-নিংড়ানো ডলার সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকে নিজের ক্ষমতাকে আরও শক্ত করা। তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের বাণী শিক্ষা দেওয়া

হয় না এবং যদি কেহ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে বক্তৃতার কথা বলে, তখনই তাহাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। এই জল্লাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য, কিন্তু তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত জল্লাদেরা খুন করা বন্ধ করিবে না এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তাহারা হত্যা করিবে। পুঁজিপতি রক্ষা করে তাহার ডলারকে, যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে—তিনি যে ব্যক্তিই হউন না কেন—ডলার তাহার কাছে বেশি মূল্যবান। শ্রমিকশ্রেণীর জানিয়া রাখা উচিত রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিবনেখ্‌ট্‌কে সৈন্যেরা হত্যা করে নাই, হত্যা করিয়াছে পুঁজিপতিরা, জানিয়া রাখা উচিত লেনিনকে গুলী করিয়াছিল কোন অর্ধোন্মাদিনী রমণী নহে, লেনিনকে গুলী করিয়াছিল হীন, অমানুষিক বুর্জোয়া পদ্ধতির একটি যান্ত্রিক উপকরণ।

শ্রমিকশ্রেণীর জানিয়া রাখা উচিত তাহাদের ও পুঁজিপতিদের মধ্যে কোনো চুক্তি, কোনো আপোষ, কোনো সাময়িক শান্তি সম্ভব নহে। একথা জানিবার সময় আসিয়াছে শ্রমিকশ্রেণীর। এবং একথা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ১৯১৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল এবং ইহার ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর তিন কোটি জীবন খোয়া গিয়াছে। একথা যেন তাহারা না ভোলে যে, 'রক্তপিপাসু ডালকুত্তা' নোস্কেও একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট। শ্রমিকশ্রেণীর নানা ধরনের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক ও দুর্বৃত্তেরা তাহার বিরুদ্ধে যে পাপ করিয়াছে তাহা যেন সে না ভোলে। অতীতের রক্তাক্ত নৃশংসতার যাহাতে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে, এ সব মনে রাখিতে হইবে সেই জন্যই। মনে রাখা সহজ। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যালিস্টদের হীন কার্যকলাপের দিকে এবং সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা যে চক্রান্ত করিতেছে সেই দিকে নজর রাখিলেই এই স্মরণ রাখার কাজ সহজ হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের একথা বুঝা উচিত যে তাহারা যখন যুদ্ধশিল্পে কাজ করে, তখন যে রাইফেল, মেশিনগান ও কামান তাহারা তৈয়ারী করে সে সব তাহাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে। সোবিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগানো যদি তাহারা সাব্যস্ত করে, তবে পুঁজিপতিরা তো নিজেরা যুদ্ধ করিতে যাইবে না; তাহারা মৃত্যুপ্রান্তরে পাঠাইবে তাহাদের শ্রমিক-কৃষকদের, পাঠাইবে সেই সব শ্রমিক-কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাহারা নিজেদের দেশে পুঁজিবাদ বিলুপ্ত করিয়াছে। প্রত্যেক পুঁজিবাদী যুদ্ধের অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে আত্মহত্যা।

পুঁজিপতিদের হাতে প্রত্যেকটি শ্রমিকহত্যার প্রতিবাদ জানাইতে হইবে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীকে। এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়া তাহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংহতির মনোবৃত্তি দৃঢ়তর হইবে এবং এই মনোবৃত্তিরই ব্যাপকতা ও গভীরতার আজ বড় বেশি প্রয়োজন ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক-শ্রেণীর। কিন্তু, আর একটি বিশ্বব্যাপী শ্রমিক ও কৃষকহত্যার যে চক্রান্তজাল পুঁজিপতিরা বুনিয়া চলিয়াছে তাহার প্রতিটি অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়,

আরও কঠোর, আরও প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় তুলিতে হইবে। এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে নিশ্চিত, সবচেয়ে বাস্তব ব্যবহারিক পন্থা সমস্ত সোশ্যালিস্ট শ্রমিকদের একত্রে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া।

তৃতীয় আন্তর্জাতিকই শ্রমিকদের প্রকৃত নেতা। কারণ, ইহা শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক। ইহা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। ইহা শুধু একটি যুদ্ধেরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে—তাহা হইল পরাশ্রয়ী আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি-দস্যুদলের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর যুদ্ধ।

(১৯৩১)

॥ মাগনিতোগর্স্ক ও অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের প্রতি ॥

প্রিয় কমরেডগণ,

আপনারা যে স্থানগুলিতে শিল্পদুর্গ গড়িয়া তুলিতেছেন, সেই স্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এই আমন্ত্রণের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এই বিরাট কারখানাগুলি গঠনের সময় আপনাদের সহিত দেখা করিতে পারিলে ও আপনাদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারিলে আমি খুব খুশি হইতাম। কিন্তু দেশভ্রমণের সময় আমার একেবারেই নাই; আমি এমন একটি কাজে ব্যাপৃত আছি যে কাজের প্রয়োজনীয়তা আশা করি, আপনারা যথাসময়েই উপলব্ধি করিবেন। আপনারা নিজেরাই তো জানেন প্রত্যেককেই তাহার নিজের কাজ সমস্ত সামর্থ্য ও শক্তি নিয়োগ করিয়া করা উচিত। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্মী তাঁহারা তো ইহা ভালভাবেই জানেন। তাঁহাদের শ্রম-বীরত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ। আমার নিকটও ইহা দৃষ্টান্তস্থল। সময় আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, উহার একটি মিনিটও অপব্যয় করা চলিবে না। যে কাজ আমাদের সাধন করিতে হইবে তাহা বিরাট; সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সংঘের শ্রমিকশ্রেণী এমন এক কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে ও সম্পন্ন করিতেছে, এমন লক্ষ্যে পৌঁছানর সংকল্প করিয়াছে ও সেদিকে অগ্রসর হইতেছে, ইতিপূর্বে যাহা পৃথিবীর কোন জাতি করে নাই।

যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা আমাদের ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে এবং [illegible] এমন এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, পৃথিবীতে যাহা কোনদিন কোথাও ছিল না। আমাদের কোটি কোটি চাষীকে যন্ত্র দিতে হইবে, জমিকে আরও উর্বর করিয়া তুলিতে হইবে, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি যে সকল

প্রাকৃতিক দুর্বিপাক মাঠের শস্য ধ্বংস করে সে-গুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিতে হইবে, লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ভাল রাস্তা তৈয়ারী করিতে হইবে; অতি জনাকীর্ণ নোংরা গ্রামগুলিকে তুলিয়া দিয়া, যাহারা জমি চাষ করে তাহাদের জন্য চমৎকার চমৎকার শহর গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সব শহরে থাকিবে ইস্কুল, থিয়েটার, সাধারণ স্নানাগার, হাসপাতাল, ক্লাব, রুটি তৈয়ারীর কারখানা, ধোতাগার প্রভৃতি নগরজীবনের সমস্ত সম্পদ, যে সম্পদ স্মরণাতীত কাল হইতে রীতি, নীতি, অভ্যাস, জীবনধারা ও মানসিক গঠনের দিক হইতে শহরবাসীকে গ্রামবাসী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই বিষাক্ত বিভেদ অতীত ইতিহাস আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে, মূল ও শাখাসমেত ইহাকে ধ্বংস করিতে হইবে। গুণগতভাবে সম্পূর্ণ নূতন হইবার জন্য আমাদের নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের মনের মধ্য হইতে 'সনাতন আদম'কে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে; বুদ্ধিচালিত মেহনত ও যন্ত্রবিদ্যার সর্বজয়ী শক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ়তর করিতে হইবে, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে সব কিছু দেখিবার জন্য নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, ছোটখাট ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিতে হইবে সেই বিশাল কর্মভারকে যাহা সম্পাদনের মূল শর্ত এই যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আমরাই এমন একটি রাষ্ট্র গড়িতেছি যেখানে মানবসমাজ শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, ধনিকে-দরিদ্রে, মালিকে-শ্রমিকে বিভক্ত নহে এবং যেখানে মানুষের সমস্ত দুঃখদুর্দশার মূল কারণ এবং লোভ ঈর্ষা ও মূঢ়তার ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির লালসা বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা এমন একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছি যেখানে প্রত্যেকেই তাহার সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করিবে এবং পাইবে প্রয়োজনানুযায়ী, যেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজেকে নিজের দেশের সমস্ত সম্পদের মালিক বলিয়া মনে করিতে পারিবে, এবং যেখানে প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাধীন বিকাশের সুযোগ উন্মুক্ত থাকিবে। আমরা নূতন মানুষ সৃষ্টি করিতে চাই,—এবং এই নূতন মানুষ আমরা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করিতে শুরু করিয়াছি।

* * *

যে চিঠিগুলি আমি পাইয়া থাকি তাহার কয়েকখানি হইতে আমি বুঝিতেছি যে, এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা বোঝেন না যে ব্যক্তিগত অহমিকা হইতেই সমস্ত দুর্বৃত্তির সৃষ্টি, এবং এখনও এমন অনেকেই আছেন যাঁহাদের নিকট পিতৃ-পিতামহদের ক্ষুদ্র ও মূঢ় জীবনযাত্রা আজও দুঃসহ হইয়া ওঠে নাই। কমরেডগণ, আপনাদের মধ্যে এখনও এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা অতীতের বিষে বিষাক্ত—গ্রাম হইতে ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় ইঁহারা আপনাদের মধ্যে আসিতেছেন। কিন্তু আপনা-দের পরিবেশ সুস্থ পরিবেশ, এ পরিবেশে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবাদীও রোগমুক্ত হইয়া যায়। আপনারা ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে নিজেদের শ্রমশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করিতেছেন এবং একথা আর বলা চলে না যে সামাজিক বিকলাঙ্গদের 'সুস্থ ও স্বাভাবিক করিতে পারে শুধু গোরস্থান',—শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বীরত্বই ইহাদের

নিরাময় করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, পুরাতন জগতের মানুষের কানে এই কথাটি আপনাদের অবিশ্রাম ধ্বনিত করিয়া যাইতে হইবে যে, তাহাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের সম্মুখে জীবনের যে একটিমাত্র পথ খোলা ছিল, তাহা অর্থলাভের ঘৃণিত সংকীর্ণ পথ। এই পথে চলিতে গেলে দরিদ্রদের, শ্রেণী-ভ্রাতাদের পিঠের উপর দিয়া তাহাদের হাঁটিতে হইত। বিবেক ভুলিয়া এবং গরীবের উপর ধনীর পীড়নের মাত্রা বাড়াইয়া এই পথেই তাহাদের পূর্বপুরুষরা ধাপে ধাপে ঐশ্বর্যের মঞ্চে আরোহণ করিতেন। টাকা ছাতার মত বাড়ে। মানুষের যত টাকা হয়, তত আর সে মানুষ থাকে না, ততই সে বেশী করিয়া গরীবকে নিংড়াইয়া রক্ত ও মাংস-সমেত টাকা বাহির করিতে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিপতিরা কোন্ পর্যন্ত গিয়াছে তাহা আমরা দেখিতেছি। তাহাদের টাকার লেখাজোখা নাই এবং সাড়ে তিন কোটি বেকারকে তাহারা মজুদ করিয়াছে। হাজার হাজার ধনী সোনার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, কোটি কোটি গরীব মরিতেছে না খাইয়া। একবার হিসাব করিয়া দেখুন : যদি সাড়ে তিন কোটি বেকারের প্রত্যেকে প্রতিদিন যদি অন্তত এক রুবল করিয়া নিজের জন্য ব্যয় করিতে পারিত, তবে কত মুনাফা পুঁজিপতিদের পকেটে গিয়া পড়িত? কিন্তু ঘটনা হইতেছে এই যে, বিক্রয়ের জিনিস রহিয়াছে, কিনিবার কেহ নাই। পুঁজিপতি শস্তায় বিক্রয় করিবে না, দাম যাহাতে কমিতে না পারে সেজন্য উদ্বৃত্ত মাল তাহারা নষ্ট করিয়া দেয়। বীভৎস কিন্তু সত্য। ১৪ই আগস্ট ইউরোপের সংবাদপত্রগুলিতে আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় : "নিউইয়র্ক, ১২ই আগস্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর চৌদ্দটি তুলা উৎপাদনকারী রাষ্ট্রের গভর্ণরদের নিকট এই মর্মে এক সুপারিশ করিয়াছেন যে, তুলার দাম বৃদ্ধির জন্য ১৯৩১ সালের ফসলের এক-তৃতীয়াংশ যেন নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।" এই কাহিনী কাহারও মস্তিষ্কপ্রসূত নহে। এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতেছে মার্কিন সংবাদপত্রগুলি এবং 'ইভনিং পোস্ট' পত্রিকায় এ মন্তব্যও করা হইয়াছে যে, এই ঘটনা মার্কিন রাষ্ট্রের বর্তমান মানসিক অবস্থার শোচনীয় অধঃপতনেরই নিদর্শন, বোঝা যায় উৎপাদন-শক্তি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে অতি-প্রাচুর্য ও অন্য দিকে চরম অভাব—তৎসত্ত্বেও মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্য নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে; যোগান ও চাহিদা ব্যবস্থা কী শোচনীয়ভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহা তাহারও নিদর্শন। সংবাদপত্রটিতে আরও বলা হইয়াছে যে, যখন কোটি কোটি নাগরিকের ভাগ্যে গম ও তুলার কোনটিই জুটিতেছে না, তখন গম ও তুলা পোড়াইয়া ফেলা হইতেছে অথবা মাঠে ফেলিয়া পচানো হইতেছে; মার্কিন উৎপাদন-শক্তির এ কী অবস্থা!

প্রায়ই বলা হইত, পুঁজিপতিদের এই অমানুষিক পাপ কাজের একমাত্র ব্যাখ্যা হইতেছে যে তাহারা উন্মাদ, টাকার লোভ ও টাকা জমাইবার লালসায় তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। দুনিয়ার লুণ্ঠনকারীরা যে কত নির্লজ্জ হইতে পারে তাহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্যই একথা বলা হইত। কিন্তু আজ একথা ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। প্যারিসের রাজতন্ত্রী নির্বাসিতদের

পত্রিকা 'ডজরোজদেনিয়ে'তে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে : "তাহাকে উন্মাদ আশ্রমে প্রেরণের জন্য চিকিৎসকের হুকুমনামাকে বাতিল করিবার জন্য জন ও'ব্যানন নামক একজন কোটিপতি নিউইয়র্কের আদালতে মামলা দায়ের করিয়াছেন। এই কোটিপতি আদালতে নিজের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। চামড়ার বদলে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন একটি জিনিস তিনি আবিষ্কার করেন, একটি কোম্পানি খোলেন এবং দেড় কোটি ডলার কামাই করেন। স্নায়বিক অবসাদ বোধ করিয়া তিনি ডাক্তারদের শরণাপন্ন হন, তাহারা তাঁহাকে পাগল বলিয়া ঘোষণা করে এবং পাগলা-গারদে রাখিবার হুকুম দেয়। পাগলা-গারদে থাকিয়াই তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আরও বিশ লক্ষ ডলার কামাই করেন। আরও ভালভাবে এবং লাভজনকভাবে পাগলাগারদ চালাইবার অনেকগুলি পরিকল্পনা আশ্রম পরিচালককে দিয়া তিনি মানসিক হাসপাতালেই নিজের ব্যবসায়-প্রতিভার পরিচয় দেন। আদালত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তাঁহারা সকলেই বলেন যে, এই প্রতিভাশালী ব্যবসায়ী উন্মাদ, এবং তখন তাঁহাকে আবার উন্মাদ-আশ্রমে পাঠানো হয়।"

ঘটনাটি হইতে এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, শ্রমিকদের লুণ্ঠন করিবার পুঁজিবাদী পন্থা এতই সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটা বদ্ধ পাগল পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা কামাইতে পারে। পুঁজিপতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমেই স্পষ্টভাবে ও নির্লজ্জভাবে দস্যু-ব্যবস্থায় পরিণত হইতেছে এবং জীবনযাত্রার বিশৃংখল চরিত্র ক্রমেই বেশী করিয়া নগ্ন হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এই সংবাদটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :

"শুধু শিকাগো নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম-বেশী সমস্ত বড় শহরকেই 'গুণ্ডাদের স্বর্গ' বলা চলে। উইকারশ্যাম কমিটির রিপোর্টে ইহা স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। জেলের অবস্থা ও পুলিশব্যবস্থা তদন্তের জন্য প্রেসিডেন্ট হুভার এই কমিটি নিয়োগ করেন।"

রিপোর্টে ধীরভাবে বলা হইয়াছে : "প্রকৃতপক্ষে প্রায় শহরেই পুলিশের সহিত অপরাধী-জগতের যোগসাজস রহিয়াছে। যেখানে পুলিশকে চোখ বুজিয়া মেয়রের হুকুম তামিল করিতে হয় এবং এই মেয়র যেখানে সর্বপ্রকারের খুনী ও দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক দালাল সেখানে পুলিশের কার্যকলাপ তাহাদেরই প্রভাবকারী লোকদের পর্যায়ে নামিতে বাধ্য।" ইহার পরিণতি কি হইতে পারে তাহা শিকাগো, নিউইয়র্ক ও সানফ্রান্সিস্কোর ঘটনাবলীতেই প্রকাশ। এই সব শহরে ডাকাতরা স্পষ্ট দিবালোকেই যাহাকে খুশি লুঠ করিতেছে ও খুন করিতেছে।

সম্প্রতি শিকাগোর রাস্তায় ডাকাত ও পুলিশের মধ্যে গুলী বিনিময়ে চারিটি শিশু নিহত হইয়াছে। সাধারণত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাকাত, পুলিশ ও সাধারণ-ডাকাতদের খণ্ডযুদ্ধে পথচারীদের কথা বিবেচনা করা হয় না, যদি পুলিশের পাশে-দাঁড়ানো কেহ খুন হয়, তবে 'অসাবধানতাবশত নরহত্যা' বলিয়া পুলিশটি শাস্তির হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

পুঁজিবাদী জগত মরিতেছে, পচিয়া গলিয়া মরিতেছে। নিজেকে চাঙ্গা করিবার মত শক্তি তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা এখন চলিয়াছে এক যান্ত্রিক জড়তায় ও অসাড় অভ্যাসে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পশুশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া। এ শক্তিও খুব নির্ভরযোগ্য নহে: কারণ সৈনিকদের অধিকাংশই শ্রমিক এবং যদিও তাহাদের মন মধ্যশ্রেণীর কুসংস্কারে ভরিয়া আছে, তথাপি বিশেষ অবস্থার মধ্যে তাহাদের রাজনৈতিক শ্রেণীবিপ্লবী চেতনা বিকশিত হইয়া উঠিবেই। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অলীক কল্পনা নহে, ইহা অনিবার্য এবং ইতিমধ্যেই ইহা দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। ইউরোপে পুলিশ ছাড়াও, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠালোভী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক 'নেতারা' ও তাহাদের দ্বারা প্রতারিত শ্রমিকদের একাংশ পুঁজিপতিদের সাহায্য করিতেছে। এই নেতাদের কার্যকলাপ ক্রমেই কলঙ্কজনক হইয়া উঠিতেছে। যেমন, জর্জ বার্নার্ড শ'র সহিত আমাদের দেশ পরিভ্রমণান্তে ইংলণ্ডে ফিরিয়া লর্ড লোথিয়ান বলেন :

"রুশ বিপ্লবের মধ্যে যে ভাবধারা নিহিত রহিয়াছে তাহা মানবসমাজের ভবিষ্যৎ বিকাশকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করিবে। আমাদের দেশে (অর্থাৎ ইংলণ্ডে) উহার প্রয়োগ কিভাবে হইবে, তাহাই সমস্যা।" সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পাণ্ডা ভাণ্ডারভেলড্ লর্ড লোথিয়ানের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধে বলেন, "সুবিধাভোগী দুনিয়া যদি তাঁহার মত ভাবিতে শুরু করে, তবে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ শীঘ্রই ঘটিয়া যাইবে।" শ্রমিকশ্রেণীর 'নেতার' এই কথাগুলির মধ্যে আনন্দ নাই, আছে স্পষ্ট বিপদ, মনিব যে কোনো মুহূর্তে পথে দাঁড়াইতে পারেন এই আতঙ্কে পুরাতন চাকরের বিষাদ। দৃঢ়তার সহিত তুমি তোমার শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিতেছ না বলিয়া যে 'সোশ্যালিস্টরা' পুঁজিপতিদের তিরস্কার করে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকের লজ্জাকর নামটি তাহারই প্রাপ্য। এই 'সোশ্যালিস্টরা' কি বলিতেছে? তাহারা বলিতেছে, "কোটিপতিদের অসুবিধার মধ্যে দিন যাপনের চেয়ে কোটি কোটি শ্রমিকের উপবাস করা ভাল।" পুঁজিবাদী দুনিয়া পচিতেছে এবং যাহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহার অমানুষিক স্বার্থের সেবা করিতেছে এবং শ্রমিক-কৃষক নিংড়াইয়া সোনা বানাইবার লালসার রসদ যোগাইতেছে তাহাদের সকলের মধ্যেই এই পচনের দুর্গন্ধময় বিষ সংক্রামিত হইতেছে। যাহাদের সেদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী বন্ধু ও নেতা ভাবিত, সেই 'কথার সোশ্যালিস্টরা'ও দ্রুত পচিতেছে। আজ শ্রমিকেরা অতি-ন্যায্য ক্রোধ ও বিতৃষ্ণায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্র 'ভোরভার্টে'র সম্পাদকীয়-আফিসের জানালা ভাঙিতেছে। এই আফিসেই বসিয়া আছেন বৃদ্ধ কাউট্স্কি, দেখিলে করুণা হয়। একদা ইনিই ছিলেন ইউ-রোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর একজন প্রধান শিক্ষক। আজ দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে, তাহাদের এমন একজনই মাত্র বন্ধু, শিক্ষক ও নেতা আছেন যিনি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না, তাহাদের স্বার্থ বিক্রয় করিবেন না। এই নেতা আছেন ও কাজ করিতেছেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত

ইউনিয়নে। ইনি কোন ব্যক্তি নহেন; ইনি ঐতিহাসিক শ্রেণী-কর্তব্যের চেতনায় একত্রীভূত বহু কোটি মানুষের যৌথ রূপ।

সোবিয়েত ইউনিয়নে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা বলেন, "আমাদের দেশ সৃজনীশক্তির এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের যুগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে" এবং এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শক্তিকে ছোট করিয়া দেখাইতে চাহেন। নানা মনোবৃত্তি হইতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী আসে। কিন্তু একটি বিশেষ মনোবৃত্তি ইহাদের সকলের মধ্যেই আছে—শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ। ধরিয়া লইতে পারি, এই সন্দেহ ও সংশয় শ্রমিকদের মধ্যেও কম্পন সৃষ্টি করে, কারণ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের বীরদের চিঠির সঙ্গে মাঝে মাঝে অনেক ব্যক্তির নিকট হইতে আমি এমন চিঠি পাই যাহাতে নিজের শক্তিতে অবিশ্বাস, প্রারব্ধ মহান কার্যের সফলতা সম্পর্কে সন্দেহ এবং চূড়ান্ত জয়লাভ সম্পর্কে সংশয় স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কমরেড স্তালিনের একটি বক্তৃতার কথা আমি ইহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। পরীক্ষিত সত্য ঘটনাকেই এবং সাধারণ 'কায়িক শ্রমিকদের', সমাজতন্ত্রের কোটি কোটি নির্মাতাদের—যৌথ সংস্থার সৃজনী উদ্যোগের ঘটনাগুলিকেই কমরেড স্তালিন সর্বদা নিজের মন্তব্যের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কমরেড স্তালিন বলিয়াছেন, আমাদের জয়লাভের সমস্ত বাস্তব শর্ত বিদ্যমান এবং সব কিছুই এখন আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। এই কথাগুলির অর্থ কি?

কমরেডগণ, এই কথাগুলির অর্থ এই যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আপনারা নিজেদের হাতে লইয়াছেন। এই দেশের যতটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ আজ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহারই পরিমাপ করা যায় না। এখনও অনাবিষ্কৃত যে সম্পদ ইহার গর্ভে রহিয়াছে এবং যাহার সামান্য ভগ্নাংশের মাত্র আবিষ্কার-কার্য শুরু হইয়াছে তাহার কথা তো বাদই দিতেছি। ধরাগর্ভে লুক্কায়িত প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধানরত আমাদের বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণে কয়লা, ধাতুমৃত্তিকা ও আমাদের জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইতে পারে এমন খনিজ পদার্থের সন্ধান পাইতেছেন। ধরিত্রী যেন বুঝিতে পারিয়াছে এতদিনে তাহার ন্যায্য মালিকের আবির্ভাব হইয়াছে। আবির্ভাব হইয়াছে সেই বুদ্ধিমান সাচ্চা মালিকের যে তাহার গোপন গহ্বর খুলিয়া সম্পদরাশি নিজের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে।

সামান্য বোতাম অথবা দিয়াশলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ফসল তোলা কম্বাইন অথবা বিমান পর্যন্ত সব কিছুই মানুষ তৈয়ারী করিতেছে। মানুষের মেহনত জীবনের সমস্ত রহস্যের, সমস্ত প্রহেলিকার সমাধান করিতেছে। তাই, এই মেহনতকেই তীব্রতর ও বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ সব কিছুই আপনাদের হাতে।

পৃথিবীর গর্ভ চিরিয়া সম্পদ আহরণের মত শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন পুঁজিবাদী দুনিয়ার, লুণ্ঠনকারী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের দুনিয়ার ফুরাইয়াছে। শ্রমিকদের শ্রম-

শক্তি, এই শস্তা জীবন্ত শক্তিকে লুণ্ঠন করিয়াই তাহারা ধনী হইতে চাহে। আপনারা এমন একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছেন যেখানে বলপ্রয়োগে মানুষকে কাজ করানো, উন্মাদ ও অশ্লীল বিলাসিতার জন্য পাগলের মত মানুষের শ্রমশক্তির অন্ধ অপচয়, যুদ্ধের জন্য বিরাট বিরাট সেনাপতি পোষণ ও ব্যাপক নরহত্যার মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য মূল্যবান ধাতুর অপচয়, একেবারেই অসম্ভব। আপনারা এমন একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছেন যেখানে, শক্তি ও প্রতিভা বিকশিত করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই সমান রহিয়াছে, যেখানে বিজ্ঞান ও শিল্পের পথ সকলের নিকটই উদার উন্মুক্ত, যেখানে কোন প্রভুশ্রেণী নাই কিন্তু প্রত্যেকেই প্রভু ও প্রত্যেকেই সমান।

ব্যাপারটি সহজ নহে, ব্যাপারটি সত্যই কঠিন এবং আমি জানি আপনাদের জীবনযাত্রা এখনও কঠোর। কিন্তু জীবনে আরাম সৃষ্টির স্বাধীনতা আপনাদের রহিয়াছে এবং এই কাজ আপনারা ছাড়া আর কেহই পারিবে না। এখনও আপনাদের অনেক জিনিসেরই অভাব কিন্তু যাহা নাই তাহা তৈয়ারী করিতে একমাত্র আপনারাই পারেন। আপনাদের মধ্যে রহিয়াছে আপনাদের শত্রুরা, পুরানো জগতের মানুষেরা। তাহারা এখনও চীৎকার করিতেছে, নালিশ জানাইতেছে, হীন চিন্তাভাবনা আপনাদের মনে ঢুকাইয়া দিয়া আপনাদের মেহনতের গভীর তাৎপর্য ও জয়লাভের অনিবার্যতা সম্পর্কে আপনাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিতেছে। পুরানো জগতের ধ্বংসস্তূপের এই উকুনগুলিকে পিষিয়া মারিতে পারেন শুধু আপনারাই।

কমরেডগণ, আপনাদের শক্তি দুর্জয়। গৃহযুদ্ধের শ্রেণীসংঘাতে ইহার পরিচয় আপনারা অতীতে দিয়াছেন এবং বর্তমানে প্রত্যহই দিতেছেন আপনাদের বীরত্বপূর্ণ শ্রম-সাধনার মধ্যে। আপনাদের শক্তি দুর্জয় এবং কোন বিঘ্নের সাধ্য নাই আপনাদের জয়লাভ প্রতিহত করে। সব বিঘ্নকেই আপনাদের উত্তীর্ণ হইতে হইবে—এবং উত্তীর্ণ আপনারা হইবেনই। অন্তরের গভীর আবেগে আমি আপনাদের প্রবল প্রচণ্ড মুঠি জড়াইয়া ধরিতেছি।

(১৯৩১)

।। "সংস্কৃতির প্রভুরা", আপনারা কার পক্ষে? ।।

মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের পত্রের জবাব

আপনারা লিখিয়াছেন :

"সমুদ্রের পরপার হইতে অপরিচিতদের এই চিঠি পাইয়া হয়ত আপনি বিস্মিত হইবেন।"

না, আপনাদের চিঠিতে আমি বিস্মিত হই নাই; প্রায়ই আমি এই ধরনের চিঠি পাইয়া থাকি; এবং আপনাদের এই চিঠিকে আপনারা 'মৌলিক' বলিয়া ভুল করিতেছেন,—গত দুই-তিন বৎসর যাবৎ বুদ্ধিজীবীদের এই আতঙ্কের চীৎকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক : চিরদিনই বুদ্ধিজীবীদের কাজ হইয়া আসিয়াছে প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের অস্তিত্বের শোভাবর্ধন এবং ধনীদের ন্যাকামিভরা দুঃখভোগের সময় তাহাদের সান্ত্বনাদান। পুঁজিপতিদের সখী ও দাসীরূপী এই বুদ্ধিজীবীদের অথবা তাহাদের অধিকাংশের কাজ হইল বুর্জোয়াশ্রেণীর ধর্ম ও দর্শনের পোশাকটিতে যত্নসহকারে সাদা সুতার তালি মারা, কিন্তু বহুদিন হইতেই বুর্জোয়াদের এই খোলসটি মলিন ও জীর্ণ হইতে শুরু করিয়াছে, বহুদিন হইতেই উহার গায়ে শ্রমজীবী মানুষের রক্তের দাগ লাগিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীরা আজও তাহাদের এই কঠিন কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন, যদিও এই একান্ত নিষ্ফল কাজে তাহাদের ভাগ্যে বিশেষ কোন বাহবা জুটিতেছে না। এই কাজের মধ্যে অবশ্য তাহাদের একটা অদ্ভুত ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, চীনের অঙ্গচ্ছেদে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা অগ্রসর হইবার পূর্বেই জার্মান স্পেঙ্গলার তাহার 'মানুষ ও যন্ত্রকৌশল' নামক বইয়ে ঘোষণা করেন যে, নিজেদের জ্ঞান ও কৌশলগত

'কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলিকে' জানিতে দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা দারুণ ভুল করিয়াছে। স্পেঙ্গলারের এই মত সমর্থন করিয়াছেন আপনাদের মার্কিন ঐতিহাসিক হেনড্রিক ভ্যান লুন; তিনি এ মতও পোষণ করেন যে, কৃষ্ণ পীত জাতিগুলিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা দান করা ইউরোপীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর "সাতটি মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুলের" একটি।

আজ এই ভুল সংশোধনের একটা আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করিতেছি; ইউরোপীয় ও মার্কিন পুঁজিপতিরা জাপানী ও চীনাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়া পরস্পরকে ধ্বংস করিতে সাহায্য করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে নিজেদের নৌবহর পাঠাইয়া দিতেছে উপযুক্ত সময়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখে রুদ্রমূর্তিতে আর্বিভূত হইবার জন্য এবং নিহত ভল্লুকের চামড়া ভাগের উদ্দেশ্যে বীর খরগোসের সহিত সদর্পে অগ্রসর হইবার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভল্লুকটিকে মারা যাইবে না, কারণ, স্পেঙ্গলার, ভ্যান লুন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে-সকল সান্ত্বনা-দাতারা ইউরোপীয়-মার্কিন 'সংস্কৃতি'র বিপদ সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন, তাহারা দু'একটি বিষয় উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ভারতীয়েরা, চীনারা, জাপানীরা ও নিগ্রোরা সামাজিকভাবে অখণ্ড, অবিভাজ্য ও সমান নহে, তাহারাও শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার চোখবাঁধা বলদদের স্বার্থপর চিন্তাবিষের প্রতিষেধক হিসাবে মার্কস ও লেনিনের বাণী আজ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং এই প্রতি-ষেধকের অত্যন্ত সুস্থ প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। কিন্তু হয়ত তাহারা সত্যই এই কথাগুলি ভুলিয়া যান নাই, নীরবতার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র, কারণ নিজেদের বিষের অক্ষমতা ও প্রতিষেধকের কার্যকারিতা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই হয়ত তাহারা ইউরোপীয় সংস্কৃতির পতন লইয়া এমন আতঙ্কের চীৎকার সুরু করিয়াছেন।

সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া যাহারা চীৎকার করিতেছে তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে, চীৎকারের মাত্রাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে। মাস তিনেক আগে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাইঅ সভ্যতার নিরাপত্তা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন।

তিনি আর্তনাদ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, "প্রাচুর্য ও অবিশ্বাসের মর্মান্তিক যন্ত্রণাই আজ সমগ্র জগৎ ভোগ করিতেছে। কোটি কোটি মানুষের যখন বাঁচিবার মত আহার জুটিতেছে না তখন গম পোড়ানো হইতেছে ও কফির থলি সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা কি মর্মান্তিক ঘটনা নহে? আর অবিশ্বাসের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ক্ষতি ইতিপূর্বেই সুরু হইয়া গিয়াছে। এই অবিশ্বাসের জন্যই যুদ্ধ, এই অবিশ্বাসই শান্তিচুক্তিগুলির ভিত্তি, এই অবিশ্বাসের আবহাওয়া কাটিয়া না গেলে, এই অবস্থার নিরসন হইবে না। বিশ্বাস যদি ফিরিয়া না আসে, তবে সমগ্র সভ্যতাই বিপন্ন হইয়া পড়িবে, কারণ যে অর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থাকে জনসাধারণ তাহাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল বলিয়া মনে করে, সেই ব্যবস্থাকে তাহারা উচ্ছেদই করিতে চাহিবে।"

আজ নির্লজ্জভাবে নখদন্ত বাহির করিয়া পরস্পরকে যাহারা কামড়াইতে উদ্যত সেই ডাকাতদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপনের সম্ভাবনার কথা যাহারা বলে তাহারা হয় ভণ্ড, না হয় একান্ত নির্বোধ। 'জনসাধারণ' বলিতে যদি তাহারা শ্রমজীবী জনসাধারণকেই বুঝাইয়া থাকে, তবে প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবেই যে, সম্পদ উৎপাদনকারী মেহনতের পুরস্কারস্বরূপ যে দুর্গতি ও দুর্দশা তাহারা ভোগ করে, তাহার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূঢ়তাকে 'দায়ী করিয়া' শ্রমিকেরা বিন্দুমাত্র ভুল করে নাই। শ্রমিকশ্রেণী ক্রমেই স্পষ্টভাবে বুঝিতেছেন যে, 'কমিউনিষ্ট ইস্তেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন সে কথাগুলির যথার্থতা আজ বুর্জোয়া বাস্তবতাই বিস্ময়করভাবে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া দিতেছে। মার্কস-এঙ্গেলসের কথাগুলি এই :

"তাহার (বুর্জোয়াশ্রেণীর) শাসনের যোগ্যতা নাই, কারণ নিজের গোলামকে তাহার দাসত্বের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিতে সে আজ অক্ষম, কারণ এই গোলামের এমন এক অবস্থায় নামিয়া আসা সে কিছুতেই রোধ করিতে পারে না, যে অবস্থায় গোলাম তাহার আহার জোটাইবার পরিবর্তে গোলামকেই তাহার খাওয়াইতে হয়। এই বুর্জোয়াশ্রেণীর অধীনে সমাজ আর থাকিতে পারে না অর্থাৎ সমাজের সহিত তাহার অস্তিত্ব আর খাপ খায় না।"

কাইঅ সেই সব শত শত পুরানো ঝানুদেরই একজন এখনও যাহাদের দৃঢ় ধারণা, বুর্জোয়া মূঢ়তাই মানুষের শাশ্বত জ্ঞান, এর বেশি কিছু সে আবিষ্কার করিতে পারে না, এর বেশি দূর সে অগ্রসর হইতে পারে না, এর বেশি ঊর্ধ্বে সে উঠিতে পারে না। এই সেদিন পর্যন্তও বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক বিজ্ঞতা ও স্থায়িত্বের নিদর্শনস্বরূপ বুর্জোয়াশ্রেণীর তল্পিবাহকরা বুর্জোয়া-বিজ্ঞানকে তুলিয়া ধরিতেন।

আজ সেই বিজ্ঞানকে তাঁহারা তাঁহাদের পাপ চক্রান্তের বাহিরে রাখিতে চান। এই কাইঅই ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্যারিসে প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পল মিলিউকভ ও বিগতদিনের অন্যান্য হোমরাচোমরাদের এক সভায় স্পেঙ্গলারেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, "যন্ত্রবিজ্ঞান বহুক্ষেত্রেই বেকারীর সৃষ্টি করে, কর্মচ্যুত শ্রমিকদের মজুরিকে কারবারের অংশীদারদের অতিরিক্ত লভ্যাংশে পরিণত করে। 'বিবেকহীন' বিজ্ঞান, 'বিবেকের' উত্তাপশূন্য অনুতপ্ত বিজ্ঞান মানুষের অকল্যাণ করে। মানুষকে তাই বিজ্ঞানের পক্ষচ্ছেদ করিতে হইবে। বর্তমান সংকট মানুষের বুদ্ধি-শক্তির পরাজয়। মাঝে মাঝে এক-একজন দিক্‌পাল বিজ্ঞানের চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়ান। তিনি এমন তত্ত্ব প্রচার করেন, প্রচারের বিশেষ যুগে যাহার অর্থ ও তাৎপর্য আছে। যেমন কার্ল মার্ক্স। তাঁহার তত্ত্ব ১৮৪৮ অথবা ১৮৭০ সালে নির্ভুল ছিল, কিন্তু আজ ১৯৩২ সালে উহা একেবারেই ভুল। আজ যদি মার্ক্স বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা লিখিতেন না।"

এই কথাগুলির দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণী স্বীকার করিতেছে, তাহার শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি কতখানি শক্তিহীন ও দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। সে আজ 'বিজ্ঞানের পক্ষচ্ছেদে'র জন্য সুপারিশ করিতেছে, ভুলিয়া যাইতেছে একদিন এই বিজ্ঞানই শ্রমজীবী জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে তাহাকে কতখানি সাহায্য করিয়াছিল! 'বিজ্ঞানের পক্ষচ্ছেদে'র অর্থ কি? গবেষণার স্বাধীনতা হরণ? এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞানের স্বাধীনতার উপর চার্চের আক্রমণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা বীরত্ব ও সাফল্যের সহিত লড়িয়াছিল। মধ্যযুগের সবচেয়ে অন্ধকার আমলে দর্শন ছিল ধর্মতত্ত্বের সহযোগী। আজ বুর্জোয়া ধীরে ধীরে সেই দিকেই চলিয়াছে। কাইঅ ঠিক কথাই বলিয়াছেন, ইউরোপ আবার বর্বরতার দিকে চলিয়াছে। যে মার্কসের বাণী সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই মার্কসও এই ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন। একথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পৃথিবীর প্রভু, ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়াশ্রেণীর যতই দিন যাইতেছে ততই অজ্ঞতা, বুদ্ধিহীনতা ও বর্বরতার মাত্রা বাড়িতেছে এবং তাহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনাদের মুখেই তাহাদের নিজস্ব স্বীকৃতি প্রকাশ পাইতেছে।

বর্বর যুগে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনার কথা আজকাল বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় 'ফ্যাশন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্পেংগ্লার, কাইঅ প্রমুখ 'চিন্তাবিদরা' হাজার হাজার চোখবাঁধা বলদের মনোভাবকেই প্রতিফলিত করিতেছেন। নিজ শ্রেণীর ধ্বংসের পূর্বচেতনা হইতেই এই আতঙ্কিত মনোভাবের উৎপত্তি। সারা দুনিয়ায় শ্রমজীবী জনতার মধ্যে নিজেদের সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্পর্কে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়া উঠিতেছে; এই ঘটনাই আজ বুর্জোয়াশ্রেণীকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। মেহনতী মানুষের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশ্বাস করিতে বুর্জোয়ার মন সরে না, কিন্তু এই ঘটনাকে তো তাহারা চোখের উপর দেখিতেছে, বুঝিতেছে। এ বিকাশ এক সর্বব্যাপী ঘটনাপ্রবাহ, অতুলনীয় ইহার ন্যায্যতা। মানবসমাজের যে সমগ্র শ্রম-অভিজ্ঞতার গুণগানে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা মুখর, ইহা তাহারই যুক্তিসম্মত অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু ইতিহাসও তো বিজ্ঞান, অতএব তাহারও পক্ষচ্ছেদের প্রয়োজন অর্থাৎ আরও সহজে বলিতে গেলে ইহার অস্তিত্বকে ভুলিতে হইবে। ফরাসী কবি ও পণ্ডিত পল ভালেরী তাঁহার 'বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা' নামক পুস্তকে এই উপদেশই দিয়াছেন। তিনি চান আমরা ইতিহাস ভুলিয়া যাই এবং জাতিসমূহের বিপর্যয়ের জন্য তিনি যখন ইতিহাসকেই দোষী সাব্যস্ত করেন তখন তাহা মোটেই পরিহাসের মত শোনায় না। তিনি বলেন, অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ইতিহাস নিষ্ফল স্বপ্নের জাল সৃষ্টি করে এবং মানুষের মনের শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়। মানুষ বলিতে তিনি অবশ্য বুঝাইয়াছেন বুর্জোয়াশ্রেণীকেই। বুর্জোয়া ছাড়াও পৃথিবীতে যে মানুষ আছে, তাহা দেখিবার ক্ষমতা সম্ভবত ভালেরীর নাই। যে ইতিহাস লইয়া বুর্জোয়ারা সেদিন পর্যন্তও এত গর্ববোধ করিত, যে ইতিহাস

তাহারা এত নিপুণভাবে রচনা করিয়াছে সেই ইতিহাস সম্পর্কে ভালেরী কি বলিতেছেন শুনুন ঃ

"আমাদের বুদ্ধির রাসায়নিক গবেষণাগারে যত জিনিস তৈয়ারী হইয়াছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হইতেছে ইতিহাস। ইতিহাস স্বপ্নের জাল সৃষ্টি করে, জাতিকে নেশাচ্ছন্ন করে, জাতির মনে মিথ্যা স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, মানসপটে আঁকে অতিরঞ্জিত ছবি, পুরাতন ক্ষত জাগাইয়া তোলে, মনের শান্তি কাড়িয়া লয়, আত্মম্ভরিতা অথবা নিজেকে উৎপীড়িত ভাবিবার একটা উন্মাদ মনোবৃত্তি জাগাইয়া তোলে জাতির মনে।"

দেখিতে পাইতেছেন নিশ্চয়ই, সান্ত্বনাদাতার ভূমিকায় ইনি খুব প্রগতিশীল। ইনি জানেন, বুর্জোয়াশ্রেণী শান্তিতে থাকিতে চায় এবং এই শান্তিতে থাকিবার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণহরণের অধিকার তাহাদের আছে বলিয়াই বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করে। তাহারা অতি সহজেই লক্ষ লক্ষ বই ধ্বংস করিতে পারে কারণ পৃথিবীর অন্যান্য জিনিসের মত গ্রন্থাগারগুলিও তাহাদের হাতের মুঠিতে। ইতিহাস কি শান্তিতে থাকিবার অন্তরায়? তাই যদি হয়, তবে ধ্বংস করো ইতিহাস! বন্ধ করো ইতিহাস-সম্পর্কিত সমস্ত বইয়ের প্রচার! ইস্কুলে যেন ইতিহাস আর পড়ান না হয়! অতীতচর্চাকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, এমন কি পাপ বলিয়া ঘোষণা করা হোক! যাহাদের ঐতিহাসিক গবেষণার ঝোঁক রহিয়াছে তাহাদের ঘোষণা করা হোক অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন বলিয়া, নির্বাসিত করা হোক মনুষ্যবাসহীন দ্বীপে।

আসল জিনিস শান্তি। বুর্জোয়াদের সমস্ত সান্ত্বনাদাতাদের ইহাই একমাত্র কাম্য। কাইঅ ঠিকই বলিয়াছেন, এই শান্তিলাভের জন্য চাই বিভিন্ন জাতির পুঁজিবাদী ডাকাতদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্য চীনের মত দেশের দ্বার খুলিয়া দেওয়া, যাহাতে ইউরোপের ডাকাতেরা ও দোকানদারেরা এই দেশগুলি লুটিতে পারে। কিন্তু জাপানের ডাকাতেরা ও দোকানদারেরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাহাকেও চীনের দরজা দিয়া ঢুকিতে দিবে না, তাহারা বলে, চীন ইউরোপ হইতে তাহাদেরই বেশী কাছে এবং ভারতীয়দের অপেক্ষা চীনাদেরই লুণ্ঠন করা তাহাদের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক, কারণ ইংলণ্ডের 'ভদ্রলোকেরা' ভারতীয়দের লুণ্ঠন করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। লুণ্ঠনের এই প্রতিযোগিতা হইতে আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আসে এক নূতন বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়; 'গ্র্যাঁগোয়া' নামে প্যারিসের একখানি সাময়িকপত্র লিখিতেছে—"রুশ সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক ও পাকা বাজার ইউরোপের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।" পত্রিকাখানি এই ঘটনার মধ্যেই সমস্ত 'গোলমালের মূল' দেখিতে পাইয়াছেন এবং অন্যান্য সাংবাদিক, রাজনীতিক, বিশপ, লর্ড, প্রতারক ও ভাগ্যান্বেষীর মতই সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের যৌথ হস্তক্ষেপের দাবি জানাইয়াছে। তারপর, ইউরোপে বেকারী দ্রুত বাড়িতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে নিজেদের সংগ্রামের ন্যায্যতা সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর

বিপ্লবী চেতনা। অতএব, মনের শান্তির সম্ভাবনা বিলীন হইয়া যাইতেছে, এমন-কি মনে হইতেছে, আজ ইহার কোন স্থানই নাই। আমি আশাবাদী নই এবং একথাও জানি যে বুর্জোয়াশ্রেণীর মানববিদ্বেষের সীমা-পরিসীমা নাই। তবু একথা আমি মানিতে প্রস্তুত যে, কিছুটা শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার একটি পথ বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্মুখে এখনও খোলা আছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি কলোনের এক বক্তৃতায় জাতিবিদ্বেষ-প্রচারক ডেপুটি বার্গার এই পথেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

"যদি হিটলারের ক্ষমতালাভের পর ফরাসীরা জার্মান অঞ্চল দখলের চেষ্টা করে, তবে আমরা সমস্ত ইহুদীর গলা কাটিব।"

এই বক্তৃতার কথা যখন প্রুশিয়ান সরকারের কানে গেল তখন তাহারা ভবিষ্যতে বার্গারের প্রকাশ্য বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ করিলেন। ইহাতে হিটলারের শিবিরে ক্রোধের ঝড় বহিয়া গেল। একটি জাতিবিদ্বেষী পত্রিকা লিখিল— "বেআইনী কার্যকলাপে প্ররোচনাদানের অভিযোগ বার্গারের বিরুদ্ধে আনা চলে না। আমরা যখন ক্ষমতা লাভ করিব তখন এমন আইন পাশ করিব যাহার বলে আমরা ইহুদীদের গলা কাটিতে পারিব।"

এই উক্তিকে ঠাট্টা বলিয়া, জার্মান 'ভিৎস' বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বর্তমান মানসিক অবস্থায় ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে এমন আইন পাশ করা খুবই সম্ভব যাহারা বলে শুধু ইহুদীদের নহে, যাহারাই তাহাদের চেয়ে অন্যভাবে চিন্তা করে এবং সর্বোপরি যাহারা তাহাদের অমানুষিক স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে, তাহাদের সকলকেই তাহারা সমগ্রভাবে নির্মূল করিতে পারে।

* * *

এই 'পাপচক্রের' আবর্তে পড়িয়া বুদ্ধিজীবী সান্ত্বনাদাতার দল ক্রমে ক্রমে সান্ত্বনাদানের ক্ষমতা হারাইতেছে এবং আজ তাহাদের নিজেদেরই সান্ত্বনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সান্ত্বনার জন্য তাহারা আজ এমন লোকেরও স্বারস্থ হইতেছে, যাহারা নীতিগতভাবে ভিক্ষাদানে অসম্মত, কারণ একবার ভিক্ষা দিলে ভিক্ষাদানের অধিকার স্বীকৃত হইয়া যাইবে। 'চমৎকার মিথ্যা বলিবার' প্রতিভাই তাহাদের মূল প্রতিভা। কিন্তু বুর্জোয়া বাস্তবতার কদর্য মানববিদ্বেষ ঢাকিয়া রাখিবার সামর্থ্য আর এ 'প্রতিভার' নাই। যাহারা বিশ্ব-লুণ্ঠনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন, যাহারা নিজেদের পাপ লক্ষ্যলাভের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের তীব্রতায় আতঙ্কিত, যাহাদের ধনলালসা বিকারগ্রস্ত উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছে এবং ধ্বংস ও সংহারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাদের সান্ত্বনা ও আনন্দদান যে শুধু ব্যর্থ নহে, সান্ত্বনাদাতাদের পক্ষে বিপজ্জনকও বটে, তাহা আজ কেহ কেহ বুঝিতে শুরু করিয়াছেন।

অবসন্ন ডাকাত ও খুনেদের সান্ত্বনাদান যে কত বড় পাপ, সেকথা ইহাদের বলিয়া লাভ নাই। কারণ আমি জানি, এই যুক্তিতে কাহারও হৃদয় বিচলিত

হইবে না। এই ধরনের নীতি উপদেশ আজ অনধিকারচর্চা বলিয়া নিষিদ্ধ। এই কথা বলিলেই অনেক বেশী সংগত হইবে যে, বর্তমান দুনিয়ায় বুদ্ধিজীবী সান্ত্বনাদাতা ক্রমে সেই 'মধ্যমে' পরিণত হইতেছে, যুক্তিশাস্ত্র যাহার কোন অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

বুর্জোয়ার সন্তান অথচ সামাজিক মর্যাদায় শ্রমিক এই বুদ্ধিজীবী, মনে হয়, তাহার নিজের অবস্থার অপমানকর মর্মান্তিকতা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিতেছে, সে বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে, সে যে-শ্রেণীর গোলাম সে-শ্রেণীর ধ্বংস অনিবার্য এবং পেশাদার ডাকাত খুনীর মত তাহার ধ্বংস হওয়াই উচিত। একথা সে যে বুঝিতে শুরু করিয়াছে তাহার কারণ, বুর্জোয়াশ্রেণীর নিকট তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়া আসিতেছে। অবিরাম সে শুনিতেছে যে, বুর্জোয়ার প্রসাদ-লাভের জন্য তাহারই জাতভাইরা জোরগলায় বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতেছে। সে চোখের উপর দেখিতেছে, দার্শনিক ও 'চিন্তাবীর' অপেক্ষা ভবিষ্যদ্বক্তা 'গণকে'র দিকেই সান্ত্বনালাভের জন্য বেশী ঝুঁকিয়াছে বুর্জোয়াশ্রেণী। ইউরোপের সংবাদপত্রগুলি আজ হস্তরেখাবিদ, ফলিত জ্যোতিষী, ফকির, যোগী, সামুদ্রিক গণৎকারের বিজ্ঞাপনে ভর্তি। এই ভণ্ড প্রতারকের দল যদিও বুর্জোয়াদের চেয়েও অজ্ঞ, তথাপি বুর্জোয়ারা আজ ইহাদেরই শরণাপন্ন। ফোটোগ্রাফী ও সিনেমা চিত্রাংকনবিদ্যার সর্বনাশ করিতেছে এবং উপবাসমৃত্যুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য শিল্পীরা তাহাদের ছবির বিনিময়ে রুটি, আলু ও মধ্যবিত্ত-পরিত্যক্ত পোশাক কিনিতেছেন। প্যারিসের একটি সংবাদপত্র এই আনন্দময় ছোট্ট খবরটি ছাপিয়াছেন :

"বার্লিনের শিল্পীদের মধ্যে দুর্দশা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে; উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। শিল্পীদের পারস্পরিক সাহায্যের কথা উঠিয়াছে, কিন্তু যাহাদের কোন রোজগার নাই, রোজগারের সম্ভাবনাও নাই, তাহারা পারস্পরিক কি সাহায্য করিতে পারে? বার্লিনের শিল্পীমহল তাই আম্রৎ জ্যাকোবি নামক একজন মহিলা-শিল্পীর সরাসরি কেনাবেচার প্রস্তাবকে উৎসাহের সহিত সমর্থন জানাইয়াছেন। মূর্তি ও ছবির বিনিময়ে কয়লার ব্যবসায়ীরা শিল্পীদের দিবে জ্বালানীর জিনিস। সময় বদলাইবে, কয়লার কার-বারীদের তখন এই কারবারের জন্য আর অনুশোচনা করিতে হইবে না। দাঁতের ডাক্তাররা শিল্পীদের উপর তাহাদের বিদ্যা প্রয়োগ করুক। দাঁতের ডাক্তারের রোগী বসিবার ঘরে একখানা ভাল ছবি কখনও বেমানান হইবে না। একটা ভাল কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া কসাই ও গয়লারা নিশ্চয়ই লাফাইয়া উঠিবে, নগদ টাকা না দিয়াই তাহারা প্রকৃত শিল্প পাইতেছে। আম্রৎ জ্যাকোবির প্রস্তাবকে সুষ্ঠু ও কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য বার্লিনে একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হইয়াছে।"

যে পত্রিকা এই সরাসরি পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে সে পত্রিকা কিন্তু লেখে নাই যে প্যারিসে এ-ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু হইয়া গিয়াছে।

উ'চুদরের মঞ্চ-শিল্পকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিতেছে সিনেমা। বুর্জোয়া সিনেমার দুষ্টপ্রভাব এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে উহা আর বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নাই। ভাবালুতার প্রতিটি বিষয়বস্তু চর্বিতচর্বণ করিয়া এখন তাহারা দৈহিক বিকলাঙ্গতা দেখাইতে শুরু করিয়াছে।

"মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের হলিউড স্টুডিওগুলি ফিল্মের 'খেয়াল' দেখাইবার জন্য একটি মৌলিক দল যোগাড় করিয়াছে। ইহাতে আছে কু-কু নামে বিহঙ্গবালা, ইহার চেহারা সারসপাখীর মতো; আছেন কঙ্কাল-মানুষ পি, রবিনসন; মার্থা বলিয়া একটি মেয়ে আছে, জন্ম হইতেই তাহার একখানি হাত, এবং পা দিয়া সে নিপুণভাবে লেস্ সেলাই করে। 'সিলভে' বলিয়া একটি 'পিন-মাথা' মেয়েও যোগাড় হইয়াছে, যাহার দেহটি স্বাভাবিক, কিন্তু মাথাটি অস্বাভাবিক রকমের ছোট—ঠিক একটি পিনের মত। ওল্‌গা বলিয়া একটি মেয়ে জোটানো হইয়াছে যাহার সারা মুখে পুরুষের মত দাড়ি ভর্তি; আর আছে আধা পুরুষ-আধা মেয়ে জোসেফ-জোসেফিন, শ্যামদেশীয় যমজ ভগ্নী, বামনবীর, খুদেমানুষ ইত্যাদি।"

বার্নেস, পসার্টস্, মুনে-সুলির মত শিল্পীর প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। তাহাদের স্থান দখল করিয়াছে ফেয়ারব্যাঙ্ক, হ্যারল্ড লয়েডস্ প্রমুখ বাজিকরের দল এবং ইহাদের পাণ্ডা হইতেছেন একঘেয়ে ভাবালুতার বিষণ্ন শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন, যেমন জাজ্ দখল করিতেছে মার্গসঙ্গীতের স্থান আর স্তাঁদাল, ব্যালজাক, ডিকেন্স ও ফ্লবেয়ারের স্থান দখল করিতেছে সেই ওয়ালেসের দল যাহারা বড় ডাকাত ও পাইকারী নরহত্যা-সংগঠকদের সম্পত্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ডিটেক্‌টিভেরা কিভাবে ক্ষুদে চোর ও খুনীদের ধরিয়া থাকে তাহার কাহিনী বর্ণনায় পারদর্শী। শিল্পের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী ডাক-টিকিট ও ট্রামের টিকিট, বড় জোর পুরানো শিল্পীশ্রেষ্ঠদের শিল্পকর্মের ঝুটা অনুকৃতি সংগ্রহ করিয়াই খুশি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর একমাত্র লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর দৈহিক শক্তি শোষণের সবচেয়ে সস্তা ও সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি আবিষ্কার। নিজের নির্বুদ্ধি, অন্ত্র ও পাকস্থলীর কর্মশক্তি পরিচালনা ও যৌনশক্তি বৃদ্ধি ছাড়া বুর্জোয়ার কাছে বিজ্ঞানের কোন মূল্য নাই। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য যে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ, পুঁজিবাদী নিপীড়নে ভাঙিয়া-পড়া মানবদেহকে পুনরায় শক্ত সজীব করিয়া তোলা, অসাড় জড় বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করা এবং মানবদেহের গঠন ও বিকাশের যন্ত্রপদ্ধতিকে অনুশীলন করা, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি বুর্জোয়াশ্রেণীর নাই। এ সব কিছুতেই আধুনিক বুর্জোয়াদের ঔদাসীন্য মধ্য-আফ্রিকার অসভ্যদের অপেক্ষা কম নহে।

ইহা দেখিয়া কোন কোন বুদ্ধিজীবী বুঝিতে শুরু করিয়াছেন যে, যে সৃজনশীল সংস্কৃতিকে একদা তাহাদের নিজেদের কাজ, নিজেদের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ইচ্ছার সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতেন, তাহাতে তাহাদের আর কোন অধিকার নাই, এবং সে-সংস্কৃতি আর পুঁজিবাদী দুনিয়ার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

চীনের ঘটনা তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছে ১৯১৪ সালে লুভেন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার গ্রন্থাগারের ধ্বংসসাধনের কথা। এই তো সেদিন তাহারা শুনিয়াছে জাপানী কামানের মুখে সাংহাইয়ের তুঙ্ সি বিশ্ববিদ্যালয়, নৌ-বিদ্যা শিক্ষার কলেজ, মৎস্যবিদ্যার স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও শ্রমিকদের বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইবার কথা। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বরাদ্দ টাকা হ্রাসে কেহ যেমন ক্ষুব্ধ হয় না, তেমনই এই বর্বরোচিত কার্যকলাপেও কেহ ক্ষুব্ধ হয় না। অস্ত্রসজ্জা যত বাড়িতেছে ততই কমিতেছে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দের টাকা।

অবশ্য ইউরোপীয় ও মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের একটি খুব সামান্য অংশই বুঝিতেছে যে 'বহির্ভূত মধ্যমের নিয়মের' মধ্যে তাহাদের পড়িতেই হইবে। তাহারা আজ ভাবিতেছে কোন্ পক্ষ লইবে, পুরাতন অভ্যাসমত শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষ? অথবা আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ? অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এখনও পুঁজিবাদকে সেবা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই পুঁজিবাদ এমন এক মালিক যে তাহার ভৃত্য ও সান্ত্বনাদাতার নৈতিক পিচ্ছিলতার খবর রাখে এবং তাহার আপোষমূলক কার্যকলাপের ব্যর্থ ও বন্ধ্যা রূপ দেখিয়া তাহাকে খোলাখুলি ঘৃণা করিতে শুরু করিয়াছে। এই ভৃত্য ও সান্ত্বনাদাতাদের একেবারেই কোন প্রয়োজন আছে কি-না সে সন্দেহও আজ তাহার মনে জাগিয়াছে।

মধ্যবিত্ত ফিলিস্তিনদের সান্ত্বনাদানে সিদ্ধহস্ত অনেকের নিকট হইতে প্রায়ই আমি চিঠিপত্র পাইয়া থাকি। সিটিজেন স্ভেন-এলভেরস্টাডের নিকট হইতে পাওয়া এমনই একখানি চিঠি আমি উদ্ধৃত করিতেছি:

"প্রিয় মিঃ গর্কি,

যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশকে কবলিত করিয়াছে তাহার ফলে সারা দুনিয়া জুড়িয়া ভীষণ বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক প্রায় নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী ট্রাজেডি দেখিয়াই আমি নরওয়ের সবচেয়ে বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্র 'তিদেন্স তেন'-এ কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশের সংকল্প করিয়াছি। এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য হইবে, এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের আবর্তে পতিত কোটি কোটি মানুষের মধ্যে নূতন মনোবল ও আশা সৃষ্টি করা। তাই, লোকের গত দুই বৎসরের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অভিমত জানাইবার অনুরোধ করিয়া আমি লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও [illegible] নিকট আবেদন করিতেছি। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সম্মুখে আজ দুইটি পথ: হয় নিষ্ঠুর ভাগ্যের মারাত্মক আঘাতে তাহাকে ধ্বংস হইতে হইবে অথবা সংকটের মনোমত সমাধানের আশায় লড়াই চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রত্যেকেরই আজ এই আশার প্রয়োজন যে, বর্তমানের এই অন্ধকার পরি-

স্থিতির আনন্দময় অবসান ঘটিবে এবং যে মানুষের কথা সকলেই মনোযোগের সহিত শুনিতে অভ্যস্ত তাহার আশার বাণী পড়িয়া প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই আশার আলো জ্বলিয়া উঠিবে। আমি তাই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাইতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। আপনার এ অভিমত তিন-চার লাইনের বেশী না হইতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহে ইহা বহু লোককে নৈরাশ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবে এবং সাহসের সহিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইবার শক্তি যোগাইবে। ইতি

শ্রদ্ধাবনত,

স্ভেন এলভেরস্টাড।

এই পত্র লেখকের মতো এখনও এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা আজও 'দুই-তিন লাইনে'র ঔষধে, কয়েকটি কথার শক্তিতে, শিশুর মতো বিশ্বাস করেন। এ-বিশ্বাস এত বেশী সরল যে, এ বিশ্বাসকে অকপট বলা চলে না। দুই-তিনটি অথবা দুইশত-তিনশত কথার সাধ্য নাই বুর্জোয়া দুনিয়ার স্থবির দেহে নবজীবনের সঞ্চার করে। প্রতিদিন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্টে ও লীগ অব নেশনস-এ হাজার হাজার কথা উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু কেহই তাহাতে আশা বা সান্ত্বনা পাইতেছে না, বুর্জোয়া সভ্যতার সংকটের পরিব্যাপ্তিরোধের সম্ভাবনার কোন আশাই তাহাদের মনে জাগিতেছে না। বিজ্ঞানকে 'সীমাবদ্ধ' ও 'সংযত' করিবার জন্য বুর্জোয়া সমাজকে নির্দেশ দিয়া প্রাক্তন মন্ত্রীরা ও অন্যান্য আলস্যবিলাসীরা শহরে শহরে সফর করিতেছেন। এই সব লোকের বক্তৃতা সংবাদিকেরা সংগে সংগে লুফিয়া লইতেছে। তাহাদের কাছে এগুলি 'সেই একই বিরক্তিকর খেলা', যে-খেলা তাহারা বহুদিন ধরিয়াই খেলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে এমিল লুড্‌ভিগ নামে একজন ব্যক্তি গুরুগম্ভীর 'ডেইলী এক্সপ্রেস' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মানবজাতিকে 'বিশেষজ্ঞদের হাত হইতে দূরে থাকিতে' উপদেশ দিয়াছেন। এই অর্থহীন বাজে কথাগুলি পেতি-বুর্জোয়ারা কান পাতিয়া শোনে ও পড়ে এবং সিদ্ধান্তও করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করা দরকার বলিয়া যদি ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ঠিক করে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। প্রসঙ্গক্রমে তাহারা তাহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করিবেঃ পদপ্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রয়োজন এমন ৬,০০০ পদ প্রতি বৎসর জার্মানিতে খালি হয় কিন্তু জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে প্রতি বৎসর বাহির হয় ৪০,০০০ গ্রাজুয়েট।

সিটিজেন ডি, স্মিথ ও সিটিজেন টি মরিসন, আপনারা যখন বুর্জোয়া সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে 'সুমার্জিত অভিমতের সংগঠক' বলিয়া অভিহিত করেন তখন আপনারা ভুল করেন। এই 'সংগঠক' এক 'পরাশ্রয়ী' প্রতিষ্ঠান, বাস্তবের শোচনীয় বিশৃঙ্খলাকে ঢাকিবার চেষ্টাই ইহার কাজ। কিন্তু আইভি-লতা অথবা আগাছা যতখানি ধ্বংসাবশেষের আবর্জনা ঢাকিয়া রাখে, বাস্তবকে ততখানি ঢাকিয়া রাখিবার ক্ষমতা এ 'সংগঠকের' নাই। হে নাগরিকেরা, আপনাদের সংবাদপত্রের

সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান আপনাদের অত্যন্ত কম। আপনাদের সমস্ত সংবাদপত্রগুলি সমবেতকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকে যে "একজন আমেরিকান সর্বপ্রথমে আমেরিকান", তারপর সে মানুষ। জার্মানির জাতিবিদ্বেষী সংবাদপত্রগুলি এই বাণী প্রচার করে যে, জাতিবৈষম্যবাদীরা সর্বপ্রথমে আর্য, তারপর চিকিৎসক, কিম্বা ভূতাত্ত্বিক, কিম্বা দার্শনিক। ফরাসী সাংবাদিকেরা বলিয়া থাকেন ফরাসীরা সর্বপ্রথমে বিজয়ী, অতএব অন্যদের চেয়ে তাহাকে আরও বেশী সশস্ত্র হইতে হইবে—অবশ্য এ অস্ত্রসজ্জা বুদ্ধির নহে, বাহুবলের।

একথা বলিলে বেশী বলা হইবে না যে, ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠকদের সাংস্কৃতিক মান নীচু করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ইহা তাহার প্রায় একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের সাহায্য না পাওয়ার ফলে পাঠকদের সাংস্কৃতিক মান অবশ্য এমনিতেই নীচু। মালিক পুঁজিপতিদের স্বার্থসেবায় রত সাংবাদিকরা তিলকে তাল বানাইবার কৌশল জানেন। দুর্বৃত্ত একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে দেখিয়াও, তাহাকে শায়েস্তা করিতে তাঁহারা চান না।

আপনারা লিখিয়াছেন : "আমরা যখন ইউরোপে ছিলাম, তখনই বুঝিয়াছিলাম ইউরোপীয়রা আমাদের কী দারুণ ঘৃণা করে।" একান্ত নিজেদের দিক হইতে দেখিয়া আপনারা সত্যের একটি অংশমাত্র দেখিয়াছিলেন, এই একান্ত আত্মমুখিতার জনাই সমগ্র সত্যকে আপনারা দেখিতে পান নাই। আপনারা দেখিতে পান নাই যে, ইউরোপের সমস্ত বুর্জোয়ারা একটা পারস্পরিক ঘৃণার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতেছে। লুণ্ঠিত জার্মানেরা ফ্রান্সকে ঘৃণা করে। অতিরিক্ত সোনার গুরুভারে রুদ্ধশ্বাস ফ্রান্স ঘৃণা করে বৃটিশকে, আবার ইতালীয়ানরা ঘৃণা করে ফ্রান্সকে। আর সমস্ত বুর্জোয়াই একসঙ্গে ঘৃণা করে সোবিয়েত ইউনিয়নকে। ইংরাজ লর্ড ও দোকানদারদের বিরুদ্ধে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর বুকে ঘৃণার আগুন জ্বলিতেছে। সাড়ে চল্লিশ কোটি চীনা ঘৃণা করে জাপানীদের এবং এতকাল চীন লুণ্ঠনে অভ্যস্ত ইউরোপীয়ানরা ঘৃণা করে জাপানীদের, কারণ জাপানীরা মনে করে চীনকে লুণ্ঠন করিবার অধিকার শুধু তাহাদেরই আছে। সকলের প্রতি সকলের এই ঘৃণা ক্রমেই বাড়িতেছে, ক্রমেই ঘন হইতে ঘনতর, তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে এই ঘৃণা পচা ঘায়ের মত ফুলিয়া উঠিতেছে; যেদিন এই ঘা ফাটিবে সেদিন হয়ত আবার পৃথিবীর সমস্ত জাতির গাঢ় বিশুদ্ধ রক্তের বন্যা বহিয়া যাইবে। কোটি কোটি শক্ত জোয়ান মানুষ ছাড়াও, এই মানুষের পুষ্টি ও প্রাণদান করে যে সম্পদ ও কাঁচা মাল তাহাও বিপুল পরিমাণে ধ্বংস করিবে এই যুদ্ধ, ফলে মানবজাতির স্বাস্থ্য, ধাতু-সম্পদ ও জ্বালানি সম্পদ কমিয়া আসিবে দারুণভাবে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ বিভিন্ন জাতির বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার পারস্পরিক বিদ্বেষ মুছিয়া দেয় না। আপনারা মনে করেন, 'সর্বজনীন মানবসংস্কৃতির স্বার্থরক্ষা করিবার শক্তি আপনাদের আছে', আপনারা মনে করেন 'এই সংস্কৃতিকে বর্বরতায় পরিণতি হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আপনাদের।' খুব ভাল

কথা। কিন্তু একবার এই সহজ প্রশ্নটি নিজেদের জিজ্ঞাসা করুন : এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য আজ অথবা কাল কি করিতে পারেন আপনি? প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, এই সংস্কৃতি কোনদিনই 'সর্বজনীন মানবসংস্কৃতি' ছিল না এবং যতদিন মেহনতী মানুষের প্রতি দায়িত্বহীন জাতীয়-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, এবং যতদিন সে জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে লেলাইয়া দিবার কাজ চালাইয়া যাইবে ততদিন কখনও এই সংস্কৃতি সর্বজনীন মানবসংস্কৃতি হইতে পারে না। নিজেকে প্রশ্ন করুন, বেকারীর মত সংস্কৃতি-ধ্বংসকারী ঘটনা রোধ করিবার জন্য আপনারা কি করিতে পারেন? কি করিতে পারেন আপনারা মেহনতী মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষুধার প্রতিক্রিয়াকে রোধ করিতে? কি করিতে পারেন আপনারা শিশুদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির প্রসার বন্ধ করিবার জন্য? আপনারা কি বোঝেন না যে, জনসাধারণের শুকাইয়া যাওয়ার অর্থ যে-মাটিতে 'সংস্কৃতি'র মূল, সেই মাটি শুকাইয়া যাওয়া? আপনারা হয়ত জানেন যে, সমাজের তথাকথিত 'মার্জিত স্তর' জনসাধারণেরই সৃষ্টি। একথাটি আপনাদের ভালভাবেই জানিয়া রাখা উচিত, আমেরিকানরা দম্ভভরে ঘোষণা করিয়া থাকে যে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের হকার বালকেরাও প্রেসিডেন্টের মর্যাদার আসনে উঠিতে পারে।

আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য বালকদের বুদ্ধির উল্লেখ করা, প্রেসিডেন্টদের প্রতিভার উল্লেখ করা নয়। ও সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আর একটি প্রশ্ন আপনাদের ভালভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত : যখন ত্রিশ কোটি ভারতবাসী বুঝিতে সুরু করিয়াছে যে, বৃটিশের ক্রীতদাস হইয়া থাকা কোনমতেই তাহাদের বিধিনির্দিষ্ট ভাগ্য নহে, তখন চীনের সাড়ে চল্লিশ কোটি মানুষকে ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজির ক্রীতদাসে পরিণত করা সম্ভব বলিয়া কি আপনারা মনে করেন? একবার ভাবিয়া দেখুন : কোটি কোটি শ্রমজীবীর শক্তি শোষণ করিয়া কয়েক হাজার ডাকাত ও ভাগ্যান্বেষী চিরকাল শান্তিতে বাস করিতে চাহে। আপনারা হয়ত বলিবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। ইহা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু চিরদিন থাকিবে একথা বলার সাহস কি আপনাদের আছে? এক সময় মধ্যযুগে প্লেগকে লোকে প্রায় স্বাভাবিক ঘটনাই বলিত, কিন্তু এখন প্লেগ প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং আজ পৃথিবীতে উহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে বুর্জোয়া-শ্রেণী। শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষে কৃষ্ণকায় মানুষের সমগ্র জগতকে তাহারা আজ বিষাইয়া তুলিতেছে। হে সংস্কৃতির প্রহরীগণ, আপনাদের কি মনে হইতেছে না যে পুঁজিবাদ জাতিবিদ্বেষী যুদ্ধের প্ররোচনা দিতেছে?

* * *

আমি 'ঘৃণা প্রচার' করিতেছি বলিয়া আপনারা অভিযোগ করিয়াছেন, আমাকে উপদেশ দিয়াছেন 'প্রেম প্রচার' করিবার জন্য। মনে হইতেছে আপনারা ভাবিতেছেন, শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি আমিও বলিতে পারি : পুঁজিপতিদের ভালবাস, কারণ তাহারা তোমার শক্তি গিলিয়া খাইতেছে; পুঁজিপতি-

দের ভালবাস, কারণ তোমাদের পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তাহারা হেলাভরে নষ্ট করিতেছে; এই মানুষগুলিকে ভালবাস, কারণ যে কামান তোমাদেরই হত্যা করিবে, তোমাদেরই লোহা দিয়া তাহারা সেই কামান গড়িতেছে; ভালবাস সেই দুর্বৃত্তদের যাহাদের জন্য তোমাদের শিশুরা না খাইয়া মরিতেছে; নিজেদের আরাম ও তৃপ্তির জন্য যাহারা তোমাদের ধ্বংস করিতেছে ভালোবাস তাহাদের; ভালবাস পুঁজিপতিকে, কারণ তাহারই উপাসনা-মন্দির তোমাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখিয়াছে। বাইবেল অনেকটা এই কথাই বলে, তাই বাইবেলের কথা তুলিয়া আপনারা 'খৃস্টধর্ম'কে 'সংস্কৃতি উন্নত করিবার যন্ত্র' বলিয়া উল্লেখ করেন। আপনারা এখনও যুগের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন; 'প্রেম ও নম্রতার সুসমাচারের' সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে কথা বলা সৎ মানুষেরা বহুকাল আগেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। খৃস্টান বুর্জোয়ারা আজ কি স্বদেশে, কি উপনিবেশে জনসাধারণকে জোর করিয়া নম্র রাখিতেছে এবং ক্রমেই বেশী করিয়া 'আগুন ও তরবারি'র সাহায্যে তাহাদের গোলামদের বাধ্য করিতেছে প্রভুকে ভক্তি করিতে। অতএব, আজিকার দিনে খৃস্টধর্মের এই প্রভাবের কথা না বলিলেই ভাল হয়। আপনারা জানেন, আজ তরবারির স্থান দখল করিয়াছে কামান ও বোমা; এমন-কি "স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশও" আজ আসিয়াছে।

প্যারিসের একখানি সংবাদপত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

"আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরাজেরা এমন এক কৌশল বাহির করিয়াছে যাহাতে তাহাদের খুব সুবিধা হইবে। দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে এক অধিত্যকায় কয়েকজন বিদ্রোহী আশ্রয় লইয়াছে। হঠাৎ তাহাদের মাথার উপর অনেক ঊর্ধ্বে একটি বিমানের আবির্ভাব হয়। অস্ত্রগ্রহণের জন্য আফ্রিদিরা লাফ দিয়া ওঠে। কিন্তু বোমা পড়ে না। বোমার পরিবর্তে বিমান হইতে নামিয়া আসে বাণী, স্বর্গের বাণী—এই স্বর্গীয় বাণী তাহাদের মাতৃভাষায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই অর্থহীন সংগ্রাম বন্ধ করিয়া তাহাদের অস্ত্রত্যাগ করিতে বলে। এই স্বর্গীয় বাণীতে সচকিত হইয়া সত্যসত্যই বিদ্রোহীরা যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছে এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে।

"ফাশিস্ত মিলিশিয়া প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে মিলানে এই কৌশলপূর্ণ ঈশ্বরের বাণীর পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল; সমস্ত শহর শুনিয়াছিল স্বর্গীয় কণ্ঠে ফ্যাশিজমের সংক্ষিপ্ত প্রশংসাবাণী। জেনারেল বালবো-র বক্তৃতা আগেই শোনা ছিল শহরবাসীদের। স্বর্গাগত কণ্ঠস্বরে তাহারা জেনারেল বালবোর কণ্ঠস্বরের আভাস পাইয়াছিল।"

এইভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার ও তাঁহার কণ্ঠস্বরকে অসভ্যদমনে কাজে লাগাইবার এক কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যায় একদিন ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনা যাইবে সানফ্রান্সিস্কো অথবা ওয়াশিংটনে। শোনা যাইবে ঈশ্বর কথা বলিতেছেন ইংরাজীতে এবং সে ইংরাজীতে জাপানী টান।

আপনারা আমার নিকট 'খৃস্টধর্মের বাণী-প্রচারক মহাপুরুষদের' দৃষ্টান্ত

তুলিয়া ধরিয়াছেন। আপনারা মোটেই রসিকতা করিতেছেন না, সেইজন্য ব্যাপারটিতে সত্যই আমার মজা লাগিতেছে। এই মহীয়ান ধর্মনায়কেরা কিভাবে, কি দিয়া, কেন তৈয়ারী হইয়াছিলেন, সে প্রসঙ্গ তুলিব না। কিন্তু তাঁহাদের সমর্থনের উপর নির্ভর করিবার আগে তাঁহাদের দৃঢ়তার পরীক্ষা করিয়া লওয়া ভাল। আপনাদের 'চার্চ' সম্পর্কিত বক্তৃতায় যে 'মার্কিন আদর্শবাদে' আপনাদের বিশ্বাস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, সে আদর্শবাদের জন্ম গভীর অজ্ঞতার মধ্যে। বর্তমান ক্ষেত্রে খৃস্টীয় চার্চের ইতিহাস সম্পর্কে আপনাদের অজ্ঞতার একটিমাত্র কারণই চোখে পড়ে ঃ ইউরোপের অধিবাসীদের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা কখনো নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে একথা শেখে নাই যে চার্চ মানুষের মন ও বিবেককে শৃংখলিত করিবার প্রতিষ্ঠান। 'চার্চের মোহান্তদের' শয়তানী, স্বার্থপরতা ও উচ্চাভিলাষের জন্য সর্বজনীন চার্চ-পরিষদগুলিতে যে-সকল রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহার খবর ও বিবরণ আপনাদের জানা উচিত। বিশেষ করিয়া 'কাউন্সিল সব ইফিসুস্'-এর ভণ্ডামির কাহিনী হইতে আপনারা অনেক কিছুই জানিতে পারিবেন। ধর্মীয় মতান্তরের ইতিহাস আপনাদের কিছু পড়া উচিত ঃ প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীগুলিতে বিধর্মীদের হত্যা, ইহুদী-নির্যাতন, আলবিজেন্স্ ও টেবোটাইটস্দের হত্যা এবং সাধারণভাবে খৃস্টীয় চার্চের রক্তাক্ত নীতির খবর আপনাদের রাখা উচিত। অর্ধশিক্ষিতদের পক্ষে ধর্মীয় আদালতের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনাদের দেশবাসী ওয়াশিংটন লী যে ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং ধর্মীয় আদালতের প্রধান কর্তা ভ্যাটিকানের সেন্সর যাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সে ইতিহাস এ-ইতিহাস নহে। একথা সুনিশ্চিত, এই সব ইতিহাস যদি আপনারা পড়েন তবে আপনাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইবেই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের ক্ষমতাকে সংহত করিতে চার্চ-নায়কেরা কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং তাঁহারা যে মতান্তর বা বিরোধী মতের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন তাহার কারণ, মেহনতী মানুষ একটা সহজ সংস্কার-বলে চার্চ-নায়কদের অসত্য প্রচারের আভাস পাইয়াছিল বলিয়াই এই মতান্তর বা বিরোধী মতগুলি চিরদিনই আসিয়াছে শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্য হইতেই। যে ধর্ম তাহারা প্রচার করিত সে ধর্ম ছিল ক্রীতদাসের জন্য, সে ধর্মকে ভুলভাবে বুঝিয়া অথবা ক্রীতদাসদের ভয়ে ছাড়া প্রভুরা কখনো গ্রহণ করে নাই। "বড় বড় ঐতিহাসিক ভুল' সম্পর্কিত প্রবন্ধে আপনাদের ঐতিহাসিক ভ্যান লুন বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের বাণীর (গস্পেলস্) পক্ষে নহে, বিরুদ্ধেই লড়িতে হইয়াছে চার্চকে। তিনি বলিয়াছেন, জেরুজালেমকে ধ্বংস করিয়া চূড়ান্ত ভুল করিয়াছিলেন টাইটাস, কারণ প্যালেস্টাইন হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই খৃষ্টধর্ম দানা বাঁধিয়া বাড়িয়া ওঠে; এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে মার্কস ও লেনিনের ভাবধারা যেমন মারাত্মক, রোমক সাম্রাজ্যের পক্ষে খৃষ্টধর্মও তাহার চেয়ে কম মারাত্মক ছিল না।

সত্যই তাই। খৃস্টের বাণীর সরল সাম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়াছিল খৃস্টীয় চার্চ—সমগ্র 'ইতিহাসের' ইহাই হইল সার কথা।

আজ চার্চ কি করিতেছে? আজ চার্চের আসল কাজ প্রার্থনা করা। সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধের' মত একটা যুদ্ধের প্রচার চালাইয়াছিলেন ইয়র্কের আর্কবিশপ ও ক্যান্টারবেরির আর্কবিশপ। এই দুই আর্কবিশপ এক নূতন প্রার্থনা রচনা করিয়াছেন। বৃটিশ-কপটতার সহিত বৃটিশ রসিকতার এ এক অপূর্ব সম্মেলন। 'আমাদের পিতা' এই প্রার্থনাটির ভঙ্গিতে রচিত এ এক দীর্ঘ রচনা। আর্কবিশপদ্বয় ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেছেন :

"বিশ্বাস ও সম্পদ ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমাদের সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন সে সম্পর্কে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে যাহা কিছু করা হইতেছে সে সম্পর্কে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আগামী নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সম্পর্কে এবং পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা কিছু করা হইতেছে সব কিছু সম্পর্কে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। বাণিজ্য, ঋণদানের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনা সম্পর্কে, আজ আমাদের দৈনন্দিন রুটির ব্যবস্থা করিয়া দাও। সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে সর্বশ্রেণীর সহযোগিতা সম্পর্কে, আজ আমাদের দৈনন্দিন রুটির ব্যবস্থা করিয়া দাও। যদি আমরা জাতীয় গর্ববোধের অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকি, যদি আমরা অন্যকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেয়ে তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেই বেশী সন্তোষ পাইয়া থাকি, তবে আমাদের পাপ মার্জনা কর। যদি আমরা আমাদের কর্ম পরিচালনায় স্বার্থপরতা দেখাইয়া থাকি এবং নিজেদের ও নিজ শ্রেণীর স্বার্থকে অন্যদের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকি, তবে আমাদের পাপ মার্জনা কর।"

ভীত দোকানদারদের প্রার্থনা! এই প্রার্থনাটুকুর মধ্যে বার বার তাহারা 'পাপ মার্জনা'র জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। কিন্তু একবারও তাহারা বলিতেছে না যে, তাহারা এই পাপ আর করিতে চাহে না বা করিবে না। এবং মাত্র একবার তাহারা ঈশ্বরের 'মার্জনা' ভিক্ষা করিতেছে :

"আমরা জাতীয় দম্ভের কবলে পড়িয়াছি, অন্যকে সেবা করার চেয়ে তাহার উপর প্রভুত্ব করাতেই আনন্দলাভ করিতেছি। হে ঈশ্বর, আমাদের ক্ষমা কর।"

আমাদের পাপ মার্জনা কর, কিন্তু আমরা পাপ কাজ বন্ধ করিতে পারিব না—এই কথাই তাহারা বলিতেছে। কিন্তু ইংরাজ পাদ্রীদের অধিকাংশই এই মার্জনাভিক্ষার প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই প্রার্থনা-পাঠ তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তিকর ও অপমানকর হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

লণ্ডনের সেন্ট পল গীর্জায় ২রা জুন বৃটিশ 'ঈশ্বরের' সিংহাসনতলে এই প্রার্থনা রাখা হইবে বলিয়া কথা ছিল। প্রার্থনাটি যে-সকল পাদ্রীর মনোমত হয় নাই, তাঁহারা উহা পাঠ না করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপের নিকট হইতে। অতএব দেখিতেছেন, খৃস্টান চার্চের ইতর ও নির্বোধ প্রহসন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাদ্রীরা যে কেমন করিয়া তাহাদের

ঈশ্বরকে একজন প্রবীণ দোকানদারের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে এবং তাঁহাকে ইউরোপের সমস্ত নামকরা দোকানদারদের সমস্ত কারবারের অংশীদারে পরিণত করিয়াছে, তাহাও কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু শুধুমাত্র ইংরেজ পাদ্রীদের কথা বলিলে ভুল করা হইবে। ভুলিলে চলিবে না ইতালীয়ান পাদ্রীরা একটি পবিত্র আত্মার (হোলি গোস্ট্) ব্যাংক স্থাপন করিয়াছে এবং রুশ নির্বাসিতদের প্যারিসস্থ পত্রিকায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের 'মুলাউসে' এই ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"অ্যাবে এগি পরিচালিত ক্যাথলিক ইউনিয়ন পাবলিশিং হাউসের একটি পুস্তকের দোকানের ম্যানেজার ও সেলস্ম্যানকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়াছেন। জার্মানি হইতে আমদানী অশ্লীল যৌন ফটো ও বই এই দোকানে বিক্রয় করা হইত। 'মালগুলি' বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। কতকগুলি বই শুধু যৌন অশ্লীলতায়ই পূর্ণ নহে, ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসাও উহাতে রহিয়াছে।"

এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যায় এবং এই ঘটনাগুলিতে শুধু একটি জিনিসই প্রমাণ হয়। প্রমাণ হয়, যে-রোগ মুরুব্বি ও মালিক পুঁজিবাদকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, সেই একই রোগে ভৃত্য চার্চও আজ আক্রান্ত। এবং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এমন এক সময় ছিল যখন বুর্জোয়াশ্রেণী 'চার্চের নৈতিক কর্তৃত্ব'কে মানিয়া চলিত তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কর্তৃত্ব ছিল 'মনের পুলিশে'র কর্তৃত্ব, শ্রমজীবী জনসাধারণের নিপীড়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব। আপনারা বলিতেছেন, চার্চ 'সান্ত্বনা' দিত? আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সান্ত্বনা বুদ্ধির শিখাকে নিভাইয়া দিবার একটি পদ্ধতিমাত্র।

না, গরীবের নিকট ধনীকে ভালবাসিবার কথা, মজুরের নিকট মালিককে ভালবাসিবার কথা প্রচার করা আমার ব্যবসায় নহে। সান্ত্বনাদানের কাজ আমার দ্বারা হইবে না। আমি ভালভাবেই জানি এবং বহুকাল ধরিয়াই জানি যে, সমগ্র জগৎ ঘৃণার আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন এবং চোখের উপর দেখিতেছি, যত দিন যাইতেছে ততই এই আবহাওয়া আরও বেশী ঘন, আরও বেশী সক্রিয়, আরও বেশী কল্যাণকর হইয়া উঠিতেছে।

আপনারা "মানবপ্রেমিকেরা, যাঁহারা বাস্তববাদী হইতে চান" তাঁহাদের আজ একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, এ জগতে দুই ঘৃণা কাজ করিতেছে : এক ঘৃণা আসিতেছে লুণ্ঠনকারীদের মধ্য হইতে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার আবহাওয়া হইতে, লুণ্ঠনব্যবসায়ীদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের আতঙ্কে বিহ্বল ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন হইতে। অন্য ঘৃণা, শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণা, আসিতেছে বর্তমান [illegible] প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে এবং শ্রমিকশ্রেণী যে শাসনদণ্ড হাতে লওয়ার অধিকারী এই চেতনার আলোকে এ ঘৃণা প্রতিদিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। এই দুই ঘৃণা বাড়িতে বাড়িতে আজ তীব্রতার এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে এই দুই ঘৃণার মধ্যে আপোষ অসম্ভব। এই দুই

ঘৃণার দুই বাহকশ্রেণীর অনিবার্য সংঘাত ও শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ ছাড়া এ পৃথিবীকে আর কিছুই ঘৃণামুক্ত করিতে পারিবে না।

আপনারা লিখিয়াছেন : "অনেকের মতো আমাদেরও ধারণা, আপনাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কৃষকদের উপর বলপ্রয়োগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।" অল্পসংখ্যক, এখনও খুবই অল্পসংখ্যক, বুদ্ধিজীবী বুঝিতে শুরু করিয়াছেন যে, মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখর, এবং একমাত্র এই শিখর হইতেই সামাজিক ঘটনাবলীর অকপট অনুশীলন সম্ভব এবং শিখরে দাঁড়াইলেই সামাজিক সুবিচারের ও সংস্কৃতির নব নব রূপের সোজা পথটি চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। এই বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা খুবই অল্প। তবু অনেকের মতো নহে, এই মুষ্টিমেয়ের মতো চিন্তা করিতেই আমি আপনাদের উপদেশ দিতেছি। যে শ্রেণীর সহিত আপনাদের সংযোগ সে-শ্রেণীর সমগ্র ইতিহাস শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে দৈহিক ও মানসিক বলপ্রয়োগের ইতিহাস। চেষ্টা করিয়া এই শ্রেণীর আত্মীয়তা-বন্ধন অন্তত কিছুকালের জন্য ভুলিয়া যান। এই চেষ্টাটুকু করিলে বুঝিতে পারিবেন আপনার শ্রেণীই আপনার শত্রু। কার্ল মার্কস খুবই জ্ঞানী লোক ছিলেন, এবং একথা মনে করা ভুল হইবে যে, তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন জুপিটারের মাথা হইতে মিনার্ভার আবির্ভাবের মতো। তাহা মোটেই নয়। ডারুইন ও নিউটনের তত্ত্ব যেমন বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার পথিমধ্যে প্রস্তর-ফলক, কার্ল মার্কসের বাণীও তাই। লেনিন মার্কস অপেক্ষা সহজ, এবং শিক্ষক হিসাবে কম জ্ঞানী নহেন। তাঁহারা আপনাদের দেখাইয়া দিবেন কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ আপনারা সেবা করিতেছেন—সেবা করিতেছেন প্রথমে তাহার শক্তি ও গৌরবের উজ্জ্বলতার মধ্যে; তারপর তাঁহারা দেখাইয়া দিবেন কিভাবে অমানুষিক জবরদস্তির দ্বারা সেই শ্রেণী গড়িয়া তুলিয়াছে এমন এক 'সংস্কৃতি' যাহার ভিত্তি রক্তপাত, মিথ্যা ও প্রতারণা। তারপর তাঁহারা আপনাদের দেখাইয়া দিবেন, এই সংস্কৃতির অধঃপতনের রূপটি। তাহার পরবর্তী বর্তমান কালের দুর্নীতি তো আপনারা নিজেরাই চোখের উপর দেখিতেছেন। এই দৃশ্যই আপনাদের মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে আমার নিকট লেখা চিঠিতে সেই আতঙ্কই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'জবরদস্তির' কথায় আসা যাক। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব একটি সাময়িক ব্যাপার। প্রকৃতি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কোটি কোটি গোলামকে নূতনভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে এবং তাহাদের স্বদেশের ও স্বদেশের সমস্ত সম্পদের একমাত্র মালিকে পরিণত করিতে হইলে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন। যখন সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, সমস্ত কৃষক, সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিতে থাকিবে এবং যখন প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব হইবে নিজের সামর্থ্যানুসারে কাজ করা ও প্রয়োজনানুসারে অর্জন করা, তখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আর প্রয়োজন থাকিবে না। 'জবরদস্তি' বলিতে আপনারা এবং আপনাদের মতো অনেকেই যাহা বুঝিতেছেন, তাহা ভুল বুঝার

ব্যাপার। কিন্তু প্রায়ই ইহা নিছক ভুল বুঝার ব্যাপার হয় না, হয় সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসা রটনা। সোবিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক কর্মপ্রবাহ সম্পর্কে 'জবরদস্তি' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরা। শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে, তাহার দেশ পুনর্গঠন ও নূতন অর্থনৈতিক কাঠামো সংগঠনের কাজকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

আমার মতে, বাধ্যকরণের কথা বলাই ঠিক হইবে, জবরদস্তি হইতে বাধ্যকরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ আপনি যখন শিশুদের অক্ষর পরিচয় করান তখন নিশ্চয়ই তাহাদের উপর জবরদস্তি করেন না? সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার পার্টি আজ কৃষকশ্রেণীকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অক্ষর পরিচয় করাইতেছেন। ঠিক এইভাবেই কেহ বা কোনো কিছু আপনাদের অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের বাধ্য করিয়াছে নিজেদের অবস্থার মর্মান্তিকতা—'হাতুড়ী ও নেহাইয়ের মধ্যে' থাকিবার মর্মান্তিকতা—উপলব্ধি করিতে। আপনাদেরও কেহ সামাজিক ও রাজনৈতিক অক্ষর-পরিচয় করাইতেছে—এই 'কেহ' অবশ্য আমি নই।

সমস্ত দেশেই কোটি কোটি ক্ষুদে মালিক লইয়া গঠিত কৃষকশ্রেণী এমন এক জমি সৃষ্টি করিয়া রাখে যাহা লুণ্ঠনকারী ও পরাশ্রয়ীর জন্ম দেয়। এই জমির বুকেই জন্ম নেয় পুঁজিবাদ, তাহার সমস্ত দানবীয় বীভৎসতায়। তাহার এই ভিক্ষুকের সম্পত্তি রক্ষা করিতেই কৃষকের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিভা ব্যয় হইয়া যায়। ক্ষুদে মালিকের সাংস্কৃতিক মূঢ়তা পুরোপুরিই কোটিপতির সাংস্কৃতিক মূঢ়তার সমান—বুদ্ধিজীবী আপনাদের এই ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝিয়া দেখা উচিত। অক্টোবর-বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় কৃষকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থার মধ্যে বাস করিত। আজ সোবিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে রুশ নির্বাসিতদের ক্রোধ মাত্রা হারাইয়া হাস্যকর পর্যায়ে উঠিয়াছে; কিন্তু তাহারা পর্যন্ত আজ একথা অস্বীকার করিবে না।

কৃষককে অধ-অসভ্য চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের পর্যায়ে রাখা চলিবে না, তাহাকে চতুর ধনী-চাষী, জমিদার ও পুঁজিপতির শিকারে পরিণত হইতে দেওয়া চলিবে না। অসংখ্য ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত, উর্বরতাশক্তিহীন যে জমি হইতে জমির নিরক্ষর ভিখারী মালিকের অন্নের সংস্থান হয় না, সেই জমিতে কয়েদীর মতো ক্রীতদাসের খাটুনি খাটিবার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইবে কৃষককে। জমিতে সার দিবার অক্ষমতা হইতে, চাষের জন্য মেশিন প্রয়োগের অপারগতা হইতে, কৃষি বিজ্ঞানের অজ্ঞতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে কৃষককে। নৈরাশ্যময় মালথুসীয় তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে কৃষককে আর দাঁড় করানো চলিবে না। আমার মতে, এই তত্ত্বের পশ্চাতে রহিয়াছে পাদ্রীসুলভ চিন্তার শয়তানী। কৃষকশ্রেণী যদি আজও তাহাদের অবস্থার অবমানকর বাস্তবতা বুঝিতে সমর্থ না হইয়া থাকে, তবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য তাহাদের মধ্যে এই চেতনাকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, এমন-কি জোর করিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া। কিন্তু এ

ভ্রোরের প্রয়োজন নাই, কারণ ১৯১৪-১৮ সালের ধ্বংসের যন্ত্রণা ভোগের পর সোবিয়েত ইউনিয়নের কৃষকশ্রেণী অক্টোবর-বিপ্লবের আঘাতে জাগিয়া উঠিয়াছে, সে আজ আর অন্ধ নহে, তাহার বাস্তব দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। সে আজ মেশিন ও সার পাইতেছে, সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে তাহার সম্মুখে, প্রতি বৎসর হাজার হাজার কৃষকসন্তান ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও কৃষিবিজ্ঞানী হইতে চলিয়াছে। কৃষকেরা বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে, নিজস্ব পার্টির মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণী সোবিয়েত ইউনিয়নে এমন একটিমাত্র মালিক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে যাহার ষোলো কোটি মাথা ও বত্রিশ কোটি হাত। এই কথাটি যদি সে বুঝিতে পারে, তবে অসাল কথাটিই বুঝিয়াছে, বলিতে হইবে। কৃষক দেখিতেছে তাহার দেশে যা' কিছু করা হইতেছে, সকলের জন্যই করা হইতেছে, মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর জন্য নহে। কৃষক দেখিতেছে যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে শুধু তাহাই করা হইতেছে যাহা তাহার কাজে লাগিবে। সে দেখিতেছে, দেশের ছাব্বিশটি কৃষি-গবেষণাভবন কাজ করিতেছে তাহারই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ও তাহারই শ্রম লাঘব করিবার জন্য।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে নোংরা গ্রামে সে বাস করিয়া আসিতেছে, সে ধরনের গ্রামে কৃষক আর থাকিতে চাহে না। সে থাকিতে চাহে কৃষি-নগরীতে যেখানে তাহার সন্তানসন্ততির জন্য থাকিবে ভালো স্কুল ও শিশুরক্ষণশালা, এবং নিজের জন্য থাকিবে থিয়েটার, ক্লাব, লাইব্রেরী ও সিনেমা। জ্ঞানের তৃষ্ণা ও মার্জিত জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা কৃষকদের ক্রমেই বাড়িতেছে। কৃষক যদি ইহা না বুঝিতে পারিত তবে, শ্রমিক ও কৃষকের সম্মিলিত শক্তিবলে সোবিয়েত ইউনিয়নে এই পনের বছরে যে বিরাট কর্মকান্ড গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারিত না।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে মেহনতী মানুষ যান্ত্রিক শক্তিমাত্র, নিজেদের মেহনতের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পর্কে তাহারা অজ্ঞ। আপনাদের দেশের মালিকেরা তো মেহনতী মানুষের শ্রমশোষক পরাশ্রয়ী ও জাতীয় শ্রমশক্তি লুণ্ঠনকারী কতকগুলি ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান। টাকার খেলায় আত্মকলহে মাতিয়া তাহারা পরস্পরকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং শেয়ার বাজারে প্রচণ্ড প্রতারণার খেলা খেলিতেছে। অবশেষে তাহাদের উচ্ছৃংখলতা দেশকে এক অবিশ্বাস্য সংকটের আবর্তে আনিয়া ফেলিয়াছে। কোটি কোটি শ্রমিক না খাইয়া মরিতেছে, জাতির স্বাস্থ্য অকারণে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, ভীষণভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে শিশু-মৃত্যু, বাড়িয়া চলিয়াছে আত্মহত্যা এবং সংস্কৃতির মূল মাটি যে জীবন্ত মানুষের প্রাণশক্তি তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। ইহা সত্ত্বেও বেকারদের আশু সাহায্য-দানের জন্য সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব করিয়া যে 'লা কোলেতি কোস্তিগান' বিলটি আসিয়াছিল, আপনাদের সেনেট তাহাও 'অগ্রাহ্য' করিয়াছে। অথচ 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণীতে দেখা যায়, ১৯৩০ সালে পরিবারসহ ১৫৩,৭০১ জন বেকারকে ও ১৯৩১ সালে পরিবারসহ

১৯৮,৭৩৮ জনকে বাড়ীভাড়া দিতে না পারায় বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। এই বছরের জানুয়ারি মাসে নিউইয়র্কে প্রতিদিন শত শত বেকারকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে যাঁহারা শাসনকার্য চালান ও যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন সকলেই শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণীর সেই অংশ, যাঁহারা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের এবং ক্ষেতচাষকে সমষ্টিগত ও যন্ত্রচালিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন; যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কলে-কারখানায় যে শ্রমিকেরা কাজ করেন তাঁহাদের মত নিজেদের মনকে গাড়িতে হইবে অর্থাৎ তাঁহারাই হইবেন দেশের প্রকৃত ও একমাত্র মালিক। সমবায়ী কৃষকদের ও কমিউনিস্টদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। ভূমিদাসত্বের দায়ভাগ হইতে এবং বহু শতাব্দীর ক্রীতদাসত্বসঞ্জাত কুসংস্কার হইতে নূতন যুগের মানুষেরা যত দ্রুত নিজেদের মুক্ত করিবে, তত দ্রুত এই সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে আইন তৈয়ারী হয় নীচু হইতে, মেহনতী জনতার মধ্য হইতেই সে আইনের জন্ম হয়, মেহনতী জনতার প্রাণপ্রক্রিয়ার অবস্থা হইতেই এই আইন বাহির হইয়া আসে। শ্রমিক ও কৃষকের শ্রমপ্রক্রিয়ার মধ্যে যাহা পরিপক্ক হইয়া ওঠে শুধু তাহাকেই সোবিয়েত সরকার ও পার্টি রূপদান ও আইনে পরিণত করেন—এই শ্রম-প্রক্রিয়ার আসল লক্ষ্য একটি সমসমাজ গঠন। পার্টি ততটুকুই ডিক্টেটর যতটুকু সে শ্রমজীবী জনসাধারণের স্নায়ু-মস্তিষ্ক-ব্যবস্থার সংগঠক কেন্দ্র। পার্টির লক্ষ্য যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত যতখানি সম্ভব শারীরিক শক্তিকে মানসিক শক্তিতে পরিণত করা, যাহাতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষের ও সমগ্র জনসাধারণের ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

স্বাতন্ত্র্যবাদের মন্ত্রদীক্ষিত বুর্জোয়া রাষ্ট্র তরুণ-তরুণীকে নিজের স্বার্থ ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই অতি-সন্তর্পণে শিক্ষিত করিয়া তোলে। ইহা অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ, আমরা দেখিতে পাই বুর্জোয়াশ্রেণীর তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই উন্মার্গী (অ্যানার্কিস্ট) তত্ত্ব ও ভাবধারা সবচেয়ে বেশী জন্মিয়াছে ও জন্মাইতেছে। ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা, ইহা এমন এক অস্বাভাবিক, অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার পরিচায়ক যাহার মধ্যে মানুষের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। তাই মানুষ নিজের অবাধ স্বাধীনতার জন্য সমাজের সামগ্রিক ধ্বংসের স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আপনারা জানেন, আপনাদের তরুণেরা শুধু ইহা স্বপ্নই দেখে না, এই অনুসারে কাজও করে। ইউরোপের সংবাদপত্রগুলিতে প্রায়ই মার্কিন ও ইউরোপীয় তরুণদের অদ্ভুত অপরাধীসুলভ 'তামাসা'র খবর থাকে। এই অপরাধের মূলে কোন বৈষয়িক অভাব নাই, আছে জীবনের 'দুর্বহ একঘেয়েমি', কৌতূহল, রোমাঞ্চক কিছু করিবার ইচ্ছা—এবং এ সব কিছুর মূলে রহিয়াছে ব্যক্তি ও তাহার জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত নীচু ধারণা। শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে প্রতিভাশালীদের নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইয়া এবং নিজেদের স্বার্থসাধনে তাহাদের বাধ্য করিয়া

বুর্জোয়ারা 'ব্যক্তিগত উন্নতির' পথে ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা'দানের বড়াই করিয়া থাকে —এই উন্নতির অর্থ অবশ্য একটুখানি আরামদায়ক বাসগৃহ। কিন্তু, একথা নিশ্চয়ই আপনারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, আপনাদের সমাজে হাজার হাজার প্রতিভাবান মানুষ বুর্জোয়া জীবনের বাস্তবতার বাধা উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া কদর্য উন্নতি-লাভের রাস্তায় পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। শক্তিমান মানুষের ব্যর্থ জীবনকাহিনীতে ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্য পরিপূর্ণ। বুর্জোয়াশ্রেণীর ইতিহাস তাহার নিজের মানসিক নিঃস্বতার ইতিহাস। আজ সে কোন্ প্রতিভার বড়াই করিতে পারে? নানা প্রকারের হিটলার ও আত্মম্ভরী বামনবীর ছাড়া বড়াই করিবার আর তাহাদের কিছু নাই।

সোবিয়েত ইউনিয়নের জনগণ আজ এক নব জাগরণের যুগে প্রবেশ করিতেছে। অক্টোবর-বিপ্লব হাজার হাজার প্রতিভাশালী মানুষকে এক প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী যে বিরাট কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রয়োজনে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। সোবিয়েত ইউনিয়নে কোনও বেকার নাই এবং সর্বত্রই, মানবপ্রয়াসের সর্বক্ষেত্রেই কর্মিসংখ্যা এখনও প্রয়োজনের অনুরূপ নহে, যদিও উহা অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

আপনারা বুদ্ধিজীবী, আপনারা "সংস্কৃতির মালিক।" আপনারা যদি একটি কথা বোঝেন তবে বড় ভাল হয়। কথাটি এই যে, শ্রমিকশ্রেণী যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লইবে, তখন সাংস্কৃতিক সৃজনী চেষ্টার ব্যাপকতম সুযোগ সে আপনাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে।

একবার দেখুন, রুশ বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস রুশ বুদ্ধিজীবীদের কি কঠোর শিক্ষাই না দিয়াছে। তাহারা শ্রমজীবী জনতার পাশে দাঁড়াইতে অস্বীকার করিয়াছিল, আজ তাহারা অক্ষম আক্রোশে নির্বাসনে পচিয়া মরিতেছে। শীঘ্রই তাহারা একদম শেষ হইয়া যাইবে, এবং লোকে তাহাদের মনে রাখিবে শুধু বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া।

বুর্জোয়াশ্রেণী সংস্কৃতির শত্রু, সংস্কৃতির শত্রু হওয়া ছাড়া তাহার উপায় নাই—বুর্জোয়া বাস্তবতা এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সমগ্র ব্যবহারিক কর্মপন্থাই এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বজনীন নিরস্ত্রী-করণের পরিকল্পনাটি বুর্জোয়ারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পুঁজিপতিরা যে সমাজ-জীবনে বিপজ্জনক জীব এবং তাহারা যে আর একটি নূতন বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন চালাইতেছে, এই একটিমাত্র ঘটনাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। সোবিয়েত ইউনিয়নকে তাহারা আত্মরক্ষার এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থার মধ্যে রাখিয়াছে এবং পুঁজিপতিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অস্ত্র নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণে মহামূল্য সময় ও সম্পদ ব্যয় করিতে শ্রমিকশ্রেণীকে বাধ্য করিতেছে। পুঁজিপতিরা সোবিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের আয়োজন চালাইতেছে; তাহারা এই বিশাল দেশটিকে নিজেদের উপনিবেশে, নিজেদের বাজারে পরিণত করিতে চাহে। পুঁজিপতিদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ সোবিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণকে আজ যে বিপুল

পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে হইতেছে তাহা ব্যয়িত হইতে পারিত মানব-জাতির সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কল্যাণে, কারণ সোবিয়েত ইউনিয়নের নির্মাণ-কান্ড সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘৃণার বিষে ও ভবিষ্যতের আতঙ্কে বুর্জোয়াশ্রেণী পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার পূতিগন্ধময় পরিবেশ ক্রমেই বেশী সংখ্যায় নির্বোধের জন্ম দিতেছে। এই নির্বোধেরা নিজেরাই জানে না, যাহার জন্য তাহারা চীৎকার করিতেছে তাহার তাৎপর্য কি? তাহাদের একজন ইউরোপের 'ভদ্রমহোদয়গণ, শাসকগণ ও কূট-নীতিজ্ঞদের' নিকট আবেদন জানাইতেছে: "তৃতীয় আন্তর্জাতিককে ধ্বংস করিবার জন্য পীত জাতিকে নিয়োগ করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে ইউরোপের।" ইহা খুবই সম্ভব যে, স্বগোত্রের 'ভদ্রমহোদয়গণ, শাসকগণ ও কূটনীতিজ্ঞগণের' স্বপ্ন ও বাসনাই এই নির্বোধ চীৎকার করিয়া প্রকাশ করিতেছে। এই নির্বোধের চীৎকার অনুযায়ী কাজ করিবার কথা খুব সম্ভব কোন 'ভদ্রমহোদয়' গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা শাসন করিতেছে দায়িত্বহীন 'ভদ্র-মহোদয়েরা'। ভারত, চীন ও ইন্দোচীনে যাহা ঘটিতেছে তাহা ইউরোপীয়দের এবং সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন যোগাইতে পারে। ইহা হইবে তৃতীয় ঘৃণা; আপনারা মানবপ্রেমিক, আপনাদের ভাবিয়া দেখা উচিত আপনাদের অথবা আপনাদের সন্তানদের পক্ষে ইহার প্রয়োজন আছে কিনা? জার্মানীতে যে 'জাতিগত বিশুদ্ধতা' অর্থাৎ জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা হইতেছে তাহাতে আপনাদের কি কল্যাণ হইতে পারে? একটি নমুনা দিতেছি:

"গ্যেটের আগামী মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে থুরিঙ্গিয়া শহরে গেরহার্ট হাউপ্টম্যান, টমাস ম্যান, ওয়াল্টার ভন মোলো ও সরবোর্নের অধ্যাপক হেনরি লিশ্‌টেনবার্গার আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য থুরিঙ্গিয়ার নাৎসী নেতা সাউকেল হ্বাইমারের ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট গ্রুপকে নির্দেশ দিয়াছে। এই ব্যক্তিগণ অনার্যবংশোদ্ভূত বলিয়া সাউকেল অভিযোগ করিয়াছে।

তাই, আপনাদের আজ এই সহজ প্রশ্নটির সমাধানের সময় আসিয়া গিয়াছে: হে 'সংস্কৃতির মালিকগণ', আপনারা কাহার পক্ষে? যাহারা নিজের হাতে সংস্কৃতি তৈয়ারী করিতেছে, তৈয়ারী করিতেছে জীবনের নূতন নূতন রূপ, আপনারা কি তাহাদের পক্ষে? অথবা তাহাদের বিপক্ষে, এবং যে দায়িত্বহীন লুণ্ঠনব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আপাদমস্তক পচিয়া গিয়াছে এবং যাহারা এখন নিতান্ত অভ্যাসবশেই চলাফেরা করিতেছে তাহাদের অস্তিত্ব কায়েম রাখিবার স্বপক্ষে?

(১৯৩২)

॥ পুরাতন ও নূতন মানুষ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় "প্রগতির যুগ।" যোগ্য নাম সন্দেহ নাই। কারণ এ যুগ যুক্তির যুগ। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে আদিম শক্তিকে শৃংখলিত করিবার প্রচেষ্টা এ যুগে এমন এক সাফল্যের শিখরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যাহা অতীতে কোনদিন সম্ভব হয় নাই। এ যুগ "যান্ত্রিক বিস্ময়ের" যুগ। এ যুগে যুক্তি দিয়া মানুষ জৈব-জীবনকে অনুশীলন করিয়াছে, যুক্তির আলোকে আবিষ্কার করিয়াছে অদৃশ্য জীবাণুজগত। শ্রেণী-শাসিত সামাজিক অবস্থার নির্লজ্জ মানববিদ্বেষী রক্ষণশীলতা এই আবিষ্কারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে মানুষকে বাধা দিয়ছে। ওয়ালেসের 'দি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' ('বিংশ শতাব্দী') নামক গ্রন্থের রুশ অনুবাদে বলা হইয়াছে যে, এই যুগে মানুষের চিন্তা এমন এক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে যেখান হইতে নিজের শক্তির গর্বোদ্ধত রাজকীয় মহিমা তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পাশাপাশি আর একটি চিন্তাধারাও কম সক্রিয় ছিল না, এই চিন্তাধারা বুর্জোয়াদের মধ্যে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল জার্মান ভাষায় তাহাকে বলা হয় 'হেবেলট্শমের্ৎস্'—নৈরাশ্যবাদের দর্শন ও কাব্য। ১৮১২ সালে লর্ড বায়রন তাঁহার 'চাইল্ড হ্যারল্ড' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কাণ্ড প্রকাশ করেন এবং ইহার অল্পকাল পরেই দার্শনিক ও কবি, মোনাল্ডোর কাউন্ট জিআকোমো লিওপার্দি প্রচার করিতে শুরু করেন যে, জ্ঞান যুক্তির অক্ষমতাই প্রকাশ করে এবং সবই মায়া। দুঃখ ও মৃত্যুই একমাত্র সত্য। এ তত্ত্বের মধ্যে নূতন কিছু ছিল না। বাইবেলের পূর্ব-ভাগের 'একলেসিয়াস্ট্স্' গ্রন্থে খুব চমৎকারভাবেই এই তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন

বুদ্ধ। এই তত্ত্বই টমাস মুর, জ্যাঁ জাক রুশো প্রমুখ বিদগ্ধ প্রতিভাধরদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে অভিজাত সমস্ত শ্রেণীর পরাজয়ের গ্লানি ও বেদনাই যে বায়রন ও লিওপার্দি কর্তৃক এই তত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র কারণ তাহা মনে করা ভুল হইবে। একথা না বলিলেও চলে যে, অভিজাত শ্রেণীর ভূমির সংগে সংগে তাহার চিন্তা ও ভাবধারার কিছুটাও বুর্জোয়াশ্রেণী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল, কারণ যে অবস্থায় তাহার জন্ম সে অবস্থা অবসানের পরও বাঁচিয়া থাকিবার একটা কদর্য ক্ষমতা ভাবধারার আছে।

নৈরাশ্যবাদী ভাবধারার এইভাবে টিঁকিয়া থাকিবার কারণ—এই দার্শনিক তত্ত্বের মূলে রহিয়াছে গভীর রক্ষণশীলতা। জীবের জীবসত্ত্বা যে অর্থহীন তাহা জোরের সহিত ঘোষণা করিয়া এই দর্শন তীক্ষ্ণদৃষ্টিহীন অগভীর মনকে পরি-তৃপ্ত করিয়া রাখে, যাহারা প্রশান্তি ভালোবাসে তাহাদের রাখে প্রশান্ত করিয়া। এই ভাবধারার গ্রাহকমহল মুষ্টিমেয় সীমাবদ্ধ বলিয়াও ইহার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কিছুটা সহজ হইয়াছে, এবং এইজন্যই এই ভাবধারার মধ্যে কোন মৌলিকত্ব বা দুঃসাহসী চিন্তা চোখে পড়ে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানরাই ছিল ইউরোপে এই নৈরাশ্যবাদী ভাবধারার সবচেয়ে অক্লান্ত বাহক। শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের বৌদ্ধ দর্শনের কথা নাই-বা তুলিলাম। নৈরাজ্যবাদী ম্যাক্স স্টারনারের 'দি ইগো এণ্ড হিজ ওন' গ্রন্থখানি তো নৈরাশ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। ফ্রিডারিশ্ নীট্শে সম্পর্কেও ওই এক কথা বলা চলে। বুর্জোয়াশ্রেণীর মনে যে একজন "জবরদস্ত লোকের" কামনা রহিয়াছে নীট্শে তাহারই উদ্গাতা। এই কামনারই আদর্শ অধোগতির পথে নামিতে নামিতে বিখ্যাত ফ্রেডারিক দি গ্রেট হইতে বিসমার্কে, বিসমার্ক হইতে আধা-জড়বুদ্ধি দ্বিতীয় উইলহেল্মে এবং সেখান হইতে খোলাখুলি উন্মাদ হিটলারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথম বারো বৎসর "লিট্ল্ করপোরাল" বোনাপার্টি ছিলেন ইয়োরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর 'মহাপুরুষে'র আদর্শ। মধ্যবিত্তশ্রেণীর কয়েক পুরুষের চিন্তা-চেতনাকে বোনাপার্টির কর্মজীবনের আধা-আজগুবি উন্নতিমার্গ কতোখানি এবং কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা এখনও ভালোভাবে সন্ধান করিয়া দেখা হয় নাই, অথচ একজন 'বীরে'র উপর নির্ভর করা যে মধ্যশ্রেণীর পক্ষে কতো প্রয়োজন এবং এই 'বীরে'র পতন যে কতোখানি অনিবার্য তাহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ বোনাপার্টির জীবনের মতো আর কী আছে?

ইতিহাসের স্রষ্টারূপে 'বীরের' ভূমিকাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে, যদিও বিকারগ্রস্তের মতো, প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কার্লাইল। তাহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের দ্বারা 'বীরের' মূর্তি চুপ-সাইয়া ক্লেমাঁসো-চার্চিল-উড্রো উইলসন-চেম্বারলেন প্রমুখ "মার্জিত মানবসমাজের নেতাদের" মূর্তিতে পরিণত হওয়া রোধ করিতে পারে নাই। "মার্জিত মানব-সমাজের নেতা" অবশ্য তাহাদের পদলেহী চাটুকার ছাড়া আর কেহই বলে না।

নিজেদের অধীনস্থ 'বীরদের' সম্পর্কে মালিকদের আর সে আগেকার উচ্ছ্বাস নাই। কারণ যুদ্ধ 'বীরের' জন্ম দেয় বলিয়া যে মালিকচক্রগুলি ১৯১৪-১৯১৮ সালের ধ্বংস-অভিযান শুরু করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই আশা করিয়াছিল আলেকজান্দার দি গ্রেট, তৈমুরলঙ অথবা কমপক্ষে একটি নেপোলিয়ন লাভ করিবে, কিন্তু পরিবর্তে পাইয়াছে জোফ্রে, পার্শিং, লুডেনডর্ফের দল। আর পাইয়াছে "সেক্স এন্ড ক্যারেকটার" নামক নৈরাশ্যবাদী পুস্তকের লেখক হ্বাইনিংগারকে এবং "ডিক্লাইন অব ইয়োরোপ" ও "ম্যান এন্ড টেকনিক"এর গ্রন্থকার স্পেংলারকে। "ডিক্লাইন অব ইয়োরোপ"—ইয়োরোপের অধোগতি অর্থাৎ তাহার আত্মিক শক্তিহীনতা, তাহার প্রতিভার ক্ষয়িষ্ণুতা, তাহার সংগঠনী চিন্তাধারার চরম দৈন্য—এ সব শুধু ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্য নহে, আমেরিকারও বৈশিষ্ট্য, সমগ্র জগতের বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়া-আকাশের সমস্ত উজ্জ্বল তারকাই আজ নিভিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ফোরসাইটরা, জার্মানীর বাডেনব্রুকরা এবং আমেরিকার স্ন্যাপ্টিরা আজ স্পষ্টতই বীরের জন্মদানে অক্ষম। তাই বাধ্য হইয়া তাহারা আজ ক্ষুদে ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে বীর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

যে দেশে একদিন আশাবাদী ডিকেন্সের অস্বচ্ছ অমায়িকতা থ্যাকারের সুস্থ সমালোচনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে সম্প্রতি টমাস হার্ডির বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং আজ রিচার্ড আলডিংটনের "বীরের মৃত্যু"র মতো এতো তিক্ত, এতো ভীষণ নৈরাশ্যময় রচনা সম্ভব হইয়াছে। গলস্‌ওয়ার্দি, টমাস ম্যান ও সিনক্লেয়ার লিউইসের সাহিত্যে বিশেষ হইতে নির্বিশেষে রূপান্তরণের যে শিল্পোৎকর্ষ চোখে পড়ে, বিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য সে-উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। বুর্জোয়াশ্রেণীর পশুসুলভ স্থূলতা সহ্য করিতে না পারিয়া "জাঁ ক্রিস্‌তফের" মতো আশ্চর্য মহাকাব্যের লেখক, সাহস ও সততার প্রতিমূর্তি রোমা রোলাঁকে আজ দেশ ছাড়িতে হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ফ্রান্স, কিন্তু লাভবান হইয়াছেন দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ। ফরাসী পুঁজিপতির অবস্থা আজ সেই বোড়া সাপের মত যে অতিরিক্ত আহার গিলিয়াছে, কিন্তু হজম করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ বাকি যেটুকু আছে তাহা সগোত্রীয় অন্য জানোয়ারে গিলিয়া খাইতে পারে, এই ভয়ে সে মরিতেছে। নূতন নূতন দেশ দখলের ও ঔপনিবেশিক জাতিগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার চিরাচরিত মূঢ় প্রচেষ্টার পথে বুদ্ধির দৈন্য অবশ্য কোন বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু, সোনার তাল যে অধঃপতন আনে তাহা বুর্জোয়াশ্রেণীর মস্তিষ্ককে আরও কদর্য, আরও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। ইউরোপের এই আত্মিক দৈন্য এক আশ্চর্য দৃশ্য; অবশ্য দোকানদারেরা যে অমানুষিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে থাকিতে লজ্জিত হইতেছেন এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে, ইঁহারা বুঝিতেছেন 'বীরদের' উপর ও স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর নির্ভর করিয়া দোকানদারেরা পথে বসিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কৃতির কীর্তি কতটুকু'—এই প্রশ্নের

মাত্র একটি জবাব আছে। জবাবটি এই : ইহা নিজের সমৃদ্ধির মাত্রা এমন কদর্য পরিমাণে বাড়াইয়া তোলে যে, এই বৈভবই যে শ্রমিকশ্রেণীর অভূতপূর্ব দারিদ্র্যের কারণ তাহা সকলের চোখেই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হইয়া যায়। শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানের গহ্বরটিকে এত গভীর করা হইয়াছে যে, বুর্জোয়াশ্রেণীকে এই গহ্বরের মধ্যে পড়িতে হইবেই। এই গহ্বরই অবশ্য বুর্জোয়াশ্রেণীর যোগ্য স্থান। ইহাতে 'সংস্কৃতির' ক্ষতি হইবে? মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে বিপ্লব কখনও বিরতি আনে নাই। নূতন নূতন সৃজনীশক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়াই বিপ্লব।

রোমানভ বংশীয় জারশাসিত প্রাক্তন রাশিয়ার বুকে আজ সাংস্কৃতিক বিপ্লবী কর্মধারা দ্রুত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। একদিন যে দেশের সম্পদকে অর্ধ-শিক্ষিত কারবারীর দল ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের হাতে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা কৃষক ও শ্রমিকদের লুণ্ঠন করিত ও বুদ্ধিদীপ-নির্বাণকারী অজ্ঞ পুরোহিতদের হাতে কৃষকদের তুলিয়া দিত, সেই দেশের বুকেই আজ সাংস্কৃতিক বিপ্লবী প্রবাহ উদ্দাম হইয়া ছুটিতেছে।

এখানে আমার নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আমি মনে করি। এই জীবনই আমাকে সুবিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ দর্শক হিসাবে বিবেচিত হইবার অধিকার দিয়াছে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়াছি। নিজের অভিজ্ঞতার সদ্যলব্ধ ধারণার উপর বেশী আস্থা স্থাপন না করিয়া, এই ধারণাগুলিকে আমি নিজের জাতির ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলির ইতিহাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি যথেষ্ট পরিমাণে 'বহির্বস্তুনিষ্ঠ' হইয়াছি। যখন বুঝিয়াছি এই বহির্বস্তুনিষ্ঠা জীবনের প্রাথমিক 'সত্য' উপলব্ধিতে আমাকে বাধা দিতেছে এবং জগৎ সম্পর্কে আমার জ্ঞানের বিকাশকে সরল রেখাপথ হইতে বিচ্যুত করিতেছে, তখনও আমি এই বহির্বস্তুনিষ্ঠা ত্যাগ করি নাই। যে ঘটনাগুলির মধ্যে আপোসের কোন ভিত্তি নাই, তাহাদের মধ্যে আপোসের না হইলেও অন্তত সমতাস্থাপনের একটা বাসনা যে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা সহজ নহে। যাহাদের দেশে আপোসতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁহারাই ইহা ভালো বুঝিবেন। ভালো বুঝিবেন সেই দেশেরই লোক যে-দেশে জীবনের রহস্যভেদে বিশেষজ্ঞ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী মাত্র ১৯১৪-১৮ সালের কলঙ্ককর যুদ্ধের পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছেন যে, অন্তর্দ্বন্দ্বের পক্ষে আপোস-মীমাংসার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইল অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ অনুধাবনের।

একথা আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে, ইউরোপের যে-কোন শ্রমজীবী-শ্রেণীর তুলনায় জারশাসিত রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের দুর্দশা ছিল এত বেশী যে দুইয়ের মধ্যে তুলনাই চলে না। রাশিয়ার শ্রমজীবীশ্রেণী ছিল ইউরোপের তুলনায় আরও অজ্ঞ, আরও পদদলিত।

মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধির উপর রাষ্ট্র ও ধর্মের চাপ ইউরোপ অপেক্ষা রাশিয়ায় ছিল অনেক বেশী গুরুভার, অনেক বেশী স্থূল। ইউরোপ অপেক্ষা রাশিয়ায় রাষ্ট্র ও ধর্ম মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধিকে বিকলাঙ্গ করিয়াছে অনেক বেশী। রুশ দেশে যে পরিমাণে ও যতো নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে পৃথিবীর আর কোথাও তাহা ঘটে নাই। আমি 'অন্ধ স্বদেশপ্রেমিক' নই। আমার 'জাতির আত্মাকে' যে আমি ভালভাবেই চিনি এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আদিম জীবনযাত্রাজাত অন্ধ, কুৎসিত, অসভ্য কুসংস্কারের বিষ-বাষ্পে সমাচ্ছন্ন ছিল এই 'উদার' ও প্রশস্ত আত্মা। প্রসঙ্গত, তুর্গেনিভ, তলস্তয় কিম্বা দস্তয়েভস্কির রচনায় এই আত্মাকে খুঁজিতে গেলে চলিবে না, খুঁজিতে হইবে রাশিয়ার লোকসাহিত্যে—গানে, গাথায়, প্রবচনে, পুরাণ কাহিনীতে, —খুঁজিতে হইবে রাশিয়ার গার্হস্থ্য ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, তাহার বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে, খুঁজিতে হইবে তাহার কুটীরশিল্প ও বৃহৎশিল্পের মধ্যে। শুধু এই সকল ক্ষেত্রে খুঁজিলেই চোখে পড়িবে জাতির ভয়াবহ অজ্ঞানতার পূর্ণাঙ্গ বিষণ্ণ অন্ধকার রূপটি; সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়িবে জাতির বিস্ময়কর, বিচিত্র, বহুমুখী, গভীর প্রতিভার দিকটিও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অভিজাত লেখকেরা অত্যন্ত করুণার সহিত কৃষকদের কথা লিখিতেন। কৃষকদের তাঁহারা চিত্রিত করিতেন 'দেবতুল্য মানুষ'-রূপে,—শিষ্ট, নিরীহ, কাব্যাবেগময়, স্বপ্নতন্দ্রালু, অদৃষ্ট-অনুগত জীবরূপে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে বোঝানো যে, কৃষকও মানুয এবং এই কৃষকের ক্রীত-দাসত্বের—ভূমিদাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিবার সময় আসিয়াছে। শতাব্দীর শেষার্ধের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরাও এই আদিম মানব-প্রেমের প্রচারধারা চালাইয়া যান। তুর্গেনিভ, তলস্তয় প্রমুখ শিল্পীরা কৃষকদের চিত্রিত করেন উজ্জ্বল কোমল রঙে। মনে হইতে পারে, আরও উৎপাদনক্ষম শ্রমিক লাভের জন্য অভিজাতরা কৃষকের মুক্তি চাহিয়াছিল এবং বুর্জোয়ারা চাহিয়াছিলেন স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুক্ত কৃষকের শক্তি ব্যবহার করিতে।

শতাব্দীর শেষাশেষি শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে আবির্ভাব হইল 'আইনপন্থী মার্কসবাদীদের'। ইহারা ছিল বুর্জোয়া জগতের এক জাতীয় গৃহপালিত কুক্কুট; যে রাজহংসীরা রোমকে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া গল্প আছে, ইহারা ছিল তাহাদের মত। তাহারা বলিত গীতিকাব্যময় কৃষককে 'কারখানার গলন-পাত্রে' রাখিবার প্রয়োজনের কথা। সে সময় স্বৈরতান্ত্রিক সর-কারও 'যুগের দাবি' মানিয়া গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে শুরু করে, শিক্ষক নিযুক্ত হয় গ্রাম্য পুরোহিতরা। এই সব কিছুর সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কৃষক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর পরিবর্তন দেখা যায়। কোমলপ্রাণ, কাব্যময়, স্বপ্নালু কৃষক একেবারেই বিদায় গ্রহণ করে, তাহার স্থলে দেখা দেয় শেখভ, বুনিন প্রমুখ লেখকের রচনায় অসভ্য, পানোন্মত্ত, অদ্ভুত এক কৃষক।

বাস্তবজগতে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি না, কিন্তু বিংশ

শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্যে এই পরিবর্তন সত্যই ঘটিয়াছিল। এই সাহিত্যিক আমূল পরিবর্তন শিল্পীর সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সন্দেহই জাগাইয়া তোলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ করিয়া তোলে 'স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিমানুষের' কণ্ঠস্বরের সহিত তাহার শ্রেণীর কণ্ঠস্বরের সামঞ্জস্য সম্পর্কে। বুঝাইয়া রাজী করাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যে মনোরঞ্জনের চেষ্টা শুরু হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তাই, বিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়ার হাতে কৃষকের সাহিত্যিক চিত্রাংকন মোটেই জমে নাই। ১৯০৫-'৭ সালে এই চিত্রে যাহার প্রতিচ্ছবি সেই কৃষক নিজের ব্যবহারের জন্য জমি হাতে লইবার সংকল্প করিয়া জমিদারদের প্রাসাদভবন পোড়াইতে শুরু করে। কিন্তু, শ্রমিকদের—'ধর্মঘটীদের'—সে সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে, তাহাদের উপর খুব বেশী আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। ১৯১৭ সালে কিন্তু সে শ্রমিকশ্রেণীর আসল রূপটি চিনিতে পারে এবং আমরা জানি, চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়াই মাটিতে সঙীন পুঁতিয়া তাহারা জার্মানীর শ্রমিক-কৃষকদের ধ্বংস করিতে অস্বীকার করে।

ইহাও আমরা জানি যে, 'জারের অধিকারের' অজুহাতে জার্মানবাহিনী রুশ কৃষককে একদম ছিন্নবিক্ষত করিয়া ফেলে এবং এই কৃষকেরই অসাধারণ অভিযান দেখিয়া ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা বিদ্রোহী রুশদের পদানত ও নির্মূল করিবার জন্য নিজেদের কৃষক ও শ্রমিক পাঠায়। উদারপন্থী ও প্রগতিপন্থী রুশ বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই এই পাপ-অভিযানকে সমর্থন ও অনুমোদন জানান। পুঁজিবাদের রক্ষায় তাঁহারা আত্মনিয়োগ করেন, সোবিয়েত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে চালান গোপন চক্রান্ত ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, শ্রমিক-কৃষকদের নেতাদের বিরুদ্ধে শুরু করেন সন্ত্রাসবাদী গুপ্তহত্যার আয়োজন। লেনিনকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলী ছোঁড়া হয়, সেই গুলীই শ্রমিক-কৃষক জনতাকে দেখাইয়া দেয় কে তাহাদের সত্যিকার বন্ধু ও নেতা। এই গুলীটিই তাহাদের চোখে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরে তাহাদের শত্রুরা অন্যায়-অবিচারের কোন্ চরমে পৌঁছিয়াছে, এই গুলীই তাহাদের বুকে জাগাইয়া তোলে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর এই অংশের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ—এ বিদ্বেষ যে একেবারেই অমূলক নহে বুদ্ধিজীবীদের পরবর্তীকালীন বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার প্রমাণ দিয়াছে। এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিলে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা লাভবান হইতে পারেন।

তারপর পনের বছর কাটিয়া গিয়াছে। এই পনের বছরে সোবিয়েত ইউনিয়নে কতখানি কাজ হইয়াছে? যন্ত্রশিল্পে পশ্চাৎপদ একটি দেশ, যাহার আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইউরোপীয় পুঁজিবাদী যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, তাহার উপর আসে স্বদেশের ও ইউরোপের বর্বরদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, যে-সংগ্রামে শ্রমিকেরা লড়িয়াছে সংস্কৃতির অধিকারের জন্য ও বুদ্ধিজীবীরা লড়িয়াছে

বুর্জোয়াদের লুণ্ঠনের অধিকারের জন্য। এই দেশকে শিল্পোন্নত করিবার যে বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হইয়াছে, তাহার কথা এখানে বলিব না।

আমি এখানে শুধু উল্লেখ করিতে চাই, এই পনের বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান গবেষণা-মন্দিরের ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়াছে, বলিতে চাই, এই পনের বছরে এত পরিমাণে খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে সুনিশ্চিত রাখিতে পারে। এ সব কথা সকলেই জানেন। যাহারা নিজেদের পশুস্বার্থে ও অমানুষিক শ্রেণী-সংস্কারে অন্ধ, মন ও ইচ্ছার এই জয়যাত্রা শুধু তাহাদেরই চোখে পড়ে না। দেখিতে পান না শুধু তাঁহারাই যাঁহারা দেখিতে অনিচ্ছুক; আর দেখিতে পান না সেই সাংবাদিকেরা, যাঁহাদের পক্ষে সত্যকে দেখা মালিকেরা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

সোবিয়েত ইউনিয়নে মালিক মাত্র একজন। ইহাই সোবিয়েত ইউনিয়নের মূল কীর্তি এবং এইখানেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র হইতে তাহার পার্থক্য। এই মালিক হইতেছেন লেনিনশিষ্যদের সংগঠনপরিচালিত শ্রমিক-কৃষকদের রাষ্ট্র। যে লক্ষ্যে সে পৌঁছিতে চাহে তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহার বহুজাতিক জনসংখ্যার ষোলো কোটি মানুষের প্রত্যেকের জন্য প্রতিভা ও ক্ষমতার স্বাধীন বিকাশের উপযোগী অবস্থা সে সৃষ্টি করিতে চাহে—অর্থাৎ তাহার নিহিত ও নিষ্ক্রিয় স্নায়ু-মস্তিষ্কের শক্তির সম্মিলিত সমগ্রত্বকে সে সক্রিয় কর্মশক্তিতে পরিণত করিতে চাহে, সৃজনী-শক্তি জাগাইয়া তুলিতে চাহে। ইহা কি সম্ভব?

ইহাই করা হইতেছে। আজ জনসাধারণের সম্মুখে সংস্কৃতির সমস্ত পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ফলে নিজেদের মধ্য হইতে জনসাধারণ লক্ষ লক্ষ প্রতিভা-দীপ্ত তরুণকে প্রেরণ করিতেছে শক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে।

অবশ্য জীবনের ও কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও ভুল হয়, কিন্তু মালিকানা-প্রবৃত্তি, মূঢ়তা, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি যে সকল দোষ আমরা আমাদের অতীতের দায়ভাগ হিসাবে লাভ করিয়াছি, দশ-পনের বছরে তাহা মুছিয়া ফেলা সম্ভব নহে। তথাপি, উন্মাদ অথবা বিদ্বেষে অন্ধ ব্যক্তি ছাড়া একথা অস্বীকার করিতে কেহ সাহসী হইবে না যে, ইউরোপে তরুণ শ্রমিকদের ও সর্বজনীন মানবসংস্কৃতির তর্কাতীত কীর্তিগুলির মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, সেই ব্যবধান আজ সোবিয়েত ইউনিয়নে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কমিয়া আসিতেছে।

পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে যাহা কিছু নিঃসন্দেহে মূল্যবান তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সোবিয়েত ইউনিয়নের জনগণ আজ সাহসের সহিত তাহাদের জাতীয়, অথচ সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংখ্যালঘু জাতিগুলির নবীন সাহিত্য ও সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যে-কেহই এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবেন।

তুর্কী ও তুর্কো-ফিনিশ উপজাতিগুলির নারীদের মুক্তি, জীবনযাত্রার নব

নব রূপের জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের কার্যকলাপের কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সোবিয়েত ইউনিয়নের আইনক্ষেত্রের কার্যকলাপের সৃষ্টিও মেহনতী জনসাধারণের মধ্য হইতে; মেহনতী মানুষের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং তাহাদের কাজের অবস্থার পরিবর্তনের উপরই ইহার ভিত্তি। গণপ্রতিনিধি-পরিষদ শুধু এই অভিজ্ঞতাকে আইনের রূপ দেন, এবং একমাত্র শ্রমজীবী জন-সাধারণের স্বার্থেই তাঁহারা ইহা করিতে পারেন—কারণ দেশে অন্য কোন মালিক নাই।

দুনিয়ার সর্বত্রই আইন শিলাবৃষ্টির মত উপর হইতে আসিয়া পড়ে। এই আইনের দুইটি উদ্দেশ্য থাকে : শ্রমজীবী জনসাধারণের শ্রমশক্তিকে শোষণ করা এবং শারীরিক শক্তিকে মানসিক শক্তিতে রূপান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করা। পারস্পরিক লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা অস্ত্র নির্মাণের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করে, সেই সম্পদ যদি তাহারা জনশিক্ষায় ব্যয় করিত তবে বুর্জোয়া জগৎ এত কদর্য হইয়া উঠিত না। সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঘৃণাই বুর্জোয়াশ্রেণীকে এত সময় ধাতুসম্পদ ও অস্ত্রনির্মাণে ব্যয় করিতে বাধ্য করিতেছে—শ্রমিক-কৃষকের বিরুদ্ধে ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণীর ইহা আর একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

গণপ্রতিনিধি পরিষদের এমন একটি নির্দেশের কথাও কেহ উল্লেখ করিতে পারেন না, মেহনতী মানুষের সাংস্কৃতিক দাবি ও প্রয়োজন মিটানোই যাহার লক্ষ্য ছিল না। লেনিনগ্রাদ পুনর্নির্মিত হইতেছে এবং এ ব্যাপারে যে সকল সম্মেলন হইতেছে তাহাতে যোগ দিতেছেন ডাক্তার, শিল্পী, নার্স, ভাস্কর, লেখক এবং বলা বাহুল্য শ্রমিক ও কারখানার প্রতিনিধিরা। যতদূর জানি, ইউরোপে এ রীতি নাই।

নিজেদের কাজের ভুলভ্রান্তি এবং পুরাতন জীবনযাত্রার সমস্ত দোষত্রুটি, মূর্খতা প্রকাশ করিবার জন্য সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবাদপত্রগুলি প্রচুর স্থান ব্যয় করিতেছে। এই কাজে এতটা স্থান ব্যয় করা আমার মতে বাহুল্য, এমন কি ক্ষতিকর। কারণ, এই বিবরণ মূর্খদের মনে অপূরণীয় দুরাশার সৃষ্টি করিবে। একাজ করিবার সাহস কখনও বুর্জোয়া সংবাদপত্রের হইবে না। নরহত্যার বিশদ হিংসারসাত্মক বর্ণনা অথবা সুকৌশলী জুয়াচুরির রমণীয় কাহিনী দ্বারা অশিক্ষিত পাঠকের মন ও রুচিকে বিকৃত করিতেই তাহারা ভালবাসে।

পনের বৎসরে শ্রমিক-কৃষক জনতা নিজেদের মধ্য হইতে হাজার হাজার আবিষ্কর্তার জন্ম দিয়াছে ও এখনো দিতেছে। এই আবিষ্কারকেরাই সোবিয়েত ইউনিয়নকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হ্রাসে সাহায্য করিয়া ক্রমে ক্রমে জনসাধারণকে আমদানির প্রয়োজন হইতে মুক্তি দিতেছে।

শ্রমিক আজ নিজেকে শিল্পের মালিক বলিয়া মনে করে। তাই, স্বভাবতই দেশের প্রতি তাহার একটা দায়িত্ববোধ জাগিয়া উঠিতেছে; ফলে উৎপন্নদ্রব্যের

উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং উৎপাদন-ব্যয় কমাইবার জন্য তাহার মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হইতেছে।

বিপ্লবের পূর্বে কৃষককে সপ্তদশ শতাব্দীর অবস্থার মধ্যে বাস করিতে হইত। তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত প্রকৃতির খেয়ালের এবং বহু ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত উৎপাদনশক্তিহীন জমির উপর। আজ সে কলের লাঙল, বীজ বপন-যন্ত্র ও ফসলকাটা যন্ত্রে দ্রুত নিজেকে সজ্জিত করিয়া তুলিতেছে, ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতেছে 'ফার্টিলাইজার', তাহার জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছে ছাব্বিশটি কৃষিবিজ্ঞান ভবন। আগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা ছিল না, আজ এই বিজ্ঞানের শক্তি সম্পর্কে, মানুষের বুদ্ধির শক্তি সম্পর্কে, ব্যবহারিক জীবনে সে নিঃসন্দেহ হইতেছে।

যন্ত্র বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত কারখানায় কাজ করিয়া আসিয়া গ্রামের যুবক এক অভিনব জগতের মধ্যে প্রবেশ করে। এই অভিনব জগৎ তাহার কল্পনাকে নাড়া দেয় এবং মনকে জাগাইয়া তোলে, জাগাইয়া তুলিয়া প্রাচীন বন্য কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে এই মনকে উহা মুক্ত করে। জটিলতম যন্ত্র ও যন্ত্রপাতির মধ্যে সে মানুষের বুদ্ধির সক্রিয়তাকে মূর্তিমান দেখিতে পায়। অভিজ্ঞতার অভাবে সে হয়ত দু'একটা জিনিস নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু এই বৈষয়িক ক্ষতি পোষাইয়া যায় তাহার বুদ্ধির বিকাশে। সে দেখে তাহার মত শ্রমিকেরাই কারখানার মালিক, তরুণ ইঞ্জিনিয়ারটি শ্রমিক বা কৃষকের ছেলে। খুব দ্রুত এই বিশ্বাস তাহার মধ্যে জাগিয়া ওঠে যে, তাহার নিকট এই কারখানা এমন একটি বিদ্যালয় যেখানে তাহার ক্ষমতার স্বাধীন বিকাশের সুযোগ রহিয়াছে। যদি তাহার ক্ষমতা থাকে তবে কারখানা হইতে তাহাকে কোন উচ্চতর শিক্ষানিকেতনে পাঠান হইবে, কিন্তু অনেক কারখানা ইতিমধ্যেই নিজেদের কারিগরী উচ্চবিদ্যালয় খুলিয়া দিয়াছে। যে স্নায়ু-মস্তিষ্ক-শক্তির মধ্যে মানুষের জাগতিক ঘটনা উপলব্ধি ও অনুসন্ধানের ক্ষমতা নিহিত রহিয়াছে, সেই শক্তি পারিপার্শ্বিকের সমষ্টিগত সামগ্রিক আঘাতে জাগিয়া ওঠে। এই পারিপার্শ্বিক তাহার পিতার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত থিয়েটার সে দেখিতে যায়, সে পড়ে ইউ-রোপ ও পুরাতন রাশিয়ার বনিয়াদি সাহিত্য, সংগীতসভায়, যাদুঘরে যায়, দেশকে এমনভাবে অনুশীলন করে যেভাবে তাহার পূর্বে আর কেহ করে নাই।

সারা দেশব্যাপী ধাতব ও অ-ধাতব খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানের যে কাজ চলিয়াছে তাহাতে যোগদানের জন্য কিছুদিন আগে কমরেড কুইবিশেভ* 'যুব

---

* ভি. ভি. কুইবিশেভ (১৮৮৮-১৯৩৫) ছিলেন একজন বিশিষ্ট পার্টিকর্মী ও সোবিয়েত রাজনীতিজ্ঞ, সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সভ্য এবং রাষ্ট্র পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান।

কমিউনিস্ট লীগের' সভ্যদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ইহার অর্থ, সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদদের অধীনে কাজ করিয়া লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী কাঁচা মালের নূতন নূতন ঘাঁটি আবিষ্কার করিয়া স্বদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ করিবে নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এই ধরনের কাজ, এই ধরনের বাহিনী সংগঠন পুঁজিবাদী দেশের সামর্থ্যের অতীত; তাহা ছাড়া যে-সব দেশে খুঁজিবার মতও কিছু নাই পুঁজিবাদী কুশাসনে সব সম্পদের তন্ন-তন্ন খোঁজ হইয়াছে, সব সম্পদই লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের রক্তচোষা দস্যুরা যদি আবার সোবিয়েত ইউনিয়নের উপর হানা দেয় তবে সৈন্যবাহিনীকে এমন যোদ্ধাদের মুখোমুখি হইতে হইবে যাহাদের প্রত্যেকেই জানে কি রক্ষার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতেছে।

এই নরঘাতী খেলায় পুঁজিপতিদের মূলধন জনসাধারণের মূঢ়তা। কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে মেহনতী জনসাধারণকে আজ এক সংশোধিত পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে; শাসনের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান জাগিয়া উঠিতেছে তাহাদের মধ্যে। সোবিয়েত ইউনিয়নে নূতন মানুষের জন্ম হইতেছে, তাহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা ইতিমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই নূতন মানুষ মানববুদ্ধির সংগঠনী শক্তিতে বিশ্বাসবান; অথচ এই বিশ্বাসই হারাইয়াছে ইউরোপের বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণীদ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টায় অবসন্ন হইয়া। নূতন মানুষ শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছে যে, সে এক নূতন জগতের স্রষ্টা এবং যদিও তাহার জীবনযাত্রা আজও সহজ নহে, সে জানে এই জীবনযাত্রার অবস্থার পরিবর্তনই তাহার লক্ষ্য, এই পরিবর্তন নির্ভর করিতেছে তাহার যুক্তিচালিত ইচ্ছার উপরই। তাই নৈরাশ্যবাদী হইবার কোন কারণই নাই তাহার। সে তরুণ, শুধু জীবতত্ত্বের দিক হইতে তরুণ নহে, ইতি-হাসের দিক হইতেও বটে। সে এমন এক শক্তি যে-শক্তি সবেমাত্র নিজের পথ ও নিজের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সন্ধান পাইয়াছে। সহজ ও স্পষ্ট কোন নীতির প্রেরণায় এইমাত্র কাজ শুরু করিয়াছে যে-তরুণশক্তি তাহারই সমস্ত দুঃসাহস লইয়া আজ সোবিয়েতের নূতন মানুষ সাংস্কৃতিক বিকাশের কাজে হাত দিয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে আতঙ্কিত স্পেঙ্‌লারদের গোঙানি ও চীৎকার শুনিতে তাহার মজা লাগে; কারণ সে ভালভাবেই জানে, দৈহিক মেহনতের কোটি কোটি ক্রীতদাসের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যন্ত্রবিজ্ঞান এখন পর্যন্ত কোন কাজই করে নাই। সে দেখে, স্বাতন্ত্র্যবাদকে মূলধন করিতে গিয়া বুর্জোয়াদের সর্বনাশ হইয়াছে, অথচ ব্যক্তির বিকাশের জন্য প্রকৃতপক্ষে কিছু তো সে করেই নাই, উপরন্তু, স্বার্থপরতার সহিত ব্যক্তির বিকাশকে বাধা দিয়াছে এমন কতকগুলি ভাবধারার সাহায্যে যেগুলি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অধিকাংশ মানুষের উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর অবৈধ আধি-পত্যকে শাশ্বত সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বুর্জোয়ার পশুসুলভ স্বাতন্ত্র্য-

বাদকে পরিহার করিয়া এই নূতন মানুষ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে যে, সমষ্টিমানুষের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত যে ব্যক্তিমানুষ সে কতখানি অখণ্ড! কারণ সে নিজে এমন একজন ব্যক্তিমানুষ যে স্বাধীনভাবে জনসাধারণের মধ্য হইতে, তাহাদের মেহনতের প্রবাহ হইতে শক্তি ও প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারে। পুঁজিবাদ মানবসমাজকে শৃঙ্খলাহীনতার মধ্যে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। এই শৃঙ্খলাহীনতাই আজ পুঁজিবাদকে এক মহাবিপর্যয়ের গহ্বরমুখে আনিয়াছে। প্রত্যেক সৎ ব্যক্তির চোখেই ইহা আজ স্পষ্ট।

দৈহিক ও নৈতিক বলপ্রয়োগের দ্বারা, রণক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শহরের রাজপথে রক্তপাতের দ্বারা, পুরাতন জীর্ণ অমানুষিক 'ব্যবস্থাকে' ফিরাইয়া আনাই পুরাতন জগতের উদ্দেশ্য। এই 'ব্যবস্থা' ছাড়া পুঁজিবাদ বাঁচিতে পারে না।

নূতন মানুষের লক্ষ্য বর্ণ, জাতি, শ্রেণী ও ধর্মের প্রাচীন কুসংস্কার হইতে মেহনতী মানুষকে মুক্ত করা এবং এমন এক সর্বজনীন ভ্রাতৃ-সমাজের সৃষ্টি করা যে-সমাজের প্রতিটি সভ্য কাজ করিবে সামর্থ্য অনুযায়ী, অর্জন করিবে প্রয়োজন মত।

(১৯৩২)

॥ যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রতি ॥

[এই ভাষণটি প্রদত্ত হয় নাই]

আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে যে-সকল নরনারী সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন আমি তাঁহাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাই। নিজেদের বৈভববৃদ্ধির জন্য এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘৃণার বীজ বপনের জন্য পুঁজি-পতিরা এই যুদ্ধ সংগঠিত করিয়া থাকে।

আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে, আপনাদের প্রতিবাদ মানুষের শত্রুদের পাপবুদ্ধিকে নাড়া দিতে পারিবে তবে সত্যই সুখী হইতাম। এই মানবশত্রুরাই আজ একটি আন্তর্জাতিক ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করিতেছে।

সংখ্যায় নগণ্য, কতকগুলি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ—যাহারা বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াও এখনও বিভিন্ন জাতির জীবন ও ইচ্ছাকে আপনাদের কবলিত রাখিয়াছে—তাহাদের ধ্বংস-চক্রান্তকে শান্তিবাদীরা কথা দ্বারা পরাজিত করিতে পারিবেন, এমন ভরসা অতীত অভিজ্ঞতা হইতে পাই না।

আপনাদের সকলেরই নিশ্চয় মনে আছে, প্রুশিয়ার হাতে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পরাজয়ের পর তেতাল্লিশ বছর ধরিয়া অবিরাম শান্তিবাদ প্রচার করা হইয়াছে। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে বার্থা ভন সাটনারের বিখ্যাত বই "অস্ত্রশস্ত্র বরবাদ হোক" সারা দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীরা পড়িয়াছে ও সমর্থন জানাইয়াছে। কিন্তু এই বই-ই বলুন অথবা লিও তলস্তয়ের কিম্বা যে-কোন ব্যক্তির প্রচারই বলুন, কিছুতেই পুঁজিবাদীদের অভিযান বন্ধ করিতে পারে নাই। উপনিবেশ দখলের লড়াইয়ে তাহারা কোটি কোটি লোককে মারিয়াছে, পিকিংয়ের উপর আক্রমণ,

চালাইয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে চীনের রাজধানী, যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়াছে বল্কানে, বাধাইয়াছে সবচেয়ে নির্লজ্জ যুদ্ধ, ইউরোপীয় যুদ্ধ।

এই যুদ্ধের জন্য ইউরোপীয় শান্তিবাদীদের প্রস্তুত না থাকিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। মানবপ্রেমিকেরা সহজেই এই যুদ্ধের কবলে গিয়া পড়িলেন, একে দাঁড়াইলেন অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে, কোটি কোটি অনিচ্ছুক হত্যাকারীর সারিতে; শান্তির প্রচারকেরা অসভ্যোচিত হিংস্রতায় পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিলেন। অনিচ্ছুক হত্যাকারী বলিতে আমি বুঝাইতেছি শ্রমিক ও কৃষকদের, শ্রেণীশত্রুর শক্তিবৃদ্ধির জন্য পরস্পরকে ধ্বংস করিবার কোন কারণই যাহাদের নাই, অথচ জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করিবার মত চেতনা ও ইচ্ছা যাহাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। আমরা জানি ১৯১৪ সালে চতুর সোশ্যাল জেসুইটের দল, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা ইউরোপের শ্রমজীবী জনগণকে দুর্বৃত্তের মত প্রতারিত করিয়াছিল; তাহাদের চাতুরিতে শ্রমিকেরা ভুলিয়াছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত শত্রু কে এবং কেন, কিসের প্রয়োজনে, এই শত্রু জাতিতে-জাতিতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্ররোচনা দেয়। মানবপ্রেমিকদেরও চোখে পড়ে না, কে মানবসংস্কৃতির প্রকৃত শত্রু। ১৯১৪ সালে নিজেদের শ্রেণীর মানুষের উন্মাদনা সহজেই তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর মানুষের কাছে পৃথিবীতে সোনার চেয়ে মূল্যবান কোন জিনিস নাই। প্রাকৃতিক ঘটনার অনুসন্ধান করিবে যে বিজ্ঞান, মানুষকে উন্নত করিবে যে শিক্ষা, সব কিছুকেই পুঁজিপতিরা সোনায় পরিণত করে, যেমন সোনায় পরিণত করে তাহারা মেহনতী মানুষের রক্তকে। ইহার একটি প্রমাণ, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা হইতে জীববিজ্ঞান বহুদূরে পিছাইয়া আছে।

বুর্জোয়ারা অবশ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান লইয়া কারবার করে, উহা হইতে মুনাফাও তাহারা করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা বিজ্ঞানের যে-শাখাগুলির কাজ সেগুলি রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মত অতখানি অর্থকরী নহে। যেমন, বলবিদ্যাকে প্রয়োগ করা হয় অস্ত্রনির্মাণ শিল্পে, অর্থাৎ ব্যাপক নরহত্যার কাজে।

পুঁজিপতিদের প্রত্যেক জাতীয় উপদলই পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের লুণ্ঠনের বিশেষ অধিকার দাবি করে, পরস্পরের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। সুকৌশলে 'জাতীয় প্রবৃত্তি'কে নাড়া দিয়া মানুষের মধ্যে সেই আদিম প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে যাহা মানুষ হইতে মানুষকে বিভিন্ন শত্রু-শিবিরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। এই প্রবৃত্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে পুঁজি-পতিরা এবং প্রয়োজনমুহূর্তে এই প্রবৃত্তিকে নাড়া দিয়াই তাহারা শান্তিবাদীদের বশম্বদ ভৃত্যে পরিণত করে। বেশ কিছুদিন হইল ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, 'জাতির স্বার্থ' বলিতে এখন জাতির দৈহিক ও মানসিক শক্তিশোষণকারী শিল্পপতিদের একটি দলের স্বার্থকেই বুঝায়। ইহাও আজ অজানা নয় যে, এই দলগুলির প্রত্যেকটিই নিজের 'জাতি'র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। ইহা

প্রমাণ করিবার জন্য কি ঘটনার উল্লেখ করিতে হইবে? আচ্ছা, তাই করিতেছি।

"১৯১২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ফরাসী 'সোসিয়েতে দ্য কার্বুরে'র এক প্রতিনিধি ক্রুপ-কোম্পানির নিকট হইতে ফেরো-সিলিকেটের অর্ডার পান। কামানের ইস্পাত তৈয়ারীর কাজে ইহা লাগে। তাহার পত্রে প্রতিনিধি লিখিয়াছেন: "ক্রুপ জিদ করিতেছেন, আমরা যেন এক হাজার টন মাল কারখানার খুব কাছাকাছি মজুত করিয়া রাখি। এক্ষেত্রে যানবাহনের অসুবিধা ক্রুপ-এর উদ্বেগের কারণ বলিয়া আমার মনে হয় না। জার্মানদের বিশ্বাস আগামী দুই বৎসরের মধ্যে একটি ইউরোপীয় যুদ্ধ অনিবার্য। ইহাই ক্রুপের দাবির মূলে। কারণ সাধারণ সামরিক সমাবেশের সময় প্রয়োজনীয় সরবরাহ যোগাড় করা ক্রুপের পক্ষে খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ...সেইজন্যই ক্রুপ এক হাজার টন ফেরো-সিলিকেট হাতের কাছে রাখিতে চান।"

দেখা যাইতেছে, যুদ্ধ অনিবার্য ভাবিয়া ক্রুপ ফেরো-সিলিকেট কিনিতেছে এ-কথা ফরাসী সোসিয়েত্তে দ্য কার্বুরে জানিত। তৎসত্ত্বেও ফরাসী 'দেশপ্রেমিকেরা' ক্রুপের নিকট কামান তৈয়ারীর জন্য ইলেকট্রোমেটাল বিক্রয় করে। পরে এই কামানই হাজার হাজার ফরাসী সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে। ফরাসী তদন্ত কর্তৃপক্ষের বিবরণীতে জানা যায়, শুধু যুদ্ধের আগে নহে, যুদ্ধের মধ্যে পর্যন্তও, সোসিয়েত্তে দ্য কার্বুরে ক্রুপকে যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিয়াছে।

যে-সময় ফরাসী-জার্মান দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হইতেছে, যখন ফরাসী সংবাদপত্র-জগতের একাংশ জার্মানী ক্ষতিপূরণের ভারবহনে অস্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখাইতেছে, যখন জেনেভায় ফরাসী যুদ্ধ-জীবীদের রণহুংকার ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, ঠিক তখনই 'আই-জি ফার্বেন-ইনডাস্ট্রি'র 'দেশপ্রেমিকেরা' ফরাসী সমর বিভাগকে সোডিয়াম নাইট্রেট্ প্রভৃতি বিস্ফোরক নির্মাণে প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিতেছে। এই ধ্বংসের উপকরণ-গুলি দূরপ্রাচ্যের চীনের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হইবে, কাছাকাছি কোথাও নহে—জার্মান দেশপ্রেমিকেরা নিশ্চয়ই এমন কোন প্রতিশ্রুতি পান নাই। বিশ বছর আগেকার মত আজও যুদ্ধবাজেরা নররক্তের পংকশয্যায় সোনার পাহাড় গড়িবার স্বপ্ন লইয়া প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবেই তাহাদের পাপ কাজ চালাইয়া যাইতেছে।"

আপনারা জানেন, জারশাসিত রাশিয়ায় ছাড়া আর কোথাও পুঁজিপতিরা তাহাদের দায়িত্বহীন পাপখেলার জন্য শাস্তি পায় নাই।

কেন আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে চায় এই শিল্প-সম্রাটেরা? মুনাফা-লালসার মূঢ়তা ও উৎপাদনের বিশৃংখলায় যে অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কবল হইতে পরিত্রাণে যুদ্ধ তাহাদের সাহায্য করিবে বলিয়াই তাহারা মনে করে।

উপমার ভাষায় বলা যায়, মেহনতী মানুষের রক্তে স্নান করিতে তাহারা আবার আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আশা এই রক্তস্নানে তাহাদের স্থবিরত্ব-জনিত অক্ষমতারোগ সারিয়া যাইবে। আমি স্পষ্ট ভাষায় জোরের সহিত বলিতে

চাই, পুঁজিপতিরা উন্মাদ—কদর্য ধনলালসার এই বীভৎস পরিমাণের অন্য কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। অতিভোজন একপ্রকার রোগ। যে অতিভোজী, পাকস্থলী অতিরিক্ত ভর্তি হইয়া গেলেও সে খাওয়া ত্যাগ করে না। পুঁজিবাদী মুনাফা-পাগল, সে আত্মম্ভরিতা রোগে ভুগিতেছে। এই অস্বাভাবিকতাগুলি ছাড়াও সে সাধারণত অজ্ঞ, শকুন-প্রবৃত্তির দ্বারা তাহার মনোবৃত্তি সংকুচিত। 'শিল্পের সংগঠক'—এই নাম তাহাকে দেওয়া সম্পূর্ণ ভুল—শ্রমিকশ্রেণীর দৈহিক শক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ও ইঞ্জিনিয়াররাই শিল্পকে সংগঠিত করেন। যে দুধ দোহাইতে শিখিয়াছে, তাহাকে আমরা দুধের আবিষ্কারক বলি না। ফোর্ডের মত কোন পুঁজিপতির জীবনী অথবা আত্মজীবনী পড়িলে মনে হয়, তিনি নিজেকে গরু দোহনের পদ্ধতির নহে, দুধেরই আবিষ্কর্তা বলিয়া মনে করেন। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী এবং কলকারখানা, খনি ও রেলের শ্রমিকেরা অবিশ্রাম মেহনত ও সৃজনী কার্যের মধ্য দিয়া পুঁজিপতির মনে এই আত্মম্ভরী বিশ্বাস প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে ও এখনও দিতেছে। তাহার মনে হয়, তাহারা যা' কিছু করিতেছে সবই সে নিজেই করিতেছে; কারণ সে তাহাদের টাকা দেয়। সে টাকা অবশ্য সংস্কৃতির প্রকৃত মালিক যাহারা সেই শ্রমিকদের নিকট হইতেই লুণ্ঠিত। যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহাকে সপ্রমাণে উপস্থিত করিতে যাওয়া সত্যই অস্বস্তিকর।

আমি বলিতেছি সর্বজনীন মানবসংস্কৃতির আসল স্রষ্টাদের কথা, যাহারা কর্মকে জ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন, মেহনতের কাব্যের প্রতি যাঁহাদের সংবেদনা অত্যন্ত গভীর, বিজ্ঞান ও শিল্পের তর্কাতীত ঐশ্বর্যের জন্য সমগ্র মানবসমাজ যাঁহাদের নিকট ঋণী; আমি বলিতেছি সেই সব মানুষের কথা, বুর্জোয়াশ্রেণীর কদর্য স্বর্গ যাঁহাদের প্রলুব্ধ করিতে পারে না, যাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পান আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর সৃজনীশক্তি কত দুর্বল, কত নিঃস্ব, তাহাদের গড়া জীবন কত ঘৃণ্য, সৃজনী প্রতিভার আধারস্বরূপ জনসাধারণের জীবনকে কেমন করিয়া উহা বিষাক্ত ও দুর্নীতি-দুষ্ট করিয়া তোলে।

সংস্কৃতি জগতের এই দিক্‌পালদের সম্মুখে ইতিহাস আজ দৃঢ়ভাবে একটি সহজ, সরল প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছে : আজ কিসের প্রয়োজন?—একটি জাতীয় পুঁজিপতি উপদলের বিরুদ্ধে অপর একটি উপদলের অন্তহীন পাপযুদ্ধ, অথবা, সমস্ত দেশের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর যুদ্ধ,—যে যুদ্ধ রক্তাক্ত নরহত্যাকে চিরদিনের জন্য অসম্ভব করিয়া তুলিবে, কোটি কোটি স্বাস্থ্যবান মানুষকে ও তাহাদের মেহনতের ফলকে ধ্বংসের হাত হইতে চিরদিনের মত রক্ষার ব্যবস্থা করিবে?

সংস্কৃতির দিক্‌পালেরা ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবেন কাহাদের সহিত পা ফেলিয়া—নিজস্বার্থের জন্য যাহারা তাঁহাদের সৃজনীশক্তিকে শোষণ করে, এই শোষণের ফলে ও বৈষয়িক সংস্কৃতির দ্রব্য-সম্ভারের প্রাচুর্যে সংস্কৃতি সম্ভোগ যাহাদের তৃপ্তির মাত্রা ছাড়াইয়া অরুচির পর্যায়ে গিয়াছে, মানস-সংস্কৃতির বিকাশের প্রয়োজন যাহাদের পক্ষে অনেক আগেই ফুরাইয়া গিয়াছে, এবং মানস-

সংস্কৃতির বিকাশকে যাহারা বাধা দিতেও শুরু করিয়াছে—সাংস্কৃতিক দিক্-পালেরা কি তাহাদের সাথেই পা মিলাইয়া অগ্রসর হইবেন?

অথবা পায়ে পা মিলাইয়া অগ্রসর হইবেন সেই নূতন শ্রেণীর সহিত, ইতিহাস যে-শ্রেণীকে সর্বসম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে এবং যে-শ্রেণী ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ নরনারীর এক দেশে ইতিমধ্যেই ক্ষমতা হাতে লইয়াছে?

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের 'সামাজিক জেসুইট' নামটি খুব যোগ্য নাম। ইহারা শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী। পুঁজিবাদী-প্ররোচিত শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী জাতীয় যুদ্ধ ইহাদের কাছে অনেক কম বিপজ্জনক। তাহাদের ভয় শ্রেণীসংগ্রামকে, কারণ শ্রেণীসংগ্রাম তাহাদের অনিবার্যভাবেই আনিয়া ফেলিবে নোস্‌কে নামক ব্যক্তিটির ঘৃণিত অবস্থার মধ্যে। নোস্‌কের 'রক্তলোভী কুকুর' নামটি খুবই যোগ্য নাম।

১৯১৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা জগৎসমক্ষে একথা স্পষ্ট-ভাবেই জানাইয়া দিলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও রক্তের কারবারীদের আন্তর্জাতিকতার সহিত তাঁহাদের আন্তর্জাতিকতার কোন প্রভেদ নাই। 'মোস্ট ক্রীশ্চান চার্চ'-প্রধানের মুখপত্র 'ল্যা'সারভাতোরে রোমানো'র সহিত ইঁহারাও যদি 'রাশিয়া হইতে উদ্ভূত আত্মিক উচ্ছৃংখলতার বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় ইউরোপের সমস্ত শক্তিকে সংহত করিবার প্রয়োজন'কে স্বীকার করিয়া লন তাহা হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মোটেই আশ্চর্য হইব না।

উচ্ছৃংখলতা বলিতে এ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্যকেই বুঝানো হইতেছে। উচ্ছৃংখলতা এখানে সোবিয়েত ইউনিয়নের মানসশক্তির সেই বিকাশ যে-বিকাশের গতিবেগের পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে: সোবিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৯ সালে ইঞ্জি-নিয়ার ও কারিগরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৭,০০০ ও ৫৫,০০০; ১৯৩২ সালে উহা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬৩,০০০ ও ১৩৮,৫০০ এ। ১৯৩২ সালে সোবিয়েত ইউনিয়নে একমাত্র মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ রহিয়াছে ৪০০টি, কারিগরী শিক্ষালয় রহিয়াছে ১,৬০৯টি—ছাত্রছাত্রী মোট পঁচিশ লক্ষ। কিন্তু এত ছাত্রছাত্রী সত্ত্বেও সোবিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানকর্মীর চাহিদা মিটিতে এখনো বেশ কিছুদিন দেরী হইবে। কিন্তু জার্মানীর কথা ধরুন; সেখানে রাইখ্‌স্‌ভারব্যান্ড ডার আঙ্গেস্‌টেলটেন আর্‌ৎস্‌তে হাসপাতালগুলিতে বিদেশী ডাক্তার নিয়োগের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট অভিযোগ করেন, যদিও দেখা যায় এই বিদেশী ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ১৪৫। ইহাতে অবশ্য বুঝায় না যে, জার্মানীর স্বাস্থ্যব্যবস্থা আদর্শস্থানীয়, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে, ১৪৫ জন জার্মান চিকিৎসকের স্বদেশে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা নাই।

ইউরোপীয় জীবনের মর্মান্তিক বিশৃংখলার মধ্যে অবশ্য ইহা একটি সামান্য ও নগণ্য ঘটনা। কিন্তু ইহার পশ্চাতে আর একটি ঘটনার ছায়া দুলিতেছে। জার্মানীর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বৎসরে বাহির হয় ৪০,০০০ গ্রাজুয়েট,

কিন্তু সরকার কাজের ব্যবস্থা করিতে পারেন মাত্র ৬,০০০ এর। মানসিক শক্তির এই 'অতি-উৎপাদন' সমগ্র ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আপনারা জানেন এই শক্তি মেহনতী মানুষের কাজে আসে না, মেহনতী মানুষ এই শক্তিকে গ্রহণ করিতে পারে না। 'অতি উৎপাদন' ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বিশ্বের সাংস্কৃতিক শক্তিনিচয়ের যোগ্য বণ্টন অসম্ভব, অথচ সংস্কৃতির অগ্রগতির পক্ষে ইহা একান্ত অপরিহার্য।

বর্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে সোবিয়েত ইউনিয়নের ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর প্রত্যেক সক্ষম নরনারীই কাজে নিযুক্ত; সেখানে বেকার নাই, এমন কি শ্রমশক্তির ঘাটতি চলিতেছে। দেশের একমাত্র মালিক শ্রমিকশ্রেণী বিরাট সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাগুলিকে সাহসের সহিত সমাধান করিতেছে : সাগরের সাথে সাগর মিলাইতেছে খাল কাটিয়া, ঊষর স্তেপ-ভূমিতে সেচের জল আনিতেছে নদীর গতি বদলাইয়া, বিদ্যুৎশক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে সারা দেশ, রাস্তা বসাইতেছে মাইলের পর মাইল, গড়িয়া তুলিতেছে কত না বিরাট বিরাট কলকারখানা। এই পনের বছরে যে কীর্তি তাহারা স্থাপন করিয়াছে তাহা সত্যই অবিশ্বাস্য। কিন্তু, অ্যাড্‌লারদের মতে, অন্য পেশাধারী পাণ্ডা-পুরোহিতদের মতে, অস্বস্তিকর সত্যের সম্মুখে যাহারা স্বেচ্ছায় চোখ বুজিয়া থাকে তাহাদের মতে ইহাই বিশৃঙ্খলা; কিন্তু ব্যবস্থাপনাকার্যে পুঁজি-বাদীদের চেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দক্ষতা যে বেশী, এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। ডাকাতদের কেহ কেহ পর্যন্ত এই সত্যকে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু বাকী ডাকাতদের বিশ্বাস হইতেছে না—শুধু ইন্ধন পড়িতেছে শ্রেণীবিদ্বেষ ও পাশবিক অমানুষিকতার আগুনে।

যদিও সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদীদের চেয়ে আরও যুক্তি ও বুদ্ধিসম্মতভাবে তাহাদের অর্থনৈতিক বিষয়কে পরিচালিত করিতেছে, তথাপি বৈষয়িক সংস্কৃতির বিকাশকে তাহারা তাহাদের একমাত্র ও চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে না। দেশের সমৃদ্ধি সাধনের মধ্যেই, অর্থাৎ আত্মসমৃদ্ধির মধ্যে তাহাদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ নহে। সে বোঝে ও জানে যে, বৈষয়িক সংস্কৃতির প্রয়োজন তাহার আত্মিক ও মানসিক সংস্কৃতির বিকাশের ভূমি ও ভিত্তি হিসাবেই। বিশ্বের জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মহান তত্ত্বই তাহার সৃজনী শক্তিকে পুষ্টি ও শক্তি যোগাইতেছে।

কী তত্ত্ব প্রচার করে পুঁজিবাদ? পুঁজিবাদ রোপণ করে সারা দুনিয়ায় বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিবিদ্বেষের বীজ। আজ 'লীগ অব নেশনস্' নামে এক কথার-দোকান খুলিয়া বসিয়াছে পুঁজিবাদীর দল। মাসের পর মাস পুঁজিবাদের বশম্বদ ভৃত্যেরা এই দোকানে বসিয়া ইউরোপীয় নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজন লইয়া বাক্যজাল করিয়া চলিয়াছে কিন্তু আপনারা জানেন এদিকে জাপানের পুঁজি-প্রকাশ্যে ও নির্বিবাদে চীনকে লুটিয়া চলিয়াছে, দখল করিয়াছে

মাঞ্চুরিয়া, হত্যা করিয়াছে ও করিতেছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে। সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক বিপুল সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে সাংহাই-তে।

এই পাপ অভিযানও শান্তিবাদীদের মনে ক্রোধ ও কণ্ঠে প্রতিবাদ জাগাইতে পারে নাই, এমন-কি মনোযোগ পর্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। পুঁজিপতিদের এই পাপ অভিযান শুধু সাংহাই ও মাঞ্চুরিয়ায় নহে, এ অভিযান আজ চলিয়াছে সারা দুনিয়ায়, ইউরোপের সমস্ত শহরে, চলিয়াছে মানবতাবাদী, শান্তিবাদীদের চোখের উপর। ব্যাপারটি তাঁহাদের অজানা নয়, তাঁহারা জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন শ্রমিকেরা না খাইয়া মরিতেছে তখন পুঁজিপতিরা গম ব্যবহার করিতেছে রেল-ইঞ্জিনের বয়লারের জ্বালানী হিসাবে। এই ভয়াবহ ঘটনা চোখের উপর দেখিয়াও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের মোহভঙ্গ হয় না। জার্মান শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় প্রতিদিন রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটিতেছে, নিহত হইতেছে শ্রমিকেরা, চলিতেছে গৃহযুদ্ধের ছোটখাট মহড়া। এই গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা দিতেছে বুর্জোয়ারা, শুধু প্ররোচনা নহে, ক্রমবর্ধমান মানববিদ্বেষের সহিত ইহাতে ইন্ধনও যোগাইতেছে তাহারা। ইহাতে শান্তিবাদীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে? পুঁজিবাদী উচ্ছৃঙ্খলতা ও মানববিদ্বেষের বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কি আছে তাহাদের? তাহাদের চোখের উপরই অবিশ্রাম কাজ করিয়া যাইতেছে 'মারণাস্ত্র' আন্তর্জাতিক। আমেরিকার ইউরোপীয় খাতকদের সামরিক ব্যয়ের এক ফর্দ ছাপিয়াছেন 'ওয়াশিংটন পোস্ট'।*

সরকারী সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩০ সালে গ্রেট বৃটেন সামরিক খাতে ব্যয় করিয়াছে ৬০৮,০০০,০০০ ডলার; ফ্রান্স—৫৪৭,০০০,০০০ ডলার; ইতালী—৩২২,০০০,০০০ ডলার; পোল্যান্ড—১২৩,০০০,০০০ ডলার; রুমানিয়া—৬৭,০০০,০০০ ডলার; যুগোস্লাভিয়া—৪৭,০০০,০০০ ডলার; চেকোস্লোভাকিয়া—৪১,০০০,০০০ ডলার; বেলজিয়াম—২৩,০০০,০০০ ডলার। অপর সূত্র অনুসারে এই একই বছরে পুনরস্ত্রসজ্জায় জাপান ব্যয় করিয়াছে ২৪০,০০০,০০০ ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট উঠিয়াছে ৭০৯,০০০,০০০ ডলারে। আমরা জানি, ১৯৩১ সালে সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সামরিক বাজেট কমা দূরে থাকুক আরও বাড়িয়াছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে সামরিক ব্যয় বরাদ্দ আরও বাড়ান হইয়াছে।

যুদ্ধশিল্পগুলিতে দ্রুততম গতিতে কাজ চলিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, দূরপ্রাচ্যের সামরিক অভিযানের ফলে যুদ্ধাস্ত্রশিল্পের বাজার তেজী হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এ সম্পর্কে বার্লিনের 'ডয়েস আলেমাইন জাইতুং' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে : "দেখা যাইতেছে, সত্যকার ধনশালী দেশগুলি যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত থাকে, মধ্যবর্তী দেশগুলি তখন বেশ ভাল কারবার চালায়।"

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই ব্যাপক নরহত্যার একটা বিপুল আয়োজন চলিতে পারে, শহর নগর ও মানবশ্রমের অন্যান্য কীর্তির ধ্বংসলীলা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করি : পুঁজিবাদী 'সভ্যতা' কি আজ এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? ইহা কি সমর্থনযোগ্য? এই পাপের উপর প্রলেপ বুলাইতে পারে এমন শয়তানের কথা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু, দেশের শ্রমজীবীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইলে কি হইবে তাহা কল্পনা করিতে পারি। কল্পনা করিতে পারি, কারণ, আমি সোবিয়েত ইউনিয়নের একজন নাগরিক, আমি নাগরিক সেই দেশের যেখানে পুঁজিপতি নাই এবং যেখানে নব সংস্কৃতির গঠনের কাজে শক্তি প্রয়োগের সর্বক্ষেত্রেই সত্যকার কঠিন অবস্থার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় শ্রমজীবী মানুষ বেকার হইয়া না খাইয়া মরিতেছে এবং যখন পুঁজিবাদী দেশের উপনিবেশগুলিতে লুণ্ঠনকারীর শোষণের হাত হইতে মুক্তিলাভের সংগ্রামে তাহারা মেশিনগানের গুলীতে প্রাণ দিতেছে তখন দেশপ্রেমিক-দের চিন্তায় তাহাদের একেবারেই স্থান নাই।

কেন আজ শান্তিবাদীরা উৎকণ্ঠিত, কি তাঁহারা চান তাহা বুঝা সত্যই কঠিন। হয়তো তাঁহাদের উৎকণ্ঠার একমাত্র কারণ, তাঁহারা অর্থাৎ শান্তিবাদী ও মানবতাবাদীরা সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছেন এবং সেনাপতিরা শাসাই-তেছেন আগামী ধ্বংসযজ্ঞেও এই নিরীহেরা নিষ্কৃতি পাইবে না।

সাধারণভাবে ইহাই ধারণা হয় যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া মানবপ্রেমিকেরা ঘটনার পশ্চাতে ও ইতিহাসের খিড়কিদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে আত্মরক্ষা ও শান্তি। যেদিন সেই অনিবার্য শেষ যুদ্ধ শুরু হইবে, যে-যুদ্ধ সমস্ত জাতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে শেষ করিবে, সেদিন এই শান্তিবাদীরা কি করিবেন তাহা কল্পনা করা কঠিন।

আমরা জানি, জাতীয়তাবাদীদের বিদ্বেষ আজ তাহার সমস্ত হিংস্রতা লইয়া সোবিয়েত ইউনিয়নের শিয়রে উদ্যত। একথাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদি পুঁজিপতিরা বিশ্বাস করিত সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী যাহা কিছু করিতেছে সবই এক 'ব্যর্থ পরীক্ষা' ছাড়া কিছুই নহে, তাহা হইলে সোবিয়েত দেশের জনসাধারণকে এত হিংস্রভাবে ঘৃণা করিবার কোন কারণ তাহাদের থাকিত না। তাহারা শান্তমনে নিজেদের পারস্পরিক লুণ্ঠনের ও নিজেদের দেশের ধ্বংসের কাজ চালাইয়া যাইত, অপেক্ষায় থাকিত 'ব্যর্থ পরীক্ষা' চূড়ান্তভাবে ভাঙিয়া পড়িবার, তারপর ঝাঁপাইয়া পড়িত সোবিয়েত ইউনিয়নের উপর। কিন্তু পরীক্ষা স্পষ্টই সাফল্যের পথে চলিয়াছে, এবং তাহারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে এই সাফল্যের কথা স্বীকার করিতেছে। তাই ফ্রান্স আবার মস্কো-অভিযানের স্বপ্ন দেখিতেছে।

সোবিয়েতবিরোধী যুদ্ধ প্রচার ফ্রান্সেই সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। যে-জাতি যুদ্ধ চাহে না কিন্তু বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার প্রস্তুতি চালাইতেছে

সেই জাতির বিরুদ্ধে ফরাসীরা যুদ্ধাভিযান চালাইবার বিরোধী। ইহা সত্যই আশা ও আনন্দের কথা। এই জাতি দৃঢ় সংকল্প লইয়া সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে এমন এক কাজে সর্বমানবের পক্ষেই যাহার গুরুত্ব তর্কাতীত। শুধু মেহনতী মানুষের শত্রুরা, শুধু মেহনতী মানুষের মেহনতের শোষকেরা, যাহাদের কার্যকলাপের পাপিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই ও যাহাদের চক্রান্ত আরও বেশী পাপিষ্ঠ, শুধু তাহারাই এই জাতির অগ্রাভিযানে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

আমি যতদূর বুঝিয়াছি, এই চক্রান্তজালকে ছিন্ন করিবার উপায় নির্ধারণ করাই এই মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য। আর একটি ব্যাপক নরহত্যার সংগঠন-কারীদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়িতে হইবে, সে-সম্পর্কে আমার মত আমি খুব স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছি। আমি এ ছাড়া আর পথ দেখি না। কথা দ্বারা পেশাদার খুনীদের হৃদয় পরিবর্তন করা যায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

বক্তৃতার উপসংহারে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা প্রচলিত নিয়ম। সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য (শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রমিক-দের ধরিতেছি) আমি এই কামনা করি, তাঁহারা যেন যত দ্রুত সম্ভব এই কথাটি বুঝিতে পারেন যে, প্রতিটি পুঁজিবাদী যুদ্ধই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর কামনা করি, এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের আয়োজনে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কায়িক ও মানসিক মেহনতের দ্বারা শ্রমজীবীরা যে সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে এই শ্রেণীশত্রুরা আজ তাহা ধ্বংস করিতেছে।

(১৯৩২)

॥ "সৈনিকসুলভ ভাবধারা" ॥

কিছুদিন আগে বার্লিনে একটি স্তালহেল্‌ম প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক ছিলেন সেলদ্‌তে নামক একজন মদ্যব্যবসায়ী। ইনি বলেন, "স্তালহেল্‌ম প্যারেড দেখিয়া বুঝা যায়, জার্মানীর মধ্যে সৈনিকের মনোভাব আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। সৈনিকের ভাবধারা ও সৈনিকের কার্যকলাপের আবার জার্মানীতে কদর হইতে শুরু করিয়াছে।"

কয়েক বছর আগের লেখা—কাহার লেখা মনে নাই—দার্শনিক ফিক্‌টে'র একখানি জীবনীতে বলা হয়, "জার্মানী দার্শনিকদের দেশ; ফ্রান্সে যেমন নীতি নির্ধারণ করেন আইনজীবীরা, জার্মানীতে তেমনই দার্শনিকেরাই জাতির মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন।" কিন্তু আজ দেখিতেছি জার্মানীতে নীতি নির্ধারণ করিতেছে মদ্য ব্যবসায়ীরাই। ইহা অবশ্য নূতন কিছু নহে এবং ব্যাপারটি খুব খারাপ হইলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমরা জানি বুর্জোয়া দার্শনিক প্রজ্ঞার পূজারী, 'জগতকে ব্যাখ্যার জন্য' অথবা জগৎ সম্পর্কে মানসিক যুক্তিবিচারের কৌশল ব্যাখ্যার জন্য তিনি মাথা খাটাইয়া থাকেন। ইহাই তাহার পেশা এবং যাঁহারা জগতের পরিবর্তন ঘটান সেই সব কর্মযোগীদের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া বুর্জোয়া দার্শনিককে যদি 'নিষ্কর্মা' বলা যায় তবে নিশ্চয়ই তাহাকে অসম্মান করা হয় না। মদ্য ব্যবসায়ী দার্শনিক নহে, সে কর্মীপুরুষ, যুদ্ধই তাহার কর্ম।

'যোদ্ধার কার্যকলাপ' বলিতে কি বুঝা যায় তাহা সহজেই অনুমেয়: ১৯১৪-১৮ সালের এই কার্যকলাপের রক্তাক্ত বিভীষিকার কথা মানুষ কখনও ভুলিবে না; তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আমস্টার্ডামের যুদ্ধবিরোধী মহাসম্মেলনে

প্রতিফলিত জনসাধারণের মনোভাব। সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউ-রোপীয় হস্তক্ষেপের পাপ অভিযানের বিভীষিকার কথাও কেহ ভুলিবে না। সম্প্রতি চা-পেই ধ্বংস করিয়া জাপানীরা আর একবার আমাদের 'যোদ্ধার কার্যকলাপের' কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আমরা প্রায় প্রত্যহই এই 'যোদ্ধার কার্যকলাপের' পরিচয় পাইতেছি।

কিন্তু 'যোদ্ধার ভাবধারা' বলিতে কি বুঝা যায়? যতদূর জানি, দর্শনের ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ নাই এবং 'যোদ্ধার ভাবধারা' যে একটি অসম্ভব বস্তু ইহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে, কারণ চিরদিন এবং সর্বত্র সৈনিককে শেখানো হইয়াছে চিন্তা না করিতে এবং চিন্তা করিলে সে শাস্তি পাইয়াছে।

জারের সেনাবাহিনীতে সৈনিকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল জার্মানী হইতে হুবহু নকল করা। 'আমি জানি না'—এই সহজ সত্য কথায় সেনাপতির প্রশ্নের জবাব দেওয়া সৈনিকের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাহার জবাবের বাঁধা জবানী ছিল, "আমি জানিতে পারি না।" বুর্জোয়া সভ্যতার ঘৃণ্যতম অবদান 'সামরিক নিত্য-কর্ম পদ্ধতির' একচুল বাহিরের কোন কিছু জানিবার ক্ষমতা ও অধিকার বিসর্জন দিতে সৈন্যদের বাধ্য করা হইত এই বাঁধা গতের জবানীর দ্বারা।

কোন মানুষ যদি একবার সামরিক উর্দির মধ্যে বাঁধা পড়িত, তখন তাহার মাথার মধ্যে এই কথাটি ঢুকাইয়া দেওয়া হইত যে, ফৌজী কানুনের বাহিরে কোন কিছু জানিবার যোগ্যতা ও অধিকার তাহার তো নাই-ই, অধিকন্তু 'সৈনিক বলিয়াই' সে জানিতে পারে না, জানিবার ক্ষমতা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বুর্জোয়া ফৌজের সৈনিক এমন এক মানুষ—এমন এক কৃষক বা শ্রমিক—শ্রেণীশত্রু যাহাকে নিজের কবলিত রাখিবার জন্য বুদ্ধিহীন জড়যন্ত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপীয় সৈনিক তাহার শত্রুর হাতে বন্দী, শত্রুর দ্বারা সম্মোহিত, ভিখারীর বেতন ও ভিখারীর রুটি লইয়া শত্রুর জন্য খাটিয়া মরিতেছে। অথচ এই সৈনিকেরাও মানুষ, সেনাবাহিনীতে তাহাদেরই ভরণ, পোষণ ও অস্ত্রসজ্জার জন্য তাহাদেরই পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নীরা খাটিয়া মরিতেছে ও ট্যাক্সের গুরুভার যোগাইয়া চলিয়াছে। পিতা ও ভ্রাতাদের এই জীবন যখন দুঃসহ হইয়া ওঠে তখন বনিয়াদী শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে তাহারা 'বিদ্রোহ' করে এবং সৈনিকেরাই তখন এই 'বিদ্রোহীদের' উপর গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। এবং গুলী তাহারা চালায়—স্পষ্ট হইয়া ওঠে মূঢ়তার কোন্ অতলে পুঁজিপতিরা তাহাদের টানিয়া নামাইয়াছে।

প্রায় ছয় মাস ধরিয়া পুঁজিপতিদের সর্বকর্মবিশারদেরা জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ লইয়া গলাবাজি করিতেছে। ইউরোপীয় সেনাবাহিনীগুলির সৈনিকদের কানে এ কলরব একেবারেই পৌঁছিতেছে না। অথচ তাহারাই এই প্রহসনকে বাস্তবে পরিণত করিতে পারিত। অস্ত্রসজ্জার ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, কামান ও ট্যাঙ্ক নির্মাণে চলিয়াছে ধাতুর অর্থহীন অপচয়, পুঁজিপতিরা এমন এক বিশ্ব-ব্যাপী নূতন ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করিতেছে কোটি কোটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রাণোজ্জ্বল মানুষ যাহাতে শবের স্তূপে পরিণত হইবে, আরও কয়েক কোটি

হইবে বিকলাঙ্গ। এ সম্পর্কে সৈনিকেরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য উপস্থিত করিতে পারিত। কিন্তু সৈনিককে এমন মানুষে পরিণত করা হইয়াছে যে মানুষ জানে না, চিন্তা করে না। মদের কারবারী মিথ্যাকথা বলিয়াছে : সাধারণ সৈনিকের কোন 'যোদ্ধার চিন্তাধারা' নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীগুলিতে যখন শ্রমিকের সংখ্যা কম নহে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহারা ব্যারাকে ব্যারাকে তাহাদের শ্রমিকশ্রেণীগত, ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয় কাজ করিতেছে, এবং বুর্জোয়া সৈনিকেরা চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছে।

জগতে মাত্র একটি ফৌজই আছে যাহার সৈন্যদের চিন্তা করা অধিকার ও কর্তব্য। সে ফৌজ লালফৌজ, আমাদের ফৌজ। এ ফৌজের সৈনিকেরা বলে না, 'আমরা জানিতে পারি না।' জানা তাহাদের অধিকার, সবকিছু অথবা যথা-সম্ভব জানা তাহাদের কর্তব্য। এবং আসল জিনিসটি তাহারা জানে—কে তাহাদের শত্রু, কোথায় তাহাকে পাওয়া যাইবে। তাহারা জানে সম্পত্তির মালিকই তাহাদের শত্রু এবং এই শত্রু অন্যের মেহনত শোষণ করিয়া বাঁচিতে চায়, বাঁচিতে চায় শুধু নিজের জন্য—যাপন করিতে চায় মাকড়সার পরস্বগ্রাসী জীবন। লালফৌজের সৈনিক নিজের দেশের নাগরিক, নিজের দেশের মালিক, নিজের দেশের রক্ষাকর্তা, নিজের ভবিষ্যতের স্রষ্টা।

* * *

প্রধানত কোন্ শ্রেণী হইতে স্তালহেলম্-এর সভ্য সংগ্রহ শুরু হয়, জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব পাইয়াছিলাম : '১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে যাহারা নিহত হইয়াছে অধিকাংশ সভ্য তাহাদেরই সন্তান। পিতাকে যাহারা হত্যা করিয়াছে ও পিতৃ-ভূমিকে কলুষিত করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাহে ইহারা।' ফ্রান্সেও অবশ্য এমন বহু তরুণ আছে এবং ইউরোপীয় যুদ্ধে যে-সকল দেশ লড়িয়াছে সব দেশের সরকারই 'প্রতিশোধকামীদের' শিক্ষিত করিতেছেন একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলাইয়া দিবার জন্য। যুদ্ধে পিতৃহীনদের উত্তেজিত করা হইতেছে যুদ্ধে পিতৃহীনদের বিরুদ্ধে। এই উত্তেজনা যাহারা যোগাইতেছে পুঁজি-পতিদের সেই পেয়াদারা, সেই দুর্নীতিদুষ্ট, ভণ্ড, প্রতারক সংবাদপত্র-মালিকেরা ও মসীজীবী গুণ্ডারা তরুণদের নিকটে এই সহজ সত্যটিকে গোপন রাখিতেছে যে, নরহত্যার ক্ষেত্রে যে নিজের হাতে হত্যা করে সে তত দোষী নয় যত দোষী নরহত্যার উস্কানীদাতার পাপকলুষিত মন। আর আজ এই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করিবার সাহস কাহারও নাই যে, এই উত্তেজনা যোগাইতেছে পুঁজিপতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিগ্রহ পূজা যাহার পেশা; অতৃপ্ত লালসা ও ঈর্ষায় এবং ধনসম্পদ সঞ্চয়ের উন্মাদ আবেগে অন্ধ এই কুৎসিত বিকলাঙ্গ জীবটির দেহ মানুষের মত, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের সহিত তাহার সাদৃশ্য ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

এই 'যুদ্ধে পিতৃহীনদের' ও 'পিতৃহত্যার প্রতিশোধকারীদের' অবস্থা অধঃপতিত দুষ্ট বালকদের হাতে টিনের সেপাইয়ের মত। এই খেলনা যখন আর তাহাদের ভাল লাগে না, তখন টিনের সেপাইয়ের মাথা ও পা ভাঙিয়া তাহারা আনন্দ পায়।

টনের সেপাই ও 'প্রতিশোধকামীদের' মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, 'প্রতিশোধকামীদের' মাথাটি টানিয়া ছিঁড়িবার পূর্বে সে মাথাটি বিষাক্ত আবর্জনায় ভর্তি করা হয়। তাহাকে বিশ্বাস করানো হয় যে, পিতৃভূমি বলিয়া একটি পদার্থ আছে এবং সেই পিতৃভূমি তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। কামান, মদ ও অন্যান্য 'সাংস্কৃতিক' মূল্যেমানের প্রস্তুতকারী, দায়িত্বহীন, অমানুষ রক্তপায়ীদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি এই পিতৃভূমি। শ্রমিকশ্রেণীর দৈহিক শ্রমশক্তির উচ্ছৃঙ্খল শোষণ আজ ইউরোপীয় 'পিতৃভূমির' বুকে ব্যাপক বেকারী ও অনাহারের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে; ইহার ফলে শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য, 'জাতির' স্বাস্থ্য, ভাঙিয়া পড়িতেছে। বেকারীর ফল দাঁড়াইতেছে এই ঃ একদিনেই, ১০ই আগস্ট তারিখে, রান্নাঘরের বিষাক্ত গ্যাসে আত্মহত্যার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য বার্লিনে পনের বার ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও জলে ডুবিয়া, গলায় ফাঁস দিয়া, জানালা হইতে লাফাইয়া ও গুলীতে আত্মহত্যা। এ সব আত্মহত্যার একমাত্র কারণ বেকারী।

'বার্লিনের পক্ষে ইহা এমন একটা কিছু নহে।'—কথাগুলি বলিয়াছিলেন এমন একজন বুদ্ধিজীবী পুঁজিবাদ যাহার মনকে অসাড় করিয়া দিয়াছে, বলিয়াছিলেন সেই দলেরই একজন লোক যাঁহারা নিজেদের প্রভুর মূঢ়তা, পাপিষ্ঠতা ও অমানুষিক রূপটি চিনিয়াও 'বিত্তবান ব্যক্তি' বলিয়া তাহার পদসেবা করিয়া যান। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী আন্তর্জাতিক দলের সহিত মিশিয়া প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস এই জড়বুদ্ধি বুদ্ধিজীবীর নাই, অথচ তাহার কাণ পাতিয়া শোনা উচিত ইতিহাস ইতিমধ্যেই কঠোরকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে মূঢ়তার অন্ধকারে পচিতে দিবার অধিকার তাহার আছে কিনা?

প্রায় প্রত্যেক বুর্জোয়া দেশের আইনের একটি ধারা আছে—ধারাটির কথাগুলি আমার মনে নাই, তবে ধারাটির মর্মার্থ এই যে, যদি কেহ কোনো অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখে অথচ আপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যার্থে না আসে তবে সে নিজে অপরাধের ভাগী হয়। আমি জানি, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সুবিচারের কথা বলা শিশুসুলভ অজ্ঞানতার পরিচায়ক, যদিও আমার বিশ্বাস, অপরাধ যদি কোন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে হয়, তবে বুর্জোয়া এই ধারার প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, শ্রমজীবী জনসাধারণের বিরুদ্ধে, মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে কোনো কোনো অপরাধের বেলায় এই ধারা প্রযুক্ত হয় নাই। পুঁজিপতিদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের লক্ষ্যবস্তু ও শিকার শ্রমিকশ্রেণী আজ সর্বত্র, সারা দুনিয়ায়, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, বুঝিতে শুরু করিয়াছে আইন প্রণয়ন ও বিচারের অধিকার তাহারই। পুঁজিপতিদের বিধিবহির্ভূত মানববিদ্বেষী কার্যকলাপের দর্শকদের পাপ ঔদাসীন্যের বহু দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই আজও তাহার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। সময় আসিবে যখন মেহনতী মানুষ স্মরণ করিবে সেই দিনের কথা যেদিন সে ছিল বেকার ও অনাহার-মৃত্যুর সম্মুখীন অথচ গম ও কাফিকে আলকাতরায় মিশাইয়া জ্বালানি তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহার মনে পড়িবে, বৃটিশ ক্যাপিটালিস্টরা

স্বেচ্ছায় যোগ দিতে চাহিয়াছে বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের ফৌজে এবং বলিভিয়ার লণ্ডনস্থ কন্সাল দশ হাজার এই ভাড়াটে খুনীকে কিনিতে চাহিয়াছিলেন। সর্বোচ্চ বিচারকরূপে সেদিন সে স্মরণ করিবে এমন অনেক কিছুই, যাহা পুঁজিবাদের মন্ত্র-মুগ্ধদের চোখে পড়িয়াও পড়ে নাই, অবিশ্বাস্য পাপিষ্ঠতার পঙ্কশয্যায় নিমজ্জিত জীবনযাত্রার প্রতি মনে এতটুকু ঘৃণা যাহাদের জাগে নাই।

ইহারা কাহারা? কী অভিমত পোষণ করে ইহারা নিজেদের সম্পর্কে? আমার মনে হয়, একখানি আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের একটি চরিত্রই ইহাদের নির্ভুল বর্ণনা দিয়াছে। চরিত্রটি বলিতেছে :

"আমার কাছে মনে হয়, জীবনে এত যত্নের প্রয়োজন ও ভালভাবে বাঁচিতে গেলে এত কষ্ট করিতে হয় যে, জীবনধারণের সমস্ত আনন্দ উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়। আমি অবশ্য সভ্য জীবনের কথাই বলিতেছি, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ অথবা জুলুল্যান্ডের জীবনের কথা বলিতেছি না। আমাদের জীবনে সব কিছুই এত পরিমিত, এত মাপা, এত নির্দিষ্ট, সব কিছুর জন্যই এত সতর্ক বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় যে কখনও আমরা সহজভাবে বাঁচিতে পারি না। প্রাণধারণের আনন্দ তো দূরের কথা—সে আনন্দ আমাদের সুদূর লক্ষ্যেরও বাহিরে। আমরা যেন সব সময়েই টান করিয়া বাঁধা দড়ির উপর দিয়া হাঁটিতেছি এবং যখন বলিতে পারি 'এইটুকু পার হইয়া আসা গেল' শুধু তখনই সুখী হই। যদি তুমি ঠিক করো চিন্তা একদম করিবে না এবং যতটুকু স্ফূর্তি পাইবে উপভোগ করিয়া লইবে, তবে শীঘ্রই অতি-তৃপ্তির অবসাদে তোমার সমস্ত আনন্দই চলিয়া যাইবে। যদি তুমি অতিতৃপ্তি বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করো, তবে এত বেশি চেষ্টা তোমাকে করিতে হইবে যে জীবন হইতে আর কোন আনন্দ তুমি পাইবে না। যদি তুমি স্রোতের উজানে সাঁতার দিতে চাও, তবে নির্ঘাত পাহাড়ে ঘা খাইয়া থামিবে। যদি তুমি তোমার জাহাজকে চালাইয়া লইতে চাও, তবে সে হইবে এক অবিশ্রাম পরিশ্রমের ব্যাপার। আসল গলদ হইতেছে এই যে, জীবনকে তুমি বিশ্বাস করিতে পার না—সব সময় ইহার দিকে নজর রাখিতে হইবে, বাতাসের গতি অনুসারে দিক ঠিক রাখিতে হইবে। অতএব, বেতার-সেট অথবা গ্রামোফোনের পিন ঘুরাইয়া যেমন লোক আনন্দ পায়, একমাত্র সেই আনন্দই তুমি পাইতে পার জীবন হইতে। যতক্ষণ তুমি শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্য অথবা রেকর্ড পাল্টাইতে থাকিবে ততক্ষণই উহা চলিবে। বসিয়া চুপ করিয়া গান শোনা আর তোমার হইবে না।"

ইহাই তবে জীবনের লক্ষ্য; চুপ করিয়া বসিয়া, কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া, নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা দেখিয়া যাওয়াই তবে জীবনের লক্ষ্য। অবশ্য, ইউরোপের সকল বুদ্ধিজীবীরাই যে নিজেদের অক্ষমতা উপলব্ধির এই স্তরে পৌঁছিয়াছেন ও এতখানি নিবিড় নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু, আত্মিক দৈন্যের এই নিরানন্দ নীরস স্বীকৃতি যে ধ্বনিত হইবে ইংলণ্ডে, সাম্রাজ্যবাদের কবি কিপলিংএর ইংলণ্ডে, ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

লক্ষ্য করুন এই ঘটনাটি, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন এই মনোভাব বিষাক্ত

ছাতার মত সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন-কি সীমাবদ্ধ-দৃষ্টি আমেরিকাকে পর্যন্ত সংক্রমিত করিতেছে। এইবার 'যোদ্ধার ভাবধারায়' ফিরিয়া আসা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি সৈনিকের কোনো 'যোদ্ধার ভাবধারা' নাই এবং আমার বিশ্বাস, গাছে পেরেক পোঁতার মতো ইউরোপীয় ফৌজগুলির মধ্যে এই ভাবধারা ঢুকাইয়া দিবার দিন আর নাই। কিন্তু যোদ্ধার ভাবধারা নিশ্চয়ই আছে এবং আজ আমাদের কালে ফ্যাশিবাদরূপে তাহার তীব্র প্রচার চলিয়াছে। ইহা কোনো নূতন ভাবধারা নহে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেনরিক ট্রাইট্শকের ন্যায় জার্মান লেখকদের বইয়ে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। ফ্রিডরিখ্ নিট্শে এই ভাবধারাকেই দার্শনিক ও শিল্পরূপ দিয়াছিলেন তাঁহার 'শ্বেত জানোয়ারের' মধ্যে। এই ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা বেনিতো মুসোলিনী। ইতালিয়ান এন্সাইক্লোপিডিয়া'তে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি নিট্শের তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া ও নিট্শের 'লিবে ৎসুম ফেরন্স্টেন্'-এর প্রচারকে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এবং জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও মানুষের সামাজিক সমতার ধারণাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যে সাম্রাজ্যবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেষ করিয়াছে সেই সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন মুসোলিনী। মানুষের সমস্ত মানবিক বৃত্তির চরম অভিব্যক্তি বলিয়া যুদ্ধের গুণগান করিয়াছেন মুসোলিনী। এ তত্ত্ব তাহার আগেই ফিউচারিস্ট মারিনেত্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই উন্মাদতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন সমস্ত সমরবাদী লেখকেরাই। তাহাদের মতে যুদ্ধ মানুষকে "উন্নত করে।" যুদ্ধে পরাজিতেরা অবশ্য এ মত মানিতে পারিবে না। কেহ কি কখনও শুনিয়াছে প্রশংসায় অথবা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিজিত বলিতেছে বিজয়ীকে : "আহা, কি উদারতার সহিতই না তুমি আমাদের দলিত ও লুণ্ঠিত করিয়াছ!" ১৯১৪-১৫ সালে বেলজিয়ান ও ফরাসীরা জার্মান বিজয়ীদের উদারতার কথা বলে নাই, বরং বিজিতেরা 'টিউটন হিংস্রতার' বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়াছে এবং রক্তপিপাসু বর্বরতা ও উদারতার বিপরীত অন্যান্য কয়েকটি গুণে বিভূষিত করিয়াছে জার্মানদের। পরাজিত ও লুণ্ঠিত জার্মানরাও কখনও বিজয়ীদের উদারতা ও মহানুভবতার কথা বলে নাই, আজও বলে না। ছাব্বিশজন বাকু কমিসারকে ইংরাজরা গুলী করিয়া মারিয়াছিল, চেকরা চুরি করিয়াছিল কাজানের মজুদ সোনা, খারসন ছাড়িয়া যাইবার দিন ফরাসী ও গ্রীকেরা জেটির মালগুদামে পুরিয়া দুই হাজার নিরীহ নাগরিককে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিয়াছিল। রুশিয়ার হস্তক্ষেপকারী সেনাবাহিনীদের এই সব কার্যকলাপকে 'উদারতা' বলিলে নিশ্চয়ই অদ্ভুত, অত্যন্ত অদ্ভুত শোনাইবে। সাইবেরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপকারী বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল গ্রেভসের নিশ্চয়ই সৈন্য ও যোদ্ধাদের মহানুভবতা প্রচারের মত কোন মালমসলা হাতে নাই। উক্রেইনে জার্মানদের কার্যকলাপ এবং অন্যান্য অনেক ব্যাপারই 'সংস্কৃতিবান' ইউরোপের কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে।

'বিজয়ীদের' মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধ অঙ্গহীন করিয়াছে এবং

নৈতিক বিকলাঙ্গ বিজয়ীরা যাহাদের আজ মারিয়া ছত্রভঙ্গ করিতেছে—যেমন ঘটিয়াছে ওয়াশিংটনে 'বোনাস ফৌজের' বেলায় তাহারাও যুদ্ধের 'মহানুভবতা' সম্পর্কে সমরলিপ্সু ও ফাশিস্তদের মতবাদে সায় দিতে পারিবে না। যে সকল লক্ষ লক্ষ বিজিত ও বিজয়ী কাজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া অনাহারে মরিতেছে তাহারাও ফাশিস্তদের এই মত গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইতালীয় ফাশিস্তরা স্বপ্ন দেখিতেছে সেই দিনের যেদিন রোম পৃথিবী শাসন করিবে। হিটলার প্রচার করিতেছে, ফাশিজম্ "জার্মান জাতিকে সমস্ত মানবসমাজের ঊর্ধ্বে তুলিবে।" জাপানে একব্যক্তি আছেন যিনি বলিতেছেন, শীঘ্রই সমগ্র শ্বেতজাতি পীত বুর্জোয়াদের পদানত হইবে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র ইউরোপ কবলিত করিতে চায়—এ সমস্ত যে কত ঘৃণ্য, কত হীন, কত নীচ, কত অর্থহীন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মুসোলিনী বলিতেছে, 'জাতিসমূহ' নাকি জবরদস্ত শাসনের জন্য এতখানি ব্যাকুল ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।

ইহা খুবই সম্ভব যে, বুর্জোয়ারা এখনও এখানে-সেখানে কতকগুলি নির্বোধকে মাথায় মুকুট পরাইয়া সিংহাসনে বসাইতে পারিবে। কিন্তু বেশীদিন পারিবে না। ইহা অধঃপতিত মুমূর্ষুশ্রেণীর আস্ফালনমাত্র, মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগীর বিকার-চীৎকার ছাড়া ইহা কিছুই নহে। মুমূর্ষু ব্যক্তির বর্ণনা করিতে গিয়া সাহিত্যিকেরা প্রায়ই তাহার অতীতের, তাহার শৈশব ও যৌবনের ঘটনাগুলি স্মরণ করেন। দুনিয়ার ব্যাধিগ্রস্ত বুর্জোয়াকে আজ অতীতের ছায়া তাড়া করিয়া ফিরিতেছে—ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণীর মনে পড়িতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের কথা যখন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার রণধ্বনিতে সে সংগ্রাম করিয়াছিল। সে সংগ্রামকে আজ তাহার যৌবনের শোচনীয় ভুল বলিয়াই মনে হইতেছে। হায় রে, যদি সব কিছুই আবার সামন্তযুগীয় কায়দায় নূতনভাবে গড়া যাইত! ফ্যাশিজমের 'যোদ্ধাদের ভাবধারা' এইখানে আসিয়াই দাঁড়ায়।

বিউথেনে একজন কমিউনিস্টকে পীড়ন ও হত্যা করার জন্য পাঁচজন ফাশিস্তের যে দণ্ডাদেশ হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে আলফ্রেড রোজেনবার্গ নামক এক ব্যক্তি হিটলারের 'ভোলকিশের বিয়োবাখটার' পত্রিকায় সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছে তাহার মধ্যেই বুর্জোয়াশ্রেণীর বর্তমান মনোভাব অত্যন্ত নগ্নভাবে, বর্বরের অকপট নরবিদ্বেষ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এতখানি নৃশংস হিংস্রতা লইয়া এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় যে, বুর্জোয়া আদালত পর্যন্ত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিতে বাধ্য হয়। রোজেনবার্গ লিখিতেছে ঃ

"আমাদের চিন্তাধারা ও উদারতাবাদের মধ্যে যে গভীর গহ্বর রহিয়াছে এই দণ্ডাদেশের মধ্যে তাহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান আইনের উদার নীতি অনুসারে সমস্ত মানুষই সমান। আমেরিকাতেও ইহা স্বীকৃত। কিন্তু সেখানে সাদা ও কালো মানুষের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রহিয়াছে। কোনো নিগ্রো যে-কোনো শ্বেতরমণীকে বিবাহ করিতে পারিবে না, শুধু তাহা নহে, সাদা মানুষের সহিত এক রাস্তার গাড়ীতেও চড়িতে পারিবে না। কোনো নিগ্রো যদি

কোন শ্বেতাঙ্গিনীর উপর বলাৎকার করে, তবে তাহাকে লিঞ্চ করিয়া হত্যা করা হয়। ইহা অবশ্য 'খারাপ', কিন্তু শ্বেতজাতির রক্ষার জন্য ইহা আবশ্যক। বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ফরাসী শান্তিবাদী জরে-কে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীকে আদালত ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্লেমেসোর জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ড হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ফ্রান্স তাহার মূল স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করিয়াছিল। শুধু পোলিশ নয়, বলশেভিকও বটে, এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য পাঁচ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডদান জাতীয় আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির বিরোধী। যেমন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তেমনই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধেও আমরা অভিযান চালাইতেছি। আমাদের কাছে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সমান নয়। আমরা জার্মানদের একটা শক্তিশালী জাতি হিসাবেই দেখিতে চাই। একমাত্র বৈষম্যের তত্ত্বই জার্মানীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে পারে।"

এই বিকারের চীৎকারের প্রভাবে দণ্ডাদেশের কঠোরতা হ্রাস করা হয় এবং দণ্ডাদেশ যে একদম মকুব হইতে পারে এমন বিশ্বাস করিবারও কারণ আছে। এই চীৎকারই ফ্যাশিবাদের অন্তর্নিহিত সারবস্তু। ইহা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইউরোপ ও তাহরা মেহনতী জনতাকে যাহারা শাসন করিতেছে তাহারা উন্মাদ, এমন কোন পাপ নাই যাহা তাহারা করিতে পারে না। তাহারা যে কত-খানি রক্তপাত করিতে পারে তাহার পরিমাপ করা যায় না। এই উন্মাদের চীৎকারের স্তরে পৌঁছিতে গেলে গ্যেটে, কান্ট, শিলার, ফিকটে প্রমুখ শত শত চিন্তাবীর, কবি, সঙ্গীতকার ও শিল্পীকে মুছিয়া ফেলার প্রয়োজন। গ্রন্থাগার ও যাদুঘরে বন্দী হইয়া বুর্জোয়া সংস্কৃতি অস্পষ্ট—অস্পৃশ্য বলাই ভাল—হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এদিকে বুর্জোয়াজীবন ক্রমেই ঘৃণিত ও বর্বর হইয়া উঠিতেছে, তাহার নীতি ক্রমেই নৃশংস ও অমানুষিক হইয়া উঠিতেছে। সোবিয়েত ইউ-নিয়নের বাহিরের জগৎ আজ উন্মাদদের দ্বারা শাসিত।

(১৯৩২)

॥ শ্রমিকশ্রেণীর মানবতাবাদ ॥

"জগৎ পীড়িত"—এ কথাটি শুধু বলশেভিকরাই বলেন না, কাব্যাবেগময় মানবতাবাদীরাও কথাটি বলিয়া থাকেন। এই মানবতাবাদীরা শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছেন, 'ভালবাসা, দয়া, মহানুভবতা' প্রভৃতি যে সকল ভাবাবেগ দিয়া দ্বিপদ শিকারী শ্বাপদেরা তাহাদের হিংস্র পশু-'প্রকৃতি' এতকাল ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে সেগুলির আর কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই, আর সেগুলিকে পণ্যে পরিণত করা সম্ভব নহে, বাজারে তাহাদের ক্রেতা নাই এবং শিল্পবাণিজ্যের মুনাফা বৃদ্ধির পথে তাহারা অন্তরায়।

"দুনিয়া পাগল হইয়া গিয়াছে।" শ্রমজগতের উপর পুঁজিবাদের দায়িত্ব-হীন অমানুষ শাসন ও প্রভু কর্তৃক শ্রমিকের শ্রমশক্তির অবাধ, অর্থহীন শোষণকে সমর্থন ও রক্ষা করা যাহাদের ব্যবসায় তাহারাই চীৎকার করিতেছে,—"দুনিয়া পাগল হইয়া গিয়াছে।"—এবং এ চীৎকার তাহাদের ক্রমেই তীব্র হইতেছে।

[illegible] দুর্বল হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়াছে পুঁজিবাদের 'পীড়া'। এই অসুখ যিনি প্রথম দেখিতে পাইয়া মরিয়া হইয়া চীৎকার করিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন মার্কসের সমসাময়িক ফ্রিডরিশ্ নিট্শে। অকারণ আকস্মিক বলিয়া কোন কিছু নাই, জীবনের প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে। তাই এ ঘটনাও অকারণ ও আকস্মিক নহে যে, মার্কস যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অকাট্য যুক্তিসহকারে পুঁজিবাদের পতন ও শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের অবশ্যম্ভাবিতা তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করিতেছিলেন, ঠিক তখনই আতঙ্ক-বিহ্বল বিকারগ্রস্তের উন্মাদনা লইয়া নিট্শে প্রচার করিতেছিলেন 'শ্বেত জানোয়ারের' অবাধ শাসনের বৈধতার কথা। নিট্শের আগেই ম্যাক্স স্টার্নার

বুর্জোয়া রাষ্ট্র, নীতি ও ধর্মকে অস্বীকার করিয়া ব্যক্তির অবাধ অহমিকার অধিকার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই নৈরাজ্যবাদী অস্বীকার মূলত সেই 'মানবতাবাদেরই' অস্বীকার যাহাকে বুর্জোয়াশ্রেণী মধ্যযুগে সামন্তবাদ ও তাহার ভাবাদর্শ-নেতা চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনাতেই গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই 'মানবতা'র অসুবিধা ও স্ববিরোধিতার কথা বুর্জোয়াশ্রেণী বহু পূর্বেই নিজের ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। লুথার-ক্যালভিন প্রমুখের চার্চসংস্কারই তাহার প্রমাণ। এই সংস্কারের ফল দাঁড়াইয়াছিল 'মানব-প্রেমিক' ভগবদ্বাণীগুলির উচ্ছেদ করিয়া বাইবেলের প্রতিষ্ঠা। উপজাতীয় শত্রুতা, হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি যাহা না থাকিলে বুর্জোয়া রাষ্ট্র বাঁচিতে পারে না সব কিছুই বাইবেলের চোখে শুধু স্বাভাবিক নহে, প্রশংসনীয়ও বটে। লুথারের পূর্বে চার্চ সংস্কৃতির কারিগরদের খৃস্টের জন্য নীরবে নিগ্রহ সহ্য করিবার নির্দেশ দিত। ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষক ও কারিগরদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় লুথার অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন : "এমনভাবে জীবনযাপন করো ও কাজ করো যাহাতে রাজা ও জমিদারদের পক্ষে তোমাদের শাসন করা সহজ ও সুখকর হয়।" এতখানি স্পষ্টভাষিতা কখনও পুরোহিতদের মধ্যে দেখা যায় নাই।

আমাদের যুগে বুর্জোয়া 'মানবিকতা'র মিথ্যা ও ভণ্ডামীকে আর প্রমাণ দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। বুর্জোয়ারা আজ ফাশিজমকে তুলিয়া ধরিতেছে, খুলিয়া ফেলিতেছে মানবিকতার মুখোস। এই জীর্ণ মুখোস শিকারী জানোয়ারের দাঁত আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহারা বুঝিয়াছে, এই মানবিকতাই তাহাদের বিভক্ত ব্যক্তিত্ব ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ। পূর্বোল্লিখিত ঘটনাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াজোড়া পাপিষ্ঠতার অভিযান দেখিয়া যখন অনুভূতি-শীল ব্যক্তিগণ এই পাপিষ্ঠতার তীব্রতাহ্রাসের সরল প্রচেষ্টায় মানবপ্রেম প্রচার করেন অথবা বাগাড়ম্বরে এই পাপিষ্ঠতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন, জীবনের মালিকেরা অর্থাৎ দোকানী-কারবারীরা তখন ততক্ষণই এই প্রচার চালাইতে দেন যতক্ষণ দারিদ্র্য, স্বৈরাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি বিশ্বজোড়া দোকানী-সংস্কৃতির অনিবার্য পরিণামে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মানুষকে শান্ত রাখিবার চেষ্টার মধ্যে এই প্রচার আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে মেহনতী মানুষের এই বিক্ষোভ সমাজবিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে সেই মুহূর্তেই বুর্জোয়ারা এই 'অভিযানের' প্রতিশোধ নেয় 'পাল্টা অভিযান' দিয়া।

আমাদের উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় এই আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ১৯০৫-'৬ সালের ঘটনাবলীর পর 'ভেখী' নামক অনুশোচনা-গ্রন্থে তাহারা স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছিল : "জনসাধারণের ক্রোধের হাত হইতে সঙ্গীনের সাহায্যে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমরা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।" সরকার তখন মন্ত্রী স্তলিপিনের হাতে। এই স্তলিপিনই পাঁচ হাজারের বেশী মজুর ও চাষীকে নিজের খুশিমত ফাঁসিতে [illegible]।

আজ ঐতিহাসিক ও [illegible], প্রকৃত সার্বজনীন মানবিক, মার্ক্স-

এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিনের শ্রমিক মানবিকতার উপর আমাদের সরকারের প্রতিষ্ঠা। পুঁজিবাদের লৌহশৃংখল হইতে সমস্ত বর্ণ ও জাতির মেহনতী মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তিসাধনই এই মানবিকতার লক্ষ্য। মানবপ্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছে যে, পুঁজিবাদের লোহার শিকল মজুরদেরই হাতের তৈরী, পুঁজিবাদের 'চমৎকার জীবন' মজুররাই তৈরী করিয়া থাকে, কিন্তু নিজেরা তাহারা পদদলিত, নিঃস্ব।

বিপ্লবী মানবিকতা শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়াছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালাইবার ও বুর্জোয়া জগতের নৃশংস ভিত্তিমূলকে ধ্বংস ও নির্মূল করিবার ঐতিহাসিক অধিকার। মানুষের ইতিহাস এই সর্বপ্রথম সত্যকার মানবপ্রেমকে সৃষ্টিশীল শক্তি হিসাবে সংগঠিত করা হইতেছে। নগণ্য সংখ্যালঘুর অর্থহীন, অমানুষিক ক্ষমতার হাত হইতে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে মুক্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এই মানবপ্রেম। এই মানবপ্রেমই কোটি কোটি কায়িক-শ্রমজীবীর নিকট ঘোষণা করিতেছে যে, সমস্ত সংস্কৃতি সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদেরই মেহনত এবং এই সম্পদের সাহায্যেই শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া তুলিবে এক নূতন, সর্বজনীন মানবিক, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিই দুনিয়ার মেহনতী মানুষের মধ্যে প্রভুত্ব ও সাম্যের দৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিবে।

শ্রমিক-মানবিকতা অলীক স্বপ্ন নহে, ইহা তত্ত্ব নহে। নির্ভীক বীরত্ব ও সংগ্রামশীলতার সহিত ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োগ করিতেছে সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাহারা প্রমাণ করিয়াছে যে, বহুজাতি-বহুবর্ণ-অধ্যুষিত যে রাশিয়া ছিল বর্বর, বুর্জোয়া ও চাষীমনোবৃত্তির দেশ, সেখানে আজ সত্যই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিপুল পরিমাণ কায়িক-শ্রমশক্তিকে মানসিক শ্রমশক্তিতে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া সত্যই নিঃসংশয়ে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনার বিকাশকে বাধা দিবার জন্য কি করিতেছে সমস্ত দেশের পুঁজিপতিরা? কোটি কোটি মেহনতী মানুষের উপর নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অর্থহীন শ্রমিকশোষণ চালাইয়া যাইবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ শক্তিবিন্দু নিয়োগ করিয়া তাহারা আজ ফ্যাশিজম্ সংগঠিত করিয়া তুলিতেছে। পুঁজিবাদ কর্তৃক জরাজর্জর বুর্জোয়া সমাজের কায়িক ও নৈতিক অস্বাস্থ্যকর স্তরটির সমাবেশ ও সংগঠনই হইতেছে ফ্যাশিজম্। যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত সুরাসক্ত তরুণ সম্প্রদায়, ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধস্মৃতির বিভীষিকা-বিকারগ্রস্ত সন্তানের দল, পরাজয়ের প্রতিশোধকামী পেতি-বুর্জোয়াদের সন্তানের দল, যে জয়লাভ পরাজয়ের মতই বিপর্যয় আনিয়াছে [illegible] নিকট, সেই জয়লাভের সন্তানের দল—পুঁজিবাদ কর্তৃক ইহাদেরই সমাবেশ ও সংগঠনের নাম ফ্যাশিজম্। নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতেই এই তরুণদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে: এ বৎসর মে মাসের গোড়ার দিকে জার্মানির এসেন শহরে হাইনজ্ ক্রীস্টেন নামে ১৪ বছরের একটি ছেলে ফ্রিৎস ওয়াকেন হোর্স্ট নামে ১৩

বছরের একটি ছেলেকে হত্যা করে। হত্যাকারী শান্তভাবে বলে যে, সে আগেই তাহার বন্ধুর জন্য একটি কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছিল, তারপর তাহাকে সে জীবন্ত অবস্থায় কবরের মধ্যে ফেলিয়া দেয় ও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার দম বন্ধ হইয়া যায় ততক্ষণ তাহার মুখ বালিতে চাপিয়া রাখে। সে বলে, ওয়াকেন হোর্স্টের হিটলারী স্টর্মট্রুপার উর্দিটি দখল করিবার জন্যই সে এই হত্যা করিয়াছে।"

যাঁহারাই ফাশিস্ত প্যারেড দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, এ প্যারেড ন্যুব্জ-দেহ বিকৃতচর্ম, ক্ষয়রোগাক্রান্ত তরুণদের প্যারেড; রুগ্ন মানুষের সমস্ত কামনা লইয়া যাহারা বাঁচিতে চায় তাহাদের প্যারেড। নিজেদের বিষাক্ত রক্তের পূতিগন্ধময় উদ্‌গারের স্বাধীনতা দিবে এমন সব কিছুই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। হাজার হাজার বিবর্ণ, নিরক্ত মুখের মধ্যে স্বাস্থ্যবান, রক্তিম মুখগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই চোখে পড়ে, কারণ তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেগুলি অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতন শত্রুর মুখ, পেতি-বুর্জোয়া ভাগ্যান্বেষীদের মুখ, গতকল্যকার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মুখ, বড় কারবারী হইতে ইচ্ছুক ক্ষুদে-কারবারীদের মুখ। বিনামূল্যে অর্থাৎ চাষী-মজুরদের পকেট কাটিয়া একটু জ্বালানি অথবা কয়েকটা আলু দিয়া জার্মান ফাশিস্ত নেতারা এই সব কারবারী-দের ভোট কিনিয়া লয়। প্রধান খানসামারা চায় রেস্তোরাঁর মালিক হইতে। বড় চোরকে চুরির অধিকার দিয়াছে রাষ্ট্রশক্তিধারকেরা, সেই চুরির অধিকারই চায় ক্ষুদে চোরেরা। ইহাদের মধ্য হইতেই ফ্যাশিবাদ তাহার 'কর্মী' সংগ্রহ করে। ফাশিস্ত প্যারেড একই সংগে পুঁজিবাদের শক্তি ও দুর্বলতার অভিব্যক্তি।

আমাদের চোখ বুজিয়া থাকিলে চলিবে না। ফাশিস্তদের মধ্যে মজুরের সংখ্যা কম নহে। ইহারা সেই স্তরের মজুর যাহাদের এখনও বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীর চূড়ান্ত শক্তি সম্পর্কে চেতনা জাগে নাই। একথা যেন নিজেদের নিকট হইতে আমরা গোপন না করি যে, বিশ্বপরাশ্রয়ী পুঁজিবাদ এখনও খুবই শক্তিশালী কারণ এখনও কৃষক ও শ্রমিক অস্ত্র ও খাদ্য তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া নিজের রক্ত-মাংসে তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যুগের ইহাই সবচেয়ে শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা। আজও শ্রমিকশ্রেণী নিরীহভাবে শত্রুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে। অসহ্য এ দৃশ্য। এ নিরীহতা তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতারা। এই নেতাদের নাম আজ ও চিরদিনই কলঙ্কের কালিতে লেখা থাকিবে। ঠিক যখন বেকারী বাড়িতেছে, মজুরী কমিতেছে এবং এমন কি পেতি-বুর্জোয়াদের ক্রয়ক্ষমতাও কমিতেছে ঠিক তখনই বাজারের দ্রব্যমূল্য একটি বিশেষ স্তরে রাখিবার জন্য খাদ্যশস্য ধ্বংস করিয়া ফেলা হইতেছে। আর ইহা সহ্য করিয়া যাইতেছে বেকার ও ক্ষুধিতের দল। কী বিস্ময়কর ধৈর্য!

ভাবিয়াছিলাম বেকার ভ্রাতাদের এই কদর্য অপমানে বৃটিশ শ্রমিকদের মানব-মর্যাদাবোধ ক্ষুব্ধ আক্রোশে জাগিয়া উঠিবেঃ

"ইংলণ্ডের শহরে শহরে কুকুরদের জন্য একটি খাবারের দোকান খোলা

হইয়াছে। এ ধরনের দোকান এই প্রথম। এই দোকানে সমস্ত কুকুরের জন্য খাবার বিক্রয় হয় এবং গৃহহীন, ক্ষুধার্ত কুকুরদের খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হয়। মিঃ জেমস প্যাটার্সনের দেওয়া টাকা হইতে এই দোকানটি খোলা হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ আগে ব্রুকহার্স্টে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

'অভিজাত জাতির' দেশ ইংলণ্ডে এই ধরনের কলঙ্কময় মানববিদ্বেষী আতিশয্যের প্রকোপ ক্রমেই বাড়িতেছে। খুব সম্ভব, নিজেদের শ্রেণীর পতনের অনিবার্যতা সম্পর্কে প্যাটার্সনদের একটা নিঃসংশয় আতঙ্কের অভিব্যক্তি এই ঘটনাগুলি। ইহলোক হইতে বিদায়কালে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত প্যাটার্সনেরা যতটা পারেন নোংরা ছিটাইয়া যাইতে চান। হয়ত ইহা সেই অভিজাত ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

কিশোর ও তরুণদের হাতে শুধু রিভলবার তুলিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না তাহারা, রিভলবারের সংগে দিতেছে কতকগুলি পুরাতন, অচল জাতিবিদ্বেষের মন্ত্র। তরুণদের মনে মানববিদ্বেষ এবং হত্যা ও ধ্বংসের উল্লসিত কামনা সঞ্চারিত করিয়া তাহারা যে ইহাদের শুধু বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পুলিশের সহকারীরূপে সংগঠিত করিয়া তুলিতেছে তাহাই নহে, নরহত্যার আধুনিক যান্ত্রিক অস্ত্রসজ্জিত শ্রমিক-কৃষকবাহিনীর রক্তে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য তাহাদের এক প্রকারের বিষে পরিণত করিতেছে। পুঁজিপতিদের খুব ভালই মনে আছে, ফৌজী ব্যারাকের জানোয়ারী শিক্ষায় শিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক ও কৃষকেরা দেখাইয়াছিল যে, একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত তাহারা তাহাদের শ্রেণীশত্রুকে আপনা হইতেই অর্থহীন ও আত্মঘাতীভাবে সেবা করিবে; কিন্তু কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষক পরস্পরকে হত্যা ও পঙ্গু করিতে করিতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিবে যখন এই সীমা উত্তীর্ণ হয়। তখন আর বন্দুক-বেয়নেট পুঁজির স্বার্থকে সেবা করিতে চায় না। 'একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরী হওয়া ভাল', একথা ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রেণীশত্রুর নিকট হইতে শেখা ভাল ঃ পুঁজিপতির বিরুদ্ধে বৈধভাবে তাহার অকলঙ্কিত হাত তুলিবার পূর্বেই পুঁজিপতি শ্রমিককে শেষ করে।

ইউরোপের তরুণদের উপর ফ্যাশিজমের ধ্বংস ও দুর্নীতির প্রভাবের মাত্র কয়েকটি নহে, শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই ঘট্যাগুলি বিবৃত করিতে গেলেও বমির উদ্রেক হয়। এই কদর্য আবর্জনার স্মৃতির ভাণ্ডার ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও প্রাচুর্যের সহিত এই আবর্জনাই সৃষ্টি করিয়া চলে বুর্জোয়া। কিন্তু আমি এখানে একটা কথা বলিতে চাই, যে-দেশে শ্রমিকশ্রেণী সাহস ও সাফল্যের সহিত শাসন চালাইতেছে, অস্বাভাবিক যৌন আচরণের পাপ যেখানে আইনে শাস্তিযোগ্য সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য, অথচ মহান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সুরকারদের 'সংস্কৃতিবান' দেশে ইহা শাস্তির আশঙ্কাহীন অবাধ স্বাধীনতায় আচরিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই একটি বিদ্রূপ-বাণী সৃষ্টি হইয়াছে ঃ "অস্বাভাবিক যৌন আচরণকে ধ্বংস কর, ফ্যাশিজম আর

থাকিবে না।" এখানে বলা প্রয়োজন, যে-ইহুদীয় প্রয়োজনে নিজেদের জাতি-বিশুদ্ধতার গর্ব করিতে পারে এবং যাহারা মানবসমাজকে এতগুলি সত্যকার সংস্কৃতিস্রষ্টা দান করিয়াছে, দান করিয়াছে সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত প্রবক্তা কার্ল মার্কসকে, সেই ইহুদীদের আজ জার্মানির ফাশিস্ত বুর্জোয়ারা তাড়াইয়া দিতেছে। বৃটেনে যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে ইহুদীদের সংখ্যা কম নহে এবং যেখানে দেশের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইহুদীরা গৃহীত হইয়াছে সেখানেও ইহুদী-বিদ্বেষের কদর্য তত্ত্বের প্রচার শুরু হইয়াছে।

অপরপক্ষে যে-দেশের শাসনক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, সেখানে একটি স্বাধীন ইহুদী প্রজাতন্ত্র—ইহুদী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল—গঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির পুঁজিপতিরা রুদ্ধশ্বাসে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতেছে। শ্রমিক ও কৃষকের শ্রমশক্তিকে আরও বেশী করিয়া ও আরও সুবিধাজনকভাবে শোষণের জন্য তাহারা পৃথিবীকে নূতনভাবে ভাগ করিতে চায়। ছোট ছোট দেশগুলি আবার বড় বড় দেশের লৌহকবলে পড়িতে চলিয়াছে; আবার তাহারা তাহাদের স্বাধীন সংস্কৃতি-বিকাশের অধিকারটিকে হারাইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন ভাষা ও জাতির শ্রমিকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিজম জাতিগত কলহ, দম্ভ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছে। এই জাতিবিদ্বেষ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের একাত্মতার চেতনার বিকাশ ব্যাহত করিবে। বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যবসায়ীদের অরক্ষিত ও পদদলিত ক্রীতদাসের অবস্থা হইতে দুনিয়ার শ্রমিক-কৃষককে শুধুমাত্র এই চেতনাই মুক্তি দিতে সক্ষম। তাহাদের জাতিগত, বাণিজ্যগত, শিল্পগত শত্রুতা অতি সহজেই জাতি-শত্রুতা ও জাতিযুদ্ধের প্রচারে পর্যবসিত হইতে পারে, এবং হইতেছেও। আজ তাহারা ইহুদীবিদ্বেষ প্রচার করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ঘৃণিতভাবেই উহার প্রয়োগ শুরু করিয়া দিয়াছে। কাল তাহারা মমসেন, ট্রাইটস্কে প্রমুখের মতবাদ স্মরণ করিয়া স্লাভ-বিদ্বেষ প্রচার করিতে শুরু করিবে, ভুলিয়া যাইবে জার্মান সংস্কৃতিতে কতজন প্রতিভা দান করিয়াছে পোলেরা, পোমোরেরা, চেকেরা। ইউরোপের সমস্ত কারখানা-মালিকেরা ও দোকানীরা যখন একই ধরনের মাল তৈয়ারী করে ও একই ধরনের মাল লইয়া কারবার করে, রোমানসীয় অথবা এ্যাংলো-স্যাকসন জাতির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির শত্রুতা ও যুদ্ধ তখন খুবই স্বাভাবিক। মৈত্রী আছে অবশ্য; কিন্তু যখন বিক্রয় করিতেই হইবে, তখন বেইমানী করিতে ক্ষতি কি? যথা: বৃটেনের মৈত্রী রহিয়াছে জাপানের সহিত, কিন্তু জাপানীরা জোড়া তিন পেনিতে সিল্কের মোজা বেচিতেছে লণ্ডনে; ব্যাপারটি সামান্য কিন্তু জাপানের 'ডাম্পিং' (উৎপাদন ব্যয়ের কমে জিনিস বিক্রয়) পীতজাতির বিরুদ্ধে শত্রুতা জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের মাঞ্চুরিয়ায় যাহা বিনা বাধায় চালাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের রসনা সজল হইয়া উঠিয়াছে।

জাতিতত্ত্ব যুদ্ধোন্মুখ পুঁজিবাদের ভাবাদর্শ-ভাণ্ডারের শেষ মজুত নহে। কিন্তু

ইহার পূতিগন্ধ সুস্থমনা মানুষকেও বিষাক্ত করিয়া তোলে। কারণ এতকাল মারাত্মকভাবে অস্ত্রসজ্জিত ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে নিরস্ত্র ভারতীয়, চীনা ও নিগ্রোদের বিনা বাধায় ক্রীতদাসে পরিণত হইতে দেখিয়া সাধারণ মানুষের মন বিকৃত ও বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীভ্রাতাদের এই নৃশংস অবাধ লুণ্ঠন দাঁড়াইয়া দেখিবার বিষাক্ত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়িতে পারে সংযুক্ত মোর্চায় সম্মিলিত একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীই। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত এই শ্রমিকশ্রেণী। এই মতাদর্শকেই তাহাদের নেতা স্তালিন পরম প্রজ্ঞার সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। এই শ্রমিকশ্রেণীই দুনিয়াকে দেখাইয়াছে যে, তাহার বহুজাতিক দেশে সমস্ত জাতি ও উপজাতি, জীবন, শ্রম ও সংস্কৃতি বিকাশের অধিকারে সম্পূর্ণ সমান। যে সকল নিরক্ষর, অর্ধ-সভ্য জাতির পূর্বে নিজেদের বর্ণমালা পর্যন্ত ছিল না, রুশ শ্রমিক আজ তাহাদের সম্মুখে জ্ঞানের বিস্তৃত রাজপথ খুলিয়া দিয়াছে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্রুতবেগের কথা আজ সমস্ত দেশের সৎ নরনারীই স্বীকার করিয়া থাকেন। মনে হইবে, এই ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইয়া সৎ নরনারীরা এই অত্যন্ত সহজ, নৈতিক স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন যে, অন্তর ও বাহির উভয় দিক হইতেই সামাজিক ব্যাধিগ্রস্ত অনিবার্য-ধ্বংস মাধ্যম অপেক্ষা কোন সুস্থ মাধ্যমে বাস করা অনেক বেশী উপকারী, কার্যকরী ও অকপট। সামাজিক সৃষ্টিকার্যে শ্রমিকশ্রেণীর সক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইলে, তাহার জ্ঞানপিপাসাবৃদ্ধিতে ও প্রতিভাবিকাশে উৎসাহদান ও তাহার ঐতিহাসিক কর্তব্যের চেতনাকে শ্রমিকসাধারণের মধ্যে সঞ্চারণ অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কাজ মনে হইবে। সতর কোটি মানুষের দেশে এই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতির প্রতি দোকানী-[illegible] উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য, মানবহত্যা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নয়নের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযান সংস্কৃতিস্রষ্টা মানবতাবাদীদের মর্যাদাকে অপমান করে। কিন্তু ফ্যাশিজম-অনুমোদিত গ্রন্থের বহ্নুৎসবে বুর্জোয়া সংস্কৃতিস্রষ্টাদের মনে আঘাত লাগিতে দেখা যায় না, জাতীয়তাবাদী ও জাতিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারে তাহাদের বিচলিত হইতে দেখা যায় না; আর একটি নূতন হিংস্র যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি চলিয়াছে, সুস্থতম ব্যক্তিমানুষদের অর্থহীন উৎসাদনের জন্য, বহু শতাব্দীর সাংস্কৃতিক সম্পদের বহ্নুৎসবের জন্য, নগরের পর নগরকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য, কলকারখানা, মাঠ-ঘাট, পুল-রাস্তা প্রভৃতি জনসাধারণের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলকে ধ্বংস করিবার জন্য যে আয়োজন চলিয়াছে বুর্জোয়া সংস্কৃতিস্রষ্টারা তাহাতে বিচলিত নহেন। বক্তৃতার দ্বারা লুণ্ঠনকারীদের উন্মত্ততার উপশম করা যায় না। বাঘ ও হায়না কখনো মিঠাই খায় না।

মানুষকে [illegible] ক্ষমতা '[illegible]' মধ্যে দেখা যায় না। এ

যুগের বীরত্বপূর্ণ পরমতম নাটকটিও তাহাদের মনে কোনো সাড়া জাগায় না, এ নাটকের নায়কেরা কে তাহাও তাহারা জানে না। এমন দিন আসিতেছে যখন দোকানীদের উন্মত্তচঞ্চল উইটিপির উপর হাতীর মত পা ফেলিবে বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণী, দলিত, পিষ্ট হইয়া ধূলায় মিশিয়া যাইবে সে উইটিপি। ইহা অনিবার্য। একদল নগণ্য মুষ্টিমেয় মানুষ সৃষ্টিশক্তি হারাইয়া, জীবনের আতঙ্কে ও অতৃপ্ত, বিকৃত ধনলালসায় দুর্নীতি ও ক্ষয়ের বিষে জর্জর হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই মানব-জাতি নিজেকে ধ্বংস হইতে দিতে পারে না। এই সংখ্যালঘুদলের ধ্বংসসাধন হইবে চরম সুবিচারের কাজ এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য ইতিহাস শ্রমিকশ্রেণীকে নির্দেশ দিতেছে। এই মহান কর্তব্য সম্পন্ন হইবার পর সারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি সর্বজনীন সামঞ্জস্য ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে স্বাধীন চমৎকার এক নূতন জীবন গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে।

এই বিশ্বাস কি সত্য বিশ্বাস? শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে সে দিনের শেষ হইয়াছে যখন বিশ্বাস ও জ্ঞান ছিল মিথ্যা ও সত্যের মতই পরস্পরবিরোধী। যেখানে শ্রমিকশ্রেণীই শাসক এবং সব কিছুই তাহারই শক্তিমান হাতের সৃষ্টি সেখানে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধের কোন স্থান নাই। বিশ্বাস সেখানে মানুষের বিচারশক্তির জ্ঞান হইতে উদ্ভূত; এবং এই বিশ্বাস বীর সৃষ্টি করে; দেবতা সৃষ্টি করে না, করিবেও না।

(১৯৩৪)

।। কুয়াশা ।।

জলীয় বাষ্পের একটি পীতাভ-ধূসর আস্তরণে শহরটি ঢাকা। ভিজে ধোঁয়া বলিয়া কোন জিনিস থাকিলে তাহার সহিত ইহার তুলনা দেওয়া যাইত। পাঁচ পা সম্মুখে এই বাষ্পাবরণ এত গাঢ় এমন-কি নিরেট ঘন মনে হয় যে, সেখানে কোন বাতাসই থাকিতে পারে না; বাতাসের শেষকণাটুকুকে এই বাষ্প গিলিয়া খাইয়াছে। কিন্তু যে-কোন কুয়াশার মত এই কুয়াশার মধ্যেও হাঁটিয়া অগ্রসর হওয়া যায়, শুধু নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় আর চোখে কিছু দেখা যায় না। এই বিশাল শহরের সমস্ত শব্দই অদ্ভুতভাবে একসাথে মিশিয়া একটা চাপা, বিবর্ণ, অস্বচ্ছ শব্দে পরিণত হইয়াছে। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ-কখনো দুই-একটা মোটরের হর্ন শোনা যায়, আরও কম শোনা যায় মানুষের কণ্ঠস্বর; তাহাও শোনা যাইত না যদি এই কণ্ঠস্বরের জন্য উৎকর্ণ হইয়া না থাকিতে। ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনিতে সে তরল ব্যঞ্জনা নাই; এ ঘণ্টাধ্বনি ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায় না, হঠাৎ থামিয়া যায়; প্রত্যেক আঘাতের পর কে যেন ঘণ্টাটিকে টুপী দিয়া চাপিয়া ধরিতেছে। নদী-বক্ষে যে সাইরেন বাজিতেছে তাহাতে হতাশার সুর। যেন স্টীমারগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে অথবা কুয়াশার মধ্যে বাহির হইতে ভয় পাইতেছে।

ট্যাক্সি, গাড়ী ও ঘোড়াগুলির গা হইতে জল ঝরিতেছে। কুয়াশার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাহারা কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। মানুষগুলি ভেজা, অদ্ভুত নীরব; তাহাদের কোটের কলার উঁচু করা, হাত পকেটে ঢুকানো, গলা সামনে আগাইয়া দেওয়া। তাহারা পরস্পরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে এমনভাবে যেন তাহারা আকস্মিক দুর্বিপাক এড়াইতে চায়। কুয়াশা তাহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে একটা অর্ধস্বচ্ছ পাতের মত। এই পাতের মধ্যে

মানুষকে দেখাইতেছে ডিমের সাদা-ঢাকা কুসুমের মত। দুইজন বৃদ্ধা মহিলা একটা ভিজা দেয়ালের গায়ে জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া একটা বড় কালো ছাতা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। খুলিতে গিয়া বাঁটের ডগাটির খোঁচা লাগিয়া গেল একটি বেঁটে মোটা লোকের গায়। লোকটি গর্জন করিয়া উঠিতেই মহিলা দুইজন দুইটি কলের পুতুলের মত একই সঙ্গে একইভাবে হাত দুইখানি ছুঁড়িয়া দিলেন, কাঁপিতে লাগিলেন এবং মুখ দিয়া এমন সব শব্দ বাহির করিতে লাগিলেন যাহার মধ্যে ওঃ আঃ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

বাড়ীর দেয়ালগুলি ও দোকানের জানালাগুলি জলের ফোঁটায় ভরিয়া গিয়াছে। সব কিছুই নরম কোমল; সব কিছুই যেন এমন নোংরা বরফে তৈরী যে বরফ গলিয়া যাইতেছে। মানুষের মাথায় অদ্ভুত, উদ্ভট কল্পনা জাগে। হয়ত, গ্রহবিদরা জানিতে পারেন নাই, সূর্য ফাটিয়া গিয়াছে এবং মৃত চাঁদকে গলাইয়া দিয়াছে; সেই তরল পদার্থ সদ্য-দোয়ানো দুধের মতো ঠাণ্ডা হইয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ও এক শ্বাসরোধকারী জলীয় বাষ্পাচ্ছাদনে পৃথিবীকে ঢাকিয়া দিয়াছে, একটা রহস্যময় গলিত পচন সংক্রামিত করিয়াছে পৃথিবীর দেহে; আর লক্ষ লক্ষ অধিবাসী-অধ্যুষিত এই বিশাল শহরও গলিতে শুরু করিয়াছে। শীঘ্রই এর ইট, কাঠ, কাচ ও ধাতু নিঃশব্দে গলিয়া ঘন ঘোলা স্রোতে বহিতে থাকিবে এবং বাষ্প হইয়া উঠিয়া যাইয়া ধূসরপীতাভ কুয়াশায় পরিণত হইবে।...

কিন্তু তোমার উত্তেজিত কল্পনার এই ভয়ংকর ছবিটিকে শহরবাসীরা অত্যন্ত লঘুভাবে মুছিয়া দিবে। তোমার কল্পনার উদ্দামতাকে সর্বপ্রথম সংযত করিবে পুলিশ। সকলেই এক ধাতুতে গড়া এক আজব জীব ইহারা—যান্ত্রিক-ভাবে, শান্তভাবে, দৃঢ়নিশ্চিতভাবে কাজ করিয়া যায় ইহারা। সমস্ত রাস্তাতেই পুলিশেরা এক। যে-শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার সবচেয়ে উৎসাহী লুণ্ঠনকারীদের অর্থাৎ 'অভিজাত জাতটি'র সংস্কৃতি মানুষকে অমানুষে পরিণত করিয়া 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' প্রতিষ্ঠা করে সেই শক্তির দিকে তাকাইলে মন সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে ভরিয়া ওঠে।

পুলিশের হাত নিয়মশৃঙ্খলারক্ষার মহাশক্তিশালী দণ্ডযন্ত্র। গাড়ী, মোটর, ভারবোঝাই গাড়ীগুলিকে কুয়াশার মধ্য হইতে ডাকিয়া বাহিরে আনিয়া আবার তাহাদের কুয়াশার মধ্যে পাঠাইয়া দিতেছে,—এই আশ্বাস আনিয়া দিতেছে মানুষের মনে যে, শহরের ধ্বংসের দিন এখনও আসে নাই। আলো ও শুষ্ক উত্তাপে ভরা দোকানগুলির সামনে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইতেছে মোটরগাড়ীগুলি; গাড়ীগুলির মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেছেন অত্যন্ত আড়ষ্ট অথবা অত্যন্ত গোলাকার ভদ্র-লোকেরা। মাথায় তাহাদের টপহ্যাট অথবা অন্য নানা প্রকারের শিরোভূষণ। অত্যন্ত শিষ্ট দাম্ভিকতার সহিত তাহারা বাহু আগাইয়া দিতেছেন অপূর্ব রূপসী রমণীদের দিকে। এই রমণীরাও হাসিয়া ও সুরেলা কণ্ঠের অস্ফুট শব্দ করিয়া ফুটপাথের ভেজা পাথরে কোমল পা দুখানি রাখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে চীনামাটির

মুখে বিরক্তি-রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। তারপর পেটুক যেমন চিংড়িমাছ গিলিয়া ফেলে, তেমনই দোকানও তাহাদের সকলকে একসঙ্গে গিলিয়া ফেলিতেছে।

এই শহরে জুতা, কাপড়, টুপী, পশম, চামড়ার জিনিস, পোর্টম্যান্টো, সিগার, পাইপ, বেড়ানোর ছড়ি, তৈজসপত্র, মাছধরার সরঞ্জাম, শিশুদের ও বড়দের বন্দুক ও খেলনা, ঘড়ি, সোনার জিনিস, গয়না-জড়োয়া ইত্যাদির কী ছড়াছড়ি! কী চোখঝলসানো প্রাচুর্য! এ সব কিছুরই উজ্জ্বলতা এত তীব্র যে, ভদ্রমহিলা-মহোদয়গণের ইহাদের ব্যবহারের অধিকারের প্রশ্নটি এই উজ্জ্বলতায় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

আহার্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৈচিত্র্য দেখিলে পরিপাকতত্ত্বের অগ্রগতি, রন্ধনশিল্পের বিকাশ ও অতিসংস্কৃতিবান নর-নারীর পাকস্থলীর সুসংস্কৃত প্রজ্ঞা সম্পর্কে নানা চিন্তায় মন ভরিয়া ওঠে। খাবার দোকানের জানালাগুলিতে গর্বের সহিত প্রদর্শিত হইতেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ, সমুদ্র, হ্রদ, অরণ্য ও নদীর উপহার। তাজা, ধোঁয়া-লাগানো, নুনে-জারানো ও কৌটোবন্দী মাংস, মাছ, কাঁকড়া, সবজি, ফল, মসলা, আচার পনীর, কাবাব, মিঠাই, মোরব্বা, বিস্কুট, কেক, চকোলেট, কোকো—সব কিছুই সম্ভবত হাজার হাজার টনে মজুত রাখা হইয়াছে। এ-সবই ভদ্রমহিলা-ভদ্রমহোদয়গণকে চিবাইতে হইবে, হজম করিতে হইবে, জমির সারে পরিণত করিতে হইবে।...

দুই পাশে ঠিক একই ধরনের তেতলা বাড়ীযুক্ত একটি জনমানবশূন্য রাস্তা। প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক তলায় তিন-চারিটি জানালা। এই রাস্তা বাহিয়া কুয়াশার মধ্য দিয়া লম্বা-পা-ওয়ালা একটা লোক দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। লোকটার পরনে স্কচম্যানের পোষাক—মাথার টুপীর পিছনে দুটি ফিতা, একটি জরাজীর্ণ জ্যাকেট, তার ডান কনুইয়ের উপর একটি তালি, পা দু'খানি গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত খালি, সে পায়ে মস্ত বড় দু'খানি গোড়ালি-ফাঁক জুতা। বগলে একটি ব্যাগপাইপ, বাঁ হাতের কনুই দিয়া সেটি পাঁজরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া আছে। তাহার লাল হাতগুলি যেমনই নিঃশব্দে চাবিগুলির উপর আঙ্গুল দিতেছে অমনি তিনটি রীড হইতে তীব্র নিনাদে এক মধুর সুরতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। বাজে রীডটিতে এই সুরতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতেছে একটি একঘেয়ে চাপা শব্দ। সুরকারের মুখখানি ফ্যাকাশে ও দুর্বল, চোয়ালের হাড় দু'খানি তীক্ষ্মভাবে বাহির হইয়া আসায় মুখের চামড়া এত টান টান হইয়াছে যে লাল লাল দাগ ফুটিয়াছে সে মুখে, হাড়সর্বস্ব নাকটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে লাল রাগে-ফুলিয়া-ওঠা গোঁফজোড়ার মধ্যে। চিবুকখানিও ঢাকা পড়িয়াছে এই তামাটে অরণ্যের মধ্যে। কোটরের মধ্য হইতে বসিয়া যাওয়া চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বাহিরে তাকাইতেছে, নীলাভ মণি দুইটি যেন পরিস্ফীত সাদার উপর দিয়া সাঁতার কাটিয়া ফিরিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে ও জ্বল জ্বল করিতেছে —মনে হয় চোখ দুইটি যেন অসম্ভব গরম। সুরকার চারিটি বাড়ীর জানালার তলা তিরিশটি দ্রুতপদক্ষেপে পার হইয়া আসিল, তারপর একটি সম্মুখ রাস্তার

বাঁক ঘুরিয়া পাগলের মত আবার ফিরিয়া আসিল। তাহার কনুয়ের উপরকার ছেঁড়া তালিটি বাতাসে এত জোরে জোরে উড়িতে লাগিল যেন উহা এখনই ছিঁড়িয়া যাইবে। গোঁফ চুমরাইয়া, গাল ফুলাইয়া, বাতাস দিয়া সে থলিটি ভর্তি করিল, তারপর ঠোঁট হইতে বাঁশীটি সরাইয়া সে কাশিতে লাগিল, কাশিতে লাগিল আর শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও পদ-চারণা বন্ধ করিল না। তাহাকে হাঁটিতেই হইবে কারণ সুখী লোকদের জানালার তলায় দাঁড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো পুলিশের নিষেধ। কিন্তু যতক্ষণ সে চলিবে ততক্ষণ তাহাকে বাজাইতে হইবে, কারণ আপোষের বনিয়াদী দেশ বৃটেনের প্রজারা স্বাধীন মানুষ। সংগীতকার কাশে আর তাহার গলা দিয়া দলা দলা কালো রক্ত বাহির হয়। নোংরা জুতা দিয়া রক্ত মাড়াইতে যেন তাহার ইচ্ছা নাই, তাই সে ফুটপাতে না ফেলিয়া থুথু ফেলে বাড়ী-গুলির তৈলাক্ত দেয়ালের উপর। মনে হয় না, সে ইচ্ছা করিয়াই ইহা করিতেছে, মনে হয় আর দশ-বারো পা হাঁটিয়াই সে ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

॥ একখানি যুদ্ধের বই ॥

সমান যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন বিভিন্ন জাতির মানুষেরা কেমন করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়াছে; কেমন করিয়া ধ্বংস করিয়াছে নিজেদের প্রাণান্ত পরিশ্রমের পার্থিব কীর্তি; কেমন করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে মন্দির, প্রাসাদ, বাসভবন; কেমন করিয়া ধ্বংস করিয়াছে শহর, গ্রাম, দ্রাক্ষাকুঞ্জ; ধ্বংস করিয়াছে পূর্বপুরুষদের নিপুণ হাতে চষা লক্ষ লক্ষ একর জমি, যে-জমি এখন বহু বৎসর ধরিয়া লোহার টুকরা ও নিহত নিরীহ মানুষের পচা মাংসের বিষে দলা বাঁধিয়া থাকিবে—কেমন করিয়া ঘটিয়াছে এ সব কিছু, কত স্পষ্ট, কি নির্মম সত্যবাদিতার সহিত তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এই বইখানিতে*।

এই মূঢ়, নির্বোধ আত্মহনন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও, যাহা কিছু তাহাদের চর্ম ও স্নায়ুকে পীড়িত করে ও হৃদয়-মনকে উত্তেজিত করে সব কিছুকেই যুক্তি দিয়া বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা এই মানুষগুলির রহিয়াছে। তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, প্রার্থনা করে আন্তরিকভাবেই, এবং বইখানির একটি চরিত্রের ভাষায়, প্রার্থনা করে 'মূঢ়ের মত একই ভাবে', তারপর আবার 'মূঢ়ের মত একই ভাবে' তাহারা আত্মহননের উন্মাদ অভিযানে মাতিয়া ওঠে। ৪৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় জার্মান ও ফরাসীদের এই প্রার্থনার একটি বর্ণনা পাইবেন। তাহারা উভয়েই মনে করে তাহাদের এই ঘৃণিত রক্তাক্ত কাজে "ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে আছেন।"

কিন্তু তারপরই তাহারা বলে, "ঈশ্বর দুটি খড় পর্যন্ত আমাদের দেন না।" তারপর এই বীরেরা, শহীদেরা, ভ্রাতৃহন্তারা নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞাসা করে

---

* অঁরি বারবুস লিখিত 'আন্ডার ফায়ার'।

'তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে আছেন' এই কথাটি প্রত্যেককে একই রকমভাবে বিশ্বাস করিয়ে ঈশ্বর কী ভাবছেন?"

সহজ, করুণ, শিশুসুলভ সরলতার সহিত এবং সাধারণত "মূঢ়ের মত একভাবে"—চিন্তা করে এই মানুষগুলি। পরস্পরের রক্তপাত করিতে করিতে তাহারা বলে, "করুণাময় ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকতেন তবে এত শীত পড়ত না।"

এইরকম ধীরভাবে যুক্তিসহকারে বিচার করিয়াও এই মহা শহীদেরা আবার পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিয়া যায়।

কেন?

কিসের জন্য?

তাহাও তাহারা জানে। নিজেদের সম্পর্কে তাহারা বলে ঃ

"আমরা সবাই খারাপ লোক নই। আমাদের কপাল খারাপ, তার উপর আমরা গরীব। কিন্তু আমরা অত্যন্ত বোকা, অত্যন্ত বোকা।"

কিন্তু ইহা বুঝিয়াও তাহারা তাহাদের ধ্বংসের লজ্জাকর পাপ অভিযান চালাইয়া যায়।

কর্পোরাল বার্ট্রাণ্ড অন্যদের চেয়ে বেশী জানে। সে কথা বলে সত্যদ্রষ্টার কণ্ঠে।

"ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত হঠাৎ সে বলিতে শুরু করে ঃ 'ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতের মানুষ কী চোখে দেখবে এই হত্যাকাণ্ডকে। আমাদের পরে যারা আসছে, সেই ভবিষ্যতের মানুষ, যাদের কাছে প্রগতি আসবে ভাগ্যের মত সুনিশ্চিত হয়ে এবং প্রগতিই যাদের মধ্যে শেষ বিবেকের স্থিরতা ফিরিয়ে আনবে, তাদের চোখে কী আলোকে প্রতিভাত হবে আমাদের এই হত্যাকাণ্ড? আমাদের যে-সব কীর্তি-কাণ্ডকে প্লুটার্ক ও কর্নিলের বীরদের অথবা খুনে-গুণ্ডাদের কাজের সাথে তুলনা করব তা' আমরা নিজেরাই জানি না, সেই কীর্তিকাণ্ডকে তারা কী চোখে দেখবে?......তা' হলেও মনে রেখো, একটি মূর্তি আজ উঠেছে যুদ্ধের ঊর্ধ্বে; সাহসের শক্তি ও সৌন্দর্যে এই মূর্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে।......'

"একখানি লাঠিতে ভর দিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার কথাগুলি আমি মন দিয়া শুনিলাম, গোধূলির নির্জনতায় সেই স্বল্পবাক ব্যক্তিটির ওষ্ঠ-নিঃসৃত কথাগুলি আমি যেন পান করিতে লাগিলাম। স্পষ্টকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করিলেন ঃ

" 'লাইবনেক্ট!'

"সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দু'খানি তাহার তখনও বুকের উপর আড়া-আড়িভাবে রাখা। ভাস্কর্যমূর্তির মুখের মত গম্ভীর তাহার মুখখানি বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মর্মর মৌনের গহন হইতে সে আবার বাহির হইয়া আসিল।

" 'ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতের কাজ হবে বর্তমানকে মুছে দেওয়া, এমনভাবে মুছে দেওয়া যা আমরা চিন্তাও করতে পারিনে, মুছে দেবে এই ঘৃণিত

কলঙ্কের অধ্যায়কে। তবু, এই বর্তমান—এ বর্তমানকে আসতে হোতই, আসতে হোতই। ধিক্কৃত হোক সামরিক মহিমা, ধিক্কৃত হোক সেনাবাহিনী, ধিক্কৃত হোক সেই সৈনিকের পেশা যা মানুষকে একবার নির্বোধ শিকার, অন্যবার কদর্য জানোয়ারে পরিণত করে। হাঁ, ধিক্কৃত হোক এ সব কিছু। হাঁ, ধিক্কার। ধিক্কারই সত্য কথা। কিন্তু বড় বেশি সত্য, এ সত্য চিরন্তন সত্য; আমাদের কাছে এ এখনও সত্য নয়। যখন এমন বাইবেল হবে যা সম্পূর্ণ সত্য তখন এ সত্য হবে। যখন এ সত্য লেখা রইবে এমন অন্য সত্যের সাথে যে-সত্যগুলিকে কোন পবিত্র মন একসঙ্গে আমাদের বুঝিয়ে দেবেন, তখনই এ সত্য সত্য হবে। আমরা পথ-ভ্রান্ত, এখনও সেদিন থেকে বহুদূরে নির্বাসিত। আজ এই মুহূর্তে এই সত্য অপসিদ্ধান্ত মাত্র, এই পবিত্র বাণী বিধর্মীর উক্তি।'

"প্রতিধ্বনিত স্বপ্নভরা এক ধরনের হাসি বাহির হইয়া আসিল তাহার কণ্ঠ হইতে—'আমিই একবার এদের বলেছিলাম যে, আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করি।' "

এই ধরনের চিন্তা যাহার, এই ধরনের কথা, যাহার মুখ দিয়া বাহির হয়, সমস্ত পল্টন যে-লোকটিকে শ্রদ্ধা করে, সেই শান্ত, সাহসী লোকটিই এই মূঢ় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তাহাদের লইয়া যায় ও কাদার মধ্যে, অসংখ্য গলিত মৃতদেহের মধ্যে নিজে মরিয়া পড়িয়া থাকে।

এ সব কিছুই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এক ভয়াবহ স্ববিরোধিতার উজ্জ্বল বিদ্যুৎশিখায়। শয়তানী লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে পাপশক্তির হাতে নির্মিত অনুগত উপকরণ ও ঘৃণিত যন্ত্রে মানুষকে পরিণত করে এই স্ববিরোধিতা।

এই নিরানন্দ বীরেরা আমাদের সহানুভূতি জাগায়, আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মন কুষ্ঠরোগীর মত। তাহারা যেন যুক্তি ও ইচ্ছার এমন এক বিরোধ নিজেদের মধ্যে বহন করিতেছেন, যে-বিরোধের কখনও কোনদিনই সমাধান হয় না। মনে হয়, তাহাদের বিচারশক্তি এত দৃঢ় ও জোরালো যে তাহারা এই অসহ্য হত্যাযজ্ঞের, এই দুনিয়াব্যাপী পাপ অভিযানের অবসান ঘটাইতে সক্ষম। কিন্তু তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই এবং যদিও তাহারা নর-হত্যার সমস্ত পাপিষ্ঠতাকে বুঝিতে পারিতেছে, এবং সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেছে তথাপি তাহারা হত্যা ও ধ্বংস চালাইয়া যাইতেছে, মরিতেছে রক্ত ও কাদার মধ্যে।

"তাহারা বলে, 'শুধু আমাদের দিয়েই তারা যুদ্ধ চালায়। আমরাই যুদ্ধের মালমশলা। শুধু সাধারণ সৈন্যের মাংস ও মন দিয়েই যুদ্ধ তৈরি হয়। আমরাই তো সকলে মিলে সৃষ্টি করি মৃতের মাঠ, রক্তের নদী; আমাদের সংখ্যার বিপুলতার জন্যই আমাদের প্রত্যেকে অদৃশ্য ও নিঃশব্দ। শূন্য শহর ও বিধ্বস্ত গ্রাম আমাদেরই কীর্তি। আমরা সকলেই যুদ্ধ, আমরা সকলে মিলে একসাথে যুদ্ধ।'

" 'হাঁ, ঠিক কথা! মানুষই যুদ্ধ। মানুষ ছাড়া যুদ্ধ কিছুই নয়, কিছুই নয়, সামান্য একটু ঝগড়া ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু মানুষ তো কিছুই স্থির করে না, স্থির করে মানুষের চালক প্রভুরা।'

" 'আর যেন এই চালকপ্রভুর চালনা সহ্য করতে না হয়, তাই আজ মানুষ লড়াই করছে। এই লড়াইয়ে যেন ফরাসী বিপ্লবই এগিয়ে চলেছে।'

" 'যদি তাই হয় তা'হলে আমরা তো প্রুশিয়ানদের জন্যও লড়ছি।'

" 'তাই আশা করা যাক্'—বলে উঠল একজন দীনহীন সৈন্য।

" 'জনসাধারণ—তাদেরই সব হওয়া উচিত, অথচ তারা কিছুই নয়।' কথাগুলি বলিল যে-লোকটি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল সেই। সে জানিল না যে-বাক্যটি সে বলিল সেই ঐতিহাসিক বাক্যটি উচ্চারিত হইয়াছিল এক শতাব্দী পূর্বে। অবশেষে আজ এই লোকটি এই মহাবাক্যটিকে নূতন সর্বজনীন তাৎপর্যে ভূষিত করিয়া তুলিল।

"যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া সেই গভীর পিচ্ছিল কাদার মধ্যে চার হাত-পায়ে হামা দিয়া উঠিয়া কুষ্ঠগ্রস্তের মত মুখখানি তুলিয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে সে অসীমের পানে চাহিয়া রহিল।"

সেখানে সে কি দেখিবে?

আমাদের বিশ্বাস সে দেখিবে তাহার পরবর্তীরা স্বাধীন, প্রজ্ঞাবান ও দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ।

* * *

এই ভীষণ অথচ আনন্দকর বইখানির লেখক আঁরি বারবুস। যুদ্ধের বিভীষিকা ও উন্মত্ততার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁহার আছে। ইহা লিও তলস্তয়ের সেই মহিমান্বিত গ্রন্থ নহে যে-গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভা সুদূর অতীতের যুদ্ধকে রূপ দিয়াছে; ইহা বার্থা ফন সাটনারের করুণ গ্রন্থ 'যুদ্ধ নিপাত যাক' নহে। পরিপূর্ণ সদিচ্ছা লইয়া লিখিত হইলেও বার্থার বই কোনো কিছু করিতে বা না করিতে সংকল্পবদ্ধ করিয়া তোলে না। বারবুসের বইখানি 'ঈশ্বরবাক্যের' মত সহজ। ইহার পাতায় পাতায় পয়গম্বরের ক্রোধ। এই-ই প্রথম বই, যে বইয়ে সহজভাবে, কঠোরভাবে, শান্তভাবে ও দুর্জয় সত্যবাদিতার সহিত যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। এ বইয়ে যুদ্ধকে লইয়া ভাববিলাসিতা করা হয় নাই, রক্ত, কাদা ও বিভীষিকাকে রামধনুর বিচিত্র রঙে চিত্রিত করা হয় নাই।

যুদ্ধের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনকথা লিখিয়াছেন। যে নিরীহ মানুষগুলির মধ্যে মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নাই তাহাদেরই পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডের ঘৃণিত, কঠোর কাজ হিসাবেই যুদ্ধকে বর্ণনা করিয়াছেন বারবুস। এ বইয়ে কোন কবিত্বময় বা বীরত্বময় যুদ্ধের বিবরণ নাই, সৈন্যবিশেষের শৌর্যের বর্ণনা নাই। বারবুসের এ বই সত্যের কঠোর কাব্যে পরিপূর্ণ। জাতিতে জাতিতে বিরোধের পরম প্ররোচনা-দাতা পুঁজিবাদের নির্দেশে অনিবার্য ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে অগ্রসরমান লক্ষ লক্ষ মানুষের বর্ণনা রহিয়াছে এই বইয়ে। এই পুঁজির শয়তান, আমাদের মধ্যে অক্লান্ত কর্মরত এই একান্ত বাস্তব শয়তান—এই শয়তানই বারবুসের বইয়ের প্রধান চরিত্র। মত তত্ত্বের মিথ্যা ঝলসানিতে লক্ষ লক্ষ নির্বোধের চোখ ধাঁধাইয়া, এই মত ও তত্ত্ব দিয়া তাহাদের ইচ্ছাকে টুঁটি টিপিয়া মারিয়া এবং লোভ, ঈর্ষা ও লালসার বিষে

তাহাদের সর্বাঙ্গ জর্জর করিয়া এই শয়তানই তাহাদের ফ্রান্সের উর্বর প্রান্তরে লইয়া গিয়াছে যেখানে বহু যুগ ধরিয়া মানুষের মেহনত যা' কিছু গড়িয়াছিল সে সব কিছুই চার বছর ধরিয়া ধ্বংস ও নির্মূল করিয়াছে তাহারা। এই কাজের মধ্য দিয়া তাহারা আর একবার নিজেদের কাছে প্রমাণ করিয়াছে ইচ্ছাশক্তির ও বিচারশক্তির অভাবই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

যুদ্ধের প্রকৃতির গভীরে এতখানি দৃষ্টিক্ষেপ বারবুসের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এইভাবে তিনি মানুষের ভ্রান্তির বিপুলতা মানুষের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

মিথ্যা, ভণ্ডামী, নৃশংসতা, রক্ত ও পঙ্কিলতার যে স্তূপকে বলা হয় যুদ্ধ, এই বইয়ের প্রত্যেক পাতাটি সেই স্তূপের উপর সত্যের হাতুড়ীর আঘাত। এ গ্রন্থ নির্মম সত্যে ভীষণ এক বিষণ্ণ গ্রন্থ; কিন্তু বর্ণনার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া সব সময়ই নূতন চেতনার ছোট ছোট আলোকশিখা চোখে পড়ে এবং এ বিশ্বাস মনে জাগে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই ছোট ছোট শিখাগুলি বিশ্বব্যাপী দাবানলে পরিণত হইয়া পুঁজি-শয়তানের সৃষ্টি রক্ত, পঙ্কিলতা, মিথ্যা ও ভণ্ডামিকে পোড়াইয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া তুলিবে। যে মানুষদের কথা বারবুস লিখিয়াছেন তাহারা ইতিমধ্যেই মানুষের উপর ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সাহসের সহিত অস্বীকার করিতে শুরু করিয়াছে এবং মানুষের উপর মানুষের ক্ষমতা যে কতখানি অসহ্য পাপিষ্ঠতা, শীঘ্রই লজ্জা ও রাগের সহিত তাহাও তাহারা বুঝিতে পারিবে, ইহা তাহারই সুনিশ্চিত লক্ষণ।

আমরা বাস করিতেছি এক মর্মান্তিক যুগে। জীবনযাত্রা এখন অসহ্য কঠোর। কিন্তু আমরা সেই দিনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যেদিন স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন মেহনতের জন্য মানুষের মধ্যেকার সমস্ত শুভশক্তি জাগিয়া উঠিবে। ইহাই সত্য এবং এই সত্যই আমাদের সান্ত্বনা দিবে, আমাদের মধ্যে নূতন শক্তি ও সাহস জাগাইয়া তুলিবে।

—এম. গর্কি

উপরের কথাগুলি লেখা হইয়াছিল পনেরো বছর আগে। ইউরোপীয় পুঁজি-পতিদের দ্বারা প্রচুরভাবে অস্ত্রসজ্জিত রুশ পুঁজিপতি ও জমিদারদের সেনা-বাহিনী ও তাহাদেরই সাহায্যার্থে ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের প্রেরিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে উপবাসী শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রামের বিজয়ী অবসান ঘটিয়াছিল যে বৎসরে, সেই মর্মান্তিক ক্ষুধিত বৎসরেই লেখা হইয়াছিল উপরের কথাগুলি। এই সৈন্যদের মধ্যে একদল গাধায়-চড়া অশ্বারোহী (ক্যাভালরি) ব্রিগেড পর্যন্ত ছিল।

এই পনের বছরে জারশাসিত রাশিয়া ও তাহার [illegible] শ্রমিক-শ্রেণী অঘটনঘটনপটিয়সী অক্লান্ত শ্রমশক্তিবলে অর্ধনিঃস্ব চাষী ও অর্ধবর্বর [illegible]

পেতি-বুর্জোয়া অধ্যুষিত এক নিরক্ষর অন্তহীন বিশাল দেশকে বহুজাতির এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বে পরিণত করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য লইয়া আজ ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা আবার এক যুদ্ধের চক্রান্ত করিতেছে। এই যুদ্ধ আরম্ভ করিবার আগে পুঁজিপতিদের ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যে-দলটি সবচেয়ে লজ্জাহীন ও চেতনাহীন সেই দলটি নেপোলিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই ঐক্য আনিতে চাহে প্রতিবেশীকে মারিয়া, ভূপাতিত করিয়া। পরে টুঁটি টিপিয়া তাহাকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছুঁড়িয়া দিবে। ইহা একটি স্পষ্ট ও সহজ পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি শুনিয়াই আমার গর্দভদের কথা মনে পড়িতেছে।

আপনারা জানেন, ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে গর্দভদের কলংকময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নেতারা, রুশ মেনশেভিকদের ও সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারিদের নেতারা এবং পেতি-বুর্জোয়াদের আরও অনেক নেতা যাহাদের পুঁজিপতিরা এই পনের বছর ধরিয়া ফাশিস্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। আমার মনে হয়, এই দিক দিয়া বিচার করিলে বারবুস ও তাঁহার সহধর্মী লেখকদের রচনার সমাজ-বৈপ্লবিক তাৎপর্য বিশেষভাবে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। যে বইগুলি এই পনের বছরে হাজার হাজার রক্তপিপাসু মনকে শান্ত করিয়াছে, বারবুসের বইখানি তাহাদের সর্বপ্রথম। যে ফাশিস্তবিরোধী আন্দোলন আজ ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সেই আন্দোলনের কর্তব্য বারবুসকে তাহার প্রথম স্থাপয়িতাদের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃতিদান।

১১ই সেপ্টেম্বর, ...
(১৯৩৫)

—এম. গর্কি
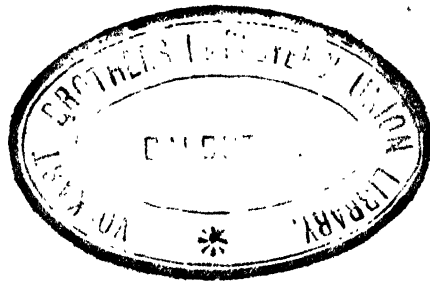
॥ সংস্কৃতি ॥

ফ্যাশিবাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই প্যারিসের লেখক-মহাসম্মেলনের মূল লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির সত্যকার অন্তর্নিহিত বস্তুটি কি, তাহা সমস্ত প্রতিনিধিই একইভাবে বুঝিবেন এবং ইহা লইয়া কোন মতভেদ হইবে না। কিন্তু সত্যই কি তাই?

বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবস্থা আজ ক্ষয় ও ভাঙ্গনের অবস্থা। ফ্যাশিবাদ এই বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই সৃষ্টি, বুর্জোয়া সংস্কৃতির উপর সে এক ক্যান-সারের স্ফীতি। ফ্যাশিবাদের তাত্ত্বিকেরা ও প্রয়োগকর্তা সেই সব ভাগ্যান্বেষীরা, বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের মধ্য হইতে যাহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইতালি ও জার্মানিতে বুর্জোয়ারা ফাশিস্তদের হাতে রাজনৈতিক ও কায়িক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে। ইতালীয় শহরগুলির মধ্যযুগীয় বুর্জোয়ারা ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের পরিচালকদের যে ম্যাকিয়াভেলীসুলভ ধূর্ততার সহিত নিয়ন্ত্রণ করিতেন, প্রায় সেই ধূর্ততার সহিতই জার্মানি ও ইতালির বুর্জোয়ারা ফ্যাশিস্তদের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ফ্যাশিস্তদের হাতে শ্রমিকদের উচ্ছেদসাধনকে তাহারা যে শুধু খুশিমনে উৎসাহ দেয় নাই, লেখক ও বিজ্ঞানীদের শাস্তি দিতে ও রুশ হইতে তাড়াইয়া দিতেও ফ্যাশিস্তদের তাহারা বাধা দেয় না। অথচ ইহারাই তাহাদের মানসশক্তির প্রতিনিধি, এই সেদিন পর্যন্তও যাহারা ছিল তাহাদের গর্ব ও দম্ভের বস্তু।

আর একটি বিশ্বযুদ্ধের সাহায্যে নূতনভাবে 'দুনিয়া বাঁটোয়ারার' জন্য সাম্রাজ্যবাদী-প্রভুদের মনে যে ইচ্ছা জাগিয়াছে সেই ইচ্ছাপূরণের জন্য ফ্যাশিবাদ এই

তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে যে, সমস্ত জগতকে ও অন্য সমস্ত জাতিকে শাসন করিবার অধিকার আছে জার্মান জাতির। ইহা ফ্রিড্রিখ নিট্শের বিকৃত মনের সৃষ্টি 'শ্বেত জানোয়ারের' শ্রেষ্ঠত্বের সেই বহুবিস্মৃত তত্ত্ব। ভারতীয়, ইন্দোচীনা, মেলানেশিয়ান, পলিনেশিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি জাতিগুলি লালচুল ও সাদা মাথা-ওয়ালা জাতিদের দ্বারা শাসিত হইতেছে—এই ঘটনা হইতেই এই তত্ত্বের সৃষ্টি। অস্ট্রীয় ও ফরাসী বুর্জোয়াদের পরাজিত করিয়া জার্মান বুর্জোয়ারা যখন বৃটিশ, ডাচ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনে ভাগ বসাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতে শুরু করিল, তখনই এই তত্ত্বের বিকাশ হয়। সমগ্র দুনিয়ার উপর শ্বেত-জাতির প্রতিযোগীহীন কর্তৃত্বের অধিকারের তত্ত্ব হইতেই প্রত্যেক জাতীয় বুর্জোয়াদল শুধু সমস্ত কৃষ্ণাংগ জাতিকে নহে, নিজেদের শ্বেতাংগ ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের পর্যন্ত বর্বর বলিয়া মনে করিতেছে এবং বর্বর বলিয়াই তাহাদের পদদলিত রাখা অথবা ধ্বংস করার কথা চিন্তা করিতেছে। ইতালি ও জাপানের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই এই তত্ত্বকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে শুরু করিয়াছে। 'সংস্কৃতির' আধুনিক ধারণার মধ্যে এই তত্ত্বটির একটি বিশেষ বাস্তব স্থান রহিয়াছে।

বুদ্ধিজীবীদের অতি-উৎপাদন ঘটিয়া গিয়াছে, শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, 'অন্তরায়' সৃষ্টি করিতে হইবে সংস্কৃতির বিকাশের পথে, যন্ত্রপাতির সংখ্যা পর্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং হস্তশিল্পে ফিরিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে—ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তারস্বরে এই কথাগুলি ঘোষণা করিতেছেন। তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ইয়র্কের আর্ক-বিশপ বোর্নমাউথের একটি স্কুলের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি দেখিতে চাই, সমস্ত আবিষ্কার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি আমি 'ইন্টার্নাল কমবাস্শন ইঞ্জিন' তুলিয়া দিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহা দিতাম।" তাহার দোচ্যুত পেশার সহযোগী ক্যান্টারবেরীর আর্কবিশপ যন্ত্রের প্রয়োজন স্বীকার কারণ তিনি সোবিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' প্রচার করিতে-তেছেন এবং বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন আগামী যুদ্ধ হইবে 'যন্ত্রের যুদ্ধ।' খৃস্টের লণ্ডন ও রোমের পার্থিব প্রতিনিধিদের এই বক্তৃতাগুলি এবং অনিবার্য সামাজিক বিপর্যয়ের আতঙ্কে অথবা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণায় উন্মাদ যে বুর্জোয়ারা, সাংস্কৃতিক বিকাশ রোধের জন্য প্রচার চালাইতেছেন তাহাদের বক্তৃতাগুলি যদি, ধরুন, ১৮৮০ সালে প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে বুর্জোয়ারাই এই বক্তৃতাগুলিকে মূঢ়তার নিদর্শন ও বর্বরতার যুগে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান বলিয়া আখ্যাদান করিত।

আজ যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর চোখে সাহস ও লজ্জাহীনতার মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই, তখন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তনের আহ্বানকেই বলা হইতেছে 'দুঃসাহসী কল্পনা।'

অতএব আমরা দেখিতেছি, ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতি 'কোনও একী-

ভূত পদার্থ' নহে, অথচ বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা ইহাকে এই আখ্যাই দিয়া থাকেন। ইহার 'জনশক্তি' ভাঙিয়া গিয়া পরিণত হইয়াছে দোকানী ও ব্যাঙ্কারে যাহারা অন্য সমস্ত মানুষকেই শস্তা ও পর্যাপ্ত পণ্য বলিয়া গণ্য করে এবং যাহারা যে কোন প্রকারে সমাজে নিজেদের উচ্চ ও আরামের অবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে চায়; পরিণত হইয়াছে ফাশিস্তে যাহাদের হয়ত এখনও মানুষ বলা চলে, কিন্তু যাহারা কয়েক যুগব্যাপী সুদীর্ঘ নেশার ফলে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং রক্তাক্ত ঘৃণিত পাপকার্য বন্ধ করিবার জন্য যাহাদের কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে আরও কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে।

* * *

মরিস বুর্দে নামক কোন ব্যক্তি মনে করেন, 'সংস্কৃতির সীমা নির্ধারণ ও সঙ্কোচন করা প্রয়োজন ও সম্ভব।' শ্রম অথবা কায়িক, যান্ত্রিক বা মানসিক সংস্কৃতিই মূল সৃজনীশক্তি। এই প্রবন্ধের লেখক মনে করেন, মূলত এবং ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক মতাদর্শই একটি যন্ত্রবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অর্থাৎ শ্রম ও যুক্তিসম্মত এমন একটি ব্যবস্থা যাহার সাহায্যে মানুষ ধীরে ধীরে দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য তাহার বিশ্বদৃষ্টিকে বিস্তৃত করে। আমরা দেখিতেছি আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণী যাহা-আছে তাহা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং বিরাট এক বেকারবাহিনী সৃষ্টি করিয়া, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসাররোধের জন্য আন্দোলন চালাইয়া, উচ্চশিক্ষালয়, মিউজিয়াম প্রভৃতির রক্ষণ ব্যয় কমাইয়া সত্যসত্যই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে 'সংস্কৃতির সাধারণ বিকাশের পথ তাহারা রোধ করিতেছে'। আমরা জানি, একমাত্র শিল্প যাহা বিনা বাধায় কাজ করিতেছে এবং যাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা হইতেছে যুদ্ধশিল্প। এ শিল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষকের হত্যাসাধন। কোন্ জাতীয় বুর্জোয়া উপদল অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করিবে? এই আন্তর্জাতিক বিরোধের ফয়সালা করিতে চায় পশ্চিমী ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই যুদ্ধক্ষেত্রেই। পদদলিত প্রতিবেশীর রক্তে স্ফীত হইয়া উঠিবার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন সেই যুদ্ধের সামরিক অধিকর্তারা প্রকাশ্যেই ধীর শান্তভাবে ঘোষণা করিতেছেন যে, এই যুদ্ধ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ অপেক্ষা আরও বেশী রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক হইবে। গত যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা এখানে স্মরণ করা উচিত। এই যুদ্ধে যে ক্ষতি ও ধ্বংস হইয়াছিল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর মেহনতের ফলে ইতিমধ্যেই তাহা পূরণ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর উন্মত্ততার জন্য ক্ষতি হইয়াছে যে শ্রেণীগুলির সবচেয়ে বেশী, মেহনত দিয়া ক্ষতিপূরণ করিল সেই শ্রেণীগুলিই।

ঘটনাগুলি এই। ১৯১৫ সালেই জার্মানিতে লুব্রিক্যান্ট তেলের অভাব ঘটে। অভাব এত তীব্র হয় যে, এক ব্যারেল 'লুব্রিকেটিং' তেলের জন্য কোপেনহেগেনে তাহারা ১৮০০ মার্ক দেয়। ঐ সময় তাহার দাম ২০০ মার্কের বেশী

ছিল না। বার্লিনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডিসেম্বর মাসে তাঁহার গভর্ণমেন্টকে লিখিলেন যে, 'লুব্রিকেটিং' তেলের অভাবেই জার্মানি শীঘ্রই পরাজিত হইবে। অথচ, ঠিক এই সময় বৃটিশ জাহাজে করিয়া ব্যারেলভর্তি হইয়া কোপেনহেগেনে এই অতিপ্রয়োজনীয় তেল আসিতেছিল। বৃটিশ বোর্ড অব ট্রেডের পরিসংখ্যান হইতে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে জার্মানির কয়লার ঘাটতি পড়িত, যদি সে স্কান্ডিনেভীয় দেশগুলির মধ্য দিয়া বৃটিশ কয়লা না পাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইডেন ৩৩,০০০ টন কয়লা পায় এবং ইহার প্রায় সবটাই সে 'কেন্দ্রীয় শক্তিপুঞ্জের' হাতে তুলিয়া দেয়।

শুধুমাত্র বৃটেনের এই বীভৎস উদারতার জন্যই ১৯১৭ সালের জুন মাসে লুডেনডর্ফ সেনাবাহিনী হইতে ৫০,০০০ লোককে রুর কয়লাখনিগুলিতে কাজ করিতে দিতে অস্বীকার করিলেন।

সুইডেনে কয়লা রপ্তানীর পরিমাণ এক লক্ষ এমন কি দেড়লক্ষ টনে গিয়া পেঁাছিল। যুদ্ধের আগে এই দেশটিতে বছরে যে পরিমাণ কয়লা লাগিত, ইহা তাহার দ্বিগুণ। কোপেনহেগেনের বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার রালফ্ পাজেট জানাইলেন যে এই কয়লা বৃটিশ সৈন্যদের হত্যায় সাহায্য করিতেছে। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কান দিল না।

প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের মধ্যে ফরাসী দোকানদারেরা তাহাদের শত্রু জার্মান দোকানদারদের নিকেল ও দস্তানা সরবরাহ করিয়াছিল, একজন বৃটিশ কামান প্রস্তুতকারক কোন জার্মান প্রস্তুতকারকের সহিত মারণাস্ত্রের আবিষ্কার বিনিময় করিয়াছিল। আরও এমন অনেক ঘৃণিত পাপ ঘটনা হয়ত প্রকাশ হয় নাই অর্থাৎ এখনও জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। এখান হইতেই দেখা যাইতেছে, যুদ্ধ বাণিজ্যের বাধা সৃষ্টি করে না, 'ঝগড়া' করিয়া প্রেমিকেরা 'আনন্দই' পায়—কিন্তু কোটি কোটি শ্রমিক ইহার জন্য নিজেদের রক্ত ও জীবন দান করে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রমিকেরা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, নিজের হাতে নিজের শ্রেণীভ্রাতাদের হত্যা ও পঙ্গু করা মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয় এবং যুদ্ধের পরে এককণা অন্নের জন্য তাহাদেরই আবার যুদ্ধে দোকানদারদের যত কিছু ক্ষতি হইয়াছে তাহা মেরামতের কাজ করিতে হইবে। সহজ, স্পষ্ট ও সত্যকার *মানবতাবাদ*। বিচারবুদ্ধি বলে যে, মেহনতের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক হইবে মেহনতী মানুষই, যে তৈয়ারী করিতে হুকুম দিয়াছে সে নহে। অস্ত্র—সমস্ত অস্ত্রই—শ্রমিকদের মেহনতের উৎপন্ন দ্রব্য।

'বর্তমান বুর্জোয়াশ্রেণীর' পশ্চিম ইউরোপীয় 'সংস্কৃতির ভিত্তি গ্রীক-রোমান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তির উপর'—এই ধারণার প্রকৃত অর্থ কি আমরা ইতিমধ্যেই তাহার কিছুটা জানিতে পারিয়াছি। 'আন্তর্জাতিক নীতিবোধ' হইতে কিছুটা আনিয়া ইহার সহিত যোগ দিতে হইবে, বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী এই জোটের

যাহা করিয়াছে জুড়িয়া দিতে হইবে তাহার খানিক। এই বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়াশ্রেণী বহু পূর্বেই প্রতিবেশীদের মধ্যে 'বিশ্বাসঘাতক' নাম কিনিয়াছে। 'বিশ্বাসঘাতক' অর্থাৎ নির্লজ্জ ও ভণ্ড। আপনারা জানেন, বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহার মূল কথাটি এই যে, জার্মানির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে ফরাসী ব্যবসায়ীদের সে রক্ষা করিবে। এমন কথাও বলা হইয়াছিল যে, "বৃটেনের সীমান্ত রাইন নদীর উপর।" এই কথাটি এখন দ্ব্যর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত আপোষ করিয়াছে। হয়ত এখনও বৃটেনের সীমান্ত রাইন নদীর উপরই রহিয়াছে, কিন্তু তাহা ফরাসীদের রক্ষার জন্য নহে, ইংরাজ ও জার্মানদের হাতে তাহাদের পরাজয়ের পর। যাহাদের 'সম্মান অথবা বিবেক নাই', তাহাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

* * *

ফরাসী সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ

"আমাদের সংস্কৃতি বহু শতাব্দীর পুরাতন সংস্কৃতি। গ্রীক ও রোমানদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে এই সংস্কৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে। এই সংস্কৃতি কি সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিজের লক্ষ্যপানে আগাইয়া চলিবে অথবা যে নূতন সংস্কৃতি মননশীলতার উপর অর্থনীতির প্রাধান্যকে ঘোষণা করিতে প্রস্তুত হইতেছে তাহার পায়ে আত্মসমর্পণ করিবে?"

'মননশীলতার উপর অর্থনীতির প্রাধান্যের' কথা বলিতে গিয়া চিন্তা না করিয়াই সাংবাদিক মহোদয়েরা যান্ত্রিকভাবে নিজেদের অজ্ঞতা কিম্বা নির্লজ্জতার দ্বারা নিজেদের প্রভাবিত হইতে দিয়াছেন। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে, ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বুদ্ধির 'স্বাধীনতার' শিশুসুলভ সরল মোহ এখনও কাটে নাই, যদিও তাঁহারা সম্পূর্ণভাবেই সম্পাদকদের অধীন এবং সম্পাদকেরা আবার পত্রিকামালিকদের অর্থাৎ ব্যাংকার, লর্ড ও কামান প্রস্তুত-কারকদের অধীন। সরল সাংবাদিকেরা—যদি অবশ্য সরল সাংবাদিক বলিয়া কেহ থাকেন তবে তাঁহারা—খোলা মন লইয়া একটু মনোযোগের সহিত যদি চারিদিকে তাকাইয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, স্থূলতম জড়বাদীরূপে অভিব্যক্ত মাকড়সাদের 'অর্থনীতি'র প্রাধান্য কেবল বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতেই, এবং 'সংস্কৃতির নূতন রূপের' লক্ষ্য এই অর্থহীন অর্থনীতির স্বেচ্ছাচার হইতে মেহনতী মানুষকে মুক্ত করা। স্যার বেসিল জাখারভ, ডিটারডিং, ভিকার্স, ক্রেউসট, হার্স্ট, শ্নিডার ইভার, ক্রুগার, স্তাভিস্কি প্রমুখ আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির অধিকর্তাদের 'মনোবৃত্তি'ই এই অর্থনীতির সৃষ্টি করিয়াছে। যে সমাজে সাংবাদিকসহ সকল মানুষকেই ছাগল-ভেড়া বা লাউ-কুমড়োর মত 'স্বাধীনভাবে' কেনাবেচা যায়, সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, কথা বলা পর্যন্ত হাস্যকর।

আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির গলিত আবহাওয়া যে কত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ জুয়াচুরির বিপুল প্রাধান্য এবং শুধু জুয়াচুরি

নয়, ছিঁচকে জুয়াচুরি। প্রবঞ্চনার এই স্বল্পত্ব হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বিশেষ প্রতিভাটিও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, 'একটি বিশেষ ধরনের চরিত্রের অধোগতি' হইতেছে। স্তাভিস্কি অথবা 'দিয়াশলাইয়ের রাজা' ইভার ক্রুগারের তুলনায় জন ল' একজন প্রতিভা।

আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্নীতি ও অধঃপতনের রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বাসঘাতকদের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে এবং এই বিশ্বাস-ঘাতকদের পাপকর্মের পাপিষ্ঠতা বৃদ্ধির মধ্যে। ১৯২০ সালের আগে 'রক্তলোভী শিকারী কুকুর' বলিয়া আত্ম-অভিহিত নোস্‌কে, এবার্ট, হাসের মত তাহাদের সহকর্মীদের এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের মত বিশ্বাস-ঘাতকদের দেখা দুনিয়ায় একদম পাওয়া যাইত না বলিলেই চলে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার ও অভ্যাসের যে ছবি ইউ-রোপীয় সাংবাদিকরা নিরুদ্বিগ্নভাবে দিনের পর দিন আঁকিয়া যান তাহা এক অস্বস্তিকর, ভয়াবহ ছবি। বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, রক্ত ও পঙ্কিলতার মধ্যে অহোরাত্র কাজ করিবার পেশাগত অভ্যাস সাংবাদিকদের অনুভূতির ধার নষ্ট করিয়া দেয় এবং প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী হইতে সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ইচ্ছাও তাহার মরিয়া যায়। নিষ্ক্রিয়, নিরাসক্তভাবে ঘটনাগুলি পেশ করিয়া বুর্জোয়া পাঠককে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এই রক্তাক্ত পঙ্কিলতাকে তাহারা আরও স্থূলভাবে আঁকে। এবং বুর্জোয়া পাঠকও অপরাধের বিবরণ পড়িয়া আরও বেশী নির্লজ্জ ও নির্বোধ হইয়া ওঠে। আমরা জানি, মাঝারি ও পেতি বুর্জোয়াদের মধ্যে অপরাধ-মূলক উপন্যাসই সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্য।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই ক্ষয় ও পঙ্কিলতার আবহাওয়ায়, কোন্ কোন্ রূপের মধ্যে 'গ্রীক ও রোমানদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে' রক্ষা করা হইতেছে? 'বৈষয়িক' মূল্যবোধ হিসাবে মিউজিয়মে, কোটিপতিদের সংগ্রহশালায়, মেহনতী জনসাধারণ ও পেতি বুর্জোয়াদের নাগালের বাহিরে এইগুলিকে রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, এস্‌কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডস প্রমুখদের গ্রন্থা-বলীর মত 'মানস' মূল্যবোধও রহিয়াছে। এগুলিকে রঙ্গমঞ্চে দেখানো উচিত, কিন্তু ইউরোপে তাহা দেখানো হয় না। বুর্জোয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপকেরা রোমান আইন ও প্রাচীন গ্রীকদর্শন প্রভৃতির মূল্যবোধ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। এগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন এমন-কি মধ্যযুগীয় মানবতাবাদ পর্যন্ত রহিয়াছে। বর্তমান জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই মূল্যবোধগুলিকে আবিষ্কার করিবার এবং তাহাদের ব্যবহারিক শিক্ষাগত মূল্য ব্যাখ্যা করিবার ভার আমরা ইউরোপীয় সাংবাদিকের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন রোমের সহিত বর্তমান ইউরোপের যদি কোন মিল থাকিয়া থাকে, তবে সে রোম ক্ষয় ও পতনের যুগের রোম।

* * *

বর্তমান ইউরোপের অধিপতিশ্রেণীর এই ক্ষয় ও ভাঙনের নাটকে বুর্জোয়া

বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এক অদ্ভুত বিষম ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কথায় আছে, 'যে যেমন সে তেমনটিকেই আঁকড়াইয়া থাকে।' এক পুরাতন অচল সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের শ্রেণীর শক্তিকেই রক্ষা করিতেছে। যন্ত্র-বিজ্ঞান ও মতাদর্শ উভয় দিক হইতেই কম-বেশী উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বুদ্ধি-জীবীরাই এই শক্তির সেবা করিয়া আসিতেছেন, এবং আজও করিতেছেন। ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এই বুদ্ধিজীবীদের হাজার হাজারকে সাধারণ সৈন্য হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠায় এবং পরস্পরকে হত্যা করিতে বাধ্য করে। পঙ্গু, বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত অথবা নিহত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই 'সংস্কৃতির প্রভুরা' নগরের পর নগর ধ্বংস করিতে, উর্বরা জমি নিষ্ফলা করিতে ও সংস্কৃতি ধ্বংস-কারী অন্যান্য কাজে সর্বশক্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছে।

এই বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই ছিল নিঃস্ব সর্বহারা, তবু সম্পত্তিবানদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করিবার জন্য তাহারাই আত্মঘাতী অভিযানে নিজেদের ধ্বংস করিয়াছে। তারপর শত শত বুদ্ধিজীবী বই লিখিয়াছে যুদ্ধের উন্মত্ততা বর্ণনা করিয়া ও যুদ্ধকে অভিসম্পাত দিয়া। আজ বুর্জোয়ারা আবার, আরও বড় আকারে, এক আন্তর্জাতিক ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করিতেছে। সাম্প্রতিক অতীতে সাংস্কৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্য নমুনা ও সঞ্চয়গুলি যুদ্ধের হাত হইতে রেহাই পায় নাই, অতএব আগামী যুদ্ধে বৃটিশ মিউজিয়াম, লুভর্, কাপিটোল এবং প্রাচীন রাজধানীগুলির অসংখ্য মিউজিয়মের ধূলিসাৎ হইবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এবং বলা বাহুল্য, আগামী যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ জোয়ান শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে মানসশক্তির আধাররূপ হাজার হাজার 'সংস্কৃতির অধিকর্তারা'ও ধ্বংস হইবেন। কারণ কি? কারণ, দোকানী—ব্যাঙ্কারদের প্রতিটি বড় দল চায় প্রতিবেশীকে পরাধীন করিয়া লুণ্ঠন করিতে। ইহাও বারম্বার তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবির্ভূত বুর্জোয়া যুদ্ধগুলি সশস্ত্র লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছুই নহে, অর্থাৎ বুর্জোয়া দলের আইনেই ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কী বিপুল পরিমাণ সুচিন্তিত, মহামূল্য শ্রমশক্তি, ধাতুসম্পদ ও আবিষ্কারকেই যে এই দোকানদারেরা গতকাল ধ্বংস করিয়াছে ও আগামীকাল ধ্বংস করিতে চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে বুর্জোয়া সংঘর্ষ-সংঘাতের নির্বোধ পাপিষ্ঠতাকে আরও অসহ্য মনে হয়। কত শহর, কত কল, কত কারখানা যে ধূলিসাৎ হইবে, কত চমৎকার জাহাজ যে ভরাডুবি হইবে, কত জমি যে বন্ধ্যা হইয়া পড়িয়া রহিবে! নিহত হইবে অসংখ্য শিশু। সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যাইবে, মেদস্ফীত শ্রেণীর পাপিষ্ঠ উন্মত্ততা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই যে, নিজেদেরই হাতের কাজ ধ্বংস করিবার জন্য এবং পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের তাহারা বাধ্য করে।

সম্পত্তিবানদের স্থূল, পশুজগতসুলভ জড়বাদই 'অর্থনীতির প্রাধান্যের' [illegible] অভিব্যক্তি। স্ফীতদেহ দ্বিপদ মাকড়সাদের এই লুণ্ঠনের জড়বাদকে

আজ অন্ন ধর্ম ও দর্শনের জীর্ণবাস দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় না। ফ্যাশিবাদ ও জাতি কৌলীন্যতত্ত্ব সশস্ত্র লুণ্ঠনের নির্লজ্জ নগ্ন প্রচারমাত্র। এইখানেই রহিয়াছে আধুনিক 'বুর্জোয়া' সংস্কৃতির 'মর্মবাণী', ঘৃণিত, লজ্জাকর মর্মবাণী। এই মর্মবাণী আজ যে দেশে সবচেয়ে নির্লজ্জ নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সে দেশ হইতে আজ সৎ বুদ্ধিজীবীরা শ্বাসরুদ্ধ হইবার ভয়ে পালাইয়া আসিতেছেন। পালাইয়া যে সকল দেশে তাঁহারা আসিতেছেন, শ্রমিকশ্রেণী বাধা না দিলে ঐ সকল দেশেও আগামীকাল এ একই ঘটনা ঘটিবে। এ প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক ঃ রাষ্ট্রক্ষমতার কী অধিকার আছে আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর, যে-শ্রেণী ত্যাগ করিয়াছে নিজের সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে, হারাইয়া বসিয়াছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার শক্তি, বেকারী সৃষ্টি করিতেছে ক্রমেই ভীষণতর আকারে, যুদ্ধের জন্য নির্লজ্জভাবে শোষণ করিতেছে কৃষকশ্রেণীকে, শ্রমিকশ্রেণীকে, উপনিবেশগুলিকে? সমগ্র জগতের শ্রমশক্তি ও সৃজনী শক্তিকে যে-শ্রেণী মূঢ়ের মত অপচয় করিয়া চলিয়াছে, সংখ্যায় যে-শ্রেণী মুষ্টিমেয় ও প্রকৃতিতে পাপী ও অপরাধী, কী অধিকার আছে সে-শ্রেণীর বাঁচিয়া থাকিবার ও শাসন করিবার? তথাপি, এই শ্রেণীই নিজের রক্তাক্ত মুঠিতে ধরিয়া রাখিয়াছে প্রায় দুইশত কোটি ইউরোপীয়, ভারতীয়, চীনা ও আফ্রিকান চাষী ও মজুর। আর একটি ঘটনার পাশাপাশি যদি এই ঘটনাটিকে আমরা দেখি, তবেই এই ঘটনার অবিশ্বাস্য নৃশংসতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এমন দেশ আছে যেখানে সমগ্র শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের ইচ্ছা ও যুক্তি এমন এক কর্মের দ্বারা উদ্দীপিত ও শিক্ষিত হইয়া ওঠে, যে কর্ম শুধু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, প্রত্যেক শ্রমরত মানুষের পক্ষেও কল্যাণকর। এমন দেশ আছে যেখানে সমগ্র শ্রমশক্তি নবজীবন নির্মাণের, নূতন সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গঠনের, বহুমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

এমন দেশ আছে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া জোসেফ স্তালিনের পরিচালনায় 'জমির' মূঢ় অত্যাচার হইতে, প্রকৃতির খেয়ালের পায়ে নিরীহ আত্মসমর্পণের অবস্থা হইতে, ব্যক্তিগত মালিকানার শ্বাস-রোধকারী প্রভাব হইতে কৃষকশ্রেণীকে মুক্ত করিয়াছে—যেখানে শ্রমিকশ্রেণী সম্পত্তির মালিককে সমবায়ীতে পরিণত করিয়াছে।

এমন দেশ আছে যেখানে যে-শ্রমিকশ্রেণী একদিন ছিল বুর্জোয়া সমাজের হীন ক্রীতদাস সেই শ্রমিকশ্রেণীই আজ প্রমাণ দিতেছে যে, জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হইলে নিপুণ ও চূড়ান্তভাবেই সে সংস্কৃতিকে অধিগত করিতে পারে, পারে নিজে সংস্কৃতি সৃষ্টি করিতে।

এমন দেশ আছে, যেখানে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক সৃষ্টি সমগ্র মেহনতী জনসাধারণ উপভোগ করে—সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে এত গভীরভাবে উপভোগ কোথাও কেহ

করে না—যেখানে এই উপভোগ ব্যক্তির বিকাশ ও শ্রমবীরত্বে অবিশ্রাম বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

এমন দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেক যে নারী, সেই নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার উপভোগ করে এবং বিশ্ব পুনর্নির্মাণে বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগের সর্বক্ষেত্রেই বীরত্বের সহিত পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করে; যেখানে নারীর ধীশক্তি, সাহস ও শ্রমোদ্দীপনা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

এমন দেশ আছে যেখানে ধর্মানুশাসনের পঙ্গুকারী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া শিশুরা মানুষ হয়। খৃষ্টীয় ধর্মানুশাসনের লক্ষ্য মানুষের মনে ধৈর্য, নিরীহতা ও 'অধিষ্ঠিত ক্ষমতার' প্রতি আনুগত্যের ভাবধারা সঞ্চারিত করা।

এমন দেশ আছে যেখানে, আগে যাহারা ছিল বিভিন্ন, বিচিত্র, এমন-কি সংখ্যাল্প অর্ধবর্বর উপজাতি, আগে যাহাদের নিজেদের কোন বর্ণলিপি ছিল না, কিন্তু আজ তাহারা বর্ণলিপি পাইয়াছে, পাইয়াছে স্বাধীনভাবে বিকাশলাভের অধিকার; আজ তাহারা সারা জগতের সম্মুখে নিজেদের অনুভূতির আদিম সজীবতা, নিজেদের সৃজনী শক্তির ও নিজেদের কাব্যের অপূর্ব সরলতার পরিচয় দিতেছে।

এমন দেশ আছে যেখানে, অতীতে একদিন জার ও দোকানদের ঔপনিবেশিক নীতির পীড়নে পীড়িত ছিল প্রাচীন উপজাতিদের সংস্কৃতি এবং যেখানে আজ সেই উপজাতিরাই তাহাদের মহীয়সী ধীশক্তি ও মুক্ত মানসলোকের মহামূল্য ঐশ্বর্যের পশরা সাজাইয়া রাখিতেছে জগৎসমক্ষে।

এই দেশে মেহনতী জনতার ইচ্ছার বাধা ছাড়া শিল্পী-বিজ্ঞানীদের অন্য কোন বাধা নাই। মানবজাতির সমগ্র প্রকৃত সাংস্কৃতিক সম্পদকে অধিকার করাই মেহনতী জনতার ইচ্ছা।

কিন্তু, এই দেশটিকে ঘিরিয়া আছে শত্রু। দেশটির সম্পদের প্রতি এই শত্রু ঈর্ষার চোখে তাকায়, দুনিয়ার মেহনতী মানুষের উপর এই দেশের কল্যাণকর প্রভাবের কথা ভাবিয়া আতঙ্কে এই শত্রুর বুক কাঁপিতে থাকে, সে এই দেশটির উপর দস্যুর মত হানা দিবার স্বপ্ন দেখে। ফলে, ভবিষ্যতকে গড়িবার অত্যাবশ্যক উপকরণরূপে অতীতকে জানিবার যে আকুল আগ্রহ এই দেশের বুকে জাগিয়া রহিয়াছে, শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষা আয়োজনের প্রয়োজনে সেই আগ্রহকে সংযত রাখিতে হয়। দেশরক্ষার প্রয়োজনই দেশের সম্পদবৃদ্ধি ও বৈষয়িক সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ কিছুটা রুদ্ধ করিতেছে। অতীতকে জানিবার আগ্রহ কিছুটা ব্যাহত হইবার আর একটি কারণ, বুর্জোয়া সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের মধ্যে মধু ও বিষ একত্রে মেশানো রহিয়াছে এবং মানুষের ঐতিহাসিক অতীত সম্পর্কে বুর্জোয়া বিজ্ঞানের প্রচারিত 'সত্য' অনেকটা প্রবীণা ও অভিজ্ঞা [illegible] নিজেদের অপাপবিদ্ধা বালিকারূপে চালাইবার চেষ্টার মত।

শ্রমিকশ্রেণীর চোখে ব্যক্তিমানুষ মহামূল্য সম্পদ। এমন কি যদি কোন

মানুষের মধ্যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কোন প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং যদি সে কিছুকাল সমাজের পক্ষে বিপজ্জনকভাবে কাজ করে তথাপি তাহাকে কারাগারের কর্মহীনতার দুর্নীতিপুষ্ট আবহাওয়ায় রাখা হয় না, তাহাকে এমন শিক্ষাদান করা হয় যাহাতে সে একজন দক্ষ শ্রমিকে অর্থাৎ সমাজের একজন কার্যকরী সভ্যে পরিণত হইতে পারে। 'অপরাধী' সম্পর্কে এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত মনোভাব শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় মানবতারই অভিব্যক্তি। যে সমাজে মানুষের কাছে মানুষ নেকড়ের সামিল, সে সমাজে কোন দিন এ মানবতা ছিল না, থাকিতে পারে না।

সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র সংঘের বিজ্ঞ শ্রমিক-কৃষক সরকার মেহনতী জনসাধারণের, বিশেষত শিশু ও কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কায়িক উৎকর্ষসাধন ও কায়িক স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও তাহারা সমান দৃষ্টি রাখেন। এই উদ্দেশ্যে 'সারা ইউনিয়ন চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান' স্থাপিত হইয়াছে। মানবদেহের সর্বাঙ্গীন অনুশীলনের জন্য এই ধরনের প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে এই প্রথম। বহু সংখ্যক আবিষ্কার আজ দ্রুত ও সক্রিয়ভাবে দেশকে সম্মুখ করিয়া তুলিতেছে ও দেশের ভৌগোলিক রূপের পরিবর্তন ঘটাইতেছে। শিল্প বাড়িয়া চলিয়াছে অবিশ্রাম গতিতে, কৃষিকে নূতনভাবে সংগঠিত করা হইতেছে, নূতন খাদ্য-শস্য ও ফলের গাছের আবাদ হইতেছে, মূল শস্য ও বীজ শস্যের চাষ ক্রমেই বেশী করিয়া উত্তরাঞ্চলে প্রসারিত হইতেছে, জল নিস্কাশন করিয়া জলাভূমি শুকাইয়া ফেলা হইতেছে, সেচব্যবস্থার দ্বারা মরু অঞ্চলকে জলসিক্ত করিয়া তোলা হইতেছে, নদীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে, প্রতি বৎসর নূতন নূতন বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে, নূতন নূতন অঞ্চলে কয়লা, তেল, ধাতুমৃত্তিকা ও খনিজ সারের সন্ধান মিলিতেছে, জয় করা হইতেছে মেরু অঞ্চলকে;—এ সব অবশ্য পূর্ণ বিবরণ নহে। এই কর্মকাণ্ডধারা অব্যাহত রাখিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের অভাব ঘটিতেছে যখন একটি দেশে, ঠিক তখনই ইউরোপ ও আমেরিকার পশারীরা কোটি কোটি বেকারের এই বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে। সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র সংঘে এ সব ঘটিয়াছে বিশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে। দেশের জন-সাধারণের প্রতিভা ও শ্রমবীরত্বের ইহা অপেক্ষা বড় সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে! এই ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে যে, আমাদের দেশে মেহনত শিল্পের পর্যায়ে উঠিয়াছে এবং লেনিনের শিক্ষা ও পার্টি এবং জোসেফ স্তালিনের অফুরন্ত, চিরবর্ধমান কর্ম-শক্তিতে চালিত সোবিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতেছে, মেহনতী মানুষের এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছে। ইহার পাশে বর্তমান বুর্জোয়াশ্রেণীর 'সংস্কৃতির' প্রকৃত বাস্তব অর্থ কি?

এখানে সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণভাবে যে ক্রিয়াকাণ্ডের কথা বিবৃত করা হইল, শ্রমিকশ্রেণীর মানবতার, মার্কস ও লেনিনের মানবতার প্রচণ্ড সৃজনী ক্ষমতাই তাহার বনিয়াদ ও প্রেরণাশক্তি। যে মানবতাকে তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি বলিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী এই সেদিন পর্যন্ত দম্ভ করিত, এ মানবতা সে মানবতা নহে। এই দুই মানবতার মধ্যে নামে ছাড়া অন্য কিছুতেই মিল নাই। দুইয়েরই

নাম মানবতা। কিন্তু অন্তর্নিহিত সারবস্তুতে একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। পাঁচশত বছর আগে যে মানবতার জন্ম হইয়াছিল, সে মানবতা ছিল সামন্তদের ও সামন্তবাদচালিত গীর্জার হাত হইতে বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মরক্ষার উপায়। পণ্য-প্রস্তুতকারক অথবা বণিক-ব্যবসায়ী ধনী বুর্জোয়া যখন মানুষের সাম্যের কথা বলিত, তখন তাহার মনে থাকিত সামন্তবাদীদের সহিত, কবচকুণ্ডলধারী নাইট-যোদ্ধাদের সহিত অথবা শুভ্র বহির্বাসপরিহিত বিশপের সহিত নিজের সমতার কথা। বুর্জোয়া মানবতা নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিয়াছে দাসত্ব ও দাসব্যবসায়ের সহিত, সংশয়ীদের বিরুদ্ধে গীর্জার নৃশংস শাসনব্যবস্থার সহিত, তুলো আলবিজেনসেসের ব্যাপক নরহত্যার সহিত, গিওর্দানো ব্রুজোর যূপকাষ্ঠে, জান হুস ও লক্ষ লক্ষ অনামী 'অবিশ্বাসী', 'ডাইনী', কারিগর ও চাষীকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যার সহিত। বাইবেল ও গস্‌পেল্‌সের (ভগদ্বাণীতে) আদিম সাম্যবাদের সুরে মুগ্ধ হইবার অপরাধের জন্যই চলিয়াছিল এই জীবন্ত দাহনের হত্যাযজ্ঞ।

গীর্জা ও সামন্তপন্থীদের এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী কি কোনদিন দাঁড়াইয়াছে? শ্রেণী হিসাবে—কখনো নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তি-বিশেষ কখনও কখনও প্রতিরোধ করিয়াছেন, বুর্জোয়াশ্রেণী তাহাদের শেষ করিয়াছে। যে শান্ত নৃশংসতার সহিত বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃতিবান কারবারীরা ভিয়েনা, আন্তওয়ার্প ও বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায়, স্পেনে, ফিলিপাইনসে, ভারত ও চীনের শহরে শহরে, সর্বত্র শ্রমিকদের হত্যা ও উৎসাদন করিয়াছেন, ঠিক সেই শান্ত নৃশংসতার সহিতই অতীতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী প্রাণান্ত প্রয়াসে সামন্ত-পন্থীদের সাহায্য করিয়াছেন ওয়াট টাইলারের বাহিনীর কৃষকদের, ফরাসীদের 'জ্যাকদের' ও টাবোবাইটদের উচ্ছেদ করিতে। যে সর্বজনবিদিত ঘৃণ্যতম অপরাধ-গুলি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছে যে, 'বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভিত্তিরূপ মানবতার' অস্তিত্ব আজ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, সেগুলির কি আর নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে? এ মানবতার কথা আর কেহ বলে না, কারণ নিশ্চয়ই তাহারা বুঝিয়াছে যে, যখন প্রায় প্রত্যহই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ক্ষুধিত শ্রমিক-দের গুলি করিয়া মারা হইতেছে, ক্ষুধিত শ্রমিকদের দিয়া জেল ভর্তি করা হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে সক্রিয় তাহাদের হয় ফাঁসীতে ঝোলানো হইতেছে অথবা দ্বীপান্তরে পাঠানো হইতেছে, তখন এই মানবতার কথা বলা লজ্জাহীনতার চরম হইবে। সাধারণত, বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও শ্রমজীবী জন-সাধারণের দুর্দশাভার লাঘবের চেষ্টা করে নাই। যেটুকু করিয়াছে তাহা দানের মধ্য দিয়া। এই দাক্ষিণ্য তো শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদার প্রতি অবমাননা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর মানবতা 'মানবসেবার' রূপ পরিগ্রহ করে; এই সেবার অর্থ লুণ্ঠিত ও বঞ্চিতকে ভিক্ষাদান। 'দক্ষিণ হাতে যাহা দান করিবে, বাম হাত যেন তাহা জানিতে না পারে।'—এই নির্বোধ প্রবঞ্চনামূলক নির্দেশটিকে আবিষ্কার করা হয় এবং ইহা সাধারণে গ্রাহ্য হয়। তাই, জীবনের প্রভুরা কোটি

কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়া সামান্য কয়েকটি পয়সা ইস্কুল, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রমে দান করেন। গোলকধাঁধার সাহিত্যিকেরা ‘পতিতের জন্য করুণা’র কথা প্রচার করিতে থাকে, কিন্তু পতিতেরা তো তাহারাই দোকানদাররা যাহাদের সর্বস্ব লুটিয়া, ফেলিয়া দিয়া, কাদার মধ্যে পায়ে মাড়াইয়া গিয়াছে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর মানবতা যদি আন্তরিক হইত, যদি মানুষের মধ্যে মানব-মর্যাদার সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিবার কোন আন্তরিক আগ্রহ তাহার থাকিত, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের ও সারা দুনিয়ার সংগঠকরূপী মানুষের মহিমা ও যৌথ-শক্তির চেতনা যদি মানুষের মধ্যে সে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে চাহিত, তাহা হইলে ‘দুঃখভোগ অনিবার্য’ এই ঘৃণিত মতাদর্শ মানুষের মনে সে কিছুতেই সঞ্চারিত করিয়া দিত না, কিছুতেই সে নিষ্ক্রিয় করুণার বাণী প্রচার করিত না, বরঞ্চ সমস্ত দুঃখভোগের বিরুদ্ধে, বিশেষত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে দুঃখ-ভোগের বিরুদ্ধে যে একটা জীবন্ত ঘৃণা জাগাইয়া তুলিত।

বিপজ্জনক কিছু তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে ও তাহার স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দিতেছে—শারীরিক যন্ত্রণা মানবদেহের এই সংকেত ছাড়া আর কিছুই নহে। যন্ত্রণা মানবদেহের আর্তচীৎকারঃ “মানুষ, নিজেকে রক্ষা কর।” তথাকথিত অলঙ্ঘ্য ও চিরন্তন শ্রেণীসম্পর্ক হইতে যে যন্ত্রণার উৎপত্তি, উঁচু ও নীচু জাতি-উপজাতিতে এবং ‘শ্বেতাঙ্গ’ অভিজাত ও ‘কৃষ্ণাঙ্গ’ ক্রীতদাসে মানবসমাজের অপমানকর গোত্র-বিভাগে যে যন্ত্রণার জন্ম, সেই অসম্মানকর যন্ত্রণাকেই মানিয়া লইবার নির্দেশ দিতেছে বুর্জোয়া মানবতা দুঃখভোগের তত্ত্বপ্রচারের মধ্য দিয়া। এই গোত্রবিভাগই বাধা দিতেছে শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থসাম্যের চেতনার উন্মেষকে। এই উদ্দেশ্যেই এই গোত্র বিভাগের সৃষ্টি।

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মানবতা অত্যন্ত স্পষ্ট। সে কখনও গলা ফাটাইয়া প্রতিবেশীকে ভালোবাসিবার মধুমাখা বাণী প্রচার করে না। পুঁজিপতিদের লজ্জাকর, রক্ততৃষাতুর, উন্মাদ উৎপীড়নের হাত হইতে সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসাধনই তাহার লক্ষ্য; সে চায় মানুষ যেন নিজেকে বুর্জোয়াদের সোনা ও বিলাসদ্রব্যের কাঁচামালরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য বলিয়া নিজেকে মনে না করে। বার্ধক্যের ব্যাধি ছাড়া নারীত্বকে পূর্ণ করিবার মত আর কিছু নাই যে অক্ষম স্থবিরের, সে যেমন স্বাস্থ্যবতী তরুণীকে বলাৎকার করে, তেমনই আজ এই দুনিয়াকে বলাৎকার করিতেছে পুঁজিবাদ। শ্রমিকশ্রেণীর মানবতা গীতিবিহ্বল প্রণয়কূজন শুনিতে চায় না, সে চায় প্রত্যেক শ্রমিক তাহার ঐতিহাসিক কর্তব্যকে উপলব্ধি করুক, উপলব্ধি করুক নিজের ক্ষমতার অধিকারকে, নিজের বিপ্লবী কার্যকলাপকে। পুঁজিপতিরা আজ মূলত তাহার বিরুদ্ধেই যে নূতন যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, সেই যুদ্ধের পূর্বাহ্ণে নিজের কার্যকলাপের তাৎপর্য উপলব্ধি আজ তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

[illegible] মানবতা চায়, [illegible] প্রতি, পুঁজিপতি ও তাহাদের দালালদের ক্ষমতার প্রতি, পরাশ্রয়ী, ফ্যাসিস্ত, কসাই ও শ্রমিকশ্রেণীর বেইমানদের

প্রতি, যাহা কিছু দুঃখ সৃষ্টি করে তাহার প্রতি, যে-কেহ কোটি কোটি মানুষের দুর্দশাকে উপজীব্য করিয়া বাঁচিতে চায় তাহার প্রতি বিদ্বেষের এক অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠুক। যে বাস্তব ঘটনাবলীর একটা খসড়া বিবরণ এখানে দেওয়া হইল, তাহা হইতেই বুর্জোয়া ও শ্রমিক সংস্কৃতির মূল্য সমস্ত চিন্তাশীল নরনারীর কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে বলিয়া আমি মনে করি। (১৯৩৫)

॥ হাজার চিঠি ॥

সম্প্রতি মস্কো বেতার স্টেশনগুলির একটি হইতে সারা দুনিয়ার শ্রোতাদের কাছে কয়েকটি বিভিন্ন ভাষায় কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। কয়েক হাজার উত্তর আসে। উত্তর আসে নানা রঙের, নানা আকারের খামে, বিশ্বপুঁজিবাদের ছোটবড় নানা শহরের ও নানা দুর্গম গ্রামের ডাকঘরের শীলমোহর বুকে লইয়া।

চিঠি আসিয়াছে যুবক ও বৃদ্ধের নিকট হইতে; চিঠি আসিয়াছে ডাক্তার, কারিগর, দোকানী, গৃহিণীদের নিকট হইতে; চিঠি লিখিয়াছেন ইংরাজ, স্প্যানিয়ার্ড, চেক, ড্যানিশ ও ফরাসী। কোন চিঠি হাতে লেখা, কোনটি বা টাইপ-করা। কিন্তু সকলেই লিখিয়াছেন স্বেচ্ছায় ও নিঃস্বার্থভাবে; আকাশপথে দূর হইতে ভাসিয়া-আসা সহজ ও জীবন্ত প্রশ্নগুলি তাঁহাদের মনে যে ভাব ও অনুভূতি জাগাইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করাই ছিল এই চিঠিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য।

"কেমন করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করা যায়?"—প্রশ্ন ছিল বেতারকেন্দ্রের।

"হয়ত বিপদের মুহূর্তে গণভোট লইলে যুদ্ধের আশংকা দূর হইবে। কারণ বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী জনসাধারণ চিরদিনই শান্তিকামী, এবং প্রায়ই উচ্চাভিলাষী নেতারাই তাহাদের যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া লইয়া যান।" কথাগুলি লিখিয়াছেন সুইজারল্যান্ডের একজন ডাক্তার। কিন্তু তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন গ্লাসগোর একজন শ্রমিক:

"আমি মনে করি চুক্তি ও সন্ধি যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারে, বন্ধ করিতে পারে না। বন্ধ করিতে পারে শুধু শ্রমিকশ্রেণী। সামরিক সমাবেশকালে বুর্জোয়া-শ্রেণী যখন তাহাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেয়, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করিয়া

যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারে শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক ব্যাখ্যার কাজ।"

বাস্‌ল্‌ হইতে পত্রে একজন শ্রমিক প্রশ্নটিকে সকল দিক হইতেই বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন ঃ

"পুঁজিপতিরা যুদ্ধকে বলে 'সংঘর্ষ'। আজকাল তাহারা যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু আমরা জানি, যতদিন পুঁজিবাদ আছে ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য, কারণ যুদ্ধ পুঁজিবাদেরই ফল। আমাদের হাতে এখন যুদ্ধকে রুখিবার শক্তিশালী হাতিয়ার রহিয়াছে ঃ (১) লালফৌজ ও ভারী শিল্পের অধিকারী সোবিয়েত ইউনিয়ন একটি শক্তিশালী শান্তির হাতিয়ার। (২) লীগ অব নেশনস্‌ ও লিট্‌ভিনভের শান্তি অভিযান। লিট্‌ভিনভ তাঁহার কাজ খুব চমৎকারভাবেই করিতেছেন। (৩) চীনা লালফৌজ। (৪) বিপ্লবী নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনসাধারণের যুক্তফ্রন্ট দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে এবং বুর্জোয়া-শ্রেণী যদি যুদ্ধ বাধায় তবে তাহাকে এজন্য গুরুমূল্য দিতে হইবে। ফৌজে যোগ দিতে যখন শ্রমিকদের ডাকা হয় তখন তাহাদের কঠোর শৃংখলার মধ্যে রাখা হয়, কিন্তু শীঘ্রই তাহারা জানিতে পারিবে অস্ত্র তুলিতে হইবে কাহাদের বিরুদ্ধে।"

বেতারকেন্দ্র হইতে আর একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল ঃ

"সোবিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় কীর্তি কি?"

উত্তরের বিচিত্র ঐক্যতান ঃ

"বুভুক্ষার বিরুদ্ধে জয়লাভ।"—(সাউথ ইংলন্ডের একজন শ্রমিক)

"নীপ্রোস্ট্রয়।"—(স্কটলন্ডের একজন শ্রমিক)

"সরকারী শাসনযন্ত্রে মেহনতী মানুষের ব্যাপক যোগদান।"—(একজন চাষী, সেভিল, স্পেন।)

"শান্তিরক্ষা।"—(একজন ছোট কারবারী, বৃটিশ আফ্রিকা।)

"এক বিশাল দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত নিরক্ষর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোটি কোটি চাষীকে সমবায়ী চাষীতে পরিণত করা সবচেয়ে বিস্ময়কর কীর্তি।"—(একজন মালী, ফ্রান্স।)

"সোবিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি"—(একজন শ্রমিক, লন্ডন।)

"ধর্মের উপর কমিউনিস্ট পার্টির জয়লাভ এবং জনশিক্ষা।"

—(একজন আফিস কর্মচারী, নরওয়ে।)

"নারীদের মুক্তি......"

"এতগুলি বিভিন্ন উপজাতি লইয়া গঠিত এতবড় বিশাল জাতির সংঘ গঠন......"

"বেকারীর বিলোপ সাধন।"

"রেশনিং বিলোপ—সোবিয়েতবিরোধী মিথ্যার প্রচারকদের মুখে চপেটাঘাত।"

"লীগ অব নেশনস্‌-এ সোবিয়েত ইউনিয়নের যোগদান ও বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্পর্ক স্থাপন।"

"শিল্পোন্নয়ন।"

"শ্রেণীর বিলুপ্তিসাধন।"

আর একটি প্রশ্ন ঃ "সোবিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী কাজ কি হবে?" এবারেও বহু উত্তেজিত ও ধ্বংসসূচক কলরব। কাহারও কণ্ঠে সুবিবেচনা, কাহারও কণ্ঠে হুঁশিয়ারী।

"যতদিন পর্যন্ত না সে অন্য সমস্ত দেশকে সুখে, সম্পদে, সমৃদ্ধিতে ম্লান করিয়া দিতে পারিতেছে ততদিন প্রারব্ধ কাজ চালাইয়া যাওয়াই সোবিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"—(ধাতুশ্রমিক, লীড্স, ইংলন্ড)

"যাহাই কর না কেন, যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িও না, অন্তত যতদিন পর্যন্ত না যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছ। তারপর আমাদের দ্বীপের শ্রমিকদের সাহায্যে আগাইয়া আসিও।"—(শ্রমিক, লেবর পার্টির সদস্য, বার্নলে, ইংলন্ড)

"সমস্ত আক্রমণকারীর হাত হইতে শ্রমিকদের দেশকে রক্ষা করিবার জন্য শক্তিশালী বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনী গড়িয়া তোল।"

"হাল্কা শিল্প গড়িয়া তোল।"

"আমলাতান্ত্রিকতাকে উচ্ছেদ কর।"

"সোবিয়েত ইউনিয়নে যে সকল হোয়াইট গার্ড ও প্রতিবিপ্লবী এখনও রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্তভাবে নির্মম লড়াই চালাইয়া যাও"

"যেমন শুরু করিয়াছ তেমনই আগাইয়া চল। যাহাতে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত-শ্রমিক অগ্রগামী শ্রমিকে পরিণত হইতে পারে; যাহাতে সমস্ত পরিকল্পনাই শতকরা একশ'ভাগ পূর্ণ হয়, সকলেই পড়িতে পারে।"

আগামী যুদ্ধ ও বিপ্লবের পান্ডুর কুয়াশার মধ্য দিয়া মানুষ ভবিষ্যতের গভীরে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। আজ হইতে বিশ বছর পরে দুনিয়ার চেহারা কি দাঁড়াইবে?

স্পেন হইতে দুইজন কৃষক উত্তর দিয়াছেন ঃ

"তখন মানুষের অবস্থা কি হইবে তাহা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস পুঁজিবাদ তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

তাহাদেরই একজন স্বদেশবাসী আর একজন স্প্যানিয়ার্ড, তাঁহার জবাবে আরও বেশী সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন ঃ

"সোবিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু ইউরোপ তখনও সোশ্যালিজম্ গঠনের পথে চলিয়াছে। কয়েকটি দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী সোবিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্য দিয়া বাঁচিবার পথ খুঁজিতে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের নিরস্ত করিবার মত শক্তি তখন শ্রমিকশ্রেণী অর্জন করিয়াছে। আমার মনে হয়, চীনের শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করিবে অত্যন্ত দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়া। কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে।"

আজ হইতে পঞ্চাশ বছর পরে? আজ হইতে একশত বছর পরে?

এই প্রশ্নের যে উত্তরগুলি আসিয়াছে সেগুলি আরও বেশী ঘটনাপ্রধান,

আরও বেশী এক ধরনের। এই উত্তরগুলি একটি গম্ভীর, প্রত্যয়সিদ্ধ ভঙ্গীতে লেখা। একজন অস্ট্রীয় শ্রমিক একটি 'বিশ্ব পরিকল্পনা কমিশনের', একটি 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক সোবিয়েতের', এবং একটি 'বিশ্ব কার্যকরী সমিতির' বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।.........

"রাষ্ট্রের সীমানাগুলি ভাষার সীমানার সহিত মিলিয়া যাইবে, প্রত্যেক জাতি-সত্ত্বার নিজের সরকার থাকিবে, ঔপনিবেশিক জনগণ মুক্ত হইবে।" "সমাজতন্ত্র জয়ী হইবে, জনসাধারণ সুখী হইবে, যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও অভাব বিলুপ্ত হইবে। যন্ত্রবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হইবে।"

কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন খুবই সতর্ক। এসেক্সের একজন দোকানীর বিশ্বাস 'আগামী একশত বৎসরের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন ও শিল্প-ক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা দেখা যাইবে। দুনিয়া আরও বেশী মানবিক হইয়া উঠিবে। আমার মনে হয়, আমরা বিবর্তনের পথ গ্রহণ করিব।'

তাঁহারই একজন দেশবাসী বার্মিংহাম হইতে লিখিয়াছেন ঃ "বর্তমান যুগ হইতে যন্ত্রের যুগ সুখের হইবে না।"

আগামী যুগ সম্পর্কে বিষণ্ণ অভিমত জানাইয়াছেন প্রাগের একটি ছাত্র।

"মানুষের বড় বড় হাত ও ছোট ছোট দেহ হইবে। সকলেই বেতারের সাহায্যে সমস্ত দুনিয়া দেখিতে পাইবে, গোপন বলিয়া কিছু থাকিবে না, মেয়েদের খুবই খারাপ সময় যাইবে।"

কিন্তু ক্লাগেনফুর্টের একজন রাজমিস্ত্রী ভবিষ্যতের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করেন ঃ

"নারী-পুরুষের সমতার জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভালবাসা ও বিবাহে আর দাসত্বের চিহ্ন থাকিবে না। বিবাহকে আর কামানের খোরাক উৎপাদনের একটা ব্যবহারিক পদ্ধতি বলিয়া মনে করা হইবে না। পরিবার দুঃখের উৎস না হইয়া হইবে আনন্দের উৎস, কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবার সৃষ্টি সহজ।"

জুরিখের একজন মোটর মেকানিক এই মতের সমর্থন জানাইয়াছেন ঃ

"শ্রেণীহীন সমাজে কোন দেহবিক্রয়কারিণী নারী থাকিবে না, সন্তানধারণও একমাত্র লক্ষ্য হইবে না নারীজীবনের। অন্ধকার ভবিষ্যতের কালো পর্দা ঝুলিবে না প্রেমিক-প্রেমিকার সম্মুখে। দৈহিক সহবাস হইবে পারস্পরিক প্রেমের পরম প্রকাশ। এবং এ সকল কিছুই সকলের স্বার্থের যৌথ দায়িত্বের চেতনায় চিহ্নিত হইবে।"

জনাকীর্ণ রাজধানীর অধিবাসীর ও দূর নির্জন গ্রামের বাসিন্দারা, বিশ্ব-জনতার সাধারণ মানুষেরা বর্তমান ও সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইভাবেই কথা বলে। কেহ দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করে, কেহ মুখ বুজিয়া সহ্য করে, কিন্তু সকলের মধ্যেই একটা গভীর অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে এই গ্রহের মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং এ অসন্তোষ আর শান্ত হইবে না। যখন পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ অঞ্চল ব্যাপিয়া নূতনভাবে গঠনের কাজ ইতিমধ্যেই

শেষ হইয়াছে এবং জীবনযাত্রা এমন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে, ন্যায়ের পথে, বহিতে শুরু করিয়াছে যে-পথে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ অসম্ভব, তখন কেমন করিয়া এই প্রতিবাদ, বিশ্ব পুনর্গঠনের এই ব্যাকুলতা স্তব্ধ হইবে? সুদূরের সুখী সোবিয়েত দেশ চুম্বকের মত তাহার হৃদয়ের মহত্তম, নির্ভীকতম তন্ত্রীতে টান দিতেছে; এই বিশ্বজনতার ভীড়ের মধ্যে সে আর নিজেকে নগণ্য, নিঃসঙ্গ মনে করে না। সীমান্তের অপর পারে রহিয়াছে তাহাদের রক্ষাব্যবস্থা, তাহাদের গৃহ, তাহাদের পরিবার, তাহাদের তপ্ত চুল্লীর আরাম, তাহাদের সমস্ত উদ্দাম কল্পনার পরিপূর্ণতা। একজন রক্ষাকর্তা লাভের এই অনুভূতি তাহাদের মহাপুরুষ নির্বাচনের মধ্য দিয়া সবচেয়ে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অবশ্য কোটি কোটি লোক এখনও খৃস্টধর্মের বাস্তব অথবা কাল্পনিক প্রতিষ্ঠাতাকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া মনে করে। কিন্তু মানবসমাজের যে শৃঙ্খলিত অংশে শ্রেণীচেতনার জাগরণ আসিয়াছে, সেখানে বিবর্ণ খৃস্টীয় পুরাণ কাহিনীর শক্তি ও প্রভাব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। হাজার হাজার পত্রের মধ্যে মাত্র খান কুড়িতে খৃস্টের প্রশংসা রহিয়াছে। পজিটিভিস্ট্ ও আধা-বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবীরা অন্যান্য নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নামগুলির মধ্যে আছে জেমস ওয়াট ('যন্ত্রযুগের প্রবর্তক'), হামফ্রে ডেভী ('মানুষের যন্ত্রণালাঘবের জন্য যন্ত্রণানিরোধকের আবিষ্কারক'), মাইকেল ফ্যারাডে ('বিরাট পদার্থবিজ্ঞানী'), প্লেটো ও সক্রেটিস। অন্যান্য নামগুলির মধ্যে আছে, আলেকজান্দার দি গ্রেট, জুলিয়াস সীজার ('কারণ তিনি আসিলেন, দেখিলেন, জয় করিলেন'), কেইর হার্ডি, মার্কনি, মহম্মদ।......সাদাম্পটনের একটি বালিকার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংলণ্ডের বর্তমান রাজা জর্জই শ্রেষ্ঠতম মানুষ। ("কারণ প্রজাদের তিনি নিজের পরিবারের মত দেখেন এবং তিনি অত্যন্ত দয়ালু")। তালিকাটিতে আব্রাহাম লিঙ্কন, কলম্বাস, লর্ড কিচেনার ও এডিসনের নামও পাওয়া যাইবে।

কিন্তু অধিকাংশ, একান্তভাবে ও বিপুল সংখ্যায় অধিকাংশ উত্তরেই দুইটি মানুষকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হইয়াছে। উত্তরগুলির মধ্যে এই ধরনের উত্তরের প্রাধান্য ও প্রাবল্য অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ নহে, কারণ মস্কো বেতার শুনিয়া যাহারা চিঠি লেখে তাহাদের বিশ্বাস ও সহানুভূতির রূপ অজানা নয়। উত্তরগুলিতে যাহা লেখা হইয়াছে, উত্তরগুলিতে যে পরিপক্কতা, চিন্তাশীলতা ও দুঃখভোগজাত বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাৎপর্যপূর্ণ হইতেছে তাহাই।

"ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন সেই শ্রমিকটি যাহার প্রথম সাহস হইয়াছিল সহ-শ্রমিকদের জন্য মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে ও দুঃখভোগ করিতে। তিনি কে ছিলেন আমি জানি না। এমন অনেকেই ছিলেন।"

কথাগুলি লিখিয়াছেন শিকাগো কারখানার একজন মেকানিক। এবং প্রতিধ্বনির মত জবাব আসিল বেলজিয়ামের একজন হোটেল-কেরাণীর নিকট হইতে :

"লেনিন। বিশ শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানুষ মানুষের যতখানি কল্যাণ করিয়াছেন, তাহার বেশী করিয়াছেন তিনি সাত বৎসরে। তুলনা

করুন, নিজেই বিচার করিয়া দেখুন। দীর্ঘজীবী হোন লেনিন। আজ হইতে একশ বছর পরে পৃথিবীতে এমন একটি শহর অথবা গ্রাম থাকিবে না যেখানে লেনিনের একটি চমৎকার স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। যেখানেই থাকিবে মর্যাদার আসন, সেখানেই সে আসন থাকিবে লেনিনের জন্য।"

আলজিয়ার্স হইতে একটি আরব ছাত্র ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন ঃ

"কার্ল মার্ক্স্। মার্কসের শিক্ষা না থাকিলে মার্কসীয় পরিকল্পনার উপর গঠনকার্য শুরু করিবার পরিবর্তে লেনিনকে এই পরিকল্পনা উদ্ভাবনের জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করিতে হইত। মার্ক্স্ ও লেনিনের মধ্যে কে বড় তাহা বিচার করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কারণ মার্কসবাদও রহিয়াছে, লেনিন-বাদও রহিয়াছে। একজন ছিলেন স্থপতি, অন্যজন একই সংগে স্থপতি ও নির্মাতা।"

লণ্ডনের একজন শ্রমিক লিখিতেছেন ঃ "ইতিহাসে বহু মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আমার কাছে তাঁহারাই সত্যকারের মহান যাঁহারা দাসত্ব ও অজ্ঞতা হইতে মানবসমাজকে মুক্ত করিবার জন্য নিজেদের প্রতিভা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। অতএব লেনিনকেই আমি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করি।"

অতীতের ইতিহাস ছাড়াও রহিয়াছে বর্তমানের ইতিহাস, আমাদের যুগের জীবন্ত ইতিহাস। এখানেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা বহু বিচিত্র ভাষায় হাজার হাজার হাতে একই চিন্তাকে পত্র-রূপ দিয়াছেন একই বিশ্বাসের আবেগ লইয়া।

"স্তালিন, যিনি সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত করিয়াছেন।" (একজন ইলেকট্রি-সিয়ান, কার্লস্টাড, সুইডেন।)

"মহাপ্রতিভা, স্তালিন।"—(খনিশ্রমিক, সেরাং, বেলজিয়াম।)

"স্তালিন। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকদের নিজেদের কাজ—মার্কস ও লেনিনের এই শিক্ষার সত্যতাকে তিনি শ্রমিকদের কাছে ও সমস্ত জগতের কাছে প্রমাণিত করিয়াছেন।"—(একজন আফিস কর্মচারী, ট্রণ্ডহাইম, নরওয়ে।)

"স্তালিন—স্তালিনের যত অনুগামী ও সমর্থক আছেন আমাদের যুগের আর কোন নেতার তাহা নাই।"—(একজন জাহাজী, ডিপফিল্ডস্, ইংলণ্ড।)

"আমরা তরুণ। আমাদের হাত ও মন বেদনাদায়ক আলস্যে টন টন করিতেছে। বাঁচিতে শুরু করিবার আগেই আমরা মরিয়া যাইতেছি। তাই পাঁচ-সালা পরিকল্পনা আমাদের কানে সঙ্গীতের মত বাজে। এ আমাদের স্বপ্ন।"
(একজন রেলকর্মী, নেমেকিব্রড, চেকোশ্লোভাকিয়া।)

"স্তালিন, যিনি বহু বৎসর কারাগারে বসিয়াছিলেন, তিনিই হইলেন, বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম যুগের—রুশ বিপ্লবের যুগের—সবচেয়ে সক্রিয় শক্তি।"
(শ্রমিক, ভাস্তেরাস, সুইডেন।)

"ইতিহাসে যে জাতি সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃংখল ছিঁড়িয়াছে, এবং যে জাতি ইতিমধ্যেই শ্রেণীহীন সমাজে পদার্পণ করিয়াছে, সেই জাতির অধিনায়কত্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তিনি। —(ডাক্তার, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া)

"স্তালিনই একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি জাতিনির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণসাধন করেন।"—(শ্রমিক, পস্‌চিয়েভ, সুইজারল্যান্ড)

"এ সম্মান স্তালিনের প্রাপ্য। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শতাধিক উপজাতি লইয়া গঠিত সতের কোটি মানুষের একটি জাতি সমাজতন্ত্র গড়িতে পারে।"

(কৃষক, নিউস্টাড, চেকোস্লাভাকিয়া।)

"সমস্ত মেহনতী মানুষই সর্বসম্মতভাবে সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান নেতাকে আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করে। তিনি সেই বিবেকবান প্রতীক-মানুষ যাঁহার বীরত্ব, শক্তি ও সাহস সর্বক্ষেত্রের মহান সংগ্রামের পথ সুগম করিয়াছে, চালিত করিয়াছে সে সংগ্রামকে সাফল্য হইতে সাফল্যের পথে, স্বপ্নের অতীতকেও সম্ভব করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে। লেনিনের নামের মত তাঁহার নামও মহান ও অমর।"—(প্লাম্বার, সালেৎ-পুই ইনফেরিউর, বেলজিয়াম।)

বিশ্বজনারণ্যের সাধারণ মানুষদের এই হাজার হাজার চিঠির লাইনগুলি জড়াজড়ি করিয়া দ্রুত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। এই চিঠির স্তূপ তো সমুদ্র হইতে নমুনা হিসাবে তুলিয়া লওয়া একটি জলবিন্দুর মত। পৃথিবীর মানুষের হাত-পা শেকলে বাঁধা। কিন্তু মুক্তির আলোকে ঝাঁপ দিবার জন্য, পুঁজিবাদের বাস্তিল দুর্গে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য তাহারা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আকুল, একাগ্র, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের চোখে। শুধু সোবিয়েতভূমির দিকে যখন তাহারা তাকায় তখন আশা, আনন্দ ও প্রশংসায় তাহাদের চোখ মমতাময় ও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

।। সংস্কৃতি-রক্ষা কংগ্রেসের প্রতি ।।

স্বাস্থ্যের জন্য আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ফ্যাশিবাদের আবির্ভাবে যাঁহারা নিজেদের তীব্রভাবে অপমানিত মনে করেন, যাঁহারা চোখের উপর দেখিতেছেন ফ্যাশিবাদের বিষাক্ত ভয়ঙ্কর ভাবধারা কিভাবে প্রসারলাভ করিতেছে, কিভাবে ফ্যাশিবাদ বিনা বাধায় নির্ভয়ে পাপের পর পাপ করিয়া চলিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আমি সত্যই দুঃখিত।

ফ্যাশিবাদ বুর্জোয়া-প্রজ্ঞার নূতন চীৎকার নহে। ইহা নৈরাশ্যের বিজ্ঞতার শেষ চীৎকার। ইউরোপীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সব কিছুর বিরুদ্ধেই তার হিংস্র বিতৃষ্ণাকে সে ক্রমেই বেশী নির্লজ্জতার সহিত প্রকাশ করিতেছে।

যে মানবপ্রেমিক সংস্কৃতির কীর্তিগুলি এতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর গর্ব ও দম্ভের বস্তু ছিল, কেন সেই 'মানবপ্রেমিক' সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে? আমরা জানি, যদি সে যুগের কুসীদজীবী ও কারবারীদের প্রয়োজন না হইত, তবে সামন্তবাদের ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্মকে লুথার অস্বীকার করিতেন না। আমাদের যুগে ব্যাঙ্কমালিক, কামানপ্রস্তুতকারী ও অন্যান্য পরাশ্রয়ীদের জাতীয় উপদলগুলি ইউরোপে আধিপত্যের অধিকার স্থাপনের জন্য, সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করিবার জন্য এক নূতন যুদ্ধের চক্রান্ত করিতেছে। এ যুদ্ধ হইবে বিভিন্ন জাতির উচ্ছেদের যুদ্ধ। বুর্জোয়া মানবতা চিরদিনই বুর্জোয়ার হাতে 'আড়াল করিয়া রাখিবার উপকরণ হিসাবে' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই উপকরণ দিয়াই বুর্জোয়াশ্রেণী পেতি বুর্জোয়াদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিজেদের

দিকে টানিয়া আনিয়াছে, কিন্তু আজ বুর্জোয়া 'সংস্কৃতির ভিত্তি' এই বুর্জোয়া মানবতাকেও বুর্জোয়াশ্রেণী ধ্বংস করিতে চায়। কারণ, নূতন নরমেধের আয়োজনে মানবতার ধারণাকে ফ্যাশিবাদ তাহার মূল লক্ষ্যের বিরোধী মনে করে।

ফ্রান্সের লেখকদের উদ্যোগে দুনিয়ার সমস্ত সৎ লেখকেরা আজ ফ্যাশিবাদ ও তাহার সমস্ত পাপিষ্ঠতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন।

'সংস্কৃতির অধিকর্তাদের' পক্ষে এই মহান লক্ষ্য খুবই স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানীরাও যে শিল্পীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন নিশ্চয়ই এ আশাও করা যায়।

কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে, ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে মানবতার যুক্তি দ্বিপদ নেকড়ে ও বরাহের বুদ্ধির নাগালের বাহিরে এবং মানবতার সর্বজনীন তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ও তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবার ক্ষমতা দুনিয়ায় মাত্র একটি শ্রেণীরই আছে। এই শ্রেণী শ্রমিক-শ্রেণী।

অতএব, যাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন অসম্ভব তাহাদেরই সমন্বয়সাধনের দিকে এবং যে বুর্জোয়া সমাজ শত্রুতা ছাড়া, মানবজাতির বৃহত্তম অংশকে নিপীড়ন করা ছাড়া বাঁচিতে পারে না, সেই বুর্জোয়া সমাজের সংস্কারের দিকে যেন আমাদের প্রচেষ্টা আমরা চালিত না করি। কোটি কোটি মেহনতী মানুষের অন্তর্নিহিত মানসশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিবার কাজেই যেন আমরা আমাদের সর্বপ্রয়াস, সর্বশক্তি নিয়োগ করি।

শ্রমিকশ্রেণীর মানবতাই একমাত্র সত্যকার মানবতা। বর্তমান জগতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূলটির পরিবর্তনসাধনের মহান কর্তব্য পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে শ্রমিকশ্রেণী। যে-দেশে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে সে দেশে আমরা দেখিতেছি জনসাধারণের মধ্যে কি বিপুল শক্তি সুপ্ত ছিল, দেখিতেছি কত প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে এই জনতার মধ্য হইতে, দেখিতেছি নূতন আধেয় দিয়া কত দ্রুত সেখানকার জীবনের আধারে পরিবর্তন ঘটাইতেছে শ্রমিকশ্রেণী।

প্রিয় কমরেডগণ, চিন্তাশীল মানুষের আন্তরিক বাণীকে উপলব্ধি করিতে পারে শুধু শ্রমিকেরা, সংস্কৃতির হস্তশিল্পীরা, মেহনতী বু[illegible] ও মেহনতী কৃষকেরা। ইহারাই সংস্কৃতির অধিকর্তা হইতে চায়, ইহা[illegible] অধিকর্তা হইবার যোগ্যতা রাখে।

ম্যাক্সিম গোর্কি